

বনফুল

রচনাবলী ২৩

বনফুল রচনাবলী

ত্রয়োবিংশ খণ্ড

শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়

গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড ॥ কলকাতা-৭০০০৭৩

সম্পাদনায় :
সরোজমোহন মিত্র
নিরঞ্জন চক্রবর্তী

প্রথম প্রকাশ : ১৩৬৭
সম্পাদনায় :
সরোজমোহন মিত্র
নিরঞ্জন চক্রবর্তী

প্রকাশক :
আনন্দরূপ চক্রবর্তী
গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড
১১এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০৭৩

মুদ্রাকর :
ফটো-টাইপ সেটিং
গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড

মুদ্রণ : প্রিন্ট ও-গ্রাফ
ভবাণী দত্ত লেন,
কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রচ্ছদ রূপায়ণে :
আনন্দরূপ চক্রবর্তী

সূচীপত্র

উপন্যাস :

আকাশবাসী

।। এক ।।

আকাশবাসী গভীর রাত্রে ধড়মড় করে উঠে বসল বিছানায়। এমন অদ্ভুত ভয়াবহ স্বপ্ন সে দেখল কেন? ঘরে একটা দেওয়াল ঘড়ি ছিল। সে বলে চলেছে—ঠিক্ ঠিক্ ঠিক্ ঠিক্ ঠিক্। আলো জ্বেলে দেখল একটা বেজেছে। স্তব্ধ হয়ে বসে রইল কিছুক্ষণ। এমন স্বপ্ন দেখবার কল্পনাও সে করেনি কখনও। দেখল আকাশে এক জ্যোতির্ময় মূর্তি—গায়ের রং টকটকে লাল—জবাফুলের মত। তার দিকে নির্নিমেষে চেয়ে আছে।

"আপনি কে—"

সভয়ে জিজ্ঞাসা করল আকাশ।

"আমি সূর্যের উপাসক। যে সূর্যকে প্রত্যহ তুমি এই মন্ত্র পাঠ করে বন্দনা কর—জবাকুসুম সঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং, ধ্বান্তারিং সর্বপাপঘ্নং প্রণতোইস্মি দিবাকরং—সেই সূর্যের আমিও উপাসক। আমি তোমার প্রপিতামহের প্রপিতামহ অনন্তনারায়ণ দেবশর্মা। আমরা সাগ্নিক ব্রাহ্মণ। আমাদের জন্মকালে প্রসবগৃহে যে অগ্নি আমাদের অভ্যর্থনা করতেন, সেই অগ্নিকে আমরা সারাজীবন রক্ষা করতাম, সেই অগ্নিতেই আমাদের হবিষ্যান্ন প্রস্তুত হত, সেই অগ্নিকেই আমরা প্রত্যহ পূজা করতাম, অবশেষে সেই অগ্নি দিয়ে চিতা জ্বেলে তাতেই আমাদের নশ্বর মরদেহ দাহ করা হত। সে অগ্নি তখন অগ্নির চিরন্তন উৎস সূর্যে লীন হয়ে যেত। এ প্রথা কিন্তু এখন আমাদের বংশে আর প্রচলিত নেই। সে অগ্নি নির্বাপিত হয়েছে। দেশে আর ব্রাহ্মণ নেই, ক্ষত্রিয় নেই, বৈশ্যও নেই—সব শুদ্র। সব দাস। তোমার বাবা কবি ছিলেন তাই তোমার নাম রেখেছেন আকাশবাসী। আমি লক্ষ্য করলাম তোমার মনের ভিতর সাগ্নিক ব্রাহ্মণ বংশের অগ্নি ধীরে ধীরে জ্বলছে। তোমার মন আদর্শ খুঁজে বেড়াচ্ছে, কিন্তু পাচ্ছে না। চারিদিকে মনুষ্যবেশী পশুর দল দেখে তুমি দিশেহারা হয়ে পড়ছ। আমি আজ তোমাকে বলতে এসেছি তোমার আদর্শ প্রত্যহ তোমার চোখের সম্মুখে উদিত হচ্ছে, ওই জবাকুসুম সঙ্কাশং সূর্যই ব্রাহ্মণের আদর্শ। তিনি আলোর উৎস, জ্ঞানের উৎস, সর্বপ্রকার মঙ্গলের উৎস। তাঁরই ধ্যান আমি জন্মজন্মান্তর করছি, তুমিও কর।"

আকাশ প্রশ্ন করল— "আপনার গায়ের রং জবাফুলের মত লাল কেন?"

"লাল নাকি? আমার গায়ের রং কেমন তা আমি দেখতে পাচ্ছি না। বহুকাল সূর্যের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থেকে আমি তপস্যা করেছি তাঁর। তাই আমার চোখের দৃষ্টি নষ্ট হয়ে গেছে। এখন আমি অনুভূতি দিয়ে দেখি। আমার দেহও বারবার বিলুপ্ত হয়েছে। বিলুপ্ত হয়নি কেবল আমার সূর্য তপস্যা। সেই জবাকুসুম-সঙ্কাশ জ্যোতির্ময় সর্বপাপঘ্ন সূর্যকেই আমি অহরহ ধ্যান করছি, তাই আমি এখন যে দেহ ধারণ করে আছি তাতে তাঁর বর্ণের ছাপ পড়েছে, হয়তো আমি তাঁর সমীপবর্তী হয়েছি।"

"আপনি তপস্যায় এখনও সিদ্ধি-লাভ করেননি?"

"না। যেদিন সিদ্ধিলাভ করব সেদিন সূর্যে লীন হয়ে যাব। সূর্যের বাইরে আর আমার অস্তিত্ব থাকবে না।"

বলেই সহসা তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

আকাশ চুপ করে বসে রইল বিছানায় রোমাঞ্চিত হয়ে। এ রকম অদ্ভুত স্বপ্ন সে দেখল কেন? তার প্রপিতামহের প্রপিতামহ কে ছিলেন সে জানত না। সে পিতামহের নাম পর্যন্ত জানে, পিতামহের বাবার নামও জানা নেই তার। তাদের বংশ-তালিকাও নেই বাড়িতে। এসব কথা ভাবেওনি কোনোদিন। তবে সে তার বাবার মুখে শুনেছিল যে তারা সাগ্নিক ব্রাহ্মণ বংশের সন্তান। যদিও জন্মদিনের অগ্নিকে আমৃত্যু রক্ষা করার প্রথা বহুদিন আগেই উঠে গিয়েছে। তার বাবা কবি ছিলেন। তিনি 'সূর্য সন্ধানে' বলে একটি কাব্যও লিখেছিলেন। সে কাব্যে তিনি সূর্যের পত্নী সংজ্ঞা এবং পরিচারিকা ছায়াকে নিয়ে যে কবি-প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন তা লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে গেছে, কারণ তিনি লিখতেই ভালোবাসতেন কিন্তু তা প্রচার করবার দিকে তাঁর মোটেই আগ্রহ ছিল না। দু'চারজন রসিক বন্ধুকে তা পড়ে শুনিয়েই তৃপ্ত থাকতেন তিনি। অনেকদিন আগেই তাঁর লেখায় পাণ্ডুলিপিগুলি নষ্ট হয়ে গেছে। তিনি তাঁর একমাত্র পুত্রের নাম রেখেছিলেন আকাশবাসী, কাব্য লিখেছিলেন সূর্যকে নিয়ে। আজ তার প্রপিতামহের প্রপিতামহ স্বপ্নে দেখা দিয়ে—তাকে বলে গেলেন আমি আজও সূর্যের তপস্যা করছি। এ কি অদ্ভুত যোগাযোগ! তারপর তার মনে হল আমি বিজ্ঞানের ছাত্র, বিজ্ঞানের অধ্যাপনা করি, সামান্য একটা স্বপ্ন নিয়ে এত বিচলিত হওয়া কি ঠিক হচ্ছে? দেওয়ালের ঘড়ি সঙ্গে সঙ্গে যেন উত্তর দিল—ঠিক্ ঠিক্ ঠিক্ ঠিক্। ঘড়িটার দিকে চাইল একবার। তারপর আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়ল আকাশ। ঘুম কিন্তু এল না। চোখ বুজে শুয়ে রইল। হঠাৎ মনে পড়ল কারেন্টের কথা। তার বান্ধবী এবং সহকর্মিনী স্রোতস্বিনীকে সে 'কারেন্ট' বলে ডাকে। প্রথম যেদিন সে দিল্লী থেকে এসে তার সহকারিণী হিসাবে কাজে যোগ দিয়েছিল সেই দিনই আকাশ তাকে বলেছিল— "দেখুন, প্রথমেই একটা কথা বলতে চাই। আপনার নাম স্রোতস্বিনী আচার্য—ইংরেজিতে সেটা হয়ে গেছে আচারিয়া। এই নামে আপনাকে সর্বদা ডাকতে আমার ইচ্ছে করছে না। আপনাকে ছোট্ট একটা নাম দিতে চাই—কারেন্ট। আপনার আপত্তি আছে?"

স্রোতস্বিনী আপত্তি করেনি। খুশি হয়েছিল। কিন্তু ওই নামে আকাশই তাকে ডাকে। আর সবাই তাকে মিস আচারিয়া বলেই ডাকে। স্রোতস্বিনী রূপসী নয়। কিন্তু অনেক পুরুষই তাকে দেখে আকৃষ্ট হয়। একদিন এক কাণ্ড হল। একজন অধ্যাপক একটু বাড়াবাড়ি রকম ঘনিষ্ঠতা করতে গিয়েছিল তার সঙ্গে। হাত ধরে টেনেছিল নাকি। স্রোতস্বিনী তার গালে ঠাস করে একটা চড় মেরে ছাড়িয়ে দিয়েছিল হাতটা। এ নিয়ে কোনো হই-চই করেনি সে। আকাশকেই শুধু সে বলেছিল কথাটা। খুব খুশি হয়েছিল আকাশ। হেসে বলেছিল "দেখছি তুমি জলের কারেন্ট নও। ইলেকট্রিক কারেন্ট।"

আকাশ নিজে নির্মল চরিত্র। কিন্তু সে লক্ষ্য করত আজকাল অনেক অধ্যাপক অধ্যাপিকা চরিত্রহীন। অনেকে মদ্যপ, অনেকে ঘুষখোর। টাকা নিয়ে প্রশ্নপত্র বলে দেন। ছেলেদের ভালো করে পড়ান না। বস্তুত শিক্ষাক্ষেত্র থেকে সততা যেন অবলুপ্ত হচ্ছে। তার স্থান নিয়েছে ষড়রিপু। ছাত্রছাত্রীদের চরিত্র গঠনই শিক্ষার লক্ষ্য ছিল এদেশে। আজকাল হয়েছে যেন-তেন-প্রকারেণ ডিগ্রী লাভ। তাই সমাজের প্রতি স্তরে দুর্নীতি। স্বাধীনতার পর সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে এ দুর্নীতি প্রবেশ করেছে। চারিদিকেই পাপ।

পাপ যেন একটা বিরাট ময়াল সাপের মত আমাদের সমাজদেহকে জড়িয়ে ধরেছে। নিষ্পিষ্ট করছে, তারপর গিলে ফেলবে। অথচ কোথাও কোনো প্রতিবাদ নেই। সে নিজেও তো এই গড্ডলিকা প্রবাহে ভেসে চলেছে। মনে পড়ল অনুশীলন সমিতির কথা। তারা প্রাণ দিয়ে অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছিল, কাঁপিয়ে দিয়েছিল অতবড় বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তি। তার এক দূরসম্পর্কের কাকা সেই অনুশীলন সমিতির সভ্য ছিলেন। তাঁর মুখে সেই বীর যুবকদের অনেক কাহিনী শুনেছে সে। তিনি এখনও বেঁচে আছেন। হুগলী জেলার এক গ্রামের বাড়িতে থাকেন। আজন্ম ব্রহ্মচারী তিনি। তাঁর কেউ নেই। গ্রাম ছেড়ে কলকাতায় আসতে চান না। আকাশই তাঁর খরচ পত্র চালায়। তাঁর কাছে থাকে তাঁর এক বিধবা বোনঝি শৈল। আর পুরাতন ভৃত্য মাধব। পূর্বপুরুষের বিঘে পাঁচেক জমি আছে। মাধবই সেটা ভোগ করে। আকাশ মাঝে মাঝে যায় তার কাকার কাছে। তাঁর বয়স নব্বই। কিন্তু এখনও তিনি সমর্থ আছেন। রোজ হেঁটে গঙ্গাস্নান করে আসেন। বাড়ির কাছেই গঙ্গা। দিনে ঘুমোন না। সমস্ত দুপুর বসে থাকেন চোখ বুজে। চোখ দিয়ে অনবরত জল পড়ে। শৈল বলে দিনরাত কি যে ভাবেন জানি না। কারো সঙ্গে মিশতে চান না। রাতে এক বাটি দুধ খেয়েই শুয়ে পড়েন। মনে হয় রাতেও ঘুমোন না।

খুব ভোরে উঠে গঙ্গাস্নান করতে যান। চোখে এখনও দেখতে পান বেশ। স্মৃতিশক্তিও বেশ আছে। সমস্ত গীতা মুখস্থ। বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা থেকে আবৃত্তি করতে পারেন। সমস্ত স্বদেশী গান মুখস্থ। মুকুন্দ দাস, গোবিন্দ দাস, রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল এবং আরো অনেক অবিখ্যাত কবির গান গড়গড় করে বলে দিতে পারেন তিনি। একবার আকাশ তাঁকে বলেছিল—"শৈল বলেছিল আপনি রোজ কাঁদেন। কাঁদেন কেন?"

"কাঁদা ছাড়া আর কি করবার আছে। কাঁদি শুধু হেরে গেছি বলে নয়, কাঁদি আমাদের দেশের লোকরা আমাদের বিরোধিতা করেছিল টাকার লোভে। তখন স্বদেশপ্রেমিকদের চেয়ে স্পাই বেশি ছিল। আমাদের দলের লোকেরাই স্পাই হয়ে গিয়েছিল অনেকে। নরেন গোঁসাই অনেক ছিল। অরবিন্দ সেইজন্য ও পথ ছেড়ে দিয়ে ধর্ম-পথে চলে গেলেন। বুঝেছিলেন এই সব অর্থলোলুপ কাপুরুষদের দিয়ে বিদ্রোহীদের দল গড়া যায় না। তা সত্ত্বেও অগ্নিযুগের অগ্নি নিবে যায়নি। অনেক বীর যুবক আশ্চর্য বীরত্ব দেখিয়ে চমকে দিয়েছিল বৃটিশ সাম্রাজ্যকে। কিন্তু প্রতিবারই এই স্পাইদের জন্যেই তারা ধরা পড়েছে। রাসবিহারী ঘোষ জাপানে পালিয়ে গিয়ে জাপানী বিয়ে করে বেঁচে ছিলেন কিছুদিন। এবং তিনিই পরে আর একজন বিদ্রোহী পলাতক সুভাষচন্দ্র বসুকে আই. এন. এ. বাহিনীর নেতা করেছিলেন। সেই নেতাজী যুদ্ধ করে প্রথম ভারতবর্ষের একটুকরো জমি দখল করে সর্বপ্রথম ভারতের স্বাধীনতা-পতাকা উড়িয়েছিলেন। জাপানীদের সাহায্য পাননি বলে শেষ পর্যন্ত হেরে গিয়েছিলেন বটে, কিন্তু ওই আই. এন. এ বাহিনীর ধাক্কা যখন ভারতবর্ষের সৈন্যদের মধ্যে অসন্তোষ জাগাল তখন ইংরেজ বুঝলেন এ দেশ আর শাসন করা যাবে না। তখন ঠিক করলেন এবং আমাদের নেতাদের জানালেন যে তাঁরা আমাদের স্বাধীনতা দান করবেন। তার আগেই তাঁরা হাত করেছিলেন কংগ্রেসের ভূতপূর্ব সেক্রেটারি মহম্মদ জিন্নাকে এবং তার পূর্বে কবি মহম্মদ ইকবালকে। মসজিদের সামনে বাজনা বাজানো নিষিদ্ধ হল, শুক্রবার দিন মুসলমানদের নমাজ করবার জন্য বিশেষ ছুটি দেওয়া হতে লাগল। চাকরিতে মুসলমানদের বেশি সুবিধা দেওয়া হতে লাগল। মুসলমানরা যাতে বেশি সংখ্যায় কাউনসিলে ঢুকতে পারে তার জন্য আলাদা ব্যবস্থা হল, প্রকাশ্য স্থানে গরু কাটা।

লাগল, হিন্দু মুসলমান দাঙ্গা একটা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে উঠল। তারপর প্রচার করা হতে লাগল মুসলমান আলাদা একটা 'নেশন'। তার প্রতিবাদ করে আমাদের হিন্দু নেতারা বড় বড় বই লিখলেন। পরে যিনি আমাদের প্রথম প্রেসিডেন্ট হলেন সেই রাজেন্দ্র প্রসাদও বড় বই লিখেছিলেন একটা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুই হল না। মাউন্ট-ব্যাটেন যখন স্বাধীনতা দান করতে এলেন তখন তিনি ভারতবর্ষকে ভাগ করে হিন্দুস্থান ও পাকিস্তান করে দিয়ে গেলেন। ভারতে বাঙালিরা আর পাঞ্জাবিরা ছিল ইংরেজের শত্রু। তাদের সর্বনাশ করে দিয়ে গেলেন তিনি। আর আমাদের নেতারা— এমন কি মহাত্মা গান্ধি পর্যন্ত মেনে নিলেন সেটা। রক্তের স্রোত বইতে লাগল দেশে। পূর্ববঙ্গ থেকে হিন্দু বাঙালিরা পালিয়ে এল মুসলমানদের অকথ্য অত্যাচারে। এখনও বহু উদ্বাস্তু গৃহহারা। জওহরলাল নেহেরু পাঞ্জাবিদের জন্য সুব্যবস্থা করলেন, কিন্তু বাঙালিদের জন্য করলেন না। মনে হয় তাঁর বন্ধু মাউন্টব্যাটেন তাঁর কানে কানে বলেছিলেন বাঙালি আমাদের শত্রু। ওদের নিশ্চিহ্ন করে দাও। স্বাধীনতার পর থেকে বাঙালি-নিধন যজ্ঞ চলছে। কাঁদব না তো কি করব? আর তো কিছু করবার নেই। স্বাধীনতার পর যে বাঙালি জাত সৃষ্টি হয়েছে তারা অধিকাংশই অমানুষ। খোশামুদে, ভিক্ষুক। তাদের কাছে মহৎ কিছু, বৃহৎ কিছু প্রত্যাশা করি না। আমি বৃদ্ধ হয়েছি, কিছু করবার সামর্থ্য নেই। তাই বসে বসে কাঁদি...

দেওয়ালের ঘড়িটা বলতে লাগল "ঠিক ঠিক ঠিক ঠিক—"

উঠে পড়ল আকাশ।

বিছানার উপর বসে হাত জোড় করে চোখ বুজে বলতে লাগল—

ওঁ জবাকুসুম সঙ্কাশং
কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্
ধ্বান্তারিং সর্বপাপঘ্নং
প্রণতোঽস্মি দিবাকরং।

তারপর বিছানা থেকে উঠে বাথরুমে গিয়ে অনেকক্ষণ ধরে স্নান করল সে। তারপর ছাতে এসে বসল আসন পেতে পূর্ব দিকে মুখ করে।

আকাশের চারতলা প্রকাণ্ড বাড়ি। ধনী পিতার একমাত্র পুত্র সে, একমাত্র উত্তরাধিকারী। আকাশের পিতা তাঁর পিতার বিপুল ঐশ্বর্য পেয়েছিলেন। তিনি সারাজীবন গান বাজনা, সাহিত্য কাব্য নিয়ে জীবন কাটিয়েছেন। আকাশকে প্রসব করবার কিছুদিন পরে তার মা মারা যান। আকাশের বাবা দ্বিজোত্তম আর বিবাহ করেননি। আকাশকে মানুষ করবার ভার নিয়েছিলেন তাঁর গুরুপত্নী পুণ্যবতী। তাঁর গুরুদেবের নাম ছিল বাল্মীকি ওঝা। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। কিন্তু তাঁর একটি ছোট টোল ছিল এবং সেখানে দুটি ছেলে সর্বদা থাকত। সবাই গরিবের ছেলে। তাদের ভরণ-পোষণ শিক্ষা সমস্তরই ভার নিয়েছিলেন তিনি। তাঁর কিছু ব্রহ্মোত্তর সম্পত্তি ছিল তাই থেকে কোনো রকমে ব্যয় নির্বাহ হয়ে যেত। তিনি দরিদ্র ছিলেন কিন্তু তাঁর পাণ্ডিত্যের ঐশ্বর্য এবং ব্রাহ্মণত্বের মহিমা তাঁকে সর্বজনশ্রদ্ধেয় করেছিল। ওই অঞ্চলে দ্বিজোত্তমবাবুর কিছু বিষয় ছিল। বাল্মীকি পণ্ডিতের পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন তিনি। তাঁকে কিছু জমি দান করবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন যখন তখন বাল্মীকি পণ্ডিত বললেন— "আমি কারো দান গ্রহণ করি না। আমার পৈতৃক যে সম্পত্তি আছে তাতেই আমার কুলিয়ে যায়। আর জমি নিয়ে কি করব?"

দ্বিজোত্তম আরও খুশি হলেন। ঘনিষ্ঠতা বাড়তে লাগল। ক্রমশ তিনি বুঝতে পারলেন বাল্মীকি

ঠাকুর একজন তপস্বী। তাঁর ইচ্ছে হল তাঁর কাছে মন্ত্র নেবেন। বাল্মীকি ঠাকুর কিন্তু মন্ত্র দেননি। বলেছিলেন—"ভগবান তোমার চারদিকেই আছেন। তোমার ভগবানকে তুমি খুঁজে নাও। আমিও খুঁজছি। আমি তোমাকে কি মন্ত্র দেব? ব্যাকুল ভাবে খোঁজাটাই আসল মন্ত্র।"

দ্বিজোত্তম কিন্তু মনে মনে বাল্মীকিকে গুরুপদে বরণ করেছিল। গরিব ঘরের ছোট ছেলেদের তিনি নিজের পাঠশালায় ভরতি করতেন। তাদের নিজের বাড়িতে রাখতেন এবং পড়াতেন। ছ'বছর বয়সের অধিক-বয়স্ক শিশু নিতেন না তিনি। দশ বছর পর্যন্ত তাদের নিজের বাড়িতে রাখতেন। তারপর তাদের শিক্ষা সমাপ্ত হলে আর দুটি ছেলে নিতেন। বাংলা, ইংরেজি এবং মোটামুটি অঙ্ক শেখাতেন তাদের। রোজ সন্ধ্যাবেলা রামায়ণ, মহাভারত আর পুরাণ থেকে গল্প শোনাতেন তাদের। খুব ভোরে তাদের সঙ্গে নিয়ে গঙ্গাস্নান করতে যেতেন। তাদের সাঁতার শেখাতেন। তাদের স্বাবলম্বী হওয়ার শিক্ষা দিতেন। বলতেন, নিজের কাজ নিজের হাতে করতে হবে। তাঁর লক্ষ্য ছিল ছেলে দুটি যাতে স্বাস্থ্যবান এবং সচ্চরিত্র হয়। বিকেলে তিনি আর পাড়ার অন্য ছেলেরা নানা রকম দেশি খেলাও করতেন ছুটোছুটি করে। পাড়ার সব ছোট ছেলেদেরই আড্ডা ছিল তাঁর বাড়িতে। সন্ধ্যাবেলায় গল্প শোনার লোভে অনেক ছেলে আসত। বয়স্ক লোকও আসতেন দু'একজন। চমৎকার গল্প বলতে পারতেন বাল্মীকি পণ্ডিত। আকাশের বয়স যখন চার বছর তখন তার মা মারা গেল। দ্বিজোত্তম গেলেন বাল্মীকি পণ্ডিতের কাছে। তাকে গিয়ে বললেন— "আমি গান বাজনা আর সাহিত্য নিয়ে থাকি। আমি আর বিবাহ করব না। কিন্তু ভাবছি ছেলেটিকে কি করে মানুষ করব। বাড়িতে চাকরবাকর আত্মীয়পরিজন অনেক আছে, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে স্নেহময়ী জননীর স্থান পূর্ণ করতে পারে এমন লোক আমার বাড়িতে নেই। আমার ভয় হচ্ছে আমার বাড়িতে যারা আছে তাদের সংসর্গে থাকলে আকাশ অমানুষ হয়ে যাবে। তাই আমি একটি প্রস্তাব নিয়ে এসেছি, কিন্তু বলতে সাহস পাচ্ছি না।"

"কি প্রস্তাব?"

"আমি আকাশকে আপনার কাছে রেখে দিতে চাই। মায়ের কোলে ও যদি মানুষ হয় তাহলে আমি নির্ভয় থাকব।"

"তোমার মাকে জিগ্যেস কর। সে যদি রাজি হয় আমার আপত্তি নেই। সব ঝঞ্ঝাট তো তাকেই পোয়াতে হবে। আর একটা কথা বলছি, সেটা ভেবে দেখ। তুমি বড়লোক। তোমার ছেলেকে কিন্তু আমার ঘরে গরিবের মত থাকতে হবে। কোনো রকম বিলাসিতা চলবে না।"

"না, না, আপনি যা বলবেন তাই হবে।"

"আমি তোমার কাছে কোনো অর্থ নেব না।"

তারপর হেসে বললেন—"বিদ্যা বিক্রয়ং ন করোমি।"

"আপনি যা আদেশ করবেন তাই হবে।"

পুণ্যবতী সানন্দে গ্রহণ করেছিলেন আকাশকে। আকাশ বাল্যকালে দশ বছর বয়স পর্যন্ত তাঁর কাছে ছিল। দ্বিজোত্তমবাবু অনেক অনুনয় করে বাল্মীকি পণ্ডিতকে একটি উপহার নিতে সম্মত করতে পেরেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "আপনি যদি অনুমতি দেন আমি একটা ভালো দুগ্ধবতী গাভী ছেলেদের দুধ খাবার জন্য উপহার দেব এবং তার ব্যয়ভার আমি বহন করব।" বাল্মীকি পণ্ডিত হেসে বলেছিলেন— "এদেশের অধিকাংশ ছেলেরাই মাতৃদুগ্ধ ছাড়া অন্য দুগ্ধ পায় না। অনেকেরই গরু পোষবার সামর্থ্য নেই। আমরাই বা দুধ খাব কেন?"

"শুনেছি দুধটা পুষ্টিকর খাদ্য। বিশেষ করে ছেলেদের পক্ষে খুব উপকারী। আমি ছেলেদের জন্যই গাইটি দেব। সের পাঁচেক দুধ হবে। আপনি সেটা পাড়ার অন্য ছেলেদেরও দিতে পারেন।"

"আমি ওসব ঝঞ্ঝাটের মধ্যে যেতে চাই না। তোমার মাকে জিজ্ঞাসা কর।"

পুণ্যবতী গাভীটি নিতে রাজি হয়েছিলেন। বলেছিলেন— "উনি তো ভাতে ভাত আর ঘি খান। আমরা সবাই তাই খাই। তবে আমি ছেলেদের জন্য ছোট মাছ কিনি। যখন যা জোটে খায় ওরা। বাড়িতে পেয়ারা গাছ, আম গাছ আর নারকেল গাছ আছে। তা তুমি গাই দিতে চাইছ দিয়ে যাও। দুধটা ছেলেদের পক্ষে সত্যি ভালো। তবে উনি দুধটুধ খাবেন না।"

দ্বিজোত্তম তাঁর প্রতিশ্রুতি পালন করেছিলেন। বাল্মীকির বাড়ির কাছে তাঁর নিজের জমি ছিল। সেইখানে একটা পাকা গোয়াল ঘর বানিয়ে একটি বড় গাভী এবং গোয়ালা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন সেখানে। সে গাভীর দুধ যখন বন্ধ হয়ে যেত তখন সেটিকে নিজের জমিদারিতে পাঠিয়ে আর একটি সদ্গুণ সবৎসা গাভী পাঠাতেন সেখানে। তিনি যতদিন বেঁচে ছিলেন ততদিন এই ব্যবস্থা বহাল ছিল। দশ বছর বয়সে যখন আকাশ কলিকাতায় ইংরেজি স্কুলে ভরতি হল তখনও প্রতি বছর বাল্মীকি পণ্ডিতের পাঠশালায় গাভী পাঠাতেন দ্বিজোত্তম। বাল্মীকি পণ্ডিত মারা যাবার পর তাঁর টোল উঠে যায়। বাল্মীকির মৃত্যুর পর পুণ্যবতী কাশীবাসিনী হন। তখনও দ্বিজোত্তম জীবিত ছিলেন। তাঁর কাশীতেও ছোট বাড়ি ছিল একটা। পুণ্যবতী সেই বাড়িতে গিয়ে রইলেন এবং দ্বিজোত্তম আকাশকেও পাঠিয়ে দিলেন সেখানে। আকাশ সেখান থেকেই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা পাস করে। সেই সময় দ্বিজোত্তম মারা যান এবং তার কিছুদিন পরে পুণ্যবতীও। আকাশই তাঁর মুখাগ্নি করেছিল এবং শ্রাদ্ধাদিও করেছিল মহাসমারোহ। বাড়িটি সে গরিব বিধবাদের কাশীবাস করবার জন্য দান করেছে।

এসব অনেকদিন আগেকার কথা। তারপর আকাশ কেমিস্ট্রি ও ফিজিক্সে এম. এ. পাস করেছে। কেম্‌ব্রিজ, অক্সফোর্ড, হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতর শিক্ষা নিয়ে এসেছে। এখন অধ্যাপনা করে। বয়স পঁয়ত্রিশ বছর। বিবাহ করেনি। করবার ইচ্ছেও নেই। তার প্রকাণ্ড চারতলা বাড়িতে সে একা থাকে। চারতলায় তার শোয়ার ঘর, পুজোর ঘর, আর প্রকাণ্ড একটা দক্ষিণমুখো ছাত। পাঁচতলায় চারদিক খোলা একটা ছাত আছে। তিনতলায় তার লাইব্রেরী, দোতলায় ল্যাবরেটরি। এক তলায় সে চারজন দরিদ্র ছাত্রকে থাকতে দিয়েছে। নীচে আলাদা রান্নাঘর এবং খাবার ঘর আছে। এ ছাড়া একতলায় একটি বৈঠকখানা আছে এবং তার পাশে আছে আরও দুখানি ঘর। সেখানে দাস থাকে। পুরা নাম দাসানুদাস। সে-ই এ বাড়ির কর্তা। বাল্মীকি পণ্ডিতের টোলে সে ছিল আকাশের সহপাঠী। বাল্মীকি পণ্ডিত মারা যাওয়ার কিছুদিন পরেই কলেরায় দাসের বাবা-মা এবং বোনটি মারা গেল। তখন পুণ্যবতী বললেন—"তুই থাক আমার কাছে।" তারপর পুণ্যবতী যখন কাশী গেলেন তখন দাসও গেল তাঁর সঙ্গে। আকাশও গেল। সেখানেও দুজনে হাইস্কুলে ভরতি হল। কিছুদূর পড়ে হঠাৎ সে একদিন আকাশকে বলল— "তুই পড়, আমি আর পড়ব না। আমি মায়ের কাছে থাকব। মা আজকাল চোখে ভালো দেখতে পাচ্ছেন না। ওঁর জন্যে যে ঝিটাকে বহাল করেছিস সে ওঁর ভালো করে সেবা করে না। সর্বদা কাছেও থাকে না। কাল মা হোঁচট খেয়ে পড়ে গিয়েছিলেন। তাই আমি ঠিক করে ফেলেছি আমি আর স্কুলে যাব না। মায়ের কাছেই থাকব সর্বদা। আমার ইস্কুলের পড়া ভালোও লাগে না। আমি মাকে ভালো ভালো গল্পের বই পড়ে শোনাব। তুই পড়, আমি বাড়িতে থাকব—"

দাস আর পড়াশোনা করেনি। বাড়িতেই সে বাংলা বই অনেক পড়েছিল। ইংরেজিও মোটামুটি জানত।

পুণ্যবতীর মৃত্যুর পর তারা কাশী ছেড়ে চলে আসে। আকাশ যখন কলকাতায় এসে কলেজে ভরতি হল তখন সে বেশ কিছুদিন হস্টেলে কাটিয়েছিল। কারণ বাড়িতে বৃদ্ধা পিসিমা ছিলেন একজন তখন। আর তাঁর ছেলেমেয়ে নাতি নাতনিরা ছিল। আকাশ তাদের বলল— "আমি এখন হস্টেলে যাচ্ছি। আমাদের বেনেপুকুরে যে বাড়িটা আছে সেটাতে ভাড়াটে আছে। তারা উঠে গেলে আপনারা সে বাড়িতে থাকবেন। এ বাড়িতে বাবার লাইব্রেরী আছে। আমারও একটা ল্যাবরেটরি করবার ইচ্ছা আছে।"

তবু পিসিমার গুষ্টিবর্গকে ওঠাতে অনেক সময় লেগেছিল। সে যে বছর এম. এস. সি. পাস করল সেই বছর সে বাড়িটা পুরোপুরি নিজের দখলের মধ্যে পেল। দাস কিন্তু গোড়া থেকেই নীচের ঘর দুটি দখল করেছিল। সে ঘর দুটিতে একজন দারোয়ান থাকত। আকাশ দারোয়ানকে বলল— "তুমি আমার লক্ষ্মীগঞ্জের যে জমি আছে সেখানে চলে যাও। এ বাড়িতে দাস থাকবে।" দাসকে সে আবার একটি স্কুলে ভরতি করে দিয়েছিল। সে একটা মেসে খেত। আর রোজ গিয়ে দেখা করত আকাশের সঙ্গে। দাসের সঙ্গে আকাশের সম্পর্ক একদিনের জন্যও ছিন্ন হয়নি। দ্বিজোত্তমবাবু যখন মারা যান তখন আকাশ নাবালক। দ্বিজোত্তমবাবুর জমিজমা কয়েকটি বাড়ি তো ছিলই, ব্যাঙ্কেও প্রচুর টাকা ছিল। তার সুদই আসত মাসে দু হাজার টাকা করে। এ টাকা ও বিষয় দ্বিজোত্তম পেয়েছিলেন তাঁর পিতা সর্বোত্তমের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে। সর্বোত্তম ছিলেন বড় ব্যবসায়ী একজন। দ্বিজোত্তম তাঁর সব বিষয় আকাশকেই দিয়ে গিয়েছিলেন এবং উইলে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে তাঁর মৃত্যুর সময় আকাশ যদি নাবালক থাকে তাহলে তাকে সাবালক না হওয়া পর্যন্ত তিনজন অভিভাবকের অধীনে থাকতে হবে। তাঁর তিন বন্ধুকে তিনি অভিভাবক নিযুক্ত করে গিয়েছিলেন। একজন বড় ওস্তাদ, একজন অধ্যাপক এবং আর একজন উকিল। তিনি আরও নির্দেশ দিয়েছিলেন যে আকাশ যতদূর পড়তে চাইবে, সে পড়ার খরচ তাকে দিতে হবে এবং এ ছাড়াও প্রতি মাসে তাকে একশ টাকা করে হাত খরচ দিতে হবে। এই টাকার অধিকাংশই আকাশ দাসকে দিত। এখানে এম. এস. সি. পাস করেই সে সাবালক হল এবং বিষয়ের সম্পূর্ণ অধিকারও পেল। বিধবা পিসি এবং তাঁর পবিরাববর্গ চলে গেলেন বেনেটোলার বাড়িতে। দাসই সম্পূর্ণ বাড়িটা দখল করে রইল আকাশ বিলেত যাবার পর। দাস ততদিনে বি. এ. পাস করেছে। দু'তিনটে টিউশানি যোগাড় করে নিয়ে স্বাবলম্বীও হয়েছে সে। তবু আকাশ বিলেত যাবার আগে তার নামে পাঁচ হাজার টাকার একটা সেভিংস ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট করে দিয়েছিল একটা। বিলেত থেকে পাঁচ বছর পরে ফিরে এসে দেখল দাস নিজের জন্যে এক পয়সাও খরচ করেনি তার থেকে। সে প্রায় হাজার খানেক টাকা খরচ করে বাড়িটির জীর্ণ সংস্কার করিয়েছে। রং করিয়েছে সমস্ত বাড়িটা।

বিলেত থেকে ফিরে এসে সে আশা করেছিল দেশে ভালো একটা চাকরি পাবে। দেশ স্বাধীন হয়েছে— তার গুণের উপযুক্ত মূল্য পাবে সে। কিন্তু পেল না। দেখল ঘুষ, ধরাধরি, খোশামোদ এই তিনটেই এদেশে চাকরি পাওয়ার সেরা পন্থা। গুণ এদেশে আদৃত নয়। এদেশে রাজনীতিও দেশের উন্নতির বাধা। কারণ যে রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকেন তাঁদের দলের লোকেরাই ভালো চাকরি পায়। যোগ্য লোকেরা প্রায়ই ভালো চাকরি পায় না। এই রাজনীতির বিষ প্রতি বিভাগকেই

মৃতপ্রায় করে এনেছে। কোনো বিভাগেই ঠিকমত কাজ হয় না। শিক্ষা-বিভাগে তো যথেচ্ছাচার চলছে। আকাশ কোনো নামজাদা কলেজে চাকরি পেল না। সে একটা সাধারণ কলেজেই অধ্যাপনার চাকরি নিল। তার উদ্দেশ্য ছিল পঠন-পাঠন নিয়ে থাকা এবং ছাত্রদের সঙ্গে মেশা। তাদের ভালো করে পড়ানো এবং তাদের সচ্চরিত্র করে তোলা। ছাত্রদের সঙ্গে না মিশলে তাদের পূর্ণ-পরিচয় পাওয়া যাবে না। সে তাদের সঙ্গে বন্ধুর মত মিশত। সে বুঝতে পেরেছিল সব ছেলেই ভালো ছেলে, সবাই আদর্শবাদী, সবাই বড় হতে চায়, কিন্তু নানা কারণে তা পারে না। প্রধান কারণ অবশ্য দারিদ্র্যের আর একটা কারণ রাজনীতির ঘূর্ণাবর্তে পড়ে, দলাদলি, হিংসা এবং নানা রকম নোংরামি। সরকারের আস্কারা পেয়েই ছাত্ররা অবাধ্য হচ্ছে, শিক্ষকদের অপমান করছে, প্রকাশ্যে টোকাটুকি করে পরীক্ষা পাস করছে। সরকার ইচ্ছে করলেই এ সব শাসন করতে পারেন, করেন না ভবিষ্যতে ভোট যদি না পান এই ভয়ে।

আকাশকে কিন্তু ছেলেরা খুব শ্রদ্ধা করে। সে পরীক্ষক হতে চায় না। তাদের অনেককে সে অর্থ সাহায্য করত, বই কিনে দিত। চারটি ছেলেকে নিজের বাড়িতে থাকতে দিয়েছে। বীরেন, বিষ্ণু, কুন্দনলাল, আর জাপানী—যে চারটি ছেলে এখন আকাশের বাড়িতে থাকে তারা সবাই বিজ্ঞানের ছাত্র নয়, সবাই বাঙালিও নয়। কুন্দনলাল উত্তর প্রদেশবাসী ক্ষত্রিয়। সকলেই আকাশের ভক্ত। তবে আকাশ গুরুদেবের উচ্চমঞ্চে আরোহণ করে বসে থাকতে চায় না। তাদের সঙ্গে বন্ধুর মত ব্যবহার করে। তাদের সঙ্গে তাস খেলে, দাবা খেলে, সিনেমা দেখতে যায়, পড়াশোনাও করে। তাদের সঙ্গে এক টেবিলে বসে খায়। বীরেন ভালো ছেলে, এবার এম. এস. সি. দেবে ফিজিক্সে। সম্ভবত ফার্স্ট ক্লাস পাবে। বিষ্ণু আর্টের ছাত্র, বি. এ. পাস করেছে সংস্কৃতে অনার্স নিয়ে। সংস্কৃতে এম. এ. পড়ছে। জাপানী দ্বিজোত্তমের বাড়ির পুরাতন চাকরানির নাতি। অর্থাভাবে পড়াশোনা হচ্ছিল না। ঠাকুমা অনেকদিন আগে মারা গেছে। মা বাবাও নেই। দ্বিজোত্তম তাকে স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছিলেন। সে এক দিদির কাছে থাকত। থার্ড ডিভিশনে হায়ার সেকেন্ডারি পাস করে পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে মস্তানি করে বেড়াচ্ছিল। তার চেহারাটায় মঙ্গোলীয় ছাপ ছিল বলে দ্বিজোত্তম তাকে জাপানী নাম দিয়েছিলেন। স্কুলে ভরতি করেছিলেন জপেশ্বর নামে। কিন্তু বাড়িতে সবাই তাকে জাপানী বলেই ডাকে। সে এখন আকাশের কাছে থেকে বি. এ. পড়ে। পড়াশোনায় খুব ভালো ছেলে নয়, কিন্তু দুঃসাধ্য কাজ করতে মজবুত। আকাশ প্রায়ই তাকে দুষ্প্রাপ্য পুরাতন বই কেনবার ভার দেয়। সে খুঁজে খুঁজে ঠিক কিনে আনে। চোরাবাজারের অনেক লোক তার বন্ধু। যারা পুরাতন বই বিক্রি করে তারা অনেকেই তার বন্ধু। গুণ্ডাজগতের নানা লোকের সঙ্গে আলাপ তার। অনেক ট্যাক্সিওলার সঙ্গেও মাখামাখি আছে তার। অনেকের ঠিকানা সে জানে। জাপানীর গায়ে জোরও খুব। জাপানী যখন মস্তানী করত তখন রোজ উঠবোস ডন করত। যুযুৎসুও জানে। প্রকৃতিটা গুণ্ডা-গোছের। পৃথিবীতে একমাত্র আকাশকেই সে ভয় করে। ভয় করে কারণ আকাশকে ভালোবাসে সে। তার জন্যে সে পরাণ তুচ্ছ করে যে কোনও বিপদের মুখে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে।

কুন্দনলাল আকাশের সহপাঠী চন্দনলালের একমাত্র ছেলে। কাশীতে চন্দনলাল তার সঙ্গে পড়ত। চন্দনলালের বাবা মোহনলাল ছিল একজন ট্যাক্সি ড্রাইভার। ট্যাক্সি অ্যাক্সিডেন্টে মারা যায়। তখন চন্দনের বয়স দশ এগারো বছর। সেই বয়সেই সে একটি মোটর-কারখানায় অল্প মাইনেতে ঢোকবার সুযোগ পায়। পরে সে ভালো একজন মোটর-মিস্ত্রি হয় এবং নিজে ছোট একটা গারাজ করে ভালো

রোজগার করতে লাগল। সেই সময় সে বিয়ে করে এবং তার কিছুদিন পরেই কুন্দনলালের জন্ম হয়। কিন্তু বেশিদিন সে গারাজ চালাতে পারেনি অর্থাভাবে। তখন সোহনলাল (মোহনলালের ভাই) বললেন— "তুমি ব্রাহ্মণের ছেলে, লেখাপড়া শেখ। মিস্ত্রিগিরি তুমি পারবে না—" তিনিই তাকে স্কুলে ভর্তি করে দেন। মোটরের মিস্ত্রি চন্দনলাল কুড়ি বছর বয়সে এসে ফোর্থ ক্লাসে ভরতি হল আকাশের সঙ্গে। আকাশের চেয়ে সে বয়সে পাঁচ ছ'বছর বড় ছিল। আকাশ যখন ম্যাট্রিক পাস করে কলকাতায় চলে এল তখন চন্দনের সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল অনেকদিনের জন্য। যখন কাশীতে ছিল তখন সে শিশু কুন্দনকে দেখেছিল। চন্দনের বউ দীয়া দেবীকেও দেখেছিল দূর হতে। একটা মধুর অস্পষ্ট স্মৃতি আঁকা ছিল তার মনে।

সে যখন এম. এস. সি. পাস করে বিষয়ের পুরো মালিক হল তখন হঠাৎ একদিন একটি চিঠি এল। অপরিচিত হস্তে লেখা।

শ্রীচরণেষু,

অসংখ্য প্রণামান্তে নিবেদন,

আমি আপনার সহপাঠী বন্ধু চন্দনলালের স্ত্রী দীয়া। আমার স্বামীর অনেকদিন পূর্বে মৃত্যু হইয়াছে। আমি তাহার পুত্র কুন্দনকে লইয়া অতিকষ্টে দিনযাপন করিতেছি। পরের বাড়িতে রাঁধুনিগিরি করিতে হয়। আমার ছেলেকে স্কুলে ভরতি করিবার সামর্থ্য নাই। আমার স্বামী মৃত্যুর পূর্বে বলিয়া গিয়াছিলেন যে আমি যদি কষ্টে পড়ি, আপনাকে যেন খবর দিই। আপনার লেখা একটি পত্রও তিনি আমাকে দিয়াছিলেন, তাহাতে আপনার ঠিকানা ছিল। এই চিঠি আমি একটি বাঙালিবাবুকে দিয়া লিখাইতেছি। আমি লেখাপড়া কিছু জানি না। আমার চিন্তা কুন্দনের জন্য। আপনি দয়া করিয়া তাহার ভার গ্রহণ করুন এই অনুরোধ জানাইয়া আপনাকে এই পত্র লিখিতেছি। আমার স্বামী বলিয়া গিয়াছেন যে আপনাকে জানাইলে আপনি নিশ্চয় কোনো ব্যবস্থা করিবেন তাই এই পত্র লিখিলাম। যদি অপরাধ করিয়া থাকি ক্ষমা করিবেন। আমার সভক্তি প্রণাম গ্রহণ করুন।

ইতি

সেবিকা দীয়া

এই চিঠি পেয়েই আকাশ দাসকে কাশী পাঠিয়ে দিয়েছিল। দিন কয়েক পরে দাস দীয়া আর কুন্দনকে সঙ্গে নিয়ে চলে এল। বলল, দীয়ার এক মামাতো ভাই ছাড়া আর কেউ নেই। কিন্তু সে লোকটি নাকি অতি পাজি। দীয়া তার সংসারে থাকতে চায় না। দীয়া যুবতী, দেখতেও ভালো। তার পিছনে কাশীর গুণ্ডা লেগেছিল। দীয়া বলল, "আমি কাশী থাকতে পারব না। কলকাতায় গিয়ে রোজগার করে খাব। কুন্দনের বয়স তখন আট বছর। তার একটা ব্যবস্থা আপনারা করে দিন। তাই মা ছেলে দুজনকেই নিয়ে এসেছি। যা করবার তুই কর এখন।"

আকাশ বলল—"কুন্দনকে স্কুলে ভরতি করে দাও। ওর মাও লেখাপড়া শিখুক বাড়িতে। একজন মাস্টারনী বহাল কর। তার কাছে ও লেখাপড়া শিখুক।"

"ওরা থাকবে কোথায়?"

"এই বাড়িতে থাক আপাতত।"

দাস বললে— "লোকে কিন্তু নিন্দে করবে।"

"করুক। আমি নিজে যদি ঠিক থাকি লোকে কি বলবে তা আমি গ্রাহ্য করব কেন?"

দাস বললে— "সমাজে বাস করতে গেলে করতে হয়।"

"আমি ওকে মা বলে ডাকব—"

"মা বাবা যা খুশি বলে ডাকতে পার, লোকের মুখ বন্ধ করতে পারবে না। তুমি ধনী লোক, কাউকে খোশামোদ কর না, এই জন্যেই একদল লোক তোমার উপর অসন্তুষ্ট। পরশ্রীকাতর দেশে শ্রী থাকলেই শত্রু সৃষ্টি হয়। কুন্দনের মাকে যদি এ বাড়িতে রাখ তাহলে সবাই একটা ছুতো পাবে। ওরা এখন হোটেলে থাক। তারপর আমি একটা ব্যবস্থা করছি।"

দীয়া কুন্দনকে নিয়ে প্রথমে আকাশের বাড়িতেই উঠেছিল।

আকাশ দীয়াকে আশ্বাস দিয়েছিল— "তোমাকেও লেখাপড়া শিখতে হবে। রাঁধুনিগিরি করা চলবে না। আমি সব ব্যবস্থা করে দেব।"

দীয়া নতমুখে চুপ করে রইল।

"তুমি কুন্দনকে নিয়ে এই বাড়িতেই থাকো। রাত্রে আমার লাইব্রেরী ঘরে শুতে পারবে।"

দীয়া তবু কোনো উত্তর দিল না।

"তুমি বাংলা জানো?"

তখন সে বাংলাতেই উত্তর দিল— "জানি। আমি বরাবর বাঙালি বাড়িতেই কাজ করেছি। এ বাড়িতে কি আপনার স্ত্রী থাকেন?"

"না, আমি বিয়ে করিনি। এ বাড়িতে আমি আর দাস থাকি। আমি কিছুদিন পরে বিলেতে চলে যাব। তখন দাস আর দারোয়ান রামভুজ থাকবে—"

দীয়া তখন বলল— "না, আমি এ বাড়িতে থাকব না।" আকাশ শুনে খুব খুশি হল মনে মনে।

"বেশ, তাহলে অন্য ব্যবস্থা করে দেব। সব ঠিক হয়ে যাবে, তুমি কিছু ভেবো না। তুমি কিছু লেখাপড়া শিখে ফেল। বাংলা ইংরেজি অঙ্ক—"

"এসব শিখে কি লাভ হবে কোনো! আর এ বয়সে কোথায় পড়ব আমি!"

"লেখাপড়া শিখলে অনেক জিনিস জানতে পারবে, একটা নতুন জগতের সন্ধান পাবে। আমি তোমার জন্যে একটি মাস্টারনী বহাল করে দেব। সে তোমাকে এসে রোজ পড়িয়ে যাবে। আর কুন্দনকে ভরতি করে দেব স্কুলে।"

দীয়া চুপ করে রইল। তারপর আবার বলল— "আমি এই বয়সে লেখাপড়া শিখে কি করব? আপনি আমার জন্য কেন বেফয়দা পয়সা বরবাদ করবেন—"

"জ্ঞান হচ্ছে আলোর মতো জিনিস। তুমি অন্ধকারে আছ। আমি চাই না যে আমার দোস্তের স্ত্রী অন্ধকারে থাকুক। আরম্ভ করে দাও লেখাপড়া। টাকাকড়ির চিন্তা তোমাকে করতে হবে না।"

দীয়া আর কুন্দন কয়েকদিন হোটেলেই রইল। কয়েকদিন খোঁজাখুঁজির পর দাস একটা সুব্যবস্থা করে ফেলল। একজন রিটায়ার্ড শিক্ষয়িত্রী সুনন্দা সেনের নাগাল পেল সে। সুনন্দা সেন বিয়ে করেননি। সারাজীবন নানা জায়গায় চাকরি করে বেড়িয়েছেন। হঠাৎ বৃদ্ধ বয়সে তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে ছোট একটি বাড়ি পেয়ে গেছেন তাঁর নিঃসন্তান এক মাতুলের কাছ থেকে। সেই বাড়ির নীচের দুটি ঘর ভাড়া দেবেন বলে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন। দাস তাঁর সঙ্গে দেখা করে বলল— "একটি অবাঙালি মেয়ে তার ছেলেকে নিয়ে নীচে থাকবে। মেয়েটি লেখাপড়া কিছু জানে না, সে বাংলা ইংরেজি এবং

অঙ্ক শিখতে চায়। আপনি যদি তাকে পড়িয়ে দেন তাহলে সে আপনাকে আলাদা পারিশ্রমিক দেবে।"

সুনন্দা সেন প্রশ্ন করলেন— "ওর পরিচয় দিন।"

"মেয়েটি বিধবা। আমার বন্ধু আকাশ শর্মা ওর স্বামীর সহপাঠী ছিল। মেয়েটির একটি ছেলে আছে। স্বামীর মৃত্যুর পর মেয়েটি নিরাশ্রয় হয়ে পড়ে। তখন সে আকাশকে চিঠি লেখে যে 'আমার স্বামী আমাকে বলে গিয়েছিলেন যে আমি যদি কোনোদিন বিপদে পড়ি আপনাকে যেন চিঠি লিখি।' এই চিঠি পেয়ে আকাশ ওকে আর ওর ছেলেকে এখানে আনিয়ে নিয়েছে। আকাশেরই ইচ্ছে ওকে একটু লেখাপড়া শেখানো হোক।"

"আকাশবাবু কি করেন?"

"কেমিস্ট্রি আর ফিজিক্সে এম. এস. সি. পাস করেছে। এবার বিলেতে যাবে। তাই মেয়েটির ব্যবস্থা করে যেতে চাইছে। ওর নিজের প্রকাণ্ড বাড়ি আছে, সেখানে কিন্তু কোনো স্ত্রীলোক নেই। তাই এই ব্যবস্থা করেছে সে। নীচের ঘর দুটির কত ভাড়া নেবেন আপনি?"

"ঘর দুটি ছোট ছোট। তবু একশো টাকা চাই আমি।"

"বেশ তাই দেব আমরা। আর ওকে যদি পড়াবার ভার নেন, তাহলে আরও একশো করে দেব আমরা—"

"বেশ আপত্তি নেই। কাল আকাশবাবুর সঙ্গে দেখা করে তবে কথাটা পাকা করব। মেয়েটিকেও আগে একবার দেখতে চাই। সে কোথায় আছে?"

"একটা হোটেলে। বেশ কালই আমি একটা ট্যাক্সি নিয়ে আসব। নিয়ে যাব আপনাকে।"

"বেশ। কাল দশটার সময় আসবেন। আমি প্রস্তুত হয়ে থাকব।"

পরদিন আকাশ এবং দীয়ার সঙ্গে দেখা করে খুব খুশি হলেন সুনন্দা সেন।

তার পরদিনই দীয়া আর কুন্দন সুনন্দা সেনের বাড়ির নীচের ঘর দুটিতে এসে হাজির হল। দাস তার হাত-খরচের জন্য নগদ একশ টাকা দিয়ে এল। বলল—"কাছেই একটা ছোট হোটেল আছে। আমি তোমাদের টিফিন-কেরিয়ার কিনে দিয়ে যাচ্ছি। হোটেলের ঠাকুরকে বলে দিয়ে যাচ্ছি সে তোমাদের খাবার বাড়িতে দিয়ে যাবে। হোটেলটা খুব কাছেই। চল তোমাকে দেখিয়ে দিই। সুনন্দা সেন কোথায় খান?"

"তিনি কুকারে রান্না করে খান। তাঁর একটি ঝি আছে, সেই তাঁর সব কাজ করে দেয়— আমি সব ঠিক করে নেব, আপনি কিছু ভাববেন না।"

কুন্দনকে তার পরদিনই একটা স্কুলে ভরতি করে দিল দাস। সুনন্দা সেন তাঁর একটি পরিচিত স্কুলে ব্যবস্থা করে দিলেন সব। মনে মনে কিন্তু উত্তরোত্তর বিস্মৃত হচ্ছিলেন তিনি। সাধারণ মাপকাঠি দিয়ে আকাশকে মাপতে গিয়ে থই পাচ্ছিলেন না। বিনা স্বার্থে বন্ধুর বিধবা স্ত্রী ও ছেলের জন্য কেউ যে এতটা করতে পারে তিনি স্বচক্ষে না দেখলে বিশ্বাস করতে পারতেন না। স্বচক্ষে দেখেও পারছিলেন না। তাঁর মনে হচ্ছিল ভিতরে কিছু একটা নিশ্চয় আছে, যা তিনি ধরতে পারছেন না। তাঁর বাড়িতে দীয়াকে দেখবার জন্য আকাশ একদিনও আসেনি। দাস এসে মাঝে মাঝে বাইরে থেকে খোঁজ-খবর নেয়।

মাস খানেক পরে ভাড়া দিতে গিয়ে অবাক হয়ে গেল দাস। দেখল দীয়াই বাড়ির কর্ত্রী হয়েছে। ঝিকে ছাড়িয়ে দিয়েছে সে, সুনন্দা সেনের রান্না, বাজার, ঘরের সব কাজ সেই করে। বৃদ্ধা সুনন্দা

সেনকে নানাভাবে সেবা করছে সে। তাঁর গা হাত পা টিপে দেয়, তেল মাখিয়ে দেয়। দাস কুন্দনকে একটি হস্টেলে ভরতি করে দিয়েছে। নীচের ঘরে এখন রান্না-ভাঁড়ার আর উপরের ঘর দুটিতে দীয়া আর সুনন্দা সেন থাকেন। তিনি দাসকে দীয়ার সম্বন্ধে যা বললেন তা তিনি জীবনে বোধহয় কারো সম্বন্ধে বলেননি। তিনি সহজে কারো প্রশংসা করেন না। তাঁর জীবনে তিনি নানা জায়গায় ধাক্কা খেয়েছেন, ঠকেছেন। তাঁর ধারণা অধিকাংশ লোকই খারাপ এবং বিশ্বাসযোগ্য নয়। দীয়ার সম্বন্ধে তিনি কিন্তু বললেন, "এমন চমৎকার মেয়ে আমি দেখিনি। যেমন রূপ, তেমনি গুণ। খুব বুদ্ধিমতী। এর মধ্যেই বাংলা, ইংরেজি অক্ষর পরিচয় হয়ে গেছে। এক দুই একশ পর্যন্ত বলতে পারে। ও দেখবেন খুব তাড়াতাড়ি সব শিখে ফেলবে। আমি ওকে কি কি বই পড়াব বলুন তো?"

"তা আপনি ঠিক করবেন। আপনি প্রবীণা শিক্ষয়িত্রী, আপনি যা ভালো মনে করবেন তাই। ওকে তো কোনো পরীক্ষায় পাস করতে হবে না। আকাশের ইচ্ছা বাড়িতে বসে যতটা শিক্ষা লাভ করা সম্ভব ততটা ও লাভ করুক। কি কি বই পড়াতে হবে আপনিই ঠিক করুন সেটা।"

"আমি সেকেলে বই ভালোবাসি। আজকালকার শিক্ষায় ভড়ং বেশি, শিক্ষা কম। আজকালকার বইতে অনেক ভুলও থাকে। আমি বর্ণ-পরিচয়, বোধোদয়, কথামালা এইসব দিয়েই শুরু করব।"

"আপনি বইয়ের 'লিস্ট' দিয়ে দেবেন আমাকে। আমি কিনে আনব। ওসব বই আজকাল বাজারে পাওয়াও শক্ত।"

"যা বলেছেন। না পান তো বিদ্যাসাগরের গ্রন্থাবলী কিনে ফেলুন।"

"আপনি যা বলবেন তাই করব।"

আকাশ বিলেতে চলে যাওয়ার পূর্বেই দীয়ার সব ব্যবস্থা করে দিয়েছিল দাস। এসব ঘটনার মাস তিনেক পরে আকাশ বিলেতে চলে যায়। যাওয়ার আগে সে একবার দীয়ার সঙ্গে দেখা করেছিল। বলেছিল— "আমি এখন বেশ কিছুদিনের জন্য বাইরে যাচ্ছি। দাসের উপর সব ভার দিয়ে যাচ্ছি। সে তোমাদের দেখাশোনা করবে। মন দিয়ে লেখাপড়া কর। আমি ফিরে এসে দেখতে চাই তোমার লেখাপড়া অনেক দূর এগিয়ে গেছে।"

চুপ করে রইল দীয়া।

সুনন্দা সেন বললেন— "ও খুব ভালো মেয়ে। খুব তাড়াতাড়ি সব শিখে ফেলবে। আপনি অনেকদিনের জন্য বাইরে যাচ্ছেন, দাসবাবু ঠিক নিয়মিত এসে আমাদের টাকা যদি না দিয়ে যান তাহলে আমরা কি করব?"

"দাস যেমন আসছিল তেমন আসবে। এখানে একজন আমার সহপাঠী পুলিস অফিসার আছেন। তাঁকেও আমি আপনাদের নাম ঠিকানা দিয়ে যাচ্ছি। সে-ও মাঝে মাঝে এসে আপনাদের খোঁজ করবে। তার নাম ঠিকানা আপনাদেরও দিয়ে যাচ্ছি। দরকার হলে তাকে খবর দেবেন। আর টাকার ব্যবস্থা আমি ব্যাঙ্কেই করেছি, তাদের নির্দেশ দিয়েছি প্রতিমাসে প্রথম সপ্তাহের মধ্যে তারা দীয়ার নামে ৩০০ টাকা মনি-অর্ডার করে পাঠিয়ে দেবেন। ওর মধ্যে দুশো টাকা আপনি নেবেন, আর একশো টাকা দীয়ার জন্য। দীয়া শুনেছি আপনার সঙ্গে খায়। তার জন্যে যা খরচ পড়ে সেটা কত তা ঠিক জানি না। দাসকে বলে যাচ্ছি সে সেটা প্রতিমাসে এসে খোঁজ করে দিয়ে যাবে। দীয়ার কাপড়-জামাও সে কিনে দেবে। দাস খুব ভালো ছেলে। ওকে আমি খুব বিশ্বাস করি। আমিও বিলেতে গিয়ে আমার ঠিকানা আপনাকে পাঠাব। প্রয়োজন হলে আমাকেও চিঠি লিখবেন।"

পাঁচ বছর পরে বিলেত থেকে ফিরে অবাক হয়ে গেল সে দীয়াকে দেখে। দেখল দীয়া বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' পড়ছে। ইংরেজি 'গ্রিম্‌স ফেয়ারি টেলস' পড়তে পারে। অঙ্ক, পাটিগণিত, জ্যামিতি এবং অ্যালজাব্রা শিখেছে। হিন্দিও শিখেছে। তুলসীদাসের রামায়ণ রোজ সুনন্দা দেবীকে পড়ে শোনায়। কুন্দনলাল ক্লাস নাইনে পড়ছে। সে-ও পড়াশোনায় ভালো। রোজ বিকেলে মায়ের কাছে আসে। কিন্তু যা দেখে আকাশ সবচেয়ে বেশি মুগ্ধ হল তা হচ্ছে দীয়ার অপরূপ শ্রী। সে তো রূপসী ছিলই। কিন্তু বুদ্ধির দীপ্তি এবং চরিত্রের শুচিতা তার মুখভাবে এমন একটা পবিত্র সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছিল যা সাধারণত দেখা যায় না। জীবন্ত দেবী মূর্তি যেন। হিন্দী দীয়া কথাটির মানে প্রদীপ। আকাশের মনে হল সত্যিই যেন একটি পবিত্র দীপশিখা জ্বলছে। আকাশ আরও বিস্মিত হল তাদের পুরোনো দারোয়ান রামভুজকে দেখে। সে এসে দীয়ার বাড়ির নীচের তলায় বসবাস করেছে। সে তো তার জমিজমা দেখছিল লক্ষ্মীগঞ্জে। এখানে এল কেন? বিলেত থেকে ফিরে আর দাসের সঙ্গে দেখা হয়নি। দাস তারই রাঁচির বাড়ির ব্যবস্থা করবার জন্য রাঁচি গিয়েছিল। বাড়িতে ছিল নূতন একটা চাকর বল্লভ। সুতরাং রামভুজ কেন যে এখানে এল তা সে জানতেই পারেনি।

"রামভুজ তুমি এখানে কেন?"

"দাসবাবু আমাকে লক্ষ্মীগঞ্জ সে বোলিয়ে আনলেন। তারপর বললেন তুমি এখানে কড়া পাহাড়া দাও। উপরে দুজন জেনানী আছে। তুমি বাড়িতে আলতুফালতু লোককে ঘুষতে দিও না।"

রামভুজের ভাষা বাংলা আর হিন্দীর খিচুড়ি। তবে বুঝতে কষ্ট হয় না।

"আলতুফালতু ছোকরা এখানে আসে না কি?"

"আসে মাঝে মাঝে। বুরি মাইজিকে সোভায় নিয়ে যাবে বলে এসেছিল কয়েকজন লৌণ্ডা। দীয়া দিদির সঙ্গে মোলাকাত করবার জন্য এসেছিল সিনেমার একবাবু মোটর হাঁকিয়ে। হাম্‌ কিসি কো ঘুষনে নেহি দিয়া। বললাম, চিঠ্‌ঠি দিজিয়ে উপর সে ভেশ দেতা হুঁ। ওঁরা যদি মুলাকাৎ করতে চান মুলাকাৎ হবে। ওরা কারো সাথে দেখা করতে মাঙে না। আমিও কাউকে ঘুষতে দিই না। রাস্তামে বহুত বেকার ছোকরা ঘুর ফির করে। আমি আমার ডান্‌ডা নিয়ে দরয়োজাতে বসে থাকি। দীয়া বেটা কুন্দনকে ছাড়া আমি আর কাউকে ঘুষতে দিই না।"

"হ্যাঁ, ঠিক কর।"

আর একটা খবর দিল রামভুজ। "কুন্দনলালকে বোর্ডিং থেকে নিয়ে আপনার কাছে রাখুন। বোর্ডিংয়ের চেটিয়ারা ভালো নয়। ভালো সঙ্গতে না মিশলে ছেলে বিগড়ে যায়। আমি একদিন কুন্দনকে বিড়ি পিতে দেখেছি। কুন্দন ছেলে খুব ভালো। লিকিন বদ সঙ্গতে খারাপ হয়ে যাবে। ওকে নিজের কাছে রাখুন।"

"বিড়ি খাচ্ছে না কি?"

"জি হাঁ।"

"আচ্ছা দেখি দাস ফিরে আসুক। ওকে বোর্ডিংয়ে রাখা চলবে না। দেখছি তাহলে—"

"হারগিজ রাখবেন না।"

"দাস আসুক।"

দাস ফিরে আসার পর কুন্দনকে সে বোর্ডিং থেকে নিজের বাড়িতে নিয়ে এসেছিল। সে নিজেই

কুন্দনকে পড়াতো। যতদিন সে কলেজে চাকরি পায়নি ততদিন কুন্দনই ছিল তার একমাত্র অবলম্বন। চাকরি পাওয়ার পর সে আরও তিনজনকে বাড়িতে থাকতে দেয়। এদের কিছু পরিচয় আগে দিয়েছি।

চাকরি পাওয়ার কিছুদিন পরে আর এক সমস্যায় পড়তে হল আকাশকে। সুনন্দা সেন বৃদ্ধা হয়েছিলেন। হঠাৎ একদিন হার্টফেল করে মারা গেলেন তিনি। তিনি বাড়ি থেকে বড় একটা বেরুতেন না। কিন্তু মৃত্যুর মাসখানেক আগে তিনি গাড়ি করে বেরিয়ে এক উকিলের বাড়ি গিয়েছিলেন। উকিল ভদ্রলোক তাঁর পূর্ব-পরিচিত। সেখানে এর আর একজন ডাক্তারকে সাক্ষী রেখে ছোট একটি উইল করেন। ছোট উইল—তার সারমর্ম, আমার কেউ নেই। কুন্দনের মা দীয়া শেষ জীবনে আমাকে সেবা করেছে নিজের মেয়ের মতো। আমার ছোট বাড়িটি তাকেই আমি দিয়ে গেলাম। এ উইলের কথা কাউকে তিনি বলেননি। দীয়াকেও না। তাঁর মৃত্যুর কিছুদিন পরে তাঁর বাক্সের ভিতর থেকে এই উইল পাওয়া গেল। তাঁর আত্মীয় স্বজন কেউ কোথাও আছে কি না তাই খোঁজবার জন্য আকাশ তাঁর ট্রাঙ্কের তালা তার পুলিস অফিসার বন্ধুটির সামনে একজন তালার মিস্ত্রির সাহায্যে খোলে। বাক্সে কিছু কাপড় জামা এবং ওই উইলটি ছিল। নগদ আড়াইশো টাকাও ছিল ওই বাক্সে। সব জিনিসের একটি ফর্দ করা হয় এবং পুলিস অফিসারটি তার নীচে মন্তব্য লিখে দেন যে সুনন্দা সেনের মৃত্যুর পর তাঁর সামনে এই বাক্স ভাঙা হয়। ফর্দে-লিখিত জিনিসগুলি বাক্সের মধ্যে ছিল। এই লিখে তাঁর নাম ও ঠিকানা লিখে দেন। উইলের প্রোবেট নিতে অবশ্য বেশ কিছু সময় লেগেছিল। কিন্তু দীয়া ওই বাড়িতেই থাকতে লাগল। সেই সময় কুন্দনও কিছুদিন ছিল দীয়ার কাছে। রামভুজই তাদের রক্ষণাবেক্ষণ করত। দীয়াকে খুব শ্রদ্ধা করত সে। 'মাতাজি' বলে ডাকত। সুনন্দা সেন মারা যাওয়াতে দীয়ার লেখাপড়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তিনি সেকালের এম. এ. ছিলেন। দীয়াকে অনেক শিখিয়েছিলেন। তাকে সংস্কৃত পড়াতে আরম্ভ করেছিলেন। ইচ্ছে ছিল ওকে ফরাসি ভাষাও শেখাবেন, কিন্তু হল না। মারা গেলেন তিনি। কিছুদিন পরে কিন্তু লোক পাওয়া গিয়েছিল আর একজন। খুব ভালো লোক।

স্রোতস্বিনী দেবীর কথা আগে বলেছি— আকাশ যার নাম দিয়েছিল— কারেন্ট। যিনি একজন ছোকরা অধ্যাপকের অশিষ্ট আচরণের জন্য তার গালে এক চড় মেরেছিলেন। চড় খেয়েও কিন্তু প্রফেসারটির চৈতন্য হয়নি, সুযোগ পেলেই সে বিরক্ত করত স্রোতস্বিনীকে। গোপনে নানারকম অশ্লীল ভঙ্গি করত। আকাশ তাকে পরামর্শ দিয়েছিল, "ওসব নিয়ে হই-চই কোর না, উপেক্ষা কর। ভান কর যেন তুমি কিছু দেখতে পাওনি।" কারেন্ট বলল, "তা তো আমি করছি। ওর দিকে চাই না কখনও। একটা ছোরা কিনেছি, সেটা সর্বদা সঙ্গে রাখি। যদি ও আমার গায়ে হাত দেয় ছোরা মারব।"

।। দুই ।।

কোনো মানুষের নিজের ইচ্ছেমত জীবন চলে না। জীবন তার নিজের ইচ্ছেমতই চলে। মানুষ শুধু সংগ্রাম করে, মানুষ শুধু লড়াই করে।

ইতিহাসও তাই। ইতিহাস পরোয়াই করে না কাউকে। ইতিহাসই নিজের প্রয়োজন সিদ্ধি করার জন্যে একজন জুলিয়াস সীজার তৈরি করে, কিম্বা তৈরি করে একজন নেপোলিয়ানকে। তাদের সকলকে সৃষ্টি করে আবার তাদের একদিন ধ্বংস করেই ইতিহাসের কৌতুক।

আকাশ লেখা-পড়া জানা ছেলে। শুধু লেখা-পড়া জানাটাই বড় কথা নয়, লেখা-পড়ার সঙ্গে সঙ্গে যদি আবার টাকার সংযোগ ঘটে তাহলে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তা একটা বিস্ফোরণ ঘটায়।

বিদেশ থেকে ফিরে আকাশ যখন আবার দেশে এসে পৌঁছল, তখন চারদিকের অবস্থা দেখে সে বিস্মিত হয়ে গেল। এত সমস্যা, এত পাপ তার চার পাশে। আগেও এ-সব ছিল এখানে, কিন্তু পরিমাণে কম।

সেদিন কলেজ থেকে বাড়ি এসে আকাশের শরীরটা একটু খারাপ হল। রাতে আর কিছু খেল না সে।

তারপরে আর কিছুই তার মনে ছিল না। কোথা দিয়ে যে রাত কেটে গেল তার আর খেয়াল রইল না।

পাঁচ বছর সে বিদেশে কাটিয়েছিল। পাঁচটা বছর কম নয়। কত অনিয়ম সে সেখানে করেছে, কত অখাদ্য-কুখাদ্য তাকে খেতে হয়েছে সেখানে বাধ্য হয়ে। তবুও কিছু ক্ষতি হয়নি তার।

আর তারও আগে?

তারও আগে যখন সে কাশীতে ছিল তখনও অনেকদিন সে কত অনিয়ম করেছে। তবু তো সে কখনও অসুস্থ বোধ করেনি।

এও বোধহয় বয়েসের ধর্ম। তাহলে সে কি এই ক'বছরের মধ্যেই বৃদ্ধ হয়ে গেল।

সমস্ত রাত যেন কী এক স্বপ্নাচ্ছন্ন অবস্থায় কাটল। আকাশের একবার মনে হল সে যেন লন্ডনের রাস্তায় একলা-একলা হাঁটছে। চমৎকার রোদ উঠেছে অনেক দিন পরে। সবারই খুব খুশি খুশি মুখ।

হঠাৎ একটা চেনা মুখ দেখে সে অবাক হয়ে গিয়েছে।

—এ কী? তুমি?

আশ্চর্য! দীয়া লন্ডনে এল কী করে?

দীয়াও অবাক হয়ে গেছে আকাশকে দেখে। বললে—আপনি?

আকাশ বললে—আমি তো এক বছর আগেই এখানে এসেছি। আসবার সময়ে তোমাকে যে আমি বলে এলাম আমি লন্ডনে যাচ্ছি। তোমার মনে নেই?

দীয়া বললে—কই, আমার তো কিছুই মনে পড়ছে না—

আকাশ বললে—আশ্চর্য তো। তা তুমি যে চলে এলে, কুন্দনকে কোথায় রেখে এলে?

দীয়া বললে—কুন্দন নেই!

—নেই মানে?

দীয়া বললে— সে বখে গেছে!

কেন, তাকে তুমি দেখতে না বুঝি? বোর্ডিং-এ থেকে সে তো খারাপ ছেলেদের সঙ্গে মিশে মিশে খারাপ হয়ে গিয়েছিল বলে দাস তাকে বোর্ডিং থেকে আমার বাড়িতে রেখে দিয়েছিল—

দীয়া বললে—বাড়িতে রাখলে কী হবে? যে খারাপ হবেই তাকে ভালো করতে চাইলেও সে কিছুতেই ভালো হবে না—

আকাশ জিজ্ঞেস করলে— শেষ পর্যন্ত কী হল তার—

দীয়া বললে— সে বোর্ডিং-এ থাকবার সময় যেমন গুণ্ডা বদমায়েশদের সঙ্গে মিশত, বাড়িতে এসেও তাদের সঙ্গে মেলা-মেশা বন্ধ হল না। শেষকালে...

—শেষকালে কী?

—শেষকালে পুলিসের হাতে একদিন ধরা পড়ল।

আকাশ জিজ্ঞেস করলে—কেন ধরা পড়ল সে?

দীয়া বললে—কখন যে সে কোথায় থাকত, কী করত তা আমরা কেউই জানতাম না। ঠিক সময়ে বাড়িতে আসত না। যখন বাড়িতে আসত তখন এক-একদিন এমন হত যে সমস্ত দিনই ঘুমোত।

—তারপর?

—তারপর একদিন হঠাৎ টের পেলাম যে সে নেশা করে।

—নেশা? কীসের নেশা? মদের?

—না। মদের নেশা নয়। ওষুধের নেশা।

আমি তবু কিছু বুঝতে পারলাম না। জিজ্ঞেস করলাম— ওষুধের আবার নেশা হয় নাকি?

দীয়া বললে— হ্যাঁ, আজকাল অমন অনেক রকম ওষুধ বেরিয়েছে, যা খেলে মদের চেয়েও বেশি নেশা হয়।

—সে সব ওষুধের নাম কী?

দীয়া বললে—তা জানি না—সে-সব ওষুধ আমি কখনও খাইওনি, সে-সব ওষুধের নামও আমি কখনও শুনিনি—পুলিসের মুখ থেকেই প্রথম তার নাম শুনলুম। তারা বললে—তার নাম ম্যান্‌ড্রেক্স না কী যেন...

—তারপর?

—তারপর একদিন হঠাৎ ভোরবেলা পুলিস কুন্দনকে ধরে নিয়ে এল আমার বাড়িতে, দেখি তার হাতে হাত-কড়া লাগানো। কী করেছিল সে? না কোথায় নাকি বোমা তৈরি করছিল। তাদের আড্ডায় নাকি অনেক বোমাও তৈরি হচ্ছিল তখন। সেই সব বোমা নাকি তারা মোটা দামে গুণ্ডাদের কাছে বিক্রি করত—

আকাশ জিজ্ঞেস করলে—তারপর কী হল?

—তারপর সে এখন ইন্ডিয়ায় জেল খাটছে, মানুষ খুন করবার অপরাধে তিন বছরের জেল হয়েছে তার। এ-সব কাণ্ড দেখে জীবনের ওপর আমার ঘেন্না হয়ে গেছে। তাই আমি লন্ডনে চলে এসেছি আপনার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে—

আকাশ অবাক হয়ে গেল দীয়ার কথা শুনে।

বললে—আমার সঙ্গে দেখা করে তোমার কী লাভ হবে?

দীয়া বললে—আপনি কলকাতায় থাকলে আমার এমন বিপদ হত না। কলকাতাতে আর থাকতে ইচ্ছে করে না আমার—

আকাশ জিজ্ঞেস করলে—তা এত দূরে কী করে এলে? কার সঙ্গে এলে? কে নিয়ে এল তোমাকে?

—আপনার বন্ধু দাসানুদাস। দাস—

এতক্ষণ রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা হচ্ছিল।

আকাশ জিজ্ঞেস করলে—দাস কোথায়?

দীয়া বলল—সে আমাকে এখানে পৌঁছিয়ে দিয়ে কোথায় পালিয়ে গেছে।

—পালিয়ে গেছে মানে? পালিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্য কী?"

দীয়া বললে—আমাকে যে জন্যে এখানে নিয়ে এসেছিল সে, কলকাতায় থাকলে আমি তা জানতে পারতুম। নিজের উদ্দেশ্যটা সিদ্ধি করবার জন্যেই সে আমাকে ভুল বুঝিয়ে এখানে নিয়ে এসেছিল—

দীয়ার কথাগুলো আকাশের কাছে কেমন যেন হেঁয়ালির মত লাগল। শেষকালে কি সেই দাসও তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করলে! অথচ আকাশই তো ওই দাসকে কত রকমে সাহায্য করে মানুষ করে তুলেছিল! মানুষ কি এত অকৃতজ্ঞ হতে পারে? তাহলে কি বুঝতে হবে সংসারে ভালো হওয়াও একটা পাপ!

হঠাৎ একটা গাড়ির হর্নের শব্দে আকাশের ঘুম ভেঙে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে বাস্তব জগতে ফিরে এসে হাঁফ ছেড়ে যেন বাঁচল আকাশ।

চোখ মেলতেই দেখলে সামনে দীয়া তার দিকেই চেয়ে আছে।

দীয়ার চেহারা এ কী হয়েছে! এত রোগা হয়ে গেছে কেন?

দীয়া জিজ্ঞেস করলে—এখন কোনো কষ্ট হচ্ছে?

আকাশ খুব নিচু গলায় জিজ্ঞেস করলে—আমার কী হয়েছিল?

দীয়া বললে— আপনি কথা বলবেন না। চুপ করে থাকুন। ডাক্তারবাবু কথা বলতে বারণ করে দিয়ে গেছেন।

বলে বিছানার পাশ থেকে উঠে গেল।

তারপর পাশের টেবিল থেকে কী একটা শিশি থেকে লাল রং-এর খানিকটা ওষুধ গেলাসে ঢেলে নিয়ে আবার সামনে এসে দাঁড়াল।

বললে—এই ওষুধটা খেয়ে নিন। হাঁ করুন—

আকাশ জিজ্ঞেস করলে—তুমি কি লন্ডনে গিয়েছিলে?

দীয়া তো হতবাক। লন্ডনে? আবার কি প্রলাপ বকছেন নাকি আকাশবাবু!

আকাশ বললে—আমার মনে হচ্ছে আমি বোধহয় স্বপ্ন দেখছিলুম।

—স্বপ্ন?

আকাশ বললে—হ্যাঁ, স্বপ্নে তোমাকে দেখছিলুম...

দীয়া বললে—আপনি আগে ওষুধটা খেয়ে নিন। হাঁ করুন—

বলে আকাশের মুখটা বাঁ হাত দিয়ে ধরে ডান হাতটা দিয়ে পুরো ওষুধটা মুখের ভেতরে ঢেলে দিলে।

তারপর খালি গেলাসটা টেবিলের ওপর রেখে এসে বললে—আপনি আর কথা বলবেন না। আপনার বিশ্রামের দরকার এখন—

আকাশ তবু জিজ্ঞেস করলে—আমার কী হয়েছিল বলো না—

দীয়া বললে—আপনি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন। দুদিন আপনার জ্ঞান ছিল না—

—দু'দিন!

—হ্যাঁ। আমরা সবাই খুব ভাবছিলাম আপনার জন্যে!

আকাশ জিজ্ঞেস করলে—তুমি কি দু'দিন ধরেই এখানে আছ?

—শুধু আমি নই, আমরা সবাই—।

—আমি কিছুই টের পাইনি। আর কারেন্ট? সেই স্রোতস্বিনী?

দীয়া বললে—হ্যাঁ, তিনিও ছিলেন।

আকাশ জিজ্ঞেস করলে—তোমার ছেলে কুন্দন ভালো আছে?

দীয়া কোনও উত্তর দিলে না সে-কথার।

আকাশ আবার জিজ্ঞেস করলে—কথা বলছ না যে। কুন্দনের কী হল?

তবু দীয়া কিছু বললে না।

আকাশ বললে—স্বপ্নে তুমি তার কথাও বলেছিলে—

—কী বলেছিলুম?

আকাশ বললে—স্বপ্ন তো মিথ্যে! স্বপ্নের কথা কি সত্যি হয়, তুমিই বলো?

দীয়া বললে—এখন ও-সব কথা না-ই বা বললেন। এখুনি ডাক্তারবাবু এসে যদি দেখতে পান যে আপনি এত কথা বলেছেন, তাহলে তিনি আমার ওপরেই রাগ করবেন। আপনি দয়া করে চুপ করুন—

আকাশ বললে—কিন্তু তুমি শুধু একবারটি বলো কুন্দন কোথায়?

দীয়া যেন কী একটা কথা বলতে গিয়েও থেমে গেল। তারপর বললে—কুন্দনের কথা না-ই বা শুনলেন। এখন আপনার শরীর খারাপ, আপনি এখন নিজের শরীরের কথা ছাড়া আর কিছু ভাববেন না—

আকাশ আর থাকতে পারলে না। দীয়ার একটা হাত ধরে বললে—তুমি শুধু একবার বলো কুন্দন সম্বন্ধে আমি যা স্বপ্নে দেখেছি, তা কি সত্যি?

—আপনি স্বপ্নে কী শুনেছেন বা কী বলেছেন তা আমি কী করে জানবো?

আকাশ বললে—তুমি বলবে না তো?

দীয়া বললে—আপনার পায়ে পড়ছি, আমার ছেলের সম্বন্ধে আপনি কিছু প্রশ্ন করবেন না—

আকাশ বললে—ঠিক আছে, শুধু একটা কথার উত্তর দাও তো, কুন্দন ভালো আছে তো?

দীয়া হয়তো এ-প্রশ্নের কিছু উত্তর দিত, কিন্তু তার আগেই ডাক্তারবাবু ঘরে ঢুকলেন। ডাক্তার মুখার্জি আকাশের চেনা। পাড়াতেই থাকেন। আকাশের মুখের দিকে চেয়ে হাসতে হাসতে বললেন—আকাশবাবু, আপনি তো আমাদের ভাবিয়ে তুলেছিলেন—

তারপর আকাশের একটা হাত নিজের একটা হাতে ধরে কী বোধহয় দেখতে লাগলেন। বোধহয় নাড়ির গতি পরীক্ষা করতে লাগলেন। তারপর স্টেথিস্‌কোপ্‌টা বার করলেন আকাশবাবুর হার্ট পরীক্ষা করবার জন্যে।

আকাশবাবু হাসি মুখে বললেন—হার্টের আর আমার কী দেখবেন ডাক্তার মুখার্জি, আমার তো হার্টই নেই—

ডাক্তার হাসতে হাসতে বললেন—আপনি কি তাহলে হার্টলেস?

আকাশের মুখেও তখন একটা ক্ষীণ হাসি ফুটে উঠল। বললে—কথাটা মিথ্যে বলেননি।

ডাক্তারবাবু কী দেখলেন কে জানে। স্টেথিস্‌কোপ্‌টা বাক্সে ঢুকিয়ে রাখলেন। দীয়া ডাক্তারবাবুর দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলে—কেমন দেখলেন ডাক্তারবাবু?

ডাক্তারবাবু বললেন—ডায়েট্ কী দিচ্ছেন?

দীয়া বললে—আজকেই তো প্রথম ওঁর জ্ঞান হল।

ডাক্তারবাবু বললেন— কেবল লিকুইড্ খেতে দেওয়াই ভালো। পাত্‌লা ঘোল, আর মিছ্‌রির জল দিতে পারেন। যদি খাওয়ার ইচ্ছে ওঁর থাকে। এখন সলিড্ ফুড্ কিছুই দেওয়া চলবে না—।

তারপর একটু থেমে আবার বললেন—আপনিও তো কদিন ওর বিছানা ছেড়ে ওঠেননি! আপনি অসুখে পড়ে গেলে কে দেখবে?

দীয়া বললে—আমার কথা ছেড়ে দিন, আমরা মেয়েরা সহজে মরি না—

বলে ডাক্তারবাবুর দিকে কয়েকটা নোট এগিয়ে দিতে গেল। কিন্তু ডাক্তারবাবু বললেন—ওটা থাক্—

বলে টাকা না নিয়ে চলে গেলেন। দীয়া কিছুক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে থেকে আবার চলে এল আকাশের ঘরে।

আকাশ তখন চোখ বুঁজে আগেকার মতই শুয়ে ছিল। দীয়া সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই অনেকক্ষণ আকাশের দিকে চেয়ে দেখতে লাগল।

পেছন থেকে হঠাৎ কানে এল বল্লভের গলা—মা—

দীয়া বল্লভের দিকে এগিয়ে গিয়ে বললে—অত চেঁচাচ্ছ কেন?

ঘরের বাইরে গিয়ে আবার বললে— দেখছ বাবু এখন ঘুমোচ্ছেন, এ সময়ে কি চেঁচাতে আছে?

বল্লভ গলাটা আরো নিচু করে বললে—কিন্তু মা, আপনি চা খাবেন না?

দীয়া বললে—তোমার আক্কেলটা কী বলো তো বল্লভ, তোমার বাবু দু'দিন ধরে মুখে কুটোটি নাড়ছেন না, আর আমি চা খাব?

বল্লভ বললে—কিছু না খেলে আপনার শরীর টিকবে কি করে? আর কেউ না জানুক আমি তো জানি এই দুদিন ধরে আপনি বাবুর কত সেবা করছেন—

দীয়া সে-কথায় কান না দিয়ে বললে— তুমি একটা কাজ করবে?

—কী কাজ, বলুন না মা—

—দুটো ডাব কিনে আনতে পারবে বাজার থেকে?

—কেন পারব না?

দীয়া বললে—আরো একটা কথা, আর আড়াই শো দইও কিনে আনতে হবে ওই সঙ্গে—

—ঠিক আছে—

বলে বল্লভ চলেই যাচ্ছিল, কিন্তু দীয়া তাকে আবার ডাকলে। বললে—তুমি চলে যাচ্ছ যে? টাকা নেবে না?

শেষ পর্যন্ত পাঁচ টাকার একটা নোট বল্লভের হাতে দিয়ে বললে— বেশি দেরি কোর না, বুঝলে? পরে আবার বাবুর জন্যে তোমাকে দোকান থেকে ওষুধ কিনে নিয়ে আসতে হবে—

—তাহলে সদর দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে যান, নইলে কে কখন ভেতরে ঢুকে পড়বে—

বলে বল্লভ চলে গেল।

সেদিন বাড়ির একতলার সামনে ভোর রাত্রে সদর দরজায় ধাক্কা পড়ল। রামভুজের ভোরবেলাতেই রোজ ঘুম ভাঙে। কিন্তু সেদিন কী হয়েছিল কে জানে তখনও তার ঘুম ভাঙেনি।

সদর দরজায় বার কয়েক ধাক্কার শব্দতেই সে যথারীতি বললে—কৌন্ হ্যায়?

বাইরে থেকে কে যেন কী জবাব দিলে তা স্পষ্ট বোঝা গেল না। তাড়াতাড়ি তার খাটিয়া থেকে উঠে সে দরজাটা খুলে দিতেই একেবারে আকাশ থেকে পড়ল। সামনেই দাঁড়িয়ে আছে কয়েকজন পুলিস কন্‌স্টেবল্ আর বোধহয় তাদের দারোগা।

রামভুজ জিজ্ঞেস করলে—ক্যা মাঙ্‌তা হুজুর?

পুলিসের দারোগা ততক্ষণে সদলবলে ভেতরে ঢুকে পড়েছে।

রামভুজ বললে—মা'জী কোঠিমে নেহি হ্যায়—

—কেন? কোথায় গেছে?

—আমার সাহেবের বাড়িতে।

—কে তোমার সাহেব?

রামভুজ বললে—আকাশবাবু।

—কেন, তোমার মাজী সেখানে গেছে কেন?

রামভুজ বললে—আকাশবাবুর বেমার হয়েছে—

—সেখানে কতদিন গেছে?

—আজ সাতদিন হল সেখানে গেছে—

পুলিস-দারোগা জিজ্ঞেস করলে—তাহলে তুমি কী করছ এ বাড়িতে?

রামভুজ বললে—আমি তো নৌকর আছি হুজুর!

—বাড়িতে তাহলে আর কেউ নেই?

—না, হুজুর।

পুলিস-দারোগা বললে— তবু আমরা বাড়ি সার্চ করব—

রামভুজ বললে—কিন্তু সব ঘরে যে তালা-চাবি বন্ধ হুজুর। আপনারা ঘরে তো ঢুকতে পারবেন না—

তখন কে আর রামভুজের কথা শোনে। পুলিস বলে কথা। তারা রামভুজের কথা না শুনেই ভেতরে ঢুকতে গেল।

প্রথমে একতলা। একতলায় রান্নাঘর। ঘরটার দরজায় শেকল দেওয়া ছিল। পুলিস শেকলটা খুলে ভেতরে ঢুকল। যেখানে যা পেলে সব উল্‌টে-পালটে ফেলে দিলে।

রামভুজ মনে মনে রাগলেও কোনো বাধা দিতে পারলে না।

পুলিস একতলা শেষ করে দোতলায় উঠল। দোতলার সব ঘরে দরজাতেই তালা-চাবি বন্ধ করা ছিল। সে সব তালা চাবি ভেঙে তারা ঘর-আসবাবপত্র তছ্‌নছ্ করে দিলে।

তারপরে দীয়ার শোওয়ার ঘর। আগে ওই ঘরে সেই সুনন্দা সেন থাকত। সে-ঘরের চারদিকে শুধু বই আর বই। সুনন্দা আগে ওই সব বই পড়ত। তারপর দীয়াকেও ওই সব বই পড়তে শিখিয়েছিল সে।

দেয়ালের গায়ে মাত্র একটা ছবি টাঙানো ছিল। একজন পুরুষ মানুষের ছবি।

পুলিসের দারোগা জিজ্ঞেস করলে—ও ছবিটা কার?

রামভুজ বললে—ওটা হামার মাজীর ছবি—

—মা'জীর ছবি? ও তো পুরুষ মানুষের ছবি!

—ছবিটা হামার বাবুর।

—বাবু কে? তোমার বাবু কে?

রামভুজ বললে—আমার বাবুর নাম আকাশবাবু।

রামভুজের কথা শুনে পুলিসের দারোগা কী বুঝল কে জানে, কিছু মন্তব্য করলে না। যেমন ঘরের আসবাবপত্র তচ্‌-নচ্‌ করছিল, তেমনিই করতে লাগল। মা'জীর ঘরের পাশে দাদাবাবুর শোবার ঘর।

সেই ঘরটার ওপরেই যেন পুলিসের বেশি আক্রোশ। দাদাবাবুর বিছানা থেকে আরম্ভ করে খাটের তলা, আলমারি, সুটকেস—সমস্ত তন্ন তন্ন করে খুঁজে কী সব চিঠি-পত্র দেখতে লাগল অনেকক্ষণ ধরে, রামভুজ তা বুঝতে পারলে না।

তারপর বাথরুম। চান করবার ঘর।

বাথরুমের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ ছিল।

পুলিস জিজ্ঞেস করলে—ভেতরে কে আছে?

রামভুজ বললে—ভেতরে কোই নেই হুজুর—

—তা হলে দরজা খুলছে না কেন?

পুলিস অনেক বার ধাক্কা মারতে লাগল তবু কোনো উত্তর নেই। তখন পুলিসের সন্দেহ হল। ভেতরে নিশ্চয়ই কেউ আছে। বার-বার ধাক্কা দিয়েও যখন দরজা খুলল না, তখন পুলিস রামভুজকে একটা শাবল দিতে বললে। শাবল না থাকে তো অন্য কোনো রকমের ভারি ধারাল অস্ত্র।

রামভুজ ভয় পেয়ে গেছে। বললে—হামার কাছে তো কুছ্‌ ওইসা চিজ্‌ নেই হুজুর—

সত্যিই কোনো ভারি অস্ত্র তার কাছে ছিল না।

পুলিসের দারোগা তখন কোমর থেকে তার রিভলবারটা বার করলে। সেটা বাথরুমের দিকে তাগ্‌ করে রেখে একজন কন্‌স্টেবলকে খুব ভারি কোনো হাতুড়ি জাতীয় জিনিস আনতে বলে দিলে থানা থেকে।

কন্‌স্টেবল দারোগা সাহেবের হুকুম পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ল থানার দিকে।

পাহাড়ি রাস্তা যেমন অসমতল, মানুষের জীবনও তেমনি বোধহয় সমতল রাস্তায় চলতে অস্বীকার করে। সোজা চলতে চলতে সে বোধহয় ভাবে তার পথের দিশা ভুল হয়ে গেল। তাই সে নিজের রাস্তা ছেড়ে আরো সোজা রাস্তায় চলবার চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করে।

আর তখনই হয় গোলমাল। যতবার সে সোজা সরল পথে চলতে চেষ্টা করে ততবার সে পরকে প্রবঞ্চনা করে, নিজেকেও করে বিড়ম্বিত।

এই সহজ পথে চলতে গিয়েই আকাশ নিজেকে বিড়ম্বিত করে তুলল।

ওই স্রোতস্বিনীর কথাই ধরা যাক। সে চেয়েছিল লেখা-পড়া নিয়েই সারা জীবনটা স্বস্তিতে কাটিয়ে দেবে। কিন্তু তা করতে গিয়ে তার কী পরিণতি হল সেটা আজও আকাশের মনে আছে।

স্রোতস্বিনীর চেহারা আর স্বভাবের মধ্যেও কী একটা যাদু ছিল যার জন্যে তাকে পদে পদে বিড়ম্বিত হতে হত। রাস্তা দিয়ে ভব্য ভদ্রভাবে চললেও অন্য লোকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার মত কিছু বৈশিষ্ট্য তার চরিত্রে ছিলই। কেন তার দিকে লোকে অমন লোভনীয় দৃষ্টি দিয়ে দেখে? সে কি তার যৌবন, না কি তার রূপ! সে যত নিজেকে আড়াল করতে চাইত ততই সে পুরুষদের চোখে আকর্ষণীয় হয়ে উঠত।

সেই কথা ভেবেই বোধহয় আকাশ তার একটা ডাক-নাম দিয়েছিল—কারেন্ট।

কিন্তু কারেন্ট তো শুধু আকর্ষণ করে না, বিকর্ষণও করে। কখনও সে টানে আবার কখনও সে ছাড়েও।

কারেন্ট থাকতো একটা লেডিজ-হোস্টেলে। কিন্তু কাজকর্মের ফিকিরে সবাইকেই যেমন বাইরে বেরোতে হয়, তেমনি কারেন্টকেও বাড়ির বাইরে বেরোতে হত। তখনই কারেন্ট দেখত যে রাস্তার লোকেরা যেন তাকে গিলছে। যেন তাকে মুখে পুরে চিবিয়ে গিলে ফেলতে পারলে তাদের আশা-পূরণ হয়।

অথচ রাস্তা দিয়ে সে একলাই শুধু যে হেঁটে যায়, তা তো নয়। তার মত আরো অনেক মেয়েই যায়। কিন্তু সবাইকে ছেড়ে দিয়ে মানুষ কেবল তার দিকেই বা অমন লোভাতুর দৃষ্টি দিয়ে দেখে কেন?

এই জন্যে তাকে অনেকবার অনেক ঘটনারও মুখোমুখি হতে হয়েছে। অনেকবার পুলিসের থানায় গিয়ে অনেক অভিযোগও দায়ের করতে হয়েছে।

কিন্তু তাতে কোনো প্রতিকার হয়নি কোনো দিক থেকে।

আজকালকার মানুষের সমাজ এমনই এক স্তরে এসে পৌঁছিয়েছে যে একা পুলিসের পক্ষে কোনও অভিযোগেরই প্রতিকার করা সম্ভব হচ্ছে না। হয় পুলিস কর্তব্যভ্রষ্ট হচ্ছে, আর নয়তো সব অভিযোগের প্রতিকার করা পুলিসের কাম্য নয়। কিম্বা দৈনন্দিন জীবন-যাপনের অতি-প্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্য-বৃদ্ধি এমন এক স্তরে গিয়ে পৌঁছিয়েছে যে বাঁধাধরা মাস-মাইনেতে তাদের সংসার-যাত্রা নির্বাহ করা দুঃসাধ্য বলে তাদের বাঁ-হাতের গোপনীয় এবং সহজ উপার্জনের আশ্রয় খুঁজে নিতে হয়েছে।

এতে পুলিসকেও দোষ দেওয়া চলে না।

কারণ অভিজ্ঞতায় এটা জানা হয়ে গিয়েছে যে আজ যদি তুমি সোজা এবং সৎ রাস্তায় চলো তাহলে তোমার অনেক শত্রু গজাবে। আর সেই শত্রুরা তোমার জীবন-সংশয় করলেও তোমাকে রক্ষা করবার কেউ থাকবে না। আর যদি তুমি অন্যায়ের সঙ্গে আপোষ করে চলো তো তোমার অনেক বন্ধু মিলবে, মিলবে অনেক শুভাকাঙ্ক্ষী।

কিন্তু মজা এই যে এমন হওয়া সত্ত্বেও কিছু সৎ লোক চিরকালই পৃথিবীতে আছে এবং থাকবে। তারাই আকাশের এই পৃথিবীর গতিকে আরো সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

সেদিন এমনি একটা ঘটনাই ঘটল।

কারেন্ট তার কাছে সব সময়ে একটা ধারাল ইস্পাতের ছোরা সঙ্গে রেখে দিত। কারেন্ট কখনও ভাবেনি যে তাকে সেটা কোনও দিন ব্যবহার করতে হবে।

কিন্তু একদিন তাকে সত্যিই ব্যবহার করতে হল।

তখন দিনের আলো নিঃশেষ হয়ে গেছে। সেই আলো-অন্ধকারের ভেতরে যখন স্রোতস্বিনী হোস্টেলের দিকে ফিরছিল তখন কোথা থেকে কে একজন অজ্ঞাত মূর্তি তাকে আচমকা আক্রমণ করে বসল।

বোধহয় সব মিলিয়ে এক মিনিটের ঘটনা।

সমস্ত ব্যাপারটা ভালো করে বুঝে ফেলার আগেই অজ্ঞাত ব্যক্তিটা নিজের কার্য সিদ্ধি করে

অন্ধকারের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল। লোকটা তার হাতের ঘড়িটা হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে চলে গিয়েছে। নিজের কাছে লুকোনো ছোরাটা ব্যবহার করবার অবকাশও দিলে না সে।

কিন্তু আশ্চর্য, ছেলেটা পালাবার সময়ে তার এক পাটি জুতো রাস্তার ওপর ফেলে দিয়েছিল। কারেন্ট সহজে হেরে যাওয়ার পাত্রী নয়। সে সেই জুতোটা কুড়িয়ে নিয়ে সোজা থানায় চলে গেল।

থানার বড়বাবু তখন দফ্‌তরে ছিল না।

ছোটবাবু? ছোটবাবু আছে?

না, তাও নেই। সবাই কাজে বেরিয়েছে।

তবু কারেন্ট দমবার পাত্রী নয়। সে বললে—আজ যতক্ষণ বড়বাবু থানায় না আসে ততক্ষণ আমি এখানে বসে থাকলুম—

বলে থানার সামনের বেঞ্চের ওপরেই বসে রইল।

প্রায় যখন এক ঘণ্টা সময় কেটে গেছে তখন বড়বাবু বুটের শব্দ করতে করতে এলেন। কারেন্ট উঠে দাঁড়ালো। জিজ্ঞেস করলে—স্যার, আপনিই এ থানার ও-সি?

বড় দারোগাবাবু চলতে চলতে বললেন—হ্যাঁ, আসুন—

বলতে বলতে থানার বড়বাবু নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। স্রোতোস্বিনীও ঢুকল।

বড়বাবু বললেন—বসুন—বলুন, কী আপনার আর্জি?

কারেন্ট বললে—আমি অনেকদিন থেকেই আপনার কাছে আসব আসব করছিলুম কিন্তু ভেবেছিলুম অযথা আপনাকে বিরক্ত করে কী হবে! কিন্তু এবার আর না এসে পারলুম না। আপনার মূল্যবান সময় একটু নষ্ট করছি—

বড়বাবু বললেন—না, না, আপনি বলুন কী আপনার অভিযোগ?

স্রোতোস্বিনী বললে—দেখুন, আমি এখানকার লেডিজ্ হোস্টেলে থাকি। কাজ করি একটা কলেজে। সেই কাজের সূত্রে আমাকে রাস্তায় বেরোতে হয়। বাসে ট্রামে উঠতে হয়। কিন্তু এ পাড়ার কিছু গুণ্ডা গোছের ছেলে আমাকে খুব উত্ত্যক্ত করে নানাভাবে,—

—কী করে তারা?

—আমাকে দেখলে তারা শিস দেয়, মাঝে মাঝে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কোনো হিন্দী সিনেমার গান গায়। তারপর কখনও কখনও আমার পেছনে পেছনে আসে। যতক্ষণ না আমি বাসে-ট্রামে উঠি ততক্ষণ তারাও পেছনে পেছনে আসে। তারপর যখন আবার কলেজ থেকে ফিরি তখন আমার পেছনে লাগে। আমি এতদিন কিছু বলিনি। এই দেখুন, আজ কী করেছে—

বলে কারেন্ট তার হাতটা বাড়িয়ে দেখালে। বললে—এই দেখুন, আজকে আমার সামনে একটা বোমা ফাটাতেই আমি ভয়ে চম্‌কে উঠেছি, আর সেই ফাঁকে তারা আমার হাত-ঘড়িটা ছিনিয়ে নিয়ে পালিয়ে গেছে—

দারোগবাবু সব শুনলেন। বললেন—তাদের মুখ দেখলে আপনি চিনতে পারবেন!

—হ্যাঁ।

—তাদের সকলের নাম বলতে পারবেন?

কারেন্ট বললে—হ্যাঁ—

—বলুন তো কী নাম?

—সকলের নাম বলতে পারব না। দুজনকে চিনি। একজন হচ্ছে কুন্দন আর একজন হচ্ছে জাপানী...

দারোগাবাবু নামগুলো তাঁর নোটবইতে লিখে নিলেন।

—ঠিকানা?

কারেন্ট বললে—ঠিকানা বলতে পারব না। তবে তাদের আরো কীর্তি-কলাপের কথা কিছু-কিছু জানি।

—কী রকম?

কারেন্ট বললে—যদি এ পাড়ায় কিছু নতুন ভাড়াটে কেউ আসে তাহলে তারা বাড়িওয়ালার কাছে পাঁচ ছ'হাজার টাকা দাবি করবে। কিম্বা আবার যদি কোনো ভাড়াটে বাড়ি খালি করে দিয়ে চলে যায় তাহলে ওই একই রেট। পাঁচ ছ'হাজার টাকা দিতে হবে বাড়িওয়ালাকে—

বড়বাবু বললেন—কিন্তু কোনও ল্যান্ড্‌লর্ড তো আমাদের কাছে আগে কখনও কম্‌প্লেন করেনি—

কারেন্ট বললে—করবে কেন?

বড়বাবু বললেন— কেন করবে না?

কারেন্ট বললে—তারা জানে যে পুলিশের কাছে কম্‌প্লেন করলে কোনো ফল হবে না।

—কে বললে?

কারেন্ট বললে—কে আবার বলবে? সবাই জানে সে-কথা। আপনার স্টাফরাও জানে। কারণ তারাও সে টাকার ভাগ পায় যে! আপনার স্টাফরা জানে কারা বোমা তৈরি করে। সবই তাদের জানা। কিন্তু তবু গুণ্ডারা ধরা পড়ে না কেন?

বড়বাবু এ-কথার কোনো জবাব দিলে না।

কারেন্ট বললে—আমি অপ্রিয় কথা বলছি বলে আপনি যেন কিছু মনে করবেন না—

বড়বাবু বললেন—ঠিক আছে, আপনি এখন যান। আমি দেখি আমার স্টাফ্ কোনো স্টেপ্ নেয় কি না—

বলে টেবিলের ওপর কলিং-বেলের সুইচ্‌টা টিপলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে একজন কন্‌স্টেবল ঘরে ঢুকেই বললে—হুজৌর—

স্রোতোস্বিনী তখন উঠে দাঁড়িয়েছিল।

বললে—আমি তা হলে যাচ্ছি স্যার—

বলে আবার বাইরে বেরিয়ে গেল।

সত্যিই মানুষের জীবনও পাহাড়ি রাস্তার মত অসমতল। সে বরাবর সমতল রাস্তায় চলতে অস্বীকার করে। যাত্রা সরল আর সহজ করবার জন্যে সে যতবার সোজা পথ বেছে নেয় ততবার সে ঘুর পথে ঘুরে ঘুরে মরে। আজ তারপর ঘুর পথ ধরে ঘুরতে ঘুরতে কখন তার ভুল ভাঙে আর কখন সে আবার তার যাত্রাপথের শুরুতে পৌঁছিয়ে আবার একবার শুরু থেকে শুরু করবার চেষ্টা করে। কিন্তু তখন তাকে মাঝপথেই যাত্রার বিরতি ঘটিয়ে জীবন থেকে হঠাৎ বিদায় নিতে হয়।

এই-ই হল মানুষের জীবন। আবহমান কাল থেকে মানুষ এমনি করেই যাত্রা করে এসেছে আর এমনি করেই জীবনের মাঝপথে ক্ষান্তি দিয়ে যাত্রার বিরতি ঘটাতে হয়েছে।

আকাশবাসীও তাই। কোথায় বাল্মীকি পণ্ডিতের কাছে তার যাত্রার আরম্ভ হয়েছিল, আর এখন সে। সে আরম্ভ করেছিল প্রজ্ঞা দিয়ে আর শেষ হতে চলেছে বিজ্ঞান দিয়ে।

আসলে প্রজ্ঞাই তো সকলের জীবনের শেষ পর্যায় হওয়া উচিত।

কিন্তু আকাশবাসীর বেলাতেই বা এমন বৈপরীত্য ঘটল কেন?

বল্লভ রোজকার মত রোজই ওষুধ কিনে আনে। ডাক্তারবাবুও রোজই একবার করে আসেন। দরকার হলে তিনি ওষুধ বদলে দিয়ে যান, কিন্তু বেশির ভাগ দিনই ওষুধ বদলানোর দরকার হয় না।

যাবার সময়ে বলে যান—আগের থেকে আপনি অনেক অনেক ভালো আছেন।

আকাশ বলে—আর ভালো থাকতে চাই না ডাক্তারবাবু...

রোগীর কথা শুনে ডাক্তারবাবু অবাক হয়ে যান। বলেন—ও কথা বলছেন কেন? এত কম বয়েসে মনে এত বৈরাগ্য এল কেন? আপনি তো বুড়ো-মানুষদের মত কথা বলছেন—

আকাশ বলে—বয়েসের দিক থেকে বুড়ো না হলেও মনের দিক থেকে আমি প্রবীণই হয়ে গেছি ডাক্তারবাবু। স্বামী বিবেকানন্দ তো অল্প বয়েসেই মারা গিয়েছিলেন, বয়েসের দিক থেকে তো তিনি মোটেই বুড়ো হননি, কিন্তু মনের দিক দিয়ে? মনের দিক দিয়ে কি তিনি আশি বছর বয়েসের জ্ঞান-বৃদ্ধ হননি?

সাধারণত ডাক্তারবাবুর এ-সব কথা শোনার সময় থাকে না। তিনি তাঁর রোগী আর ব্যবসা নিয়েই সারা দিন ব্যস্ত থাকেন। এ-সব কথা বেশি শুনতে গেলে তাঁর চলে না।

ডাক্তারবাবু চলে যাওয়ার পর দীয়া বললে—শুনলেন তো ডাক্তারবাবুর কথা? ও-সব কথা আর ভাববেন না—

আকাশ বললে—ও-সব কথা আর না-ভেবে কি পারি? দেশের অবস্থা আর দেশের মানুষের দুর্দশা দেখলে কি কোনো সুস্থ লোকের বেঁচে থাকার ইচ্ছে হয়?

দীয়া বললে—যখন আপনি তার কোনো প্রতিকার করতে পারবেন না তখন মিছিমিছি তা ভেবে শরীর খারাপ করবেন কেন?

আকাশ বললে—তুমি যে কথাটা বলছ তার মধ্যে কোনো যুক্তি নেই। মানুষ কি শুধু নিজেকে নিয়েই সুখী হতে পারে? মানুষেরও তো একটা দেশ আছে, একটা সমাজ আছে। তাদের সকলকে নিয়েই তো সেই মানুষটা। মানুষটা তো সমস্ত মানুষ-সমাজেরই একটা অংশ মাত্র। মানুষটার সমস্ত অঙ্গ পঙ্গু হয়ে গিয়ে যদি একটা অঙ্গ মাত্র সচল থাকে তাহলেই কি মানুষটা বাঁচতে পারে?

তারপরে একটু থেমে আবার বললে—এই দেখ না, সকাল বেলা খবরের কাগজটাতে চোখ বোলাতেই মনটা কেমন খারাপ হয়ে যায়। যখন দেখি কোথাও কোনো ছেলে বোমা ফাটিয়ে অনেক লোকের চোখ অন্ধ করে দিয়েছে, কোথাও কোনও সামান্য অপরাধে মানুষ একটা বাসে আগুন জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে, কিম্বা একটা ছেলে চাকরি না পেয়ে আত্মহত্যা করেছে গলায় দড়ি দিয়ে, কিম্বা বাপের কাছ থেকে ঠিক মত যৌতুক আনতে পারেনি বলে বউকে পুড়িয়ে মেরেছে, এ-সব কথা পড়লে মানুষ কি সুস্থ থাকতে পারে।

দীয়া বললে—খবরের কাগজের হকারকে বলে খবরের কাগজ দিতে বন্ধ করতে বলে দিলেই দেখছি ভালো হয়—

আকাশ বললে—তার চেয়ে বলো না তুমি আমার চোখ দুটো অন্ধ করে দিতে চাও। শরীরের

কোথাও যদি পচন ধরে তা হলে চোখ বন্ধ করে থাকলে কি সে পচন সেরে যাবে?

দীয়া বললে—সমস্ত পৃথিবীর লোক যেমন বেঁচে রয়েছে, সহ্য করছে, আপনিও তেমনি করে বেঁচে থাকুন না—

আকাশ বললে—তুমি তো বেশ বললে দীয়া। পাশের বাড়িতে আগুন লাগলে কেউ হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকতে পারে?

দীয়া বললে—আপনার শরীর খারাপ বলেই আমি তাই ও-কথা বলেছি—

আকাশ বললে—আমি জানি আমার ওপর অনেক লোকের বাঁচা-মরা নির্ভর করছে, যেমন ধরো ওই বীরেন, বিষ্ণু, জপেশ্বর আর তোমার ছেলে কুন্দন। আমার নিজের কথা ভাবি আর না ভাবি, ওদের কথা আমাকে ভাবতেই হবে। আমি একদিন থাকব না।

কেউই পৃথিবীতে চিরকাল থাকতে আসেনি। কিন্তু দেশের যে অবস্থা তাতে যদি ওরা ভালো করে মানুষ না হতে পারে, সে কথা ভাবাও কি অন্যায়? বীরেনের তো সামনেই পরীক্ষা, সে পরীক্ষা দিলে কিনা, কবে তার পরীক্ষা, কিছুই জানতে পারছি না ঘরে শুয়ে শুয়ে। কী যে করব, কিছুই বুঝতে পারছি না—তুমি কিছু জানো? ওরা কেউ এসেছে আমার খোঁজে?

দীয়া কী আর বলবে, মিথ্যে কথাই বললে—হ্যাঁ—

—তারা কী করছে এখন তা কি তোমায় বলেছে?

দীয়া এবারও মিথ্যে কথা বলল—হ্যাঁ, তারা ভালো আছে—

—আর আমার কলেজ থেকে কেউ কিছু খবর নিতে এসেছিল?

দীয়া বললে—হ্যাঁ, এসেছিল। আমি তাদের বলেছি আপনার অসুখ, তাই কলেজে যেতে পারছেন না। বলেছি শরীর ভালো হলেই কলেজে যাবেন। শুনে তাঁরা চলে গেছেন—

আকাশ সব শুনে বললে—তুমি তাহলে আর কতদিন এ বাড়িতে থাকবে? আমি তো এখন ভালোই আছি—তুমি এবার তোমার বাড়ি চলে যাও। এখন কলকাতায় বাড়ি খালি রাখা উচিত নয়—

দীয়া বললে—বাড়ি খালি নেই, সেখানে রামভুজ আছে। সে দেখাশোনা করছে ঠিক মত।

—আর দাস? আমাদের সেই দাসানুদাস?

দীয়া বললে—আমি দাসবাবুকে রাঁচিতে পাঠিয়েছি—

—কেন?

দীয়া বললে—সেই রাঁচি থেকে একজন ভদ্রলোক চিঠি লিখেছিলেন যে তিনি বাড়িটা ভাড়া নিতে চান। তখন আপনার খুব অসুখ, তাই তাঁকে বললাম যে আকাশবাবুর তো এখন অসুখ, আপনি সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করে আসুন, আর কী রকম লোক তিনি তাও জেনে আসুন। আর যদি বোঝেন যে তিনি লোক ভালো তাহলে তাকেই বাড়িটা ভাড়া দিয়ে আসুন। ভাড়ার ব্যাপারে যা বাজারদর তাই দিলেই চলবে—

—তাহলে দাসের ফিরতে এত দেরি হচ্ছে কেন? কবে গেছে দাস?

দীয়া বললে—তা পাঁচ ছ'দিন হয়ে গেছে। এখনও কেন ফিরে আসছে না, বুঝতে পারছি না।

আকাশ বললে—তারও আমার মত অসুখবিসুখ হল নাকি?

দীয়া বললে—আমি তো তাই ভাবছি—

দাস সত্যিই দাসানুদাস। সে জীবনে কখনও কারো সঙ্গে কড়া কথা বলেনি। যে ভদ্রলোক বাড়িটা ভাড়া নেবেন তার ঠিকানা খুঁজে বার করতেই প্রথম দিনটা কেটে গেল। শেষকালে যখন তাঁকে খুঁজে পাওয়া গেল তখন দাস শুনল ভদ্রলোক দু'দিনের জন্যে বাইরে গেছেন নিজের কাজে।

ভদ্রলোকের নাম বিনয় বিহারী চট্টোপাধ্যায়। তাঁর চিঠিতে তিনি সেই নামই লিখেছিলেন।

দাস জিজ্ঞেস করলে—তিনি কবে ফিরবেন?

উত্তর এল—কালও ফিরতে পারেন কিম্বা পরশুও ফিরতে পারেন। কোনো ঠিক নেই—

তারপর জিজ্ঞেস করলে—আপনি কোথা থেকে আসছেন?

দাস বললে— আমি আসছি কলকাতা থেকে। কলকাতার আকাশবাসীবাবুকে বিনয়বিহারীবাবু একটা চিঠি লিখেছিলেন—তাতে তিনি লিখেছিলেন যে তিনি আকাশবাবুর রাঁচির বাড়িটা ভাড়া নিতে চান। আকাশবাবুর শরীর এখন খারাপ, তিনি অসুস্থ। তাই তিনি আমাকে পাঠিয়েছেন সেই সম্বন্ধে কথা বলতে।

মেয়েটি কী বলবে বুঝতে পারল না।

দাস বললে—আমি কি আরো কিছুদিন অপেক্ষা করবো?

মেয়েটি বললে—আপনার যদি অসুবিধে না হয় তো অপেক্ষা করতে পারেন—

দাস চলে এল। বাড়ির চাবি তার কাছে ছিল। তাই খুব যে অসুবিধে হল, তা নয়। হোটেল থেকে রাত্রের খাওয়া খেয়ে নিয়ে বাড়ির একটা ঘরে রাতটা কাটাল। তারপর সকালে উঠেই আবার হোটেলে গিয়ে জল-খাবার খাওয়া। সেখান থেকে বাড়িতে এসে স্নান করা, দাড়ি কামানো। জামা-কাপড় বদলানো। অনেক কাজ সেরে আবার সেই বিনয়বাবুর বাড়িতে যাওয়া।

সেদিনও যথাসময়ে সেই বাড়ির সদর দরজায় গিয়ে কড়া নাড়া।

সেদিনও সেই একই মেয়েটি এসে দরজা খুলে দিল।

দাসকে বললে—আজও বাবা আসেননি।

দাস জিজ্ঞেস করলে—তাঁর কোনো চিঠিপত্র পেয়েছেন?

মেয়েটি ঘাড় নাড়লে। অর্থাৎ—না—

দাস বললে—আর কতদিন তাহলে তাঁর জন্যে অপেক্ষা করব? আমারও তো কাজকর্ম আছে—

তারপর দাস একটু থেমে আবার জিজ্ঞেস করলে—আপনার বাবা বাড়ি ভাড়া নিতে চাইছেন কী জন্যে?

মেয়েটি বললে—এই বাড়ির বাড়িওয়ালা আমাদের বিরুদ্ধে মামলা করে আমাদের উঠিয়ে দিতে চাইছেন। এবাড়ি ছেড়ে দিলে আমরা কোথায় যাব। সেই জন্যেই আপনাদের বাড়িটা ভাড়া নিতে চাইছিলেন।

দাস জিজ্ঞেস করলে—আপনাদের বাড়িতে আর কে আছেন? আর কারো সঙ্গে কথা বলতে পারি?

মেয়েটি বললে—এ-বাড়িতে আমার মা আছেন—

দাস জিজ্ঞেস করলে—আমি আপনার মার সঙ্গে একটু কথা বলতে পারি?

মেয়েটি বললে—মার খুব অসুখ, মা শুয়ে পড়ে আছে—

হঠাৎ ভেতর থেকে মেয়েলি গলায় কার আওয়াজ এল— ও চন্দ্রা, কার সঙ্গে কথা বলছিস রে!

—ওই মা ডাকছে—

বলে চন্দ্রা ভেতরে চলে গেল। দাস তখনও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছে কী করবে। একটু পরেই চন্দ্রা বেরিয়ে এসে বললে—আপনি মার সঙ্গে কথা বলবেন?

দাস বললে—হ্যাঁ, তা কথা বলতে পারি—

চন্দ্রা দাসকে ভেতরে নিয়ে গেল সঙ্গে করে।

দাস দেখলে বাড়িটা ছোট। মাত্র দেড়খানা ঘর। ওই দেড়খানা ঘরের মধ্যেই বিনয়বাবুর সংসার। একখানা ঘরের এক পাশে একটা তক্তপোশ। তার ওপর একজন মহিলা শুয়ে আছেন। বিছানার তোশক ছেঁড়া, চাদরটা ময়লা। ঘরের সব দিকেই সংসারের দরকারি অদরকারি জিনিসপত্র ছড়ানো। কোথাও কোনো শৃঙ্খলার বালাই নেই। দারিদ্র্যের চিহ্ন সর্বত্র সুস্পষ্ট।

মহিলাটি শুয়ে শুয়েই মেয়ের দিকে চেয়ে বললেন— ওরে চন্দ্রা, টুলটা এগিয়ে দে মা—

কিন্তু চন্দ্রার টুল এগিয়ে দেবার আগেই দাস টুলের ওপর বসে পড়ল।

বললে—আমি কলকাতার আকাশবাবুর বাড়ি থেকে আসছি। আপনার স্বামী বিনয়বাবু আকাশবাবুকে তাঁর এখানকার বাড়িটা ভাড়া নিতে চেয়ে চিঠি লিখেছিলেন। সেই কারণেই আমার এখানে আসা। কিন্তু বিনয়বাবু তো এখানে নেই। আমি তাঁর দেখাই পেলুম না। আমি দুদিন ধরে এখানে রয়েছি। কতদিন আমাকে এখানে থাকতে হবে বুঝতে পারছি না...

মহিলাটি বললেন—আমাদের এখন খুবই বিপদ চলছে।

—বিপদ!

মহিলাটি বললেন—একে তো এই বাড়ির বাড়িওয়ালা আমাদের উঠিয়ে দেবার জন্যে মামলা করছে, তার ওপর এই সময়েই আমি অসুখে পড়েছি আর তার ওপর...

মহিলাটি কথা বলতে গিয়ে হাঁফাচ্ছিলেন। তিনি একবার দম নিলেন।

বললেন—আবার তার ওপর ওই আমার মেয়ে, ওই চন্দ্রার জন্যে একটা পাত্রের খোঁজে গেছেন পাটনাতে—

এ কথার পর দাসের আর কীইবা বলবার থাকতে পারে।

মহিলাটি নিজেই আবার বলতে লাগলেন—ওঁরও তো শরীরটা ভালো যাচ্ছে না আজকাল। উনি একলা মানুষ, কটা দিকেই বা দেখবেন। একে বাড়ির সমস্যা, তার ওপর ওই মেয়েটার বয়েস দিন দিন বাড়ছে—

এ কথারই বা কী জবাব দেবে তা বুঝতে পারলেন না দাস।

মহিলাটি আবার বললেন—আপনি নিজে দয়া করে ওঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন আর তিনিই নেই, এসবই আমাদের কপাল।

দাস বললে—বিনয়বাবুর চিঠি না পেলে তো আমি আসতুমই না। তাই দয়া করার কথাই ওঠে না। আপনারা যদি বলেন যে আপনারা ও বাড়িটা ভাড়া নেবেন, তাহলে আমি আকাশবাবুকে গিয়ে সেই কথাই বলব। কত ভাড়া আপনারা দিতে পারবেন তা যদি বলেন তো তাও আমি আকাশবাবুকে গিয়ে বলতে পারি।

মহিলাটি বললেন—ভাড়ার কথা আমি কী করে বলব? তিনি এলে তাঁর মুখ থেকেই শুনবেন আপনি—

দাস বললে—তিনি কবে আসবেন তার যখন কিছু ঠিক নেই তখন তাঁর জন্যে আমি আর কতদিন অপেক্ষা করব? তার চেয়ে আমি কলকাতায় ফিরে যাই, তিনি কত ভাড়া দিতে পারবেন সেটা যেন তিনি চিঠি লিখেই আমাদের জানান—

বলে দাস ঘরের বাইরে চলে আসছিল, কিন্তু তার আগেই মহিলাটি বললেন—আর একটা কথা শুনুন—

দাস ফিরে দাঁড়াল। বললে—কী, বলুন?

মহিলা বললেন—আমার একটা উপকার করতে পারবেন?

—বলুন কী উপকার?

—আপনি তো কলকাতায় থাকেন। কলকাতার অনেক ভালো ভালো বাঙালি পাত্র আছে। আমার এই চন্দ্রার জন্যে একটা ভালো পাত্র দেখে দিন না। এমন পাত্র দেখবেন যার নিজের বা পৈতৃক একটা বাড়ি আছে। যেন ভাড়াটে না হয়। ভাড়াটে হওয়ার অনেক জ্বালা। আমাকে যে জ্বালায় জ্বলতে হচ্ছে আমার মেয়েকে যেন সে জ্বালায় জ্বলতে না হয়। মেয়ের বিয়েতে আমরা কিছু দিতে-থুতে পারব না, এটা আগে থেকেই আপনাকে বলে রাখা ভালো। আমরা চ্যাটার্জি, আমাদের সঙ্গে গাঙ্গুলি, মুখার্জি, ব্যানার্জি সকলের সঙ্গেই কাজ হয়। আর তা না পেলে বামুন হলে চলবে। আমার মেয়েকে তো দেখছেন, মেয়েকে সুন্দরীই বলা যায়। চন্দ্রা দুবছর হল বি এ পাশ করে বাড়িতে বসে আছে—কথা বলতে মহিলার খুবই কষ্ট হচ্ছিল।

দাস বললে—আপনাকে আর বেশি বলতে হবে না। আমি চেষ্টা করব দেখব। যদি খবর পাই তো বিনয়বাবুকে চিঠি লিখে জানাব। আমি এখন যাই—বলে দাস বেরিয়ে এল।

সামনের ঘুপচি গলিটা পেরিয়েই চওড়া রাস্তা।

দাস বাড়িটা পেরোতেই পেছন থেকে চন্দ্রা ডাকলে—একটু দাঁড়ান।

দাস পেছন ফিরে চন্দ্রার দিকে মুখ করে দাঁড়াল।

বললে—আমাকে ডাকছেন?

চন্দ্রা তখন সদর দরজা ছেড়ে গলিতে নেমে এসে দাসের কাছাকাছি দাঁড়াল। বললে—আপনি মার কথা শুনবেন না, আমার বিয়ের পাত্র খুঁজতে হবে না আপনাকে।

দাস হতবাক হয়ে চুপ করে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। তারপর জিজ্ঞেস করলে—কেন?

চন্দ্রা বললে—আমার বিয়ের পাত্র ঠিক হয়ে গেছে, আমার বিয়ের জন্যে আপনাকে মিছিমিছি আর কষ্ট করতে হবে না—

কথাটা বলেই চন্দ্রা যেমন এসেছিল তেমনি আবার সেই পথ দিয়েই নিজেদের বাড়ির ভেতরে ঢুকে দরজায় খিল বন্ধ করে দিলে।

আকাশ এখন একটু সুস্থতা বোধ করছে। সামনের টেবিলে দীয়া তার খাবারের ব্যবস্থা করছে। সব ব্যবস্থা শেষ করে দীয়া বললে—এবার খান—

আকাশ জিজ্ঞেস করলে—তুমি খাবে না?

—আমি পরে খাবোখন—

আকাশ বললে—তুমি তোমার বাড়ি ছেড়ে আর কতদিন এখানে পড়ে থাকবে? তোমার ছেলে রয়েছে সেখানে।

দীয়া বললে—সেখানে তো রামভুজ রয়েছে, সে থাকতে আর আমার কোনো ভাবনা নেই।

আকাশ জিজ্ঞেস করলে—রামভুজ এখানে আসে?

দীয়া বললে—আসবার সময় রামভুজকে অনেক টাকা দিয়ে এসেছি। যদি ইলেকট্রিকের বিলটিল কিছু আসে তো সেই টাকা থেকেই সে তা মিটিয়ে দিতে পারবে।

এরপর খানিকক্ষণ আর কোনো কথা বললে না আকাশ।

আকাশ বললে—এ মাসে বল্লভের মাইনে দেওয়া হয়নি আর রামভুজেরও মাইনে দেওয়া হয়নি।

দীয়া বললে— ওদের মাইনে আমি দিয়ে দিয়েছি—

—তুমি দিয়ে দিয়েছ? কেন?

—ওরা গরিব লোক, ওরা টাকা না পেলে ওদের খুব কষ্ট হবে তাই।

আকাশ বললে—তুমি আমাকে সব দিক থেকে ঋণী করে রাখলে দীয়া, আমি নিজের একটা জীবনে তোমার এত ধার শোধ করব কী করে বুঝতে পারছি না।

দীয়া বলল—আপনি চুপ করুন, সবে সেরে উঠেছেন, এখনই এত কথা বললে আপনার অসুখ আবার বাড়বে—

আকাশ বললে—কথা না হয় না-ই বললুম, কিন্তু আমার মন? আমার মনটাকে কি তুমি চুপ করাতে পারবে? আমি এতদিন তো বিছানায় চুপ করে শুয়েই ছিলুম, কিন্তু তাতে আমার শরীরটাই শুধু শুয়ে ছিল। কিন্তু মন তো কথা বলত! মনের সঙ্গে আমি যে কথা বলেছি তা যদি তোমরা শুনতে পেতে!

দীয়া বললে—আপনি অত ভাবেন কেন?

—ভাবি কেন?

বলে খেতে খেতে আকাশ একটু হাসল। বলতে লাগল—তুমি আমাকে না ভাবতে বলছ, কিন্তু আমি না ভাবতে পারলেই তো বেঁচে যেতুম।

দীয়া বললে—আপনার ভাবনার দরকার কী? আপনার টাকা আছে, আপনার যৌবন আছে, আপনার কীসের অভাব? সে সব যার নেই সে বেশি ভাববে, আপনি কেন ভাববেন?

আকাশ বলল—শুধু টাকা আর শুধু যৌবন থাকলেই কি সব থাকা হল দীয়া? মানুষ কি শুধু নিজেকে নিয়েই বাঁচতে পারে? তার কি দেশ নেই, তার কি সমাজ নেই, তার কি বিরাট বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড নেই?

বলে একটু থেমে নিয়ে আবার বলতে লাগল—সবাই সুখী হলে তবে তো আমার সুখ। তাই সব সময়ে তোমার কুন্দনের কথা মনে পড়ে, দাসের কথা মনে পড়ে, রামভুজের কথা মনে পড়ে। ওই বীরেন, বিষ্ণু, জাপানীর কথাও মনে পড়ে, আর শুধু কি তাই? আমার আগে যে মানুষরা জন্মেছে তাদের কথা মনে পড়ে, আমার মরার পরেও যারা জন্মাবে তাদেরও কথা আমার মনে পড়ে। আমি কাউকে ভুলতে পারি না। আর তারপরে আছ তুমি। এই দেখ না, কোথায় তুমি জন্মেছিলে, কোথায় কার সঙ্গে একদিন তোমার বিয়েও হয়েছিল। তারপর হঠাৎ কী হতে গিয়ে তুমি কী হয়ে গেলে। তুমি কার ঘরণী ছিলে। আবার হঠাৎ কোথায় এখানে এসে কার সেবা করছ, বড় বিচিত্র নয় এ-সংসার?

দীয়া এ-কথার কোনো উত্তর দিলে না, চুপ করে রইল।

আকাশ আবার বলতে লাগল—একটু আগেই তুমি বললে যে আমি এত ভাবি কেন? কেন ভাবি জানো? ভাবি মানুষের জন্যেই। হাজার-হাজার বছর ধরে মানুষ তার নিজের পছন্দ অনুযায়ী এমন গভর্মেন্ট চেয়েছে, যে সেই গভর্মেন্ট মানুষের ওপর সুবিচার করবে। কিন্তু মানুষের সমাজ কি গভর্মেন্ট পেয়েছে? সেই ইমপিরিয়ালিজম্ সেই সোশ্যালিজম, সেই কমিউনিজম—কত রকম চেষ্টাই তো হল। কারোর চেষ্টা কি সফল হয়েছে? আসলে যে ধরনের গভর্মেন্টেই হোক গভর্মেন্ট মানেই হচ্ছে Conspiracy of the few against many, whatever form it takes. এই জন্যেই এত কাল পরে মানুষের কোনো উন্নতি হচ্ছে না। মানুষের কোনো উন্নতি হবে না।

কথার মাঝখানেই বাধা পড়ল। বল্লভ এসে বললে—দাসবাবু এসেছেন—

তার পেছন-পেছন সত্যি-সত্যি দাস এসে ঘরে ঢুকল।

আকাশ বললে— সে কী রে, তুই? এত দেরি হল আসতে?

দাস টেবিলের ওপর ওষুধের সরঞ্জাম দেখে অবাক হয়ে গেল।

বললে—এত ওষুধের শিশি কার রে?

আকাশের বদলে দীয়াই প্রশ্নটার উত্তর দিলে। বললে—আপনি চলে যাওয়ার পরেই উনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। কয়েক দিন তো ওঁর জ্ঞানই হয়নি। আমি খুবই ভয় পেয়েছিলাম। আপনি কলকাতায় নেই, বল্লভ গিয়ে আমাকে খবর দিলে তাই চলে এসেছি। সেই তখন থেকে আমি এখানেই রয়েছি—

দাস জিজ্ঞেস করলে—তাহলে আপানর বাড়ি কে দেখছে?

দীয়া বললে—রামভুজ আছে, সে একাই একশো।

দাস বললে—তা বটে।

তারপরে আকাশের দিকে চেয়ে বললে—হঠাৎ এমন হলই বা কেন তোর? কী হয়েছিল?

আকাশ বললে—জানি না কী হয়েছিল। সেদিনও কলেজে গিয়েছি। ছেলে-মেয়েদের পড়িয়েছি। কলেজ থেকে ফিরে মনে হয়েছিল খুব ক্লান্ত। বল্লভকে বললাম—আজ আমি আর কিছু খাব না, আমি সকাল-সকাল শুয়ে পড়ব। তারপর রাত্তিরে কী হল জানি না, আর কিছু মনে নেই। ক'দিন ধরে আমি কেবল স্বপ্ন দেখেছি—

—স্বপ্ন?

—হ্যাঁ, বিচিত্র সব স্বপ্ন। মনে হচ্ছিল আমি যেন লন্ডনে গিয়েছি। সেখানে গিয়ে দেখি রাস্তায় দীয়া হাঁটছে। কী সব অদ্ভুত স্বপ্ন। সে-সব স্বপ্নের মাথা নেই মুণ্ডু নেই। তখন ডাক্তার মুখার্জি এসেছেন, কী ওষুধ দিয়েছেন, কিছুরই জ্ঞান নেই। এই রকম করে অজ্ঞান হয়ে কত দিন যে শুয়ে পড়েছিলাম, তারও খেয়াল নেই আমার। তারপর একদিন চোখ খুলতেই দেখলাম সামনে দীয়ার মুখ—

দাস বললে—এরকম কেন হয়েছিল? ডাক্তার কিছু বলেছে?

দীয়া বললে—ডাক্তারবাবু বললেন এও নাকি এক রকমের মূর্ছা যাওয়া, নার্ভের ওপর বেশি চাপ পড়লেও নাকি এইরকম হয়।

দাস জিজ্ঞেস করলে—তোর নার্ভের ওপর খুব বেশি চাপ পড়েছিল নাকি?

আকাশ বললে—যে যুগ পড়েছে তাতে নার্ভের ওপর যে চাপ পড়বে এতে আশ্চর্য হওয়ার কী আছে। চারদিকে যেসব কাণ্ড চলছে তাতে অজান্তেই আমাদের নার্ভ অনবরত অকেজো হয়ে পড়ছে—

তারপরে একটু থেমে জিজ্ঞেস করলে—তা রাঁচিতে গিয়ে কী হল? বাড়িটা ভাড়া নেবে?

দাস বললে— সে অনেক কাণ্ড, পরে বলব। আমি ট্রেন থেকে নেমে সোজা চলে এসেছি—এখনও তৈরি হয়ে নিতে পারিনি—

দীয়া বললে—তা আপনি এখানেই তৈরি হয়ে নিন না—আমি বল্লভকে আপনার জলযোগের ব্যবস্থা করতে বলছি।

বলে ভেতরে চলে গেছে।

স্রোতস্বিনী যেদিন পুলিশের থানায় গিয়ে তার এজাহার দিয়ে এসেছিল তার পরদিন থেকেই থানার ইন্সপেক্টর সাব-ইন্সপেক্টার কনস্টেবল সকলকেই হুকুম দেওয়া হয়ে গিয়েছিল যে পরশুদিন যেন ভোর চারটের সময়েই সবাই তৈরি থাকে। কারণ সেদিন একটা বাড়িতে তল্লাশি হবে। তাতে তাদের সকলকে অংশ নিতে হবে।

কোথায় তল্লাশি হবে, কেন তল্লাশি হবে, কোন ঠিকানায় তল্লাশি হবে, কাদের তল্লাশি করা হবে, তা কাউকেই জানানো হল না। পুলিসের নিয়ম-কানুন অনুযায়ী তা আগে-ভাগে জানানো হয়ও না।

কিন্তু দেখা গেল তা জানাজানি হয়ে গেছে একটু আগেই। অর্থাৎ আর একটু দেরি হলেই সব কিছু পণ্ড শ্রম হয়ে যেত। তবু মাঠবাগানের বস্তির সমস্ত লোক সেদিন বন্দুকের শব্দে হঠাৎ সচকিত হয়ে উঠেছে। সবাই যে-যেদিকে পারে পালাতে চেষ্টা করেছে।

কিন্তু কোথায় পালাবে?

যেদিকেই লোক যেতে চায় সেদিকেই পুলিস। পুলিস সমস্ত বস্তিটা অতর্কিতে ঘিরে ফেলেছে। একদল পুলিস তখন লাঠি রিভলবার তুলে সকলকে লক্ষ্য করে উঁচু করে ধরেছে। বেশি এগোলেই সকলকে আমরা গুলি করে মারব, সকলকে আমরা খুন করে ফেলব। দু-হাত মাথার ওপর উঁচু করে তুলে দাঁড়িয়ে থাকো সবাই। তাহলে আমরা কিছু বলব না—

বস্তির সমস্ত লোক তখন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে থর-থর করে কাঁপছে। সকলেরই দু-হাত উঁচু করে তোলা। কেউ নড়ছে না, চড়ছে না, শুধু পুলিশ দলের সামনে কাতর কণ্ঠে নিজেদের প্রাণ-ভিক্ষে চাইছে।

সামনে ছিল পুলিসের অফিসার-ইন-চার্জ। হঠাৎ কোথা থেকে একটা আওয়াজ হল। আর সঙ্গে সঙ্গে ও সি আকাশ লক্ষ্য করে ফায়ার করলেন।

তখন সব চুপ। একেবারে শ্মশানের নিস্তব্ধতা চারদিকে।

তখন আর দেরি নয়। ইনফরমার যেমন যেমন খবর দিয়েছিল তেমনি তেমনি নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে দেখা গেল আশ্চর্য কাণ্ড। যেন একটা আর্মারী। যেন একটা অস্ত্রাগার।

খানিক পরে এলাকার ডি.সিও সদলবলে এসে হাজির। সামনে পেছনে সশস্ত্র পুলিস। তারা সবাই রিভলবার উঁচু করে ডি-সিকে পাহারা দিয়ে সামনের দিকে এগোল।

সবসুদ্ধ পাওয়া গেল একচল্লিশটা বুলেট, দুটি পাইপ-গান, একটা রাইফেল, রাইফেল-চার্জার, মিলিটারি দফতরের একটা এইচ-৩৫ গ্রেনেড, দুটো পিস্তল, বাইশটা বোমা। আর শুধু তাই নয়। সবচেয়ে বেশি ভয়ঙ্কর যে জিনিসটা পাওয়া গেল সেটা হচ্ছে সাত কেজি পটাশিয়াম ক্লোরাইড আর আরসেনিক সালফাইড—যা দিয়ে কম করেও প্রায় এক হাজারের ওপর মারাত্মক বোমা তৈরি করা

যায়। আর পাওয়া গেল এমন এক ধরনের সাতটা গুলি যা পুলিস আর মিলিটারির লোকরা ব্যবহার করে।

সবাই দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল এমন সব জিনিস এই বস্তির ভেতরে এলো কি করে?

কিন্তু যারা এখানে থাকে, যারা এই সব বোমা তৈরি করে, যারা রাস্তায় বাড়িতে বোমা ফেলে, যারা মেয়েদের ছিনতাই করে, তারা গেল কোথায়? তারা কি তবে আগে থেকে খবর পেয়ে গিয়েছিল?

হঠাৎ ইনফরমার ডি সির কাছে এসে কানে কানে বললে—স্যার, তারা কোথায় গেছে আমি জানি—

—কোথায় গেছে?

তারপর ডি সির কানে কানে কী বললে সে, তা কেউ শুনতে পেলে না, সঙ্গে সঙ্গে একজন কনস্টেবল নিয়ে ডি সি জিপ নিয়ে কোথায় কত দূরে চলে গেল তা দলের অন্য কেউই জানতে পারলে না।

দীয়ার বাড়ির সদর দরজায় রামভুজের কাছে সব খবর নিয়ে পুলিস সদলবলে ভেতরে ঢুকে পড়েছিল। সব ঘরের তালা ভেঙেও যখন কারো কোনো সন্ধান পাওয়া গেল না, কোনো আপত্তিকর কিছুও পাওয়া গেল না, তখন বাথরুমের দরজায় ধাক্কা দেওয়া হল।

যখন কিছুতেই দরজা খোলে না তখন পুলিস থানা থেকে হাতুড়ি এনে ধাক্কা দিতেই এক আজব ঘটনা ঘটল। হঠাৎ বাথরুমের ভেতর থেকেই বোমা ফাটার বিকট একটা শব্দ হল! আর শুধু একবার নয় দুবার তিনবার বোমা ফাটল।

পুলিসও বাইরে থেকে গুলি চালাল।

আর সঙ্গে সঙ্গে বাথরুমের দরজাটা ভেঙে ভেতরে পড়ে গেল। দেখা গেল চারজন নয়, দুজন ছেলে বাথরুমের ভেতরেই মরে পড়ে আছে : দেখে বোঝা গেল তারা টাটকা মরেছে। তাদের নাক-মুখ সর্বাঙ্গ দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ে বাথরুমের মেঝে ভেসে যাচ্ছে।

পুলিসের গাড়ি দেখে আশে-পাশের পাড়ার লোকজন সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল। এবার বোমা-গুলির আওয়াজ পেয়ে আরও লোকজন এসে ভিড় করেছে তখন।

একজন লোক এসে সব কিছু দেখে আর একজনকে জিজ্ঞেস করলে—কী হয়েছে মশাই? এখানে পুলিসের গাড়ি কেন?

কিন্তু কেউ তা জানে না কী জন্যে পুলিসের গাড়ি এসেছে, তাই কেউই কারণটা বলতে পারলে না।

ততক্ষণে কোথা থেকে একটা অ্যামবুলেন্সের গাড়ি এল। পুলিসরা সবাই মিলে ধরাধরি করে দুটো মৃতদেহ তাতে তুলে নিয়ে হাসপাতালে চলে গেল। রামভুজকেও তাদের সঙ্গে নিয়ে গেল তারা।

পুলিস রামভুজকে জিজ্ঞেস করলে—বাড়ির মালিক কোথায়?

রামভুজ তখন ভয়ে মনে মনে রাম-নাম করছে। এতদিন রামভুজ কলকাতায় আছে কিন্তু এমন ঘটনার মুখোমুখি সে আগে কখনও হয়নি।

বললে—দিদিমণি আকাশবাবুর বাড়িতে গেছেন—

—কেন?

—আকাশবাবুর বেমার হয়েছে, তাই তাঁকে দেখতে গেছেন—

পুলিস জিজ্ঞেস করলে—কতদিন ধরে তিনি সেখানে গেছেন?

—আজ দশ বারো দিন ধরে তিনি সেখানেই আছেন। আকাশবাবুর বাড়িতে তাঁকে দেখবার কেউ নেই বলে তিনি আসতে পারছেন না।

রাস্তায় গাড়িতে যেতে যেতেই এই সব কথা হচ্ছিল। গাড়িটা একটা হাসপাতালের কাছে আসতেই অ্যাম্বুলেন্স থেকে দুটো ছেলের মৃতদেহ নামিয়ে ভেতরে নিয়ে যাওয়া হল।

রামভুজ তখনও গাড়িতে বসে বসে সব দেখছে আর ভাবছে। দিদিমণি তাকে পাহারা দেওয়ার জন্যেই বাড়িতে রেখে দিয়ে গিয়েছিল। এই ঘটনার পর যদি দিদিমণি তাকে দোষ দেয়, যদি বলে—তোমাকে বাড়ি পাহারা দেওয়ার জন্যেই এখানে রেখে দিয়ে গিয়েছিলুম, তুমি দেখতে পাওনি কারা বাড়িতে ঢুকছে কারা বাড়ি থেকে বেরোচ্ছে, তাহলে তোমাকে রেখে আমাদের কী লাভ হল?

খানিক পরে থানার বড়বাবু এসে গাড়িতে উঠে বসল। ড্রাইভার গাড়ি চালাতে আরম্ভ করল।

রামভুজ তখনও ভয়ে কাঁপছে।

পুলিসের বড়বাবু হঠাৎ বললে—আকাশবাবুর বাড়ি চেনো তো তুমি?

রামভুজ বললে—হাঁ হুজুর চিনি—

—আমরা সেখানেই যাব, তোমার মালিকের সঙ্গে আমি দেখা করব। ড্রাইভারকে বলে দাও কোন রাস্তা দিয়ে যেতে হবে—

রামভুজ রাস্তাটা বাতলে দিলে। তারপর আকাশবাবুর বাড়ির সামনে আসতেই বলল—এই, এই বাড়িটা আকাশবাবুর, এখানেই আমার দিদিমণি আছেন—

তার নির্দেশ মত গাড়িটা সেখানেই থামল? রামভুজকে দুজন কনস্টেবল ঘিরে ধরে বাড়ির দিকে চলল। বাড়ির সদর দরজার কলিং বেলটা টিপল বড়বাবু।

দরজা খুলতেই বল্লভ রামভুজকে দেখতে পেয়েছে। কিন্তু পুলিসকে দেখে ভয় পেয়ে গেছে বল্লভ। সে কিছু বলবার আগেই বড়বাবু জিজ্ঞেস করলে—এ বাড়িতে আকাশবাবু নামে কেউ আছে?

বল্লভের মুখ দিয়ে তখন কোনো কথা বেরোচ্ছে না। কোনো রকমে বললে—হ্যাঁ, হুজুর—

—চলো, ভেতরে চলো—

বলে বল্লভের সঙ্গে সঙ্গে পুলিসের দলেরও সবাই ভেতরে ঢুকল। তাদের সঙ্গে ঢুকল রামভুজও।

সামনে সামনে বল্লভ চলতে লাগল, আর তার পেছন পেছন পুলিসের দল। আর তাদের সঙ্গে রামভুজ। একতলা থেকে সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠেই ডান দিকে একটা বসবার ঘর। সেখানে আকাশ দীয়া দাস তিনজনেই তখন বসে আছে। হঠাৎ বল্লভের সঙ্গে পুলিস অফিসার দুজন কনস্টেবল আর রামভুজকে দেখে তিনজনেই অবাক হয়ে গেছে।

—কার নাম আকাশবাবু?

আকাশ উঠে দাঁড়াল? বললে—আমিই। আপনারা কোথা থেকে?

—দীয়া দেবী কে?

দীয়াও ভয়ে চমকে উঠেছে। বললে—আমি। আমার নাম দীয়া—

—আপনার ছেলের নাম কী কুন্দনলাল?

দীয়া বললে—হ্যাঁ—

বড়বাবু বললে—আপনার সেই ছেলে কুন্দনলাল মারা গেছে। আর তার সঙ্গে মারা গেছে জপেশ্বর বা জাপানী নামে আর একটা ছেলে। তাদের ডেড বডি মর্গে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। ইচ্ছে করলে আপনারা মর্গে গিয়ে দেখে আসতে পারেন। আর তাদের পার্টির দুজন বীরেন আর বিষ্ণু ফেরার।

—তারা কী করেছিল?

—স্রোতস্বিনী নামের এক মহিলার রিস্ট-ওয়াচ তারা ছিনতাই করেছিল।

কলেজ থেকে কোনো তাড়া আসেনি। আসার কথাও নয়। আকাশের বাড়াবাড়ি অসুখ এটা তার কর্মস্থানে রটে গিয়েছিল। কলেজে আকাশের বিশেষ একটা সম্ভ্রম ছিল। সে পেশাদারী মাস্টার নয়। নিয়মরক্ষার জন্যে কলেজে আসে না, মাসান্তে বিদ্যাবিক্রয়ের মজুরি নিতেও নয়। এমন মানুষকে সম্ভ্রম করার লোক তো থাকবেই। আবার সম্ভ্রমের গায়ে গায়ে জড়িয়ে থাকে শত্রুতা। আকাশকে অপছন্দ করার মতনও মানুষও কিছু ছিল বইকি! আকাশ কেন তার বৃত্তিকে ব্যবসায়িক করে তোলেনি—বোধহয় এই কারণেই তারা বিরক্ত ও অসহিষ্ণু ছিল আকাশের ওপর। হিংসে করত। আকাশ কেন স্বতন্ত্রভাবে সম্ভ্রম ও মর্যাদার আসন পাবে এটা তারা বুঝতে চাইত না। এদের ধারণা ছিল, কলেজের ছেলে-মেয়েদের কাছে, কিছু সহকর্মীর কাছে আকাশ যে সম্ভ্রম আদায় করছে—সেটা তার প্রাপ্য নয়। এরা অনেকেই আকাশের হাঁড়ির খবর রাখত। রাখত বলেই নিজেদের মধ্যে বলাবলি করত, পেছনে টাকার পাহাড় থাকলে সবই হয় হে। বাপের টাকায় অক্সফোর্ড কে না যেতে পারে? আর আদর্শ শিক্ষক কাকে বলতে চাও? পেটের ডাল-ভাত জোটাতে যেখানে কালঘাম ছুটে যায়—সেখানে তুমি হবে 'ডেডিকেটেড টিচার'? থাকত বাপের টাকা তো আমরাও আদর্শটা দেখিয়ে দিতাম। নলিন বলে একজন হাল আমলের লেকচারার ছিল যে কথায়-বার্তায় ঘোরতর উগ্র। সে বলত: 'আপনারা আর আদর্শের বড়াই করবেন না, স্যার। আপনাদের আগের জেনারেশানের গুণগান শুনতে শুনতে কানের পরদা নষ্ট হয়ে গিয়েছে। একটা কথা বলি স্যার, আপনাদের আগের জেনারেশানে এতই যদি আদর্শের ছড়াছড়ি থেকে থাকে, তবে তো বলতে হবে আজকের এই ফসল তাঁরাই ফলিয়েছেন। সাধারণ জ্ঞান কী বলে স্যার? বলে নিমের চারা পুঁতলে নিমগাছই হয়, গোলাপখাস পুঁতলে গোলাপখাস? আপনারাই ভেবে দেখুন কোন চারা আপনাদের আগের জেনারেশন পুঁতে গেছেন!

নলিন ছেলেটা উগ্র হলেও সে নিন্দুক দলের সদস্য ছিল না। সে বিন্দুমাত্র হিংসে করত না আকাশকে। কিন্তু আকাশের অনুরাগী সে ছিল না। বরং আকাশকে সে উপেক্ষা করত। মনে মনে ভাবত: ভদ্রলোকের সঙ্গে যদি লড়তে হয়, একাই লড়ব, এই সব কলেজ পলিটিক্স আর ইউনিয়নবাজি করা লোকগুলোর সঙ্গে নয়।

আকাশের বিরোধী দল আকাশকে জব্দ করার জন্যে তক্কে তক্কে থাকত। তাকে হটিয়ে রেখেছিল টিচার্স কাউন্সিল থেকে। ছেলে-মেয়েদের কাছে কৌশলে এমন সব কথা তুলত যাতে আকাশের মানসম্ভ্রমে ঘা লাগে।

আকাশের এ সব জানা ছিল। ষোলো আনা না হলেও দশ আনা তো নিশ্চয়। মাথা ঘামাত না আকাশ। অন্যদের যেখানে উৎসাহ, আনন্দ—তার সেখানে কোনো উৎসাহ নেই। নোংরামির মধ্যে সে নেই। কোনোদিন থাকেনি।

কলেজ থেকে তাড়া না এলেও মোটামুটি সুস্থ হবার পর আকাশ কলেজ যাওয়া শুরু করল। ছেলে-মেয়েদের পরীক্ষা এগিয়ে এসেছে—এখন আর কলেজ কামাই করা উচিত নয়।

কলেজে যারা আকাশের ঘনিষ্ঠ তারা একটা জিনিস লক্ষ্য করছিল। লক্ষ্য করছিল, আকাশের মধ্যে কেমন যেন একটা অবসাদ এসেছে। তার সেই সপ্রাণ তৎপরতার ঘাটতি দেখা যাচ্ছে। আগের মতন উদ্যম যেন হারিয়ে ফেলেছে সে। বড় অসুখের পর এটা হতে পারে। খুবই স্বাভাবিক। শারীরিক ও মানসিক ক্লান্তি হয়ত এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেনি পুরোপুরি।

একদিন স্রোতস্বিনী বলল, 'আপনি আরও কিছুদিন বিশ্রাম নিলে পারতেন।'

'কেন বলো তো?'

'আপনাকে ক্লান্ত দেখায়।'

আকাশ একটু হাসল। কথাটা এড়িয়ে যাবার জন্যে বলল, 'কই! আমি তো বুঝতে পারি না। তবে অসুখ-বিসুখের পর সব মানুষকেই ওই রকম মনে হয়।'

স্রোতস্বিনী তর্কে গেল না। কিন্তু বলল, 'আপনি অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছেন।' বলে সে পড়াশোনার ব্যাপারে দু-একটা কথা বলল।

আকাশ আর অস্বীকার করতে পারল না। বলল, 'এই ধরনের ভুল আমার করা উচিত ছিল না। তুমি ঠিকই বলেছ বোধ হয়। আমি আজকাল বড় অন্যমনস্ক হয়ে যাই।'

'কেন?'

'কেন! কী জানি!' ম্লান করে হাসল আকাশ।

'একটা কথা বলব?'

'বলো?'

'আপনি আরও কিছুদিন ছুটি নিন।'

'তাই কি হয় নাকি!...এমনিতেই তো আমাদের ছুটির শেষ নেই, আবার ছুটি!... তুমি ভেবো না, সামলে নেব।'

'তা হলে অন্তত একটা কাজ করুন। কাজের চাপ কিছু কমিয়ে নিন—আমরা চালিয়ে নেব। পরে আবার আপনি—'

মাথা নাড়ল আকাশ। বলল, 'না, ওটা হয় না। তুমি আমাদের কলেজের হালচাল বোঝ না? যেদিন আমি আমার দায়িত্ব, কাজকর্মের ভার অন্যদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেব—সেদিন থেকেই কথা উঠবে।'

স্রোতস্বিনী অখুশি হল। কিছু বলতে পারল না। আকাশকে সে কম চেনেনি। পরিচয় যত ঘনিষ্ঠই হোক, আকাশ এক জায়গায় সেই ঘনিষ্ঠতার সীমানা বেঁধে রেখেছে। মহিলা বলে কী? খানিকটা হয়ত তাই, বাকিটা নয়। আকাশ বরাবরই, স্রোতস্বিনী লক্ষ্য করেছে, সংযত। এক ধরনের দূরত্ব গাম্ভীর্য সে রক্ষা করে। অথচ তার ব্যবহার আন্তরিক, সস্নেহ। বন্ধুর মতনই কথা বলে। মাঝে মাঝে দু-একটা হাসি-তামাশাও না করে এমন নয়। সব করেও আকাশ কোনোদিন নিজের সীমানা থেকে বেরিয়ে আসেনি।

স্রোতস্বিনী হয়তো আরও কিছু বলতে পারত। বলল না।

আকাশই বলল, 'তুমি ভেবো না। সব ঠিক হয়ে যাবে। কাজ যদি কমিয়ে দি সময় কাটবে কেমন করে? আরও পাঁচটা চিন্তা এসে মনকে অস্থির করবে।'

'বেশ। মনকে আপনি স্থির করুন।' বলে স্রোতস্বিনী উঠে গেল।

আকাশ বুঝতে পারল, স্রোতস্বিনী রাগ করেছে।

অনেক কথা আছে যা অন্যকে বলা যায় না। বা যে-ভাবে বললে বলা হয়—তেমন করে বলা সম্ভব হয় না। আকাশ নির্বোধ নয়। কয়েক দিনের অসুখ মানুষকে পালটাতে পারে না। মানুষ মাত্রেরই অসুখ করে। প্রাবন-মরণ সংশয় দেখা দেয়। কখনও কখনও সেই অসুখের ধাক্কা সামলাতে সময় লাগে। কিন্তু সামলে নেওয়া যায়। আকাশের যা ঘটেছে এটা শরীরের অসুখ নয়। মনের মধ্যে যেন ফাটল ধরেছে আকাশের।

মানুষের অস্তিত্বটা হল পুকুরের মতন। তার বাইরের চেহারাটা সর্বজনের দৃশ্যগোচর। ভেতরের চেহারাটা নয়। আপাতদৃষ্টিতে পুকুরের যে চেহারা দেখা যায় পুকুরপাড়, ঘাট, দু পাঁচটা গাছপালা, শ্যাওলা, কালচে জল—এই চেহারা দেখেই বাইরের লোকের কাজ মিটে যায়। ভেতরের চেহারা ভেতরেই থাকে, জলের তলায়।

আকাশের চারপাশে যারা আছে, এমনকি তার অতিঘনিষ্ঠ যারা তারাও বুঝতে পারবে না কেন আজ সে এত ক্লান্ত, বিষণ্ণ, অন্যমনস্ক। বা বুঝলেও সামান্য মাত্র বুঝবে।

আজকাল আকাশ যেন কেমন এক সংশয়ের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে। এই সংশয় তার অস্তিত্বের ভেতরের দিক, গভীর দিক। আকাশ ছেলেমানুষ নয়, বোধবুদ্ধিহীন নয়। সে জানে—এই জগৎ নিতান্তই স্থূল জলের সমষ্টি নয়, তা সহজ ও সরল নয়। জগৎ নয়, জীবনও নয়। কোনো সন্দেহ নেই এই জগতের নানা দিকে অনেক নোঙরা, আবর্জনা ছড়িয়ে আছে। জীবনেও রয়েছে অজস্র জটিলতা। সহজ করে তাদের ব্যাখা করাও যায় না। করলে সেটা স্কুলপাঠ্য কেতাবের ব্যাখ্যা হয়। হ্যাঁ—সবই আছে। কিন্তু আকাশ বিশ্বাস করত, যা মন্দ নোঙরা যা আবর্জনা—তার অংশ মানুষের সভ্যতার ইতিহাসে সামান্যমাত্র। যদি তার ভাগ বেশি হত—সভ্যতা অনেক আগেই শেষ হয়ে যেত। জগৎ বল, সভ্যতা বল, মানুষ বল—সবই টিকে আছে নিজের জোরে। আর সেই জোর হল—আমরা আশা করতে জানি, ভরসা করতে জানি, স্বপ্ন দেখতে পারি। মানুষের আদর্শ থাকবে না, ভালো-মন্দ, কল্যাণ-অকল্যাণ বোধ থাকবে না—এ কেমন করে হয়?

সেদিন দক্ষিণের খোলা ছাদে অন্যমনস্কভাবে পায়চারি করছিল আকাশ। তার চোখ শূন্যে। অসংখ্য তারা ফুটেছে আকাশে। অন্ধকার ছড়িয়ে আছে আকাশের তলায়। উত্তর না পশ্চিম কোন দিক দিয়ে যে এক এক দমক হাওয়া আসছিল বুঝতে পারছিল না।

ছাদে এসেছিল দাস। খানিকক্ষণ দেখল আকাশকে। তারপর বলল, 'তোমার সঙ্গে কথা ছিল।'

আকাশ খানিকটা চমকে উঠেছিল। মুখ ফিরিয়ে দেখল, দাস।

'কী হয়েছে তোমার? আমার গলা শুনেও চমকে উঠছ?'

'কিছু হয়নি। কী খবর বল?'

'তুমি আমায় লুকোচ্ছ আকাশ।... আমার গলার স্বর তোমাকে কখনও চমকে দিয়েছে বলে তো মনে পড়ছে না।'

আকাশ হালকাভাবে কিছু বলতে যাচ্ছিল, পারল না। বলল, 'সত্যি, আমি এখন চমকে যাচ্ছি। তোর ডাকেও চমকে উঠছি।'

'কেন?'

'তুই বল, কেন?'

'ভয়ে।'

'ভয়ে?'

'মানুষ তো ভয়ে চমকায়।'

'তুই বুড়ো হলি দাস, কিছু শিখলি না। আঘাতে মানুষ চমকায় না?'

দাস বলল, 'হ্যাঁ। আমার মনে পড়েনি।'

আকাশ কিছু বলল না।

দাস বলল, 'আকাশ, আমি তোর চামড়ার তলায় কী আছে দেখতে পাই। তুই পর পর অনেক আঘাত পেলি। যাদের তুই হাতের আঙুলের মতন নিজের করে রাখতে গিয়েছিলি যাদের তুই লালন- পালনের ভার নিয়েছিলি, যাদের তুই বিশ্বাস করেছিলি তারা তোকে প্রচণ্ড ঘা দিয়ে গেছে। এই তো?'

'হ্যাঁ।'

'এখন আর তোর বিশ্বাস থাকছে না মানুষের ওপর?'

'থাকা কি উচিত?'

দাস কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'তুই বিদ্বান লোক। তুই ভালো বুঝবি থাকা উচিত কি উচিত নয়। আমার জ্ঞান কম—আমি শুধু বলব—সংসারে চোর থাকে সাধুও থাকে। চোর দেখে যদি ধরে নিস সংসারের সব কটাই চোর তাহলে ভুল হবে।'

'তা যদি ভাবব, তবে তুই সাধু আছিস কেন সংসারে।' আকাশ হেসে উঠল।

দাস কী ভেবে বলল, 'ও-সব কথা থাক। যা বলতে এসেছিলাম। দীয়াকে তার বাড়িতে দেখতে গিয়েছিলাম। ওকে কিছুদিন কোথাও পাঠিয়ে দেব?'

'কেন?'

'দেখ আকাশ, ছেলে গুণ্ডা বদমাশ বোমাবাজ যাই হোক, তবু সে ছেলে। দীয়া তার ছেলেকে কেমন করে ভুলবে? সময় লাগবে।'

আকাশ খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'ও কি কোথাও যাবে বলেছে?'

'না আমি ভাবছি। তুই যদি বলিস ওর সঙ্গে কথা বলি।'

আকাশ যেন কিছু ভাবল। বলল, 'দাঁড়া, একটু ভাবি।'

'আমি যাচ্ছি—' দাস চলে গেল।

আকাশ অন্যমনস্কভাবে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল।

দীয়া আর এ-বাড়িতে নেই। আকাশ মোটামুটি সুস্থ বোধ করতেই সে চলে গিয়েছে।

মানুষের সম্পর্ক বড় অদ্ভুত। দীয়া চলে যাবার সময় আকাশের যা মনে হয়েছিল সে জানে। দীয়ার কী মনে হচ্ছিল আকাশ জানে না। তবে আকাশ বুঝতে পেরেছিল, সন্তানের অমন মর্মান্তিক মৃত্যু তাকে নিঃস্ব করে গেছে। শুধু নিঃস্ব নয়, কুণ্ঠিত, লজ্জিত। কুন্দনের গায়ে যে গ্লানি জড়িয়ে ছিল যেন দীয়াও তার ভাগিদার।

'তোমার ছেলের পাপ তোমার নয়, দীয়া। মনকে শক্ত করো।'

'করব।'

'তোমাকে আর একটা কথা বলি। আমি ভাগ্য, বিশ্বাস করি না। কিন্তু অনেক সময় সান্ত্বনা পাবার জন্যে ভাগ্য মেনে নেওয়া ভালো।'

দীয়া কোনো কথা বলল না।

আজ এই অন্ধকারে ছাদের তলায় দাঁড়িয়ে আকাশের মনে হল, দীয়ার একার কেন, হয়ত তার ভাগ্যও এই রকম। চেয়েছিল এক, হল অন্য।

সেদিন কলেজ থেকে ফিরছিল আকাশ ট্যাক্সি করেই। বেশ খানিকটা আসতেই চোখে পড়ল, নলিন বুড়ো মতন একজনকে ধরে রিকশায় তুলছে। বুড়োর জামা ছিঁড়ে গেছে খানিকটা, একটা হাত সে বুকের কাছে তুলে ধরেছে, হাত দিয়ে রক্ত পড়ছে, কপালের কাছেও রক্ত। অ্যাকসিডেন্ট। রাস্তার কয়েকজন দাঁড়িয়ে পড়েছে রিকশার কাছে।

আকাশ ট্যাক্সি থামিয়ে নেমে পড়ল। এগিয়ে গেল নলিনের কাছে। 'আমার সঙ্গে ট্যাক্সি রয়েছে নলিন, তুমি ওকে নিয়ে এসো। হাসপাতালে পৌঁছে দেব।'

নলিন রিকশায় উঠছিল। ঘাড় ফিরিয়ে দেখল আকাশকে। বলল, 'মেডিকেল কলেজ কাছেই, রিকশা করে পৌঁছতে পাঁচ সাত মিনিট লাগবে।'

'কী আশ্চর্য। ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে—।'

'আপনি যান। রিকশায় আমাদের মতন মানুষের অসুবিধে হয় না।'

অপমানে আকাশের মুখ লাল হয়ে গেল। খারাপ লাগল তার। কিন্তু রাস্তায় দাঁড়িয়ে কথা কাটাকাটি করার সময় এটা নয়। নলিন রিকশা নিয়ে চলে গেল। আকাশ ফিরে এল ট্যাক্সিতে।

সারাটা বিকেল সন্ধে মন তার অপ্রসন্ন থাকল। নলিন সম্পর্কে আকাশের কোনো বিদ্বেষ নেই। বরং এই ছেলেটির কোনো কোনো কথা কানে এলে সে কেমন অবাক হয়ে যায়। ছেলেটির গলার স্বর ততটা রুক্ষ নয় যতটা তিক্ত তার মন্তব্য। চমক আছে, নাটকীয়তা আছে। কিন্তু সত্য আছে কী?

আকাশ কোনোদিন নলিনের সঙ্গে সদ্ভাবের সম্পর্ক পাতাতে চায়নি, আবার অসদ্ভাবেরও নয়। নলিন নিজেও সাধারণ আলাপের বাইরে আকাশকে কাছে ঘেঁষতে দেয়নি। ছেলেটা অদ্ভুত। শোনা যায় গোড়ার দিকে ভালো ছাত্র ছিল, পরে রাজনীতি নিয়ে মেতে ওঠে। কিছুদিন অজ্ঞাতবাস করেছে। শেষ পরীক্ষায় ফল ভালো করতে পারেনি। তবু এই কলেজের প্রাক্তন ছাত্র বলে তার একটা চাকরি জুটে গিয়েছে। কার কাছে আকাশ যেন শুনেছিল নলিন এক সময় কবিতা লিখত, রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে নাটক করত।

নলিনকে আকাশ মন্দ চোখে দেখেনি কখনো। তবে মূল্যও দেয়নি তেমন। নলিনও আকাশকে দেয়নি।

এসব অন্য ব্যাপার। কিন্তু নলিন তাকে অকারণে অপমান করল, রূঢ়ভাবে।

পরের দিন আকাশ টিচার্স রুমে একসময় নিরিবিলিতে পেয়ে গেল নলিনকে। নিরিবিলিতে পেলেও ঘর একেবারে শূন্য ছিল না।

'নলিন, একটু প্যাসেজে আসবে?'

'চলুন।'

প্যাসেজে দাঁড়িয়ে নলিন একটা সিগারেট ধরাল। এই কলেজেরই ছাত্র ছিল বলে তাকে একটু আড়ালে আবডালে সিগারেট খেতে হয়। অনেক সিনিয়াররা তার মাস্টারমশাই ছিলেন।

আকাশের মনে হল, যদিও সে নলিনের মাস্টার ছিল না—তবু এই সিগারেট ধরানোর মধ্যে নলিনের যেন কেমন একটা উপেক্ষার ভাব রয়েছে তার প্রতি।

আকাশ বলল, 'তুমি কাল অমন করলে কেন? আমি তো কোনো অন্যায় করিনি। আমার খুব খারাপ লেগেছে।'

নলিন যেন ঠোঁট চেপে হাসল। বলল, 'দেখুন, কত ব্যাপারেই কত লোকের খারাপ লাগে, তার কী করা যাবে! আপনি ট্যাক্সি করে বুড়ো মানুষটিকে পৌঁছে দিতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু পারতেন না। পুরো কলেজ স্ট্রিট জ্যাম ছিল।

ট্যাক্সি করে হাসপাতালে যাওয়ার শোভাটা বাড়ত, কিন্তু বুড়ো লোকটার হাসপাতালে পৌঁছতে ঘণ্টা দুই লেগে যেত। রিকশায় অলিগলি দিয়ে চলে গেলাম। ভিড়ের জায়গায় লোকে রাস্তাও করে দিল অ্যাকসিডেন্ট কেস্ বলে।'

আকাশ যেন বোকা হয়ে গেল। 'আমি জানতাম না।'

'এখন জানতে পারলেন।'

'তুমি কি ঘুরিয়ে কথা বলতে পছন্দ করো?'

'না। আমি সত্যি কথাটা মুখের ওপর বলতে পছন্দ করি।'

'আমার তো মনে হয় না।'

'না হোক! আমার কী যায় আসে!'

'তুমি রাগ করছ কেন!...আচ্ছা নলিন, আমার অসুখের সময় তুমি একদিন আমায় দেখতে গিয়েছিলে না মদনবাবুদের সঙ্গে?'

'হ্যাঁ।'

'কেন?'

'ভদ্রতা। সামাজিক কর্তব্য।

'তুমি এ-সব ম্যানো?'

'সব মানি না। কিছু মানি।'

'নলিন, তুমি একদিন আমার বাড়িতে আসবে? কিছু কথা বলব?'

'কী কথা?'

'শুনতে চাও?'

'বলুন?'

'তোমার সঙ্গে তর্ক করব। আমি জানতে চাই—আমাদের সঙ্গে তোমাদের তফাতটা কোথায়?'

নলিন হাসল। বলল, 'তর্ক করে কি সব জিনিসের নিষ্পত্তি হয়। তবে বলছেন যখন, যাব একদিন।'

'কবে যাবে? কাল—পরশু?'

'পরশু।'

বাড়ি ফিরে আকাশ দেখল তার চিঠিপত্রের মধ্যে ধ্রুবজ্যোতিদার এক চিঠি রয়েছে। ধ্রুবজ্যোতিদার

সঙ্গে আকাশের আলাপ এবং ঘনিষ্ঠতা বিলেতে থাকতে। আকাশ তখন ছাত্র, ধ্রুবজ্যোতি ডাক্তার। ছোট একটা হাসপাতালে কাজ করত ধ্রুবজ্যোতি, শহুরে হাসপাতাল নয়, গ্রাম্য হাসপাতাল। কিন্তু সে গ্রাম্য হাসপাতাল এখানকার মফস্বলী হাসপাতাল নয়।

ধ্রুবজ্যোতিকে আকাশরা ডাকত, 'ধ্রুবদা' বলে। বয়েসে কিছু বড় ছিল ধ্রুবজ্যোতি, চুলগুলোকে সাদা করে ফেলেছিল, মাথায় অতিরিক্ত লম্বা, গায়ের রঙ কালো, শরীরে মেদ বলে কিছু নেই। হাড়-হাড় চেহারা।

সেই ধ্রুবদা চিঠি লিখেছে। চিঠির সারকথা হল, ধ্রুবদা অনেকদিন পরে একবার দেশে আসছে, নিতান্তই বেড়াতে। দিল্লিতে থাকবে কিছুদিন—তারপর আসবে কলকাতায়। কলকাতা এসে আকাশলালের ঘাড়ে ভর করবে।

চিঠি পেয়ে আকাশের ভালো লাগল। ধ্রুবদা মানুষটা সঙ্গী হিসেবে অসামান্য। তার কথা বলার মধ্যে সব সময় একটা মজার ভাব আছে। দারুণ বৈঠকী। আকাশকে বরাবর 'আকাশলাল' বলে ডেকে এসেছে।

কবে আসবে ধ্রুবদা? অক্টোবরে। দেরি আছে। আসুক। কাল পরশুর মধ্যে চিঠির জবাব দিয়ে দেবে আকাশ। 'তুমি আমার বাড়িতে এসে উঠবে, এর চেয়ে আনন্দের খবর কী থাকতে পারে। চলে এসো। তোমার অপেক্ষায় থাকলাম।'

ধ্রুবদাকে নিয়ে সমস্যা মাত্র একটি। মদটদ খায় ধ্রুবদা। মাতাল হবার জন্যে খায় না। ওটা তার অভ্যেস। এ-বাড়িতে থাকার সময় যে ধ্রুবদা মদ স্পর্শ করবে না—এমন হতে পারে না। সে তার মাত্রা মতন মদ্যপান করবে। আকাশের আপত্তি করা উচিত নয়। কেননা সে জানে, ধ্রুবদা মদ্যপ নয়, স্বাভাবিক এক নেশা, বা অভ্যাস। কিন্তু দাস? দাস না হইচই শুরু করে দেয়!

ব্যাপারটা নিয়ে এখন ভেবে কোনো লাভ নেই। দাসকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে রাজি করিয়ে নেবে আকাশ।

হঠাৎ আকাশের মনে হল, ধ্রুবদা কি দিল্লিতে অকারণেই আসছে? দিল্লিতে, আকাশ শুনেছে, ধ্রুবদার সামান্য বিষয়সম্পত্তি আছে। মনে হয়, ওই সম্পত্তি বেচাকেনার একটা ব্যবস্থা করতে আসছে ধ্রুবদা। এক সময়, যখন ধ্রুবদার স্ত্রী জীবিত ছিল তখন এসব চিন্তা তার মাথায় আসেনি। এখন স্ত্রী নেই, সন্তানাদিও নেই, ধ্রুবদার কোনো ব্যাপারেই আর টান নেই।

দাস এল। বলল, 'তুমি কাল একবার কাকাকে দেখতে যাবে নাকি?'

'কাকা! কেন—তিনি—

'মাধব দুপুরে এসেছিল। বলল, যে কোনো সময়ে উনি—।'

বাকিটা বলতে হল না দাসকে, আকাশ বুঝতে পারল। নব্বই বছরের পর আয়ুকে টিকিয়ে রাখাও বোধ হয় অর্থহীন। কাকা তা হলে এবার বিদায় নেবার জন্যে পা বাড়িয়েছেন, আর তাঁকে আটকানো যাবে না।

আকাশ বলল, 'যাব। তুই আমার সঙ্গে যাবি?'

'যাওয়া দরকার। তোমার তো শরীর ভালো নয়।'

'তা হলে কাল সকালেই আমরা যাব।'

'তোমার কলেজ?'

'যাওয়া হবে না।'

দাস বলল, 'আমি নিজে গিয়েও ঘুরে আসতে পারি।'

মাথা নাড়ল আকাশ। বলল, 'নারে, আমি যাব। আজকের দিনে মানুষ অনেক দেখা যায়। কিন্তু কাকার মতন মানুষ তো চোখে পড়ে না। অমন মানুষকে শেষবারের মতন দেখা আমার পুণ্য আমি হারাতে চাই না।'

দাস বলল, 'তবে কাল সকালেই বেরিয়ে পড়ব। তবে একটা কথা আমি বলেনি। আমরা গিয়ে কী দেখব জানি না। যদি দেখি—উনি আর নেই, তুমি ওঁকে শেষ দেখা দেখে ফিরে আসবে। বাকি ব্যবস্থা আমি করে নেব।'

'কেন?'

'তোমার এখনকার শরীরে শ্মশানের ধকল সইবে না।'

'ঠিক আছে। আগে তো যাই।

রাত্রে ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে কাকাকে দেখল আকাশ। একেবারে মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছেন। দেখছেন আকাশকে।

আকাশ যেন কিছু বলতে চাইছিল, পারছিল না।

কাকা বললেন, আমি আসি আকাশ। যে দুঃখ নিয়ে এতকাল বেঁচেছিলাম সেই দুঃখের আজ শেষ হল। মৃত্যুঃ সর্বহরশ্চাহমুদ্ভবশ্চ ভবিষ্যতম্।

কাকা যেন আশীর্বাদ করার মতন করে ডান হাতটা তুললেন। 'সংশয় ও দ্বিধা থেকে মানুষের মুক্তি নেই। আমি আজ মুক্ত হলাম।'

ঘুম ভেঙে গেল আকাশের। আর এই মুহূর্তে সে বুঝতে পারল—কাকা আর নেই।

দুটো দিন আর কলেজ যেতে পারেনি আকাশ। পরের দিন কলেজে গিয়ে নলিনের খোঁজ করল। নলিনের ছুটি। সে আসেনি।

কলেজে যে কেন আসতে পারেনি আকাশ সেটা নলিনকে জানানো হয়নি। অবশ্য নলিনও আকাশকে কলেজে না দেখে কিছু অনুমান করে নিয়েছিল। আকাশের বাড়ি যায়নি।

পরের দিন দেখা পাওয়া গেল নলিনের।

আকাশ বলল, 'আমার এক দূরসম্পর্কের কাকা মারা গেলেন। অনেক বয়েস হয়েছিল তাঁর। সে যুগের স্বদেশী করা মানুষ। আমি আমার কথা রাখতে পারিনি।'

নলিন বলল, 'আজ আমার সময় হবে, আপনার যদি হয়—?'

'কেন হবে না। আজই তুমি চলো।'

'আমি সন্ধের মুখে যাব।'

'এসো, আমি অপেক্ষা করব।'

'অপেক্ষা করবেন না,' বলে নলিন একটু হাসল, 'যাব বলেও হয়ত শেষ পর্যন্ত পারলাম না। তবে ধরে নিন যাব।'

ছাদেই বসার ব্যবস্থা করে রেখেছিল আকাশ নলিন এল সন্ধের গোড়ায়। আকাশে তারা ফুটে গিয়েছে, এলোমেলো বাতাস ছিল আজ, যেন চৈত্রের হাওয়া।

নলিন হেসে বলল, 'আপনার বাড়ির এই ছাদটি চমৎকার। গানের জলসা বসিয়ে দেওয়া যায়।'

আকাশ বলল, 'তুমি কি গান-বাজনার চর্চা করো নাকি?'

'আজ্ঞে না। তেমন অবসর হল কোথায়?...আমার মা একসময় গায়িকা হিসেবে সামান্য খ্যাতি পেয়েছিলেন। দু চারটে রেকর্ড ছিল তাঁর।'

আকাশ নাম জিজ্ঞেস করল।

নলিন তার মায়ের নাম বলল।

আকাশ চিনতে পারল না। চেনার কথাও নয়। সংগীত সম্পর্কে তার যথেষ্ট অজ্ঞতা। আকাশ বলল, 'নলিন, আমার বাবা গান-বাজনা আর সাহিত্যের সমঝদার ছিলেন। সেটাই ছিল তাঁর জীবন। আমি ওদিক থেকে একেবারেই নিরেস।'

নলিন কিছু বলল না।

কিছুক্ষণ সাধারণ কথাবার্তার পর আকাশ বলল, 'নলিন, আগে আমি তোমার কথা শুনতে চাই।... দাঁড়াও, বল্লভ এসে গেছে। একটু চা জলখাবার খেয়ে নাও।'

বল্লভ চা জল খাবার নামিয়ে রাখল।

'আপনি?'

'শুধু একটু চা খাব।'

নলিন খেতে খেতে বলল, 'কলেজে আপনার বন্ধু আর শত্রুর দুটো দল আছে। আপনি এই দলের লোকদের না ডেকে আমায় ডাকলেন কেন?'

আকাশ বলল, 'কলেজের দল নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না।'

'জানি। কিন্তু আপনি জানেন না—আপনার শত্রুর দল আপনাকে নিয়ে বেশি রকম মাথা ঘামায়।

'তাদের বোধ হয় আর কিছু করার নেই।'

'আপনি ওদের চেনেন না। উদ্দেশ্য ছাড়া ওরা কোনো কাজ করে না।... ধরুন এমন যদি হয়, আপনার দুর্নাম রটিয়ে, আপনাকে অপদস্থ করে, ছেলেমেয়েদের সামনে আপনার মুখে চুনকালি মাখিয়ে আপনাকে কলেজ থেকে তাড়ানোর ব্যবস্থা করে ওরা—আপনি কী করবেন?'

আকাশ যেন অবাক হয়ে নলিনের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল। পরে বলল, 'আমি কিছুটা জানি— এতটা তো জানি না, নলিন।'

'আপনি নামে আকাশ, হাঁটেনও আকাশের দিকে মুখ করে।'

'হয়তো হাঁটি। জানি না। কিন্তু ব্যাপারটা কী?'

'ব্যাপারটা সরল। আপনার শত্রু-পক্ষ আপনাকে আর বরদাস্ত করতে পারছে না। আপনার ডিপার্টমেন্টের ওপর অন্য কারও নজর রয়েছে।

আকাশ সামান্য চুপ করে থাকল। 'আমাকে অপদস্থ করার জন্যে ওরা কী আদা জল খেয়ে লেগেছে?'

নলিন চায়ের কাপ মুখে তুলে বলল, 'আপনি কিছু গুন্ডা বদমাশ পোষেন নাকি।'

আকাশ চমকে গেল। 'আমি গুণ্ডা পুষি?'

'পোষেন না?...ওরা তো বলে পোষেন।...দুটো ছেলে—কী নাম—যারা, বোমা ফেটে মারা গেছে—

'কুন্দন—'

'হ্যাঁ কুন্দন! আর একটার কি নাম জপা—? এরা আপনার পোষা?'

আকাশ বোবা হয়ে বসে থাকল।

নলিন বলল, 'আপনি মনে করবেন না, ওরা আপনার হাঁড়ির খবর না রাখে! কারা কারা আপনার পোষ্য, কে কে আপনার বাড়িতে আসা যাওয়া করে, কারা থাকে, কে কে ফেরার—সবই ওদের জানা। গুণ্ডা বদমাশকে আপনি লালনপালন করেন, ফেরারী আসামীকে কাছে রাখেন—এ-সব কী কোনো কলেজ টিচারের উপযুক্ত কাজ?'

আকাশ স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল। নলিনকে দেখছিল। মনে হল, ও যেন আকাশকে শুধু সতর্ক করে দিচ্ছে না, সঙ্গে সঙ্গে বুঝিয়ে দিচ্ছে— আকাশের বিরুদ্ধে যে জঘন্য ষড়যন্ত্র গড়ে উঠেছে তার পরিণতি কী হতে পারে।

আকাশ বলল, 'নলিন, আমি এত টা ভাবিনি।'

'অনেকেই হয়তো ভাবে না আজকাল,' নলিন বলল। 'কিছু মনে করবেন না, একটা কথা বলি। আজকাল রাজনীতিতে গুণ্ডা পোষাক দাগী আসামী পোষা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার হয়ে গেছে। গুণ্ডা না পুষলে রাজনীতি করা যায় না। আমাদের কলেজেও দু একজন আছেন যাঁরা রাজনীতি বোঝেন। সাঙ্গপাঙ্গও সঙ্গে রাখেন। আপনি...।''

আকাশ হাত তুলে থামিয়ে দিল নলিনকে। আমি বুঝেছি। কলেজের কথা থাক। আমি তোমার কথা নিয়ে পরে ভাবব।'

নলিন চা শেষ করল। করে সিগারেট ধরল।

সামান্য চুপচাপ থাকল আকাশ।

'নলিন?... নিজের সম্পর্কে কিছু বলা আমি পছন্দ করি না। তবু তোমার কাছে খোলাখুলি কটা কথা বলি।... যে ছেলে দুটির কথা তুমি শুনেছ—তারা আমার পোষা গুণ্ডা ছিল না। আমি তাদের কেমন করে প্রতিপালন করতে চেয়েছি বাইরের লোক জানে না। আমি যা চেয়েছিলাম—তারা তা হয়নি আমার দুর্ভাগ্য!'

নলিন যেন হাসল। বলল, 'আমি সামান্য জানি।'

'জানো?'

'যে চারজনকে আপনি মানুষ করতে চেয়েছিলেন তারা মানুষ না হয়ে অমানুষ হয়ে গেল। এই তো?'

'হ্যাঁ।'

'আমাদের দেশে এখনও অনেকে মনে করে, মঠ মন্দিরে কিছু দান ধ্যান করলে পরম পুণ্য হয়।' নলিন হাসল।

'তুমি আমায় ঠাট্টা করছ?'

'না, ঠাট্টা করিনি,' নলিন বলল, 'আপনার ধারণার সঙ্গে আমার ধারণার অনেক তফাত। আপনি দু একজনকে নিয়েই বোধ হয় বেশি ভাবেন। আপনার অর্থ আছে, সামর্থ্য আছে, দু চারজনকে খাইয়ে পরিয়ে মানুষ করা, তাদের খয়রাতি করা আপনার কাছে কিছুই নয়। কিন্তু তাতে এ-দেশের কোটি কোটি লোকের কোন উপকার হবে?'

আকাশ একটু ভাবল। বলল, 'তোমার কথা বুঝেছি। কিন্তু নলিন, আমি তো নেতা নই, দেশের ভালো করার দায় আমার ঘাড়ে নেই।'

নলিন বলল, 'কিছু মনে করবেন না। দায় এবং দায়িত্ব যদি অস্বীকার করেন, আপনার এই অনুশোচনা ব্যক্তিগত। কাকে আপনি কী করেছেন, সে চোর হয়েছে না গুণ্ডা হয়েছে—সে কথা শুনে অন্যের কী লাভ! আপনার ব্যক্তিগত দুঃখ আপনার।

আকাশ আহত হল। 'তুমি কি রাজনীতি কর?'

'আমাদের কথা থাক। আপনি বুঝবেন না।'

'তোমার আপত্তি রয়েছে।... বেশ, একটা কথা বলো, আমাদের কী কোনো ব্যক্তিগত আদর্শ থাকবে না?'

'কেন নয়।'

'তা হলে।'

'আপনি হৃদয়বান। শুনেছি, আপনি অনেক বিষয়ে পড়াশোনা করেছেন। আমি শুধু একটা কথা বলতে পারি। ওই আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখুন। কত যোজন দূরে ওই নক্ষত্র। তার আলো এসে আপনার আমার চোখে লেগেছে। লাগুক। কিন্তু ওই তারার আলোয় আমাদের ঘরের কোন্ কাজটা হয় বলতে পারেন।'

আকাশ যেন স্পষ্ট বুঝল না। তাকিয়ে থাকল।

নলিন বলল, 'যা বাস্তব আর যা প্রয়োজনীয়—এই দুটোই আমাদের কাছে জরুরি। আকাশের তারা দিয়ে আমাদের কাজ মেটে না, আকাশবাবু, তার চেয়ে একটা প্রদীপ কিংবা মোমবাতি আমাদের বাস্তব প্রয়োজন মেটায়। আপনি যতটা কল্পনা নিয়ে বেঁচে থাকেন ততটা রিয়ালিটির মধ্যে থাকেন না। আমরা সামান্য মানুষ, আমাদের চোখ আকাশের দিকে নয়, মাটির দিকে।'

আকাশ চুপ করে থাকল।

আরও খানিকটা বসে থেকে নলিন বলল, 'আজ তা হলে আমি উঠি?' অন্যমনস্ক ছিল আকাশ। খেয়াল হল যখন, দেখল নলিন উঠে দাঁড়িয়েছে। আকাশও উঠে দাঁড়াল। 'তুমি কোন দিকে থাকো?'

'গড়পারের দিকে।'

আকাশ নলিনকে এগিয়ে দিতে যাচ্ছিল। বলল, 'বাড়িতে তোমার কে কে আছেন?'

'বিধবা দিদি আর আমি। জামাইবাবু আলিপুর জেলে ছিল। জেল থেকে পালাবার চেষ্টা করেছিল। পারেনি। জেলেই মারা গেছে।'

আকাশ যেন হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। দেখছিল নলিনকে।

নলিন কোনো কথা বলল না আর।

শেষ রাতে আকাশের ঘুম ভেঙে গেল।

সে কি স্বপ্ন দেখছিল? আশ্চর্য। এমন স্বপ্ন দেখার কারণ কী? আকাশ এখনও যেন স্বপ্নের শেষটুকু দেখতে পাচ্ছে। কোথায় যেন আগুন লেগেছে। আকাশ প্রথমটায় বুঝতে পারেনি। পরে বুঝল, আগুনটা তার বাড়িতে লেগেছে। বাড়ি ঘরদোরে ছড়িয়ে পড়ছে। অথচ সে আর দাস ছাড়া অন্য কেউ কাছে নেই। দু'জনেই যেন স্তম্ভিত। বুঝতে পারছে না কী করা যায়? এই আগুন তারা

কেমন করে নিভিয়ে ফেলবে? তাদের সাধ্য নেই।

দাস ছটফট করছিল। দমকলকে খবর দেওয়া সত্ত্বেও তারা আসছে না কেন?

হঠাৎ দাস ছুটে আগুনের দিকে চলে যাচ্ছে দেখে আকাশ তাকে ধরে ফেলল।

দাস আকাশকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে বাড়ির মধ্যে চলে গেল। মাটিতে পড়ে থাকল আকাশ। আগুন যেন ক্রমশই আকাশের কাছাকাছি চলে এল।

আর সেই আগুনের মধ্যে থেকে ও কে সামনে এসে দাঁড়াল? কে?

কয়েক পলক একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকার পর আকাশ বুঝতে পারল— এই সেই জ্যোতির্ময় মূর্তি, আকাশের প্রপিতামহের প্রপিতামহ অনন্ত নারায়ণ দেবশর্মা।

আকাশ চমকে উঠে বলল, 'আপনি?'

'হ্যাঁ, আমি।'

'আপনি এখানে কেন?'

'তোমার জন্যে।'

'আমি—। আমি বোধ হয় মনে মনে আপনাকেই চাইছিলাম।'

'জানি।'

'কেন বলুন তো?'

'তুমি দুর্বল হয়ে পড়েছ। তোমার চিত্ত স্থির নেই। তুমি বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছ।'

'হ্যাঁ। আপনি ঠিক বলেছেন। আমি যেন সমস্ত কিছু হারিয়ে ফেলেছি। বিশ্বাস, আদর্শ, কর্তব্য...।

'তুমি কি সেই জন্যে আত্মঘাতী হবে ভেবেছিলে?'

'না হয়ে উপায় কী। এই জীবনের কোথাও যদি সান্ত্বনা না থাকে তা হলে বেঁচে থেকে কী লাভ।'

'তুমি আত্মঘাতী হয়ে কাকে ফাঁকি দিতে চাও। নিজেকে... তুমি মূর্খ।'

'মূর্খ?'

'মানুষের জীবন কোনো দিনই সংশয়মুক্ত নয়। তুমি মহাভারত পড়োনি? গীতা পড়োনি? সংশয় মানুষকে বিচলিত করে, বিভ্রান্ত করে, কিন্তু এই সংশয় সত্যকে খুঁজে পাবার প্রেরণা দেয়।'

আকাশ নীরব।

জ্যোতির্ময় পুরুষ বললেন, 'তুমি যদি পরাজয় স্বীকার কর— তোমার বিনাশ হবে। তুমি যদি পরাজয় স্বীকার না করো— তোমার মনুষ্যত্ব রক্ষা হবে। মানুষ দেবতার কাছেও পরাজয় স্বীকার করতে চায় না। নিয়তি সত্য, সংগ্রাম আরও অধিক সত্য। আকাশ, তুমি পরাজয় স্বীকার করো না।

আকাশ আর সেই পুরুষকে দেখল না। স্বপ্ন ভেঙে গেল। দেখল—ঘরবাড়ির কোথাও আগুন লাগেনি।

বিছানা ছেড়ে ছাদে এসে দাঁড়াল আকাশ। অন্ধকার ফিকে হয়ে এসেছে। তারা রয়েছে আকাশে। ঠাণ্ডা বাতাস দিচ্ছিল।

ধ্যানস্থের মতন আকাশ, অন্ধকার, নক্ষত্রের দিকে তাকিয়ে থাকতে আকাশের চোখে জল এসে গেল।

আঘাত ও বেদনায় বিক্ষত হয়েও যে যুদ্ধ করে সেই মানুষ। আকাশ পরাজয় স্বীকার করবে না।

কৃষ্ণপক্ষ

আমি কবি নই। কবিদের আমি ঘৃণা করি। কিন্তু আজ হঠাৎ আবিষ্কার করলাম—হ্যাঁ, এই নোংরা ঘরের বিশ্রী পরিবেশের মধ্যে বসে বুঝতে পারলাম, আমিও কবি। আমার অন্তরবাসী কবি এতদিন ঘুমিয়ে ছিল। তার অস্তিত্ব তো টের পাইনি এতদিন। এতদিন কবিদের ঘৃণাই করেছি কেবল, ঠাট্টাই করেছি তাদের, বলেছি ওরা মধুকরের মতো ফুলে ফুলে গুন গুন করে গান গেয়ে বেড়ায় খালি। ওরা স্বপ্নবিলাসী, ওরা অকর্মা। আজ আবিষ্কার করলাম আমিও সারা জীবন স্বপ্ন দেখা ছাড়া আর তো কিছুই করিনি। আমার স্বপ্ন সফল হয়নি, তাই বোধহয় ক্ষোভের আবর্তে নাকানিচোবানি খেতে খেতে ভুলে গেছি যে আমিও স্বপ্ন-সম্বল অসহায় জীব ছাড়া কিছু নই। আমার মনের ভিতর যে সহস্র-স্বরা বীণা লুকিয়ে আছে, দৃশ্য অদৃশ্য নানা স্পর্শে যে ঝঙ্কার দিয়ে উঠছে তার সম্বন্ধে সচেতন ছিলাম না এতদিন। আজ হয়েছি। আজ বুঝেছি মনের ধর্ম সাড়া দেওয়া। যাদের প্রতিভা আছে তারা ওই সাড়াকে গানে রূপান্তরিত করতে পারে, তাদের আনন্দ-বিষাদ হাসি-কান্না ফুল হয়ে ফোটে, সূর্য হয়ে জ্বলে, ঝঞ্ঝার তাণ্ডবে উদ্দাম হয়ে ওঠে, বিদ্যুতে চমকিত হয়, অন্ধকার ঘন-ঘটায় আশঙ্কার নিবিড়তায় রূপান্তরিত হতে পারে, বর্ষায় কাঁদে, শরতের রোদে ঝলমল করে ওঠে। এসব হয় যাদুকরী প্রতিভার মন্ত্র বলে। আমার প্রতিভা নেই, কিন্তু তবু আমাকে সাড়া দিতে হয়েছে। সে সাড়া কবির সাড়া নয়, কিন্তু তবু আমার মনের সহস্র-স্বরা বীণা বেজেছে অহরহ। এতদিন সেটা শুনতে পাইনি। আজ পেয়েছি।

একা আছি বলেই বোধহয় পেয়েছি।

একা না থাকলে নিজেকে চেনা যায় না। নিজের পারিপার্শ্বিককেও চেনা যায় না। চেনা যায় না তাকেও যে শুধু আভাসে দেখা দেয়।

টিউ—টিউ—

হলদে পাখি এসেছে কোথাও। দেখতে পাচ্ছি না তাকে। কিন্তু কল্পনা করছি তার অপরূপ চেহারাটি। সর্বাঙ্গে সুবর্ণ-শোভা, মাথাটি কালো, ডানার পাশেও কালোর রেখা। অনেকবার দেখেছি ওকে। কিন্তু আগে কখনও মনে হয়নি ও আমার কাছেই এসেছে। আমাকেই ডাকছে। কিন্তু ওর এ ডাকে সাড়া দেবার মতো ভাষা তো আমার নেই। আমার ভাষা যে অস্বাভাবিক ভাষা, সভ্যতার ভাষা। এ ভাষায় সাড়া দিলে তা ওর কাছে পৌঁছবে না। ও এ ভাষা বুঝতে পারবে না।

টিউ—

উড়ে গেল।

ও কাকে ডাকছে জানি। ডাকছে ওর সঙ্গিনীকে। খুঁজছে ও তাকে। খুঁজে পাবে এ-ও বুঝতে পারছি।

মা—মা—মাগো।

ভিখারী ভিক্ষা চাইছে কার বাড়িতে। অনেকক্ষণ চাইতে হবে, অনেকক্ষণ ধর্ণা দিতে হবে তবে যদি পায় কিছু। একালের সভ্য-জগৎ ভিখারীকে ঘৃণা করে। মনে করে একটা আপদ। সেকালের সভ্য-জগৎ ভিখারীকে সম্মান করত আমাদের দেশে। কারণ তখন নিয়ম ছিল জীবনের চতুর্থ-আশ্রমে সবাইকে ভিখারী হতে হবে। রাজাও ভিখারী হয়ে আসতে পারেন আমার দ্বারে। কোন্ মতটা ভালো তা জানি না। একটি জিনিস কিন্তু আবিষ্কার করেছি এতদিনে। আমিও সারাজীবন ভিক্ষেই করেছি। ও ছাড়া আর কিছু করিনি। করবার ক্ষমতা ছিল না। অনেকের দুয়ারে ধর্ণা দিয়েছি আমিও। কিন্তু বুঝতে পারিনি যে ধর্ণা দিচ্ছি। এই বোধহয় নিয়ম। ছেলে মায়ের কাছে ধর্ণা দেয়, মা-ও দেয় ছেলের কাছে। প্রণয়ী ধর্ণা দেয় প্রণয়িনীর কাছে, প্রণয়িনীও পথ চেয়ে বসে থাকে প্রণয়ীর জন্য। পৃথিবীতে সব চাওয়া আর সব পাওয়ার মাঝখানে ওই ধর্ণার আকুল প্রার্থনা। প্রায়ই তাতে কান দেয় না কেউ। ভগবানের দয়াও কি বিনা ধর্ণায় পাওয়া যায়? হঠাৎ ছাতের থেকে খানিকটা চুনবালির চাপড়া খসে পড়েছিল আমার খাতার উপর। লেখাটা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল তাই। ভিখারীটা চলে গেছে। আমার মেজাজটাও। এখন আর লিখতে ইচ্ছে করছে না। তবু কিন্তু লিখতে হবে। কারণ আর তো আমার কোন কাজ নেই।

উৎকর্ণ হয়ে বসে আছি।

মনের গতি দেখে অবাক হয়ে গেছি। অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ সবই যেন তার আয়ত্তে। কল্পনা জগৎ আর বাস্তব জগৎ সর্বত্রই তার গতি অব্যাহত। বিদ্যুতের চেয়ে চঞ্চল সে। এই এখানে আছে, নিমেষেই আর নেই।

মনে পড়ছে—কেন মনে পড়ছে জানি না—মনে পড়ছে কুপ্রিনের গল্পের সেই মেয়েটিকে। সেই বুড়ো জেনারেলের বউটাকে। লম্বা অস্থি-সর্বস্ব মহিলা, সাধারণের চোখে মোটেই কমনীয় নয়। কিন্তু প্রেমের চোখ আলাদা চোখ, একটি তরুণ সৈনিক প্রেমে পড়ে গেল মহিলার। নিমজ্জিত হয়ে গেল বললেও অত্যুক্তি হয় না। আর স্বাধীন মানুষ রইল না সে। ক্রীতদাস হয়ে গেল। কুকুরের মতো তার পিছু পিছু ঘুরত। বুড়ো জেনারেল তাঁর স্ত্রীকে চিনতেন। তাঁর প্রেম-লীলায় বাধাও দিতেন না। ভাবতেন উপদেশ দিয়ে এ লীলা থামানো যাবে না, বুলেট দিয়ে থামানো যেতে পারে। কিন্তু ছুঁচো বা ছুঁচি মেরে হাত-গন্ধ করার প্রবৃত্তি ছিল না তাঁর। সুতরাং প্রেম-লীলা চলছিল। মহিলা কিন্তু প্রেমের ভুবনে ভূমাকাঙ্ক্ষিণী। অল্পে সন্তুষ্ট হন না। শতাধিক প্রেম করেছেন অতীত জীবনে। কচি মাছের ঝোল খেতে ভালোবাসেন। তাঁর ছেলের বয়সী তরুণরাই তাঁর প্রেমিক। একজনকে কিছুদিন ভোগ করেন তারপর তাকে ছেড়ে দেন। ছিপ ফেলেন আর এক পুকুরে। সুতরাং এই ছোকরা ফালতু হয়ে গেল কিছুদিন পরে। তাকে একদিন বললেন—তুমি তো প্রায়ই বল, আমার জন্যে সব করতে পার। ওই যে ট্রেনটা আসছে, ওর সামনে ঝাঁপিয়ে পড়তে পার? ছেলেটা বলল—নিশ্চয় পারি। সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ল চলন্ত ইঞ্জিনের সামনে। কিন্তু মরল না। হাত দুটো কাটা পড়ল খালি। চাকরি গেল।

দেশ ছেড়ে চলে যেতে হল অন্যত্র। সেখানে ভিক্ষা করে জীবন ধারণ করত, তারপর—তারপর আর কি—মরে গেল অবশেষে। জেনারেল জাঁদরেল গিন্নী মত্ত হলেন নতুন একটি প্রেমিককে নিয়ে। এ গল্পটা হঠাৎ মনে পড়ল কেন?

মনে পড়ছে কি সুবিকে, যার পোশাকী নাম ছিল সুবাসিনী? ছবিটা কিন্তু উলটো, ভাবার্থ যদিও এক। এ ক্ষেত্রে আমিই সেই জেনারেলের নিত্য-নব-প্রেমোন্মত্তা গৃহিণীর ভূমিকায় অভিনয় করছি। সুবি আমার প্রথম শিকার। সে আমার জন্য কুল মান স্বামী সংসার সব ত্যাগ করে এসেছিল। এখন কোথায় সে? জানি না। মোগল বাদশারাই যে কেবল মেয়েদের উপভোগ করে বাসি মালার মতো ফেলে দিতেন তা নয়, আমাদের মতো সাধারণ লোকও এই বাদশাহী বিলাস উপভোগ করেছি! তফাত রাজা-বাদশাদের কথা ইতিহাসে লেখা থাকে, আমাদের মতো সাধারণ লোকের খবর দুদিনেই হারিয়ে যায়। অনুতাপ? না, অনুতাপ হচ্ছে না। কতো ভালো ভালো কাপে চা খেয়েছি, কত সুদৃশ্য পেগে চুমুক দিয়েছি, তারা তো কেউ নেই। কেউ নেই, কেউ নেই, কেউ নেই। কেউ থাকে না, এই নিয়ম। আমি বন্দী হয়ে আছি একটা ছোট্ট নোংরা ঘরে। আমার সান্ত্বনা সম্রাট শাজাহানও বন্দী হয়ে ছিলেন। তবে তিনি ছিলেন আগ্রা ফোর্টে, নমাজ করতেন চমৎকার 'নাগিনা' মসজিদে। আর আমি আছি একটা নোংরা ঘরে। আমি পুজো করছি লিখে লিখে। লেখাটাই আমার পুজো। শাজাহানের সঙ্গে আমার আর একটা মিলও আছে। আমারও ছেলে বন্দী করেছে আমাকে। নাম তার সুজন, লোকে বলে সত্যই না কি সে সুজন। কিন্তু আমার ধারণা অন্যরকম। যদিও মুখে তার সৌজন্যের ছাপ, ব্যবহারে কোনও ত্রুটি নেই, বাইরে থেকে আমার সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা করতে সে সদাই তৎপর। আমাব ধারণা কিন্তু ও ভণ্ডামি করছে। আমার একমাত্র ছেলে, বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনও পরীক্ষায় কখনও সেকেণ্ড হয়নি, গভর্ণমেন্টের স্কলারশিপ পেয়েও লণ্ডনে বা মার্কিন মুলুকে যেতে চায়নি। বলেছিল এ দেশে যা শেখবার আছে তাই শেখা শেষ হয়নি, এ দেশে যা দেখবার আছে তা-ও দেখিনি সব। আগে স্বদেশকে চিনি জানি, তারপর বিদেশ যাব। সবাই ধন্য ধন্য করেছিল। কিন্তু আমি জানি ওটা ওর ভণ্ডামি। ঔরঙ্গজেবের চেয়ে বেশী ভণ্ড আমার ছেলেটি। কিন্তু আমাকে একটা ছোট্ট ঘরে বন্দী করে রেখেছে। দেয়ালগুলো নোনা-ধরা। ছাত থেকে চুনবালির চাপড়া খসে পড়ছে। ছোট্ট একটা ময়লা বিছানা, তার পাশে ছোট্ট একটা টেবিল আর চেয়ার। দুটোই হতশ্রী। পাছে আমি চেঁচামেচি করি তাই কাগজ-কলম দিয়ে গেছে একগাদা। জানে আমি লেখা নিয়ে তন্ময় হয়ে থাকব। আর দিয়ে গেছে একগাদা নভেল। জানে আমি নভেল পড়তে ভালোবাসি, চিরকাল নভেল পড়েছি নানারকম। প্রকাণ্ড একটা শেলফে রেখে গেছে নানারকম নভেল। কি চালাক! আমি লিখছি, নভেলও পড়ছি মাঝে মাঝে, কিন্তু একবারও ভুলিনি যে আমি বন্দী। ছোট্ট নোংরা একটা ঘরে বন্দী হয়ে আছি।

....গীটার আসে। বারবার আসে। কিন্তু দূরে দাঁড়িয়ে থাকে। আমার অন্তত মনে হয় দূরে দাঁড়িয়ে আছে। বিছানায় এসে বসে, কিন্তু আমার মনে হয় অনেক দূরে বসে আছে। গীটার আমার বৌমা। মনে হয় ও যেন আমার সেই মা যে আমায় ছেলেবেলায় মারত—তারপর যাকে গুণ্ডারা—না, না ওসব কথা লিখতেও লজ্জা করে। মনে হয় গীটার আমার সেই মা

চেহারা বদলে যেন এসেছে আমার কাছে আবার। কিন্তু আমি নাগাল পাচ্ছি না। সে মায়েরও পাইনি, এ মায়েরও পাচ্ছি না। 'দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার গানের ওপারে'—আমার মনের কথা রবীন্দ্রনাথ লিখে গেছেন। ভাবছি লিখলেন কি করে? প্রচুর টাকা রোজগার করেছি তা সত্যি, কিন্তু আসলে তো আমি একটা ওঁচা লোক, রবীন্দ্রনাথ আমার মনের কথা জানলেন কি করে? আমিও যে সারাজীবন নরক ঘাঁটতে ঘাঁটতে মনে মনে গান গেয়েছি এবং গানের ওপারে সেই অনির্বচনীয়া অধরাকে দেখেছি এ কথা রবীন্দ্রনাথের জানবার কথা তো নয়। রবীন্দ্রনাথও তো আমার গানের ওপরে দাঁড়িয়ে আছেন—এপারে আছেন বরং শেলী, মোপাঁসা, দস্তরফস্কি, জোলা, ব্যালজ্যাক জাতীয় লেখকরা, এঁরা আমারই মত নানা আবর্তে হাবুডুবু খেয়েছেন কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তো ভিন্ন জাতের লোক, তাঁর মনের কথা আর আমার মনের কথা এক হয়ে গেল কি করে? তাহলে কি আমাদের দুজনের মধ্যে মিল আছে কোথাও? ছুঁচোর সঙ্গে সিংহের মিল? হয়তো আছে। দুজনেরই ক্ষিধে পায়, দুজনেরই তেষ্টা পায়। একটু আগে বলেছিলাম শাজাহানের সঙ্গেও আমার মিল আছে। যদি প্রশ্ন করেন শাজাহান তাজমহল বানিয়েছিল, আমি বানিয়েছি কি? বানিয়েছি বই কি। একটা নয় অনেক। শাজাহান হারেমে বন্দিনী অনেক প্রেয়সীর সংস্পর্শে এসেছিলেন, কিন্তু অমর করে গেছেন মাত্র একটিকে, মমতাজকে। আমি কিন্তু কাউকে বাদ দিইনি। সবাইকে নিয়েই তাজমহল বানিয়েছি। কিন্তু সে তাজমহল মর্মর পাথরের নয়। কোনটা অশ্রুর, কোনটা আনন্দের, কোনটা দীর্ঘনিঃশ্বাসের, কোনটা আকুলতার—বাইরে তাদের প্রকাশ নেই আমিও তাদের আর দেখতে পাই না। সব হারিয়ে গেছে। তাজমহলও হারিয়ে যায়। সর্বগ্রাসী বিস্মৃতি—এর সঙ্গে কিসের উপমা দেব? মহাসমুদ্র, মহাঅন্ধকার, না মহামরুভূমির? জানি না, শুধু জানি ও বিস্মৃতি সর্বগ্রাসী, সব গ্রাস করে ফেলেছে। আমার তাজমহলগুলো আমি দেখতে পাই না এখন। তাজমহল চুলোয় যাক—যা হারিয়ে গেছে তা নিয়ে মাথা ঘামান বৃথা। ভিখারির মতো হাত পেতে আছি বর্তমানের কাছে। ভিখারীটার মতো চেঁচাচ্ছি না, কিন্তু মনে মনে প্রত্যাশা করে আছি। ক্ষুদকুঁড়ো ঘষা পয়সা যাহোক কিছু একটা পাবই। কেউ না কেউ ছুঁড়ে দেবে।

অ—ল—ঝা—ড়ু—

ফুলঝাড়ু ফেরি করেছে। ফুলঝাড়ু কথাটাকে অমনভাবে উচ্চারণ করেছে কেন? কায়দা? না জিভের দোষ? না জিভের দোষ নয়, কায়দাই। সেদিন আর একটা ফেরিওলার চিৎকারও শুনছিলাম। ক্রি—টি—না। প্রথমে বুঝতে পারিনি, পরে বুঝলাম। খালি টিন কিনছে। যারা কাগজ কেনে তারাও কা—গীজ বলে চেঁচায়। লোকের মনোযোগ আকর্ষণ করবার কায়দা। কায়দা নিয়েই সভ্যতা। কায়দা বদলেই প্রাচীন সভ্যতা নবীন হচ্ছে। ফেরিওয়ালাগুলো কিন্তু সেকেলে। একই কায়দায় একই জিনিস রোজ ফেরি করে। রোজ যদি নূতন ধরনের হাঁক দিত, কোনদিন গাধার ডাক, কোনদিন কোকিলের ডাক, কোনদিন হালুম হালুম—তাহলে মন্দ হত না। কিন্তু এদের প্রতিভা নেই একঘেয়ে ডাক রোজ ডেকে যাচ্ছে! আঃ রেডিওটা বন্ধ করে দিয়ে আসি। কি ক্যাঁককেঁকে গলা মেয়েটার। রেডিওটা আমার টেবিলের উপর রেখে গেছে

গীটার। রেডিও মানেই তো দুনিয়ার হাল্লাকে নিজের কানের কাছে ডেকে আনা। গান? গান ভালো। কিন্তু ক্রমাগত গান ভালো নয়। রসগোল্লা ভালো, কিন্তু ক্রমাগত যদি একের পর এক রসগোল্লা মুখের ভিতর ঠুসে দেয় তাহলে রসগোল্লা বিরস-গোল্লা এবং শেষে বিরক্তিগোল্লা হয়ে ওঠে।

গীটার এই সব কাণ্ড করে। কখন আসে, কখন যায়, বুঝতে পারি না। মাঝে মাঝে দেখতে পাই দূরে দাঁড়িয়ে আছে। আমার গানের ওপারে। কিন্তু সেই গানের দুস্তর সুর-সমুদ্র পার হয়ে কি করে কখন যে সে খুব কাছে চলে আসে, বুঝতে পারি না।

মাঝে মাঝে পারি। হঠাৎ দেখি সে আমার গলায় তোয়ালে জড়িয়ে দিয়ে দুধের বাটি মুখে ধরেছে। যে-ই কিছু বলতে যাই অমনি চলে যায়। অন্তর্ধান করে। দেখি দূরে—অনেক দূরে দাঁড়িয়ে আছে! দাঁড়িয়ে হাসছে। মায়ের মতো হাসছে বললে বোধহয় ভালো শোনাতো, কিন্তু মায়ের হাসি কখনো দেখিনি, জানি না মায়ের হাসি কি রকম হয়। গীটারের হাসি কিন্তু অপূর্ব, অনন্য, অবর্ণনীয়। তা জ্যোৎস্না-ধারা নয়, ঝরনা নয় তা অপরূপ সুমধুর একটা সান্ত্বনার আশ্বাস। গীটারের সঙ্গে সুজনের বিয়ের সম্বন্ধ করতে গিয়ে গীটার নামটা শুনে একটু অবাক হয়েছিলাম। গীটারের বাপ সাহিত্যিক মানুষ। তাঁকে যখন বললাম—মেয়ের নূতন ধরনের নাম রেখেছেন দেখছি। তিনি বললেন—এই ভারতবর্ষে নূতন ধরনের কিছু করার জো আছে কি? বাজনার নামে অনেক মেয়ের নাম রাখা হয়েছে আগে। বেণু, বীণা, বাঁশরী, মন্দিরা তো আপনি নিশ্চয়ই শুনেছেন, আমি সেতারও শুনেছি। আমি তাই রেখে দিলাম গীটার। একবার ইচ্ছে হয়েছিল—রাখি মৃদঙ্গ। কিন্তু ওর 'দঙ্গটা' দাঙ্গা দাঙ্গা শোনাতে লাগল তাই আর রাখলাম না। গীটারের বাবা গরীব সাহিত্যিক ছিলেন। সাহিত্য থেকে কিছু রোজগার করতে পারতেন না। কেরানীগিরি করতেন। গীটারের সঙ্গে আমার একমাত্র ছেলে সুজনের বিয়ে সে-ও এক অদ্ভুত গল্প। না, প্রেমে পড়ে নয়। ছুং ছুং করে যে সব হ্যাংলা আত্মসম্মানহীন ছেলে মেয়েদের পিছু পিছু ঘুরে বেড়ায় সুজন সে জাতীয় ছেলে নয়। হলে হতে পারত। কারণ আমি নিজেই তো আত্মসম্মানহীন কাঙাল ছিলাম আমার যৌবনে।

আমড়া গাছে আমড়া ফললে আশ্চর্য হতুম না। কিন্তু বংশধারার বিচিত্র ইতিহাস। আমাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে না কি আমও ছিলেন, আমড়াও ছিলেন। আমি আমড়ার উত্তরাধিকার বহন করছি, সুজন করছে আমের। 'জিনি'সের (genes) অদ্ভুত কাণ্ডকারখানা সব। আমিও লেখাপড়া শিখেছি, সুজনও শিখেছে। আমাকে কষ্ট করে শিখতে হয়েছে, সুজন শিখেছে আমার টাকায়। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী পাইনি, কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢোকবার সুযোগই পাইনি আমি। সুজন পেয়েছে আমার টাকায়। আমার বাবা দরিদ্র ছিলেন। তিনি আমার জন্মের আগেই মারা গিয়েছিলেন। তাঁর নাগাল আমি পাইনি। আমি নাগাল পেয়েছিলাম—নামটা করব কি—অতবড় মহাপুরুষের নামের সঙ্গে নিজের এই ঘৃণিত নামটা সংযুক্ত করা উচিত হবে কি? না, নামটা করব না। তাছাড়া তাঁর কি একটা নাম? শত নাম, সহস্র নাম। কোন্ নামটা করব। আমাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন তিনি।

তাঁর বিরাট পাঠগার-সমুদ্রে বহুকাল অবগাহন করবার সুযোগ পেয়েছিলাম আমি। চাকর

হয়ে ঢুকেছিলাম, কিন্তু মনিব হয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলাম। আমাকে মনিবত্বে প্রতিষ্ঠিত করে তিনি যেন হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিলেন। বিপত্নীক হয়ে পড়েছিলেন তখন, ছেলে-মেয়ে ছিল না। অত্যন্ত পাজী বুড়ী ঝি ছিল তাঁর একটা। সেই সংসার চালাবার ছুতোয় চুরি করত খুব। সরকারের দরবারে খুব বড় চাকরি করতেন উনি এককালে। পেনসন পেতেন পাঁচশ টাকা। আমি ক্রমশ তাঁর পুত্রের স্থান অধিকার করলাম। আমি যখন গিয়েছিলাম তখন আরবি ফার্সি শিখছিলেন একজন মুসলমান মৌলভীর কাছে। পরে জেনেছিলাম উনি ফরাসী আর স্প্যানিশ ভাষাও জানেন। ইংরেজি বাংলা সংস্কৃত ভাষাতেও অগাধ পাণ্ডিত্য। খাদ্যরসিকও ছিলেন। তাঁর এ দুর্বলতার সুযোগ নিয়েছিল বুড়ী ঝিটা। সেই বাজার করত, সেই রান্না করত। তিনি হিসেব নিতেন না কখনও। টাকা চাইলেই দিতেন। আমি ভিখারি হিসাবেই গিয়েছিলাম প্রথমে। তিনি আমাকে দশটা টাকা দিয়ে বললেন—টাকা চাইছ অভাবে পড়ে—নিয়ে যাও। কি কর তুমি, কোথায় থাক। আমার পূর্ণ পরিচয় পেয়ে বললেন আমার একজন লোক দরকার, তুমিই থাক না আমার কাছে। খানিকক্ষণ পড়া-শোনা করবে, খানিকক্ষণ কাজও করবে। তোমার খাওয়া পরার ভার নিলাম আমি। ভিক্ষা কোরো না এখন। তুমি তো ছেলেমানুষ, ভিক্ষে করবার দরকার হয় বার্ধক্যে। থেকে গেলাম তাঁর কাছে। অনেক দিন ছিলাম। যদি শেষ পর্যন্ত থাকতে পারতাম—না পারিনি—আপেলের কাছে আমড়া কতক্ষণ থাকতে পারে। পারেনি। কিন্তু কেন—না, মানে সে কথা—। আবার থপ করে খানিকটা চুন সুরকি পড়ল লেখার উপর। ছাতের প্ল্যাস্টার খুলে খুলে পড়ছে।

চারিদিকে নোনা-ধরা দেওয়ালগুলো শুধু দাঁড়িয়ে নেই, ক্রমশ এগিয়ে আসছে, ক্রমশ ঘিরে ফেলছে আমাকে। আমি বুঝতে পারছি। কিন্তু সুজন বলছে, গীটারও বলছে, ওসব না কি আমার কল্পনা। আমি না কি আমার সেই আগেকার ঘরেই আছি, মার্বলের মেজে, বড় বড় জানালা সব না কি আগেকার মতোই আছে, আমি না কি আমার আগেকার সেই গদি-আঁটা চেয়ারটাতেই বসে আছি। হেসে উঠতে ইচ্ছে করছে। আমি যা দেখছি তাকে অস্বীকার করব? যা লিখছি এ তো প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ। কল্পনা? কোনটা কল্পনা কোনটা সত্য? আমি আমার চোখকে অবিশ্বাস করব? তোমরা আমাকে বন্দী করেছ কর—কিন্তু ভণ্ডামির ভাঁওতায় ভোলাতে পারবে না। ঔরঙ্গজেবও বন্দী শাজাহানের সঙ্গে অনেক ভণ্ডামি করেছিল। কিন্তু কি ভয়ানক পাষণ্ড ছিল সে। কোথায় যেন পড়েছি শাজাহান যখন মারা গেলেন তখন লোহার শিক পুড়িয়ে সে মৃত শাজাহানের পায়ে বিঁধিয়ে দিয়ে দেখেছিল যে বুড়োটা ঠিক মরেছে না মড়া সেজে শুয়ে আছে। এসব শাস্তি শাজাহানের অবশ্য প্রাপ্য ছিল, সে-ও সিংহাসন পাবার জন্যে না করেছিল কি? খুন করেছিল খুসরৌকে, অন্ধ করেছিল শাহরিয়রকে—বিদ্রোহ করেছিল বাবার বিরুদ্ধে—লোভী—লোভী—লোভী, সবাই কামুক, সবাই পিশাচ। আমিও। যদিও আমি ও রকম বাদশাহী পাপ করিনি, কারণ আমার সে সুযোগ ছিল না, কিন্তু পাপ করেছি বই কি। একটা সাম্রাজ্য চুরি করলে যে পাপ, একটা ঘষা পয়সা চুরি করলেও তাই। আমি পয়সা চোর—আমি চরিত্র-চোরও—আমি—না, খুব বেশী দোষ ছিল না আমার—

আমার অভাব ছিল চরিত্রের। আমার সে চরিত্র কেউ গঠন করে দেয়নি, আমাকে সংযম শিক্ষা দেয়নি কেউ। আমি ভেবেছিলাম উদ্ধত হওয়াই বুঝি পৌরুষ, অপরকে ঠকিয়ে নেওয়াটাই বুঝি বুদ্ধিমত্তার পরাকাষ্ঠা—আমি যে পরিবেশে মানুষ সে পরিবেশে অমানুষ হওয়াটাই ছিল বাহাদুরি—আমি না, না, কিন্তু কি বলতে চাইছি পারছি না—আমি আশা করিনি যে গীটার ওদের দলে থাকবে। আমার ছেলে সুজন, ভালো ছেলে—Man of principles— মানে বাঘ একটি। আর এক জাতের ঔরঙ্গজেব—কিন্তু গীটার—

টিউ—টিউ—টিউ—

আবার সেই হলদে পাখিটা এসেছে। খোলা জানলা দিয়ে তার স্বরটা শুনতে পাচ্ছি—ভাগ্যে এই খোলা জানলাটা আছে—কিন্তু হলদে পাখী খোলা জানলার সামনে এসে দাঁড়াবে না। ও তো আমার চাকর নয়। কিন্তু দেখতে ইচ্ছে করছে ওকে—খুব ইচ্ছে করছে। যখন আমি স্বাধীন ছিলাম তখন ওকে দেখবার জন্যে এত আকুলতা হত কি? চঞ্চলা গ্রামে আমার সেই বাগানবাড়িটায় ছিল প্রকাণ্ড একটা বকুলগাছ। বকুলগাছকে ভালো করে দেখেছেন কখনও? অদ্ভুত, অবর্ণনীয় একটা শ্রী আছে বকুলগাছের। শিরিষ বা অশ্বত্থগাছের মতো অত ঝাঁপড়ালো নয়, পাতা দিয়ে আকাশকে আড়াল করে না, অথচ বাবলা গাছের মতো ছোট ছোট পাতা ফাঁক ফাঁক ডাল নয়, অদ্ভুত একটা আভিজাত্য আছে বকুলগাছের। আমার বাগানবাড়ির সেই বকুলগাছটায় হলদে পাখির আনাগোনা ছিল খুব। আমার কিন্তু হলদে পাখি দেখবার কৌতূহল ছিল না। চোখও ছিল না। আমার চোখের দৃষ্টি হরণ করেছিল ঝুমকো নামে মেয়েটা। তেরো চোদ্দ বছরের মেয়েটা। কিন্তু কি অপরূপ লাবণ্য যে প্রস্ফুটিত হয়েছিল তাকে ঘিরে। টিউ টিউ ডাক শুনতে পেতাম। তবু কৌতূহল জাগেনি। ঝুমকোই দেখিয়ে দিয়েছিল আমাকে হলদে পাখিটা। সেই বলেছিল—ওর আর একটা নাম 'বেনে বউ'। কিন্তু তা সত্ত্বেও হলদে পাখি নিয়ে মাথা ঘামাই নি, ঝুমকোকে নিয়েই মত্ত ছিল আমার মন। এখন ঝুমকো কোথায়? এমন হলদে পাখিটাই বড় হয়ে উঠেছে, সেদিন যাকে দেখেও দেখেনি তাকেই দেখতে পাওয়ার জন্য সারা মন এখন উৎসুক। সে তখন সুলভ ছিল, এখন দুর্লভ। দেখতে পাব কি এখন?

টিউ—

উড়ে গেল।

"এ কি—এ কি—এ কি। পিল? পিল পিল করে কত পিল আর গেলাবে। আমার হয়নি তো কিচ্ছু। আমাকে রুগী সাজিয়ে রেখেছ জোর করে। একি অত্যাচার—"

গীটার হাতে পিল আর জলের গেলাস নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে নীরবে নতমুখে। অধরে মৃদু হাসি, চোখে মমতা।

প্রতিবাদ করে না, দাঁড়িয়ে থাকে খালি চুপ করে। ইচ্ছে করে—। —হ্যাঁ ঘাড় ধাক্কা দিয়ে ওকে দূর করে না দিলে ওর হাত থেকে নিস্তার নেই।

লিয়াকৎ—লিয়াকৎ—লিয়াকৎ—।

এ কি সত্যিই পাগল হয়ে গেলাম না কি। লিয়াকৎ তো নেই। আমার দুর্ধর্ষ দেহরক্ষী

লিয়াকতের ফাঁসি হয়ে গেছে যে। আমাকে বাঁচাতে গিয়েই সে গুলি করে দেবচরিত্র মুকুলবাবুকে। গুলি করতে গিয়েই ধরা পড়ে। ফাঁসি হয়ে গেল। অনেক টাকা খরচ করেও বাঁচাতে পারলাম না তাকে। অমন একটা প্রভুভক্ত লোককে ফাঁসিতে লটকে দিলে।

বাবা এটা খেয়ে নিন—

"কি ওটা। এটার তো আবার নতুন রকম রং দেখছি—"

উনি এটা আমেরিকা থেকে আনিয়েছেন।

"কেন আনিয়েছেন? এরকম টাকা নষ্ট করবার মানে হয় কোনও? আমার অসুখ হয়েছে এই মিথ্যেটা জাহির করবার জন্য একটা বড় ডিগ্রীধারী ডাক্তার খাড়া করেছ, মনস্তত্ত্ববিদ ডাক্তার। তিনি নাকি বলেছেন আমাকে আটকে রাখতে, তিনি নাকি বলেছেন দুধ খেতে—I hate দুধ—তিনি নাকি বলেছেন ঘণ্টায় ঘণ্টায় নানা রকম পিল খেতে—আমাকে যদি বন্দী করে রাখাই তোমাদের উদ্দেশ্য হয় তাহলে সেইটাই সোজা ভাষায় স্পষ্ট করে বল না কেন। আমার যদি ইচ্ছে হয়, তা হলে তোমাদের হুকুম তামিল করব—এই নোংরা ঘরেই কাটিয়ে দেব কিছুদিন। যদি ইচ্ছে হয়। কিন্তু আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করতে পারবে না তোমরা শেষ পর্যন্ত তা বলে দিচ্ছি—আমি গায়ের জোরে বেরিয়ে যাব একদিন। লিয়াকৎ—লিয়াকৎ—। ও, লিয়াকৎ মরে গেছে ভুলে যাই বারবার। আর মরে গেছে মুকুলবাবু। পুলিস-অফিসার ছিল, কিন্তু নমস্য। এক লাখ টাকা ঘুষ প্রত্যাখ্যান করেছিল। মেরে ফেলতে হল শেষকালে। লিয়াকৎ কুকুরের মতো মেরে ফেলল তাকে—মেরে ফেলে ধরা পড়ল। কুকুরের মতো? দেবতাকে কুকুর বললেই কি সে কুকুর হয়ে যায়? হয় না। মুকুলবাবু মরেওনি। সে বার বার আসে আমার কাছে, আমি সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করি তাকে। কি আবোল-তাবোল লিখে যাচ্ছি। আসল কথাটাই লিখিনি এখনও। হঠাৎ চেয়ে দেখলাম গীটার আমার দিকে নির্নিমেষে চেয়ে আছে। তার দৃষ্টিতে শঙ্কা, অনুকম্পা মমতা বেদনা—আর চোখে জল।

"দাও—দাও—দাও—খেয়েনি তোমার পিল। কটা আছে?"

গীটার চলে গেল।

অনেক দূরে চলে গেল।

মাঝে মাঝে সন্দেহ হচ্ছে সত্যি ও এসেছিল কি? সত্যি আমি পিল খেয়েছি? বৈদান্তিক প্রশ্ন। কি সত্য কি মিথ্যা এ নিয়ে মাথা ঘামাইনি কখনও, এখনও ঘামাতে চাই না, কিন্তু, কি আশ্চর্য, ঘামাচ্ছি। প্রত্যক্ষের সঙ্গে পরোক্ষ মিলে যাচ্ছে, মিলে যাচ্ছে দিনের সঙ্গে রাত, পূর্ণিমার সঙ্গে অমাবস্যা। আলো-ছায়ার খেলা অনেক দেখেছি, কিন্তু স্মৃতি-বিস্মৃতির যুগবৎ আবির্ভাব নূতন অভিজ্ঞতা হল। কিন্তু সে হিসাবে প্রতি অভিজ্ঞতাই তো নূতন অভিজ্ঞতা। আজকের আলো আজকেরই আলো গতকালের নয়, আগামী কালেরও নয়। আজকের আলোকে আমরা অন্য দিনের আলোর মতো মনে করি, তার একমাত্র কারণ আমাদের দৃষ্টি সূক্ষ্ম নয়, স্থূল, অতিশয় স্থূল। গীটারও রোজ বদলায়, ক্ষণে ক্ষণে বদলাচ্ছে, সব সময় পরিবর্তনটা ধরতে পারি না, তার কারণ, যদিও একটু আগে বলেছি আমার মনের বীণা সহস্র-স্বরা কিন্তু দেখছি সর্ব-স্পর্শ-কাতরা নয় সে। সব সুরে সাড়া দেয় না। আমার সেই পাহাড়ী

ঘোড়া ঝটকার মতো। কিছুতেই দুলকি চালে চলতে চাইত না ঝটকা। হয় দাঁড়িয়ে থাকত নয় ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটত। না, আমি গীটারের রূপ থেকে রূপান্তর লক্ষ্য করতে পারিনি। কিন্তু আভাসে অনুভব করছি ও বদলায়। বাই জোভ, আর একটা কথা মনে হচ্ছে—ও হয়তো গীটার নয়, গীয়ার, বারবার বদলায়, না বদলালে সংসার-মোটর চলে না। কি লিখছি—যা তা। প্রশ্ন হচ্ছে, আমি পিলগুলো খেয়েছি কি? তা জেনেই বা কি হবে!

আরে, আরে, ইনি কে। ফড়িং না বোলতা? বোলতার মতোই দেখতে, কিন্তু না, বোলতা নয়, বোলতা শুধু হলদে হয়, এর খানিকটা কালো খানিকটা হলদে। দীপ্ত সপ্রতিভ চেহারা। বোঁ বোঁ করে ঘুরে বেড়াচ্ছে চারিদিকে, যে শব্দটা করছে তা ঠিক গুনগুন্ নয়, অনেকটা হুংকার গোছের। আমার শেলফের উপর বসল। আবার উড়ে গেল। দেওয়ালে বসল। সেখান থেকেও উড়ল। বেরিয়ে গেল জানালা দিয়ে। কোথায় বাসা বাঁধবে তারই জায়গা খুঁজছে বোধহয়। আমার ঘর পছন্দ হল না। কোনও গাছের ডালে বাসা বাঁধবে বোধহয়। কল্পনা করতে ভালো লাগছে কোনও পলাশ বনে বাসা বেঁধেছে ও। তার পাশে আছে একটা বকুল গাছ, যে বকুল গাছে হলুদ পাখির আনাগোনা, যে বকুল গাছের আশেপাশে সেই হারিয়ে যাওয়া ঝুমকোটাও হয়তো চেয়ে আছে পেয়ারা-গাছের দিকে, পেয়ারার উপর লোভ ছিল ঝুমকোর—কিন্তু না, আমি এবার থিয়েটার দেখতে চাই। ওয়ান, টু, থ্রি—হরিচরণ ড্রপ তোল—আগে হুইস্‌ল দাও—হ্যাঁ আমার 'তিন বোন' নাটকটা অভিনয় হোক। 'আমার' বলছি বটে কিন্তু নাটকটা আসলে শেখভের লেখা। আমি মূর্খদের মহলে নিজের বলে চালিয়েছিলাম কিছুদিন। সবাই বাহবা বাহবা করেছিল। বলেছিল আমি একজন জিনিয়াস। নাট্যজগতে যুগান্তর আনব। Olgaর নামে দিয়েছিলাম অলি, Mary-র নাম দিয়েছিলাম মীরা, আর আইরিনের নাম দিয়েছিলাম মৃন্ময়ী। Olga, Mary আর Irene মস্কো যাবে এই স্বপ্নে বিভোর হয়েছিল—আমি এদের বিভোর করেছি মধুপুর যাওয়ার স্বপ্নে। হরিচরণ হুইস্‌ল দাও—ড্রপ তোল। ড্রপ উঠছে—লাল মখমলের উপর সোনার-কাজ-করা ড্রপটা উঠছে—প্রকাণ্ড 'হলে' বসে আছে অলি, মীরা আর মৃন্ময়ী। চুপ করে বসে আছে কেন? আশ্চর্য! মনে হচ্ছে তিনটে পুতুল যেন। অলি যেন নিষ্প্রাণ, মীরা ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে আছে আমার দিকে, মৃণ্ময়ীর মাথা হেঁট। কি হল এদের? ওহো বুঝেছি। Three Sisters-এ মেরির পার্ট করেছিল Olga Kripper নামে যে মেয়েটি তাকে বিয়ে করেছিল শেখভ। আমি অলি, মীরা, মৃন্ময়ী তিনজনকেই বিয়ে করব আশা দিয়েছিলাম, কিন্তু কাউকেই করিনি। হা—হা—হা—হা। আমি বিয়ে করেছিলাম জগদম্বাকে, সুজনের মাকে, সে কোনও থিয়েটারে কোন দিন পার্ট করেনি—তার কোন ছলা-কলা হাব-ভাব ছিল না, রুজ পাউডার মাখত না, ঘুঁটে দিত, গাদা গাদা সাবান কাচত, রান্না করত, ঝগড়া করত, ভারী মুখরা ছিল—একটি মাত্র গুণ, সদ্বংশের মেয়ে। একি—ওরা সব মিলিয়ে গেল যে। হরিচরণ হুইস্‌ল দাও—জোরে হুইস্‌ল দাও। কোথায় গেল এরা? 'হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনওখানে'—কোনখানে সেইটেই সন্ধান করতে হবে। করবই—হরিচরণ—এঃ আবার ছাতের চাপড়া ভেঙে পড়ল লেখার উপর।

লেখাটা ঢাকা পড়ে গেল। কিন্তু মনটা তো ঢাকা পড়েনি। আমার আত্মা?—আমার আত্মা আছে না কি! থাকা তো উচিত। দুরাত্মারও আত্মা থাকে শাস্ত্রকাররা বলেছেন, আর বলেছেন আত্মা না কি মলিন হয় না। আমার অমলিন আত্মা কোথায় তাহলে? কোথায় তা খুঁজে পাচ্ছি না, কিন্তু অনুভব করছি আছে। যেখানেই থাকুক আছে। হয়তো আমার এই লেখার মধ্যেই ফুটে উঠেছে তার দিব্যজ্যোতি। না, না, উঠছে না—আমি জানি উঠছে না। আমি দাম্ভিক, মহা দাম্ভিক তাই একথা বললাম। আমার লেখা? ছোঃ—সে তো কোন আঁস্তাকুড়ে কোন্ আবর্জনাস্তূপের মধ্যে থাকবে কে জানে? কিন্তু আমার আত্মা আছে, শাস্ত্রকাররা বলে গেছেন সকলের মধ্যেই আত্মা আছে, আব সে আত্মা না কি অমর। ভেরী গুড্ তাই যদি হয়—হঠাৎ মনে পড়ে গেল বনবিহারীবাবুর কথা—ডাক্তার বনবিহারী মুখোপাধ্যায়। সুতীক্ষ্ণ তরবারির মতো ছিলেন তিনি, তাঁর তীব্র ব্যঙ্গের বিদ্যুৎ চকমক করে উঠেছিল বঙ্গ-সাহিত্যের আকাশে কয়েক দিন। তিনি লিখেছেন

জেনেছি আত্মা অবিনশ্বব
জেনেছি মিথ্যা দুনিয়া
তাই আমাদের নাই ভয় কানা কৌড়ি
তাই পথ চলি দিনক্ষণ দেখে
খনার বচন শুনিযা
সাহেব এড়াই সেলাম করি বা দৌড়ি

কবিতার ব্যঙ্গটা উপভোগ করেছিলাম খুব। ব্যঙ্গের চাবুকটা আমার পিঠে পড়েনি তখন। কারণ আত্মা অবিনশ্বর কি নশ্বর তা নিয়ে মাথা ঘামানো দূরে থাক আত্মা নিয়েই মাথা ঘামাইনি কোন দিন। মাথা ঘামিয়েছি নিজের সুখ নিয়ে, স্বার্থ নিয়ে। পাঁজি দেখে পথ চলিনি কখনো, সাহেব দেখে সেলামও করিনি, দৌড়ও মারিনি—ববং একটা সাহেবের সঙ্গে মারামারি করে জেল খেটেছিলাম মাস দুই—সেই জেলের জেলারকে ঘুষ দিযে রোজ রাত্রে বাড়ি চলে আসতাম। ভারি অমায়িক ছিলেন জেলার ভদ্রলোক। মাত্র পাঁচশ টাকা নিয়েই—কিন্তু না, কি বলছিলাম যেন খেই হারিয়ে ফেলেছি—আত্মা—হ্যাঁ আত্মা। শুনেছি আত্মা নাকি দুবকম—জীবাত্মা আব পরমাত্মা। শাস্ত্রকারেরা যা বলেছেন—ওকি—ওকি—হলদে পাখিটা জানালাব সামনে দিয়ে উড়ে গেল নাকি। এক ঝলক সোনার কিরণ যেন এল আর মিলিয়ে গেল।

—টিউ—টিউ

সঙ্গিনীকে খুঁজে পায়নি নাকি। পাখিদের সঙ্গিনীরা হারায় না তো। পাখিদের তো ডাইভোর্স কোর্ট নেই। ডাইভোর্স কোর্ট নেই কিন্তু মানুষ আছে, মানুষরা পাখি মেরে ফেলে। শুধু খাবার জন্যে মারে না, গবেষণা করবার জন্যেও মাবে। মানুষের খপ্পরে পড়েনি তো ওর সঙ্গিনী? ওর সঙ্গিনীটিও নিশ্চয় সোনার স্বপন ছিল। এ কি করছ তুমি? আগে সোনার বাটের কথা ভাবতে, সোনার মোহরের কথা ভাবতে,—এখন সোনার স্বপন আর সোনার কিরণের কথা ভাবছ? কিন্তু স্বপন আর কিরণের কি বাজার দর আছে? নেই। তবে ও নিয়ে মাথা ঘামিয়ে মরছ কেন! কেন, তা কি জানি। মাথা ঘামছে, জানি শুধু এইটুকু। আর জানি রুমাল দিয়ে এ ঘাম মোছা যাবে না। আমি—।

'আমার কথা একটু শোন না'

কে বললে! ঘাড় ফিরিয়ে দেখি কেউ নেই।

স্বরটা কিন্তু চেনা-চেনা। নামটা মনে নেই। নাম মনে থাকে না। স্বর মনে থাকে, হাসি মনে থাকে, মুখ মনে থাকে, নামটা হারিয়ে গেলে পৃথিবীর কাছে তার পরিচয় দেওয়া যায় না। ওগো স্বর. ওগো হাসি, ওগো মুখ তোমার কথা শুনব বই কি। তোমার কথা যে খবরের কাগজে বেরিয়েছিল, তোমাকে নিয়ে যে কবিতা লিখেছিল কবি কুঙ্কুম কাব্যতীর্থ, তোমাকে নিয়ে আমি যে—। কি করেছিলাম? তার চেয়ে জোরালো প্রশ্ন, কি করিনি?

"চারজন খুন, দশজন জখম, একজনকে কুপিয়ে কুপিয়ে কেটেছে, দুজনকে পিটিয়ে মেবেছে—"

চীৎকার কবে উঠল খবরের কাগজের শিরোনামাটা। এ কাগজ মানে এই ওঁছা খবরের কাগজটা কে রেখে গেল এখানে। নিশ্চয় গীটার। আমার মানসিক উন্নতির জন্য ও সর্বদা ব্যস্ত। ও মনে ক:ছে আমি পাগল হয়ে গেছি। হয়তো হয়ে গেছি। কিন্তু খববের কাগজের ওই খবরগুলো পড়লে কি আমার পাগলামি সারবে? আমি আমার পাগলামি সারাতে চাই না। খেয়ালখুশির খরস্রোতে বেশ তো ভেসে যাচ্ছি। যা খুশি লিখছি, যা ইচ্ছে বলছি। সদর খোলা খিড়কি খোলা। আমি সনাতন হতে চাই না। সনাতন অত্যন্ত নর্মাল লোক ছিল। মেপে কথা বলত, মেপে হাসত, মেপে খেত, মেপে গীতা পড়ত, কোন উচ্ছ্বাস, কোনও খোয়াল, কোনও বদচাল তাকে বিপথে নিয়ে যায়নি, একটি মিথ্যা কথা বলেনি, খারাপ কথা বলেনি, কারও মনে দুঃখ হয় এমন কথা বলেনি একবারও। অত্যন্ত সভ্যভব্য শান্তশিষ্ট পুতুল ছিল সনাতন বোস। কিন্তু যখন আসত মনে হত কখন যাবে, উঠলে বাঁচি। এলে সহজে উঠত না, খালি মেপে মেপে কেতাদুরস্ত কথা বলত, আর মুচকি মুচকি হাসত। বেশী দিন বাঁচেনি, ভদ্র রোগেই মারা গিয়েছিল, যক্ষ্মা হয়েছিল তার। দেখতে দেখতে ক্ষয়ে গেল লোকটা। গীটার, শুনে রাখ সনাতন হবার আমার ইচ্ছে নেই। ওসব খবরও শুনতে চাই না। গুণ্ডামি আমিও অনেক করেছি, গুণ্ডামির খবরে আর রুচি নেই। যদি খবর থাকত এদেশের প্রতিটি লোক বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ বা বামমোহন হয়েছে. যদি খবর থাকত এদেশের ঘরে ঘরে সীতা সতী সাবিত্রী লক্ষ্মীবাঈ, দুর্গাবতী, মীরা, ভগবতী দেবী আবার আবির্ভূতা হয়েছেন, তাহলে ঔৎসুক্যভরে উলটে পালটে দেখতাম কাগজটা, হয়তো বিশ্বাস করতাম না, কিন্তু বুকটা দুর দুর করে কেঁপে উঠত--কিন্তু যে খবরের কাগজে কেবল গুণ্ডাদের গুণ্ডামি আর পতিতাদের কেচ্ছা বার হয়, মতলববাজদের পেজোমির নানা প্যাঁচ যেখানে সাড়ম্বরে বর্ণিত হয় সে খবরের কাগজে রুচি নেই আমার। বুঝলে গীটার—কিন্তু গীটার কই? দূরে দাঁড়িয়ে আছে, অনেক দূরে। আচ্ছা এরকম দূরে থাকার মানে কি। অথচ ওকে ডেকে যে বলব তুমি কাছে এস সে সাহসও আমার নেই। একটা আতঙ্ক যেন আমার মুখ চেপে ধরে। কিসের আতঙ্ক তা জানি, কিন্তু বলতে লজ্জা করে--আমারও লজ্জা আছে--আবার সেই হলদে-কালো পোকাটা ঢুকল—বোঁ বোঁ বোঁ বোঁ—ঝাপটা মেরে বেরিয়ে গেল আবার। পছন্দ হল না আমার ঘর। এই নোনা-ধরা দেয়াল ওর পছন্দ হবে কেন। ও পলাশ-রঙীন বনে কোনও মহুয়া-গান্ধী নির্জনতায় ঘর বাঁধতে

চায়—তা এই শহরে পাবে না—অনেক দূরে যেতে হবে—অনেক দূর—হয়তো সভ্যতার সীমা ছাড়িয়ে। সভ্যতা মানে আমি যন্ত্র-সভ্যতা বলছি—কেরোসিনের মতো, আলকাতরার মতো, পীচের মতো, টিন-পেটা শব্দের মতো, মোটরের আর এরোপ্লেনের চীৎকারের মতো আরও অনেক কিছু জঘন্য জিনিসের মতো এই যন্ত্রসভ্যতা—লোহার বাঁধনে বেঁধে দাসখৎ লিখে নিয়েছে, কামনার পণ্য যুগিয়ে পশু করে ফেলেছে আমাদের, আমি আমার কয়লাখনিতে ওই পশুগুলোকে দেখেছি, আমার চারপাশে। একটা নাইলনের শাড়ি, একটা মোটরকার, একটা কুম-কুলার, একটা পাখা এই সব তুচ্ছ জিনিসের লোভে কত দ্রুতগতিতে অধঃপাতের শেষ-সীমায় নেমে গিয়েছিল তুফানি, খলিল রায়বাহাদুর সেন, নওলকিশোর, মোহন মহান্তি—আরও কত লোক। সবার গায়ে কেরোসিনের গন্ধ, কিংবা আলকাতরার দাগ, কিংবা পীচের ছোপ. চারদিকে কেবল ছররর ঘররর খট্ খট্ দুমদাম। যন্ত্রসভ্যতা মানেই যন্ত্রণা, অথচ এর খপ্পর থেকে উদ্ধার পাওয়ার উপায়ও নেই। এ সভ্যতায় পুষ্ট অনেক মনীষী জয়গানও করেছেন এ সভ্যতার, তাঁদের মনীষা আছে বলেই শ্রুতিমধুর হয়েছে তাঁদের গানটা। কিন্তু মনের অন্তরতম প্রদেশে ক্ষুধিত পাষাণের মেহের আলী চীৎকার করছে—সব ঝুট্ হ্যায়, সব ঝুট্ হ্যায়, সব ঝুট্ হ্যায়।

পোকাটা আবার এল, আবার বেরিয়ে গেল।

এবার মনে পড়ল বংকিকে। কালো হ্যাংলা মেয়েটা হলদে কামিজ পরে আসত। জিপ্সি ছিল বোধহয়। হিন্দীতে কথা বলত, সেলাম করত কথায় কথায়। নাচ দেখিয়েছিল বেণী দুলিয়ে। এক টাকা বখশিস দিয়েছিলাম। বলেছিলাম—আবার আসিস। তোর নাম কি? বলেছিল—বংকি। আর আসেনি কিন্তু। কিন্তু এখনও আসে মাঝে মাঝে। নাচ দেখিয়ে যায়। আশ্চর্য, এখনও আসে। এ কি। এরা কে? ও বাবা, সুজন আর সেই গুঁফো ডাক্তারটা। ব্লাড প্রেসার মাপবে? মাপ। আমি কিন্তু জানি তোমরা হালে পানি পাওনি। পাবেও না। আন্দাজি ঢিল ছুঁড়ে যাচ্ছ। তোমরা মরুভূমিতে জাহাজ এনেছ, পানি পাবে কি করে? মরুভূমিতে পানি থাকে না। যেখানে উট আনা উচিত সেখানে এনেছ জাহাজ—আপ-টু-ডেট্ হাল-ওলা জাহাজ এনে মরুভূমিতে খুঁজছো পানি। পাবে না, পাবে না, মরুভূমিতে জল পাবে না। থাম, থাম এইটুকু লিখেনি। তোমরা একটা নুইসান্স—ঠিক উচ্চারণটা কি—নিউসান্স? যাই হোক তাই তোমরা—আচ্ছা নাও, নাও মাপ। যত খুশী মাপ—ব্লাডপ্রেসার মেপে আসল প্রেসারের খবর পাবে কি? মাপ।

ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ইন্‌জেক্‌শন দিয়েছিল। কিন্তু মজার কথা ঘুমিয়েও জেগে ছিলাম। অর্থাৎ অন্য একটা বই পড়ছিলাম, গিয়েছিলাম অন্য আর একটা দেশে। যাদের সঙ্গে দেখা হল তারাও চেনা। কিছু অতীতের চেনা কিছু ভবিষ্যতের। বর্তমানের কেউ নয়। যাঁরা বুদ্ধিমান, অর্থাৎ যাঁরা সব কিছু অবিশ্বাস করেন, সব কিছু যাচিয়ে দেখতে চান, যাঁরা বাজিয়ে দেখতে চান টাকাটা অঙ্গুষ্ঠ এবং তর্জনীর সহযোগে, টং করে শব্দ না হলে বলেন টাকাটা অচল, কিন্তু আজকাল টাকা আর আছে কি, সবই তো নোট, যে টাকা ক্বচিৎ কদাচিৎ দেখতে পাওয়া যায়

তাও আজকাল টং করে না, খট্‌ করে—সেটাকে ফেলে দেবে? দেবে না, দেবে না, পেলেই পকেটে পুরে ফেলবে। তবু তোমাদের অবিশ্বাসের 'পোজ'। তোমরা হয়তো জিজ্ঞেস করবে ভবিষ্যতের লোক আবার চেনা হবে কি করে? কল্পনায় চেনা হয় যে মশাই। আমার কাছে যে আলখাল্লা পরা লোকটি এসেছিলেন তিনি বললেন—মশাই, আমাকেও সবাই বলে পাগল। কেন জান? ছিলাম স্তন্য-পায়ী হয়েছি আলোক-পায়ী। সূর্যের আলো পান করি। ওরা যা খায় আমি তা খাই না। আমি উলঙ্গ হয়ে বসে থাকি সাতমহলা বাড়ির সবচেয়ে উঁচু ছাদে—আমার শরীরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করে প্রদীপ্ত সূর্যালোক, প্রবেশ করে রামধনুর সব রং, প্রবেশ করে অবর্ণনীয় সমুজ্জ্বল পুষ্টি-ধারা। আমি আকৃষ্ট হয়েছিলাম তোমাকে দেখে। কিন্তু তোমার গায়েও ভাত রুটির মাছমাংসের কপিকুমড়োর গন্ধ ছাড়ছে, ভেবেছিলাম তোমার কাছে বসে একটু মনের কথা বলব—কিন্তু দেখছি তোমার কাছে বসা যাবে না। চললাম।

চলে গেল। চলে যাওয়ার পর মনে হল লোকটা আমার সগোত্র। ভবিষ্যতের কুয়াশা ভেদ করে এসেছিল। এসেই চলে গেল। প্রত্যাশা রইল আবার ওর সঙ্গে দেখা হবে হয়তো। তখন ও ভবিষ্যতের থাকবে না অতীতের হয়ে যাবে। অতীতের একজন এসেছিল। নটবর সোম। নেকড়ে বাঘের মতো চেহারা। স্বভাবও নেকড়ের মতো। আমার মোটর আছে, প্রভাব প্রতিপত্তি আছে এই হিংসেয় ওর বুক ফেটে যেত। গোপনে গোপনে আমার অনিষ্টের চেষ্টা করেছিল অনেক, কিন্তু কিছু করতে পারেনি। একটার জায়গায় দুটো মোটর হয়েছিল আমার। নেকড়ে তখন শৃগালে পরিণত হল। তারপর তৃতীয় মোটর কিনলাম যখন তখন শৃগালও আর রইল না সে। কুকুর হয়ে গেল। আমারই পিছু পিছু ল্যাজ নেড়ে নেড়ে ঘুরত। অনেকদিন ঘুরেছিল। সুবিধে পেলেই বলত—'আপনি চেষ্টা করলে আমার ছেলের চাকরিটি হয়ে যায়।' কিন্তু আমি চেষ্টা করিনি। ছেলেটি শুধু গবেটই নয়, চোর। আজ হঠাৎ দেখা হল নটবর সোমের সঙ্গে অনেকদিন পরে। আজও তার চোখে সেই মৌন আবেদন—'আপনি চেষ্টা করলে ছেলেটার চাকরি হয়ে যায়!' কিন্তু ওর ছেলে তো মরে গেছে। কি এক পার্টিতে যোগ দিয়েছিল, বিপক্ষ পার্টির লোক গুলি করে মেরেছে তাকে। কার জন্যে চাকরি চাইছে নটবর? মিনতিপূর্ণ চোখে আমার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ। তারপর চলে গেল। বাঃ, আশ্চর্য, একটা জিনিস দেখলাম অনেক দিন পরে আজ। অনেক দিন তো দেখিনি ওকে। আমার এই নোনা-ধরা দেওয়ালে ভাগ্যে এই জানলাটা আছে তাই তো দেখতে পেলাম ফিঙেটাকে। ফিঙের অনেক বৈশিষ্ট্য আছে। প্রথম বৈশিষ্ট্য ওর পুচ্ছ দুটি কালো তৃতীয়ার চাঁদ যেন পিঠোপিঠি বসে আছে। দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য—ওর ভোরে ওঠা। রাত আড়াইটের সময় ওঠে। তৃতীয় বৈশিষ্ট্য—ও জঙ্গী। কোনও অবাঞ্ছিত শত্রুকে ও নিজের এলাকায় থাকতে দেয় না। চতুর্থ বৈশিষ্ট্য—ওর ছাগলের পিঠে চড়া। ফিঙে ছাড়া অর কোনও পাখিকে ছাগলের পিঠে চড়তে দেখিনি। অদ্ভুত শিকারী। উড়ন্ত পোকা ধরে। এখানে ও তারের উপর এসে বসেছে আমার জন্যে নয়, পোকা ধরবে বলে। কিন্তু ওকে আমার ভারী ভালো লাগছে। জীবনে এই একটা মজা দেখেছি, আমার জন্যে কেউ কিছু করে না, তবু আমি তাদের অজ্ঞাতসারেই তাদের সংস্পর্শে আনন্দ পেয়ে যাই। আকাশ আমার জন্যে নীল হয়নি, সন্ধ্যার মেঘে মেঘে আমার

জন্য রঙের উৎসব করেনি কেউ, ফুলেরা আমার জন্যে ফোটেনি, পাখিরা নিজেদের খুশীমতো গান গেয়েছে—আমি কিন্তু মাঝ থেকে আনন্দ পেয়ে গেছি। আমার জন্য বিশেষ করে আনন্দের আয়োজন করেছিল যারা তাদের আয়োজন মেকী ছিল বলেই বোধহয় বেশী দিন টেকেনি, দুদিনেই গিল্টি বেরিয়ে পড়ল। তাদের আন্তরিকতায় আমি সন্দেহ করছি না—কি চমৎকার বেহালাই বাজাত জাফর—খুব আন্তরিক ছিল সে, তবু মনে হচ্ছে তাতে কোথাও কিছু মেকী ছিল যেন। জাফর আকাশ হয়নি, ফুল হয়নি, পাখির গান হয়নি—তাই সে মারা গেছে—হারিয়ে গেছে। ভালো ভালো অনেক জিনিস হারিয়ে গেছে। হারিয়ে যায়নি কিন্তু সেকালের সেই 'ওগো'—সেই খাটো শাড়ি-পরা কুৎসিত মেয়েটা যে খুব ভোরে উঠে ঘুঁটে দিত, তারপর বাসন মাজত, তারপর স্নান করত, তারপর ঠাকুরঘরে ঢুকত, তারপর রান্নাঘরে যেত, যে সর্বদা নজর রাখত বারান্দায়-শোয়ানো ছেলেটার উপর তখন ওর নাম ছিল খোকা, বারবার সরে সরে যেত বিছানা থেকে, বারবার এসে শুইয়ে দিত ঠিক করে। জবজবে করে সরষের তেল মাখিয়ে ফেলে রাখত রোদে, তারপরে নিষ্ঠুরের মতো স্নান করাতো ঠাণ্ডা জলে। বলতাম অত কনকনে জলে নাওয়াচ্ছ কেন, জলটা একটু গরম করে নাও না! শুনত না আমার কথা। জেদী ছিল খুব। যা মনে করত তাই করতো ঠিক। আর উপবাস করত ক্রমাগত। নানারকম ব্রত আর মানতের খানাখন্দ পার হত লাফিয়ে লাফিয়ে। আমি যেদিন মুর্গি আর মদ খেতাম সেদিন আমার বিছানায় শুতো না। পরদিন মাথায় গঙ্গাজল ছিটিয়ে বলত—শুদ্ধ হও, শুদ্ধ হও। একদিন জিগ্যেস করেছিলাম—কোন্‌টা শুদ্ধ কোন্‌টা অশুদ্ধ তা কি তুমি বোঝ। আমার দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে বলেছিল—'তা হয়ত বুঝি না, কিন্তু তোমাকে বুঝি। তোমার আদি-অন্ত সব বুঝি, আমার গয়নাগুলো চুরি করেছে এই অপবাদে তুমি রঘুনাথ চাকরটাকে তাড়িয়ে দিলে। কিন্তু আমি জানি গয়নাগুলো রঘুনাথ নেয়নি। কে নিয়েছে তাও জানি। ও গয়না কে এখন পরছে সে খবরও পেয়েছি। কেন মদ খাও, কেন মুর্গি খাও, কে তোমাকে খাওয়ায় তা সবাই জানে, আমিও জানি। ও নিয়ে তর্ক করব না, ঝগড়াও করব না, কেবল বলব শুদ্ধ হও, নির্মল হও। ছেলের বাপ হয়েছ তুমি।'

আমি কুঁকড়ে যেতাম, কুঁচকে যেতাম, পুরুষসিংহ আমি হয়ে যেতাম কেঁচো—হ্যাঁ কেঁচো। আর ওইখানেই আমার অধঃপতন। যদি ওর চুলের ঝুঁটি ধরে বলতাম, যা করেছি বেশ করেছি আরও করব। তাহলে হযতো—কিন্তু না ভুল বলেছি—তাহলে—তাহলে রাসকেল হয়তো স্কাউড্রেল হত, হয়তো কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে পড়ত, সরু ছুঁচ হয়তো শূল হত, তুষানল দাবানল হত—কিন্তু ওকে আমি দাবাতে পারতাম না। কারণ ওর মধ্যে মেকী কিছু ছিল না, মিথ্যা কিছু ছিল না, ও নীলকণ্ঠ বিদ্যার্ণবের মেয়ে ও স্বস্থান থেকে একচুল নড়ত না। আজও নড়েনি—না জগদম্বা হারায়নি। কিন্তু কোথায় আছে জানি না। অনেককে দেখতে পাই মাঝে মাঝে। ওকে পাই না। স্বপ্নে জাগরণে কোন সময়েই দেখা পাই না ওর। মাঝে মাঝে কণ্ঠস্বর ভেসে আসে, আর ওই কথাটাই মনে করিয়ে দেয় কেবল—ছেলের বাপ হয়েছ তুমি। আরে তাতো হয়েছি, কিন্তু সেটা সর্বক্ষণ মনে রেখে কি লাভ হবে আমার। ভুলতে পারলেই বরং বাঁচি! যে আমাকে বন্দী করে রেখেছে সে যে আমার ছেলে—আমার বিদগ্ধ পুত্র সুজন—এ

কথা ভুলতে পারলেই আরাম পেতাম। ও যদি সুজন না হয়ে রমেশ হত, যে রমেশকে আমি জেল খাটিয়েছি সাত বছর, তাহলে এত কষ্ট হত না আমার—সুজনকে ঔরংজেব মনে করবার হেতু থাকত না। রমেশকে আমি জেল খাটিয়েছি, রমেশও আমাকে জেল খাটাচ্ছে—টিট্ ফর ট্যাট্— কোনও ক্ষোভ থাকত না। রমেশ আমার ক্যাশ ভেঙে ধরা পড়েছিল, হয়তো তাকে ছেড়ে দিতাম, কিন্তু ছাড়িনি—কেন ছাড়িনি লিখি সেটা? লিখেই ফেলি। আমার কমলির ঘরে ওর একটা চিঠি পেয়েছিলাম। কমলিকে নিয়ে ভাগবার মতলবে ছিল। কমলি বললে রোজ একটা করে চিঠি লেখে কি করব বলুন। বললাম, আমাকে এতদিন বলনি কেন? চাবকে দিতাম। কমলি চুপ করে রইল। বুঝলাম ও হিসেব করে দেখছিল কোন্ পাল্লাটা ভারী। দর কষাকষি করছিল। কমলিকেও দূর করে দিলাম। দেখতে ভালো ছিল না, হাবভাবও ছিল না, কিন্তু নাচত গাইত ভালো। বিশেষ করে নিধুবাবুর টপ্পা এমন চোখ মুখের ভঙ্গী করে গাইত—শুনেছি মেয়েটা মুখে রক্ত উঠে মারা গেছে। কি বলছিলাম—রমেশ, রমেশ এখন লক্ষপতি, স্বাধীন গভর্নমেণ্টের সচ্চরিত্র অফিসারদের নেকনজরে পড়েছে সে, শুনেছি ইলেকশনে দাঁড়াবে, এবার মন্ত্রী হবে হয়তো।

...পট্ করে একটা কুচকুচে কালো পোকা আমার খাতার উপর পড়েই উড়ে গেল। কি চকচকে কালো তার গায়ের রং। কত আশ্চর্য রকম পোকা আছে পৃথিবীতে। আমরা কটা পোকার খবর রাখি? ছারপোকা, গোঁদোপোকা, দাঁতের পোকা, ঘায়ের পোকা এরা সবাই কি ওই জাতের? বাজের মতো পড়ল আর প্লেনের মতো সোঁ করে উড়ে গেল! চকচকে কালো, অমাবস্যার মতো—কিন্তু না বাজে চিন্তা করছি—ক্ষিধে পেয়েছে বোধহয়—ক্ষিধে পেলেই বাজে চিন্তা ভীড় করে মাথায়। কিন্তু ক্ষিধে পেয়েছে একথা উচ্চারণ করবামাত্রই অখাদ্য সব জিনিস এনে হাজির করবে গীটার—আপেল. আঙুর, পেঁপে, সন্দেশ, রাবড়ি, টোস্ট, ডিম ভাজা, জ্যাম জেলি, চিজ—অরুচি ধরে গেছে ওসব খেয়ে। ভালো লাগে গরম মুড়ি আর তেলেভাজা, তার সঙ্গে ঘুগ্‌নি, কিন্তু ওসব জিনিস দেয় না গীটার। আর একটা জিনিসও খেতে খুব ভালো। আমার মানভূমের চাকরটা দিত আমাকে করে যখন আমি কন্টাক্টারি করতাম রাঁচিতে। নিমপাতার সঙ্গে একটু উচ্ছে লঙ্কাবাটা পেঁয়াজবাটা আর হলুদ মেখে বাটিচচ্চড়ি করত সে তেল দিয়ে। অপূর্ব তার স্বাদ। আর বিরিঞ্চি করত সে। বেগুনের বিরিঞ্চি। এ সবের নামও বোধহয় শোনেনি গীটার। সুক্তো করতে পারে না, করে খালি সুপ। চচ্চড়ি ছ্যাঁচড়া সড়সড়ি কিচ্ছু করতে পারে না। পারে খালি মসলা গদগদে কোফতা, কারি আর—চমকে উঠলাম হঠাৎ।

"বাবা, আপনার খাবার আনি?"

গীটার কি অন্তর্যামিনী! পিছন দিকে কখন এসে দাঁড়িয়েছিল টের পাইনি। লেখাটা দেখতে পেয়েছে না কি। তাড়াতাড়ি চাপা দিয়ে দিলাম লেখাটা। ঘাড় ফিরয়ে দেখলাম গীটার নেই। কি আশ্চর্য, গীটার নেই। অথচ— । আলবৎ আছে। গীটার গীটার গীটার গীটার—আমার ক্ষিধে পেয়েছে—বড্ড ক্ষিধে পেয়েছে—।

ওরা বলছে আমি মূর্ছা গিয়েছিলাম। ওরা কি না বলে। ওরা বলে আমি পাগল হয়ে গেছি।

মূর্ছা গিয়েছিলাম? মূর্ছা কি একটা জায়গার নাম? জায়গাই বোধহয়। সেখানে জগদম্বা ছিল। যে শাড়িটা তাকে অনেকদিন আগে কিনে দিয়েছিলাম, কিন্তু যেটা তার পছন্দ হয়নি সেই বেগনে রঙের শাড়িটা পরেই দাঁড়িয়েছিল। বলল—তুমি অমন দাপাদাপি করছ কেন, স্থির হও, ঠাণ্ডা হও, ছেলের বাপ হয়েছ তুমি। ঠোঁট চেপে ঠিক তেমনি হাসিটি হাসল। চলে গেল তারপর। যে পথে চলে গেল সে পথ আলোয় আলো। মনে হল আকাশের নক্ষত্ররা ঝাঁকে ঝাঁকে এসে ভীড় করছে সে পথের দুধারে। সেই পথে বেগনে শাড়িটা পরে চলে গেল সে। তারপর হঠাৎ দেখলাম আমার সামনে সেই পুরোনো খাগড়াই বাসনটাতে নারকোল কোরা রয়েছে খানিকটা। জগদম্বাই রেখে গেলে কি এটা? সেই তো জানতো আমি নারকোলকোরা ভালোবাসি, ওই পলতোলা কাঁসার রেকাবিটা তো তারই। সেই তো বুঝতে পারত কখন আমার ক্ষিদে পায়। সেই তো উনুন ধরাতে জানতো পাঁচ মিনিটে, দুধের সর বাঁচিয়ে ঘি তৈরি করত, বড়ি দিত, আচার বানাত। কত ভোবে উঠত জানতে পারতাম না, কত রাত্রে শুতে আসত তা-ও না। মাতাল স্বামীটার মাথার বালিশ ঠিক করে দিত যখন, তখন আভাসে বুঝতাম ও লায়লি নয় জগদম্বা। আমি মূর্ছা গেলে সে-ইতো আসবে, কিন্তু আসেনি, এলে যেত না, থাকত। গেলেও নক্ষত্রছাওয়া আলোয়-আলো পথ দিয়ে যেত না সে। আলো সে মোটেই পছন্দ করত না। ঘুপচি অন্ধকার, সরু গলি, এরওর বাড়ির পিছন দিকে ছাঁচতলা এই সবই ছিল তার মনোমত পরিবেশ। সদর রাস্তায় আসেনি কোনও দিনও। একদিন এসেছিল। মৃত্যুর দিন। সেদিন সদর রাস্তার উপরই দড়ির খাটিয়াটা পাতা হয়েছিল। এ কি---এটা কি-- শূন্য থেকে ঝুলছে---পিঁপড়ে না মাকড়শা—আরে—কি সর্বনাশ আসুন আসুন---এখানে দ্বিতীয় চেয়ার নেই যে আপনাকে বসতে দিই—আপনি আমার বিছানাতেই বসুন, আমি দাঁড়িয়ে থাকছি—না আমি আপনার সঙ্গে একাসনে বসতে পারব না, কক্‌খনো বসিনি, কক্‌খনো বসতে পারব না---কিন্তু আপনি এ পাপিষ্ঠের কাছে এলেন কেন। কিন্তু কি আশ্চর্য। যারা মরে হেজে গেছে তারাই বারবার আমার কাছে আসছে কেন। তাহলে কি আমারও মৃত্যু সন্নিকট? নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন মহাপুরুষ। আমাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন লেখা-পড়া শিখিয়েছিলেন, তাঁর বিরাট লাইব্রেরীতে একাধিপত্য করবার সুযোগ দিয়েছিলেন—বিয়েও দিয়েছিলেন।'

নীলকণ্ঠ বিদ্যার্ণব বাল্যবন্ধু ছিলেন ওর। তাঁর যে ঐশ্বর্য ছিল প্রচুর, বাজারদর ছিল না তার। মুর্গীরা মুক্তোর কদর করে কি? অতি কষ্টে দিন চলত, একটা স্কুলে পণ্ডিতি করতেন, মাইনে পেতেন দশ টাকা। মাত্র দশ টাকা। আমি আমার শফারকে দুশো টাকা মাইনে দিয়েছি, রক্ষিতাকে দিয়েছি হাজার টাকা, কিন্তু নীলকণ্ঠ বিদ্যার্ণব দশ টাকা মাইনেয় দিন কাটিয়ে গেছেন ওই জগদম্বাকে নিয়ে। ওই মাতৃহীনা কন্যাটি ছাড়া আর কেউ ছিল না তাঁর। মহাপুরুষই ঘটকালি করে তার সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিলেন আমার। আমার বয়স তখন একুশ আর জগদম্বার নয়। নীলকণ্ঠ বিদ্যার্ণব গৌরীদানে বিশ্বাসী ছিলেন। আর বিশ্বাসী ছিলেন মহাপুরুষের বিচার-বুদ্ধির উপর। মহাপুরুষ যে-ই বললেন নিপু ছেলেটি ভালো, তোমার পালটি ঘরও, ওর সঙ্গে তোমার মেয়ের বিয়ে দিয়ে দাও। অমনি রাজি হয়ে গেলেন তিনি, আমার সম্বন্ধে কোনও খোঁজ-খবর করলেন না। বিয়ে হয়ে গেল। আমার বাবাকে দেখিনি আমি। তিনি আমাকে জন্ম

দিয়েই দেহরক্ষা করেছিলেন। শুনেছি তিনি ভিক্ষা করতেন। গানের গলাটা ভালো ছিল, গান গেয়ে ভিক্ষা করতেন। শুনেছি সংস্কৃত ভালো জানতেন। কিন্তু সে জ্ঞানের কদর কেউ করেনি এদেশে। এদেশে গানের কদর খুব—সিনেমার গান, রবীন্দ্রনাথের গান, ভিখারীর গান—সব গানেরই কদর করে সবাই—ক্ল্যাসিক্যাল গানও না কি শোনে একদল লোক—পেটে অন্ন নেই, গায়ে বস্ত্র নেই, ভবিষ্যৎ মেঘাচ্ছন্ন, চুরি করতে ওস্তাদ, মিথ্যে বলতে সঙ্কোচ নেই, মহা ভীতু, চাকরির জন্যে লালায়িত এই অপদার্থের দল গানের সমঝদার—গান শুনে ভিখারীকে পয়সা ছুঁড়ে দেয়, আমার বাবা এদের মনোরঞ্জন করে পয়সা রোজগার করতেন— I hate music—I hate them all......

গোপীনাথ আছড়ে চুরমার করা হার্মোনিয়ামটা যেটা গলায় দুলিয়ে বেড়াতে তুমি—। না, না, রংকি, অমন করে কটমটিয়ে চেয়ো না আমার দিকে। তোমার গান শুনে সত্যিই মুগ্ধ হয়েছিলাম আমি। জানলার পাশ দিয়ে সোনাঝুরির যে ডালটা দেখা যাচ্ছে—তাতে কয়েকটা সোনাঝুরি ফুলও ঝুলছে—তুমি ওর মধ্যে গেলে কি করে রংকি—মানছি সোনাঝুরি ফুলের মতো হলুদ জামা ছিল তোমার, মনে পড়ছে সেটা,—আর মনে পড়ছে সেই গানের কলিটা—বাজুবন্দ্ খুলি খুলি যায়—কিন্তু তুমি এখনও আসছ কেন? তুমি বেঁচে আছ, না মারা গেছ। যারা মারা গেছে তারাই তো আসছে বার বার। মাঝে মাঝে মনে হয় গীটার সুজন, ওই গুঁফো ডাক্তারটা সবাই মরে গেছে, আমিও মরে গেছি—

কিন্তু ও কি, কার কান্না—। ওঃ বুঝতে পারলাম না।

সেই প্যাংলা ছেলেটা। মা ঠ্যাঙাচ্ছে ছেলেটাকে—পাখার বাঁট দিয়ে ঠ্যাঙাচ্ছে—পাগলের মতো ঠেঙিয়ে যাচ্ছে—আর গাল দিচ্ছে।

'পোড়ারমুখো, ভিকিরিব বাচ্চা, যমের অরুচি—দিন রাত খালি খাই খাই। কোথায় পাব অত খাবার। দূর হ, দূর হ—দূর হ—! লাথি মেরে ঠেলে ফেলে দিলে ছেলেটাকে। পালাতে গিয়ে পড়ে গেল ছেলেটা। কপাল কেটে রক্ত পড়তে লাগল। মা ঘরের ভিতর থেকে চিৎকার করে উঠল—যা ভিক্ষে করে খে গে যা।'

দড়াম করে বন্ধ করে দিলে কপাটটা। ছেলেটা কাঁদছে। ক্রমাগত কাঁদছে। বন্ধ কপাটের সামনে বসেই কাঁদছে। কাঁদতে কাঁদতে বলছে, মা—মা—মাগো। একটু পরে খুলে গেল কপাট, মা-ই বেরিয়ে এল। হাতে একখানা বাসী রুটি, গুড় লাগানো তাতে খানিকটা। গুড়ের মধ্যে মরা পিঁপড়েও একটা।

'নে —গেল।'

ছেলেটা কান্না ভুলে খেতে লাগল। মা চলে গেল ঘরের ভেতর। উনুনে তেলের কড়া চড়িয়ে এসেছিল। পাঁচ ফোড়ন দিতেই গন্ধ ছাড়ল। আনাজগুলো দেওয়ার পর ছঁক্ ছঁক্ করে শব্দ হল। এ কে আবার! কোথায় দেখেছি? মনে পড়েছে। আমাকে দেখে একটু হেসেছিল। হেঁটে যাচ্ছিল রাস্তা দিয়ে। ফ্রকপরা ছোট্ট মেয়েটা। আমাকে দেখে হাসছে কেন একথা তখন ভাবিনি। আমিও হেসেছিলাম একটু। কতদিন আগে? মনে নেই। ও কেন হেসেছিল আমিই বা কেন হেসেছিলাম সেটা আর জানা যাবে না। হাসিটা কিন্তু কালের স্রোতে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

হরে কৃষ্ণ—হরে রাম।

আর একটা ভিখারী এসেছে। নন্‌তির মায়ের মেজাজ যদি ভালো থাকে দেবে কিছু। নন্‌তির মা বাড়ির পুরোনো ঝি, মানে সেই কর্তা গিন্নি সব। গীটার ওর ভয়ে তটস্থ। থেমে গেল হরে কৃষ্ণ বুলি। চলে গেল। ভিক্ষা পেয়েছে।

কিন্তু আমি ভাবছি কতক্ষণ এভাবে লিখে যাব। বাজারে কাগজ কলম হয়তো অফুরন্ত, কিন্তু আমার শক্তির একটা সীমা আছে তো। না, নেই—হঠাৎ বলে উঠল কে যেন। বলে উঠল, তোমার শক্তির উৎসও তোমার আয়ত্তের মধ্যে নেই, সে ডায়নামো কোথায় আছে তা-ও জান না তুমি। কাগজ কলম ফুরোতে পারে তুমি কিন্তু অফুরন্ত। একমাত্র তুমিই অফুরন্ত। বদলাবে কিন্তু ফুরোবে না। এ তো মহা অত্যাচার—আমি ফুরোব না? মহাপুরুষের কাছে উপনিষদ পড়ে যে ভুল ধারণাটা মগজে ঢুকিয়েছিলাম সেটাকে গলা-ধাক্কা দিয়ে তাড়াবার চেষ্টা করেছিলেন মহর্ষি চার্বাক, কিন্তু পারেননি দেখছি। মহাপুরুষের লাইব্রেরিতেই চার্বাকদর্শনের বইটাও ছিল। কোন্‌টা ঠিক তা মহাপুরুষকে জিজ্ঞাসা করবার সাহস হয়নি। তাঁর চারদিকে এমন একটা দুর্ভেদ্য অদৃশ্য প্রাকার থাকতো যে তাঁর কাছে থেকেও কাছে যাওয়া যেত না কিন্তু এখন দেখছি উপনিষদই জিতছে। মনের ভিতর থেকে সে-ই বলছে, তুমি অমর, তুমি অক্ষয়। কিন্তু আমি অমর অক্ষয় হতে চাই না। এক জীবনেই যে জট পাকিয়েছি—ওই গীটার আসছে। হাতে ডিশ, ডিশে আপেল সিদ্ধ, আর চামচে। ওটা আমাকে রোজ খেতেই হবে। আপত্তি করলাম না, লক্ষ্মীর মতো খেয়ে নিলাম। যখন খেতেই হবে তখন আপত্তি করে লাভ কি। কিন্তু একটা লাভ হয়ে গেল অপ্রত্যাশিতভাবে। গলায় যে তোয়ালেটা জড়িয়েছিল তাতে চমৎকার সুগন্ধ ছিল। আতর কিংবা এসেন্সের গন্ধ—নাম বলতে পারব না—কিন্তু চেনা গন্ধ—ও হেনরির লেখা Furnished Room গল্পে চেনা এসেন্সের গন্ধ যেমন আকুল করে তুলেছিল লোকটাকে—আমাকেও তেমনি তুলেছে—কিন্তু মনে করতে পাচ্ছি না কিছু। তার নামটা পর্যন্ত মনে নেই। গন্ধটা কেবল ভেসে বেড়াচ্ছে। একটু আগে একটা হাসির টুকরো দেখছি, টুকরো সব। আশ্চর্য কথা মনে হচ্ছে একটা। কতকগুলো টুকরো এসে এক জায়গায় জড়ো হয়েছিল, সৃষ্টি হয়েছিল একটা অভূতপূর্ব জিনিস। টুকরোগুলো আলাদা হয়ে গেছে, অভূতপূর্ব এখন ভূতপূর্ব। স্মৃতি থেকে মুছে গেলেই শেষ। আরও আশ্চর্য, টুকরোর স্মৃতি মনে থাকে, গোটার কথা ভুলে যাই। জট—জট—খালি জট। সব মুছে গিয়ে যদি ক্লীন শ্লেট হয়ে যেত তাহলে নিশ্চিন্ত হতাম। কিন্তু নিশ্চিন্ত হতে দেবে না। মাঝে মাঝে ফুট কাটছে গভীর জলের মাছটা। ফুটটা দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু মাছটাকে পাচ্ছি না। কোন জালেই ও মাছ ধরা দেবে না এই রকম একটা বিশ্বাস, প্রত্যয়ও বলতে পারেন, আমার মনের প্রত্যন্ত প্রদেশে গ্যাঁট হয়ে বসে আছে, কিন্তু আমার মনের সদরে একটা ফাজিল সবজান্তা বুদ্ধি সরফরাজি করছে জাল, ছিপ, হুইল নিয়ে নানারকম চারের ফরম্যুলা খুঁজে বেড়াচ্ছে, তার বিশ্বাস সে ধরতে পারবে মাছটাকে। আমি দোটানায় পড়েছি। কেন জানেন? আমি যে পাপী। আমার বিবেকটি শরশয্যা একটি, কিন্তু মুশকিল আমি ভীষ্ম নই, আমি ভীষণ, আমি পাজি, আমি পাপী। কিন্তু এসব কি লিখছি? সুজন গীটার পড়বে যে এগুলো। পড়ুক না, কোদালকে কোদাল বলে ওরা যদি চিনতে পারে ক্ষতি কি তাতে? কিন্তু ওরা চিনতে পারবে না। ওরা আর ওদের সেই গুঁফো

ডাক্তারটা ঠিক করেছে আমি পাগল হয়ে গেছি। ওরা ভাববে পাগলে কি না বলে? এই ভাববে আর ক্রমাগত সেবা করে যাবে আমার, ক্রমাগত ওষুধ খাওয়াবে, ইনজেকশন দেওয়াবে, আর আনবে অখাদ্য খাবারগুলো---সাবুর পুডিং, আপেল সিদ্ধ, মাগুর মাছের স্ট্যু, আর খুব সরু খুব পুরোনো চালের গলাগলা ভাত। নাথুনীর ভাজা বেগুনি, বেচুদার দোকানের ঝাল ঝাল কাটলেট, পান্থ-তৃপ্তি হোটেলের মোটা চালের ভাত আর লঙ্কা-লাল গরগচুরে ইলিশ মাছের ঝাল যা খেয়ে একদিন প্রচুর তৃপ্তি হত তা আনবে না---সে সব দেখেইনি ওরা---সোফিস্‌টিকেটেড, নরম, তুলতুলে, ন্যাকামি-ভণ্ডামি-ভদ্রতা-শিক্ষার কারখানায় তৈরি আজব ধরনের জীব ওরা—ওরা বুঝবে না আমাকে, বুঝতেই পারবে না। আরে রামোঃ—ঠিক এই সময়ে তোমরা এলে? বিয়ের বাজারের ঝড়তি পড়তি মাল সব। নানারকম সাজ-সজ্জা কবে রঙীন আলোর মায়া-লোকে সর্বাঙ্গ দুলিয়ে হাজার হাজার দর্শকদের সামনে রঙ্গমঞ্চে নাচছ। নানারকম মুদ্রা দেখাচ্ছ, নানারকম গান গাইছ, চোখের মুখের ভুরুর কত রকম ভঙ্গী। আমি কিন্তু ওর মধ্যে একটি গানই শুনতে পাচ্ছি। বড় করুণ গান সেটি। সে গানের একটিই মানে—পাইনি, পাইনি, পাব কি, কোথায়, কোথায়.....। তোমাদের পেতে হবে কাউকে, যেন-তেন-প্রকারেণ। এই গানের সুরে ভেসে আসছে সেকালের গৌরীদান প্রথা, পণপ্রথা, বহুবিবাহ, ভেসে আসছে লাভ ম্যারেজ, ভেসে আসছে স্বাধীনতার মুখোশের তলায় পরাধীনতার নাগপাশে বন্দী হবার আগ্রহের বহু বিচিত্র ছবি, ভেসে আসছে আগামী কালের ঝাপসা কুয়াশার ফাঁকে ফাঁকে প্রাগৈতিহাসিক যুগের পুনরাবির্ভাবের বীভৎস চিত্র সব। নানারকম ট্রেডমার্ক দেওয়া বহুরকম লালসার ছবি। কিন্তু কি সুন্দর নাচছ তোমরা, গানের ভাষা কি সুন্দর, এ সময় আমার এসব কথা মনে হচ্ছে কেন। বাহবা বলতে গিয়ে আহা বলে ফেলছি কেন। কেন—কেন—কেন—কেন—অসংখ্য কেন আর অসংখ্য কিন্তু---সারা জীবনটাই এই। এর সঙ্গে মার, নানারকম মার। ও কি চলে গেলে সব? এলেই বা কেন, গেলেই বা কেন! যাওয়ার আগে একবার অনুমতিও নিলে না? এখন না হয় আমি একটা ছোট্ট ঘরে গরীবের মতো বসে আছি, কিন্তু একদিন আমার বাগানবাড়ি ছিল, সেই বাগানবাড়িতে তোমাদের নিয়ে হুল্লোড় করেছিলাম, আমার বাগানবাড়ির নাম ছিল 'সংস্কৃতি ভবন'। আসলে আমরা নচ্ছারের দল, হেন কুকার্য নেই যা করি না, কিন্তু মাঝে মাঝে সংস্কৃতি সংস্কৃতি বলে হেদিয়ে না পড়লে আমাদের ভাত হজম হয় না। তাই আমাকে কানা পুতের নাম পদ্মলোচন দিতে হয়েছিল, যেখানে গান বাজনা হই-হুল্লোড়ের সঙ্গে একটু ইয়ে-টিয়ে এটা ওটা সেটার চর্চা করা হত সেই বাড়িটার নাম দিতে হয়েছিল 'সংস্কৃতি ভবন'। মাঝে মাঝে সেখানে যে দু একজন মহামহোপাধ্যাযটাধ্যায়রা আসতেন না তা নয়, ভালো ভালো বক্তৃতাটক্তৃতাও দিতেন, আত্মাটাত্মার কথাও শোনাতেন, কিন্তু সংস্কৃতি ভবনের আসল কৃতী ছিলে তোমরা আর প্রধান সং ছিলাম আমি। নীলামে সে সংস্কৃতি ভবন বিক্রি হয়ে গেছে। এখন সেটা পাটের গুদাম। আর তোমরা? তোমরা কি যা ছিলে তাই আছ? ও মাই গুড্‌নেস। একসঙ্গে খিলখিল করে হেসে উঠলে তোমরা! কোত্থেকে? স্বর্গ থেকে, না নরক থেকে? ওই দেখ, ধরা পড়ে গেলাম, স্বর্গ নরক বিশ্বাস করি তাহলে। এ-টা কি? হলদে সাপ না কি! বিছানায় সাপ উঠেছে? কি সর্বনাশ, গীটার, গীটার---বিছানায় সাপ! এসো, এসো, শীগ্‌গির—।

"না বাবা ওটা সাপ নয়, আপনার বেড় সুইচের ইলেকট্রিক তার!"

"আগে তো কালো রঙের তার ছিল একটা—"

"কাল আপনি যখন বাথরুমে গিয়েছিলেন তখন মাখন এসে বদলে দিয়ে গিয়েছে। তারটা একটু ছিঁড়ে ছিঁড়ে গিয়েছিল, ভাবলাম আপনার শক্‌টক্‌ লেগে যেতে পারে, তাই—"

আমি বাথরুমে গিয়েছিলাম! আমি তো কোথাও যাইনি, ঠায় এক জায়গায় বসে আছি তোমাদের হুকুমে। আমাকে বন্দী করে রেখেছে সুজন। শাজাহান বন্দী হয়েছে আরংজেবের চক্রান্তে। তোমাকে জাহানারা বলে মাঝে মাঝে মনে হয়। সঙ্গে সঙ্গে ভুলটা ভেঙ্গেও যায়। তুমি যে ওর বউ। জাহানারা আরংজেবের বোন ছিল। কিন্তু তুমি ওর কোন্ বেগম? উদিপুরী, রাজপুতানী, না সেই মুসলমানীটা—কারোও সঙ্গে মিলছে না। না মিলুক, মিলিয়েই বা কি হবে, একটা কথার জবাব দাও তো। ইলেকট্রিক ওয়্যারটা হলদে রঙের কিনলে কেন হলদে পাখির রঙের সঙ্গে রঙ্ মিলিয়ে? ওই পাখিটাই বা বারবার এসে ডাকছে কেন—টিউ টিউ টিউ। একটু আগেই ডেকে গেল। ওর সঙ্গে কোনও ষড়যন্ত্র করেছ না কি! পাপীর মন কিনা তাই বারবার ষড়যন্ত্রের কথা মনে হয়। আচ্ছা, এ কি কাণ্ড। সঙ্গে সঙ্গে গীটার ভোজবাজির মতো অদৃশ্য হয়ে গেল। দূরে দাঁড়িয়ে হাসছে। গানের ওপারে দাঁড়িয়ে আছে। আমি কি ইচ্ছে করলে ওর কাছে যেতে পারি না? নিশ্চয় পারি। পারি, কিন্তু যাব না। আমার একটা আত্মসম্মান আছে তো। কথাটা মনে হওয়া মাত্র—খটাখট্ খটাখট্ খটাখট্ শব্দ হল একটা। দেখি খোঁড়া দেবেন বাঁড়ুজ্যে এসে দাঁড়িয়েছে। ভারী আত্মসম্মানী লোক ছিল। যখন ওর দুটো পা-ই ছিল তখন আসত আমার দোকানে' প্রতিবারই হেঁট হয়ে প্রণাম করতাম ওকে। একবার করিনি। তারপর থেকে আসেনি আর। শুনেছিলাম একটা পা কাটা গেছে রেলে। দুই বগলে ক্রাচ্ দিয়ে সে এসে দাঁড়াল হঠাৎ। গায়ে আজানুলম্বিত একটা ছেঁড়া জামা। চোখে অগ্নিদৃষ্টি। কয়েক মুহূর্ত আমার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর ক্রাচের উপর ভর দিয়ে খটাখট্ করে চলে গেল। যাওয়ার ভঙ্গীতে একটা দর্প একটা অবজ্ঞা ফুটে উঠল যেন। তারপর হঠাৎ ক্রাচ্ খটখটিয়ে ফিরে এল আবার। বলল—আমার একটা পা আছে তোমার তা-ও নেই। তুমি ভাবছ তুমি চলতে পার, কিন্তু পার না, পার না। কোনও দিনই পারবে না। তুমি অনড়, স্থবির, তোমার চলা অনেক দিন থেমে গেছে। আর তোমার আত্মসম্মান? সেদিন রাত্রির কথাটা ভুলে গেলে নাকি। তুমি ভুললেও আমি ভুলিনি। সেদিন কেঁউ কেঁউ করে পিছনের দুপায়ের ভিতর ল্যাজ ঢুকিয়েছিলে। তারপর বাঘের মতো গর্জন করেছ, শেষে স্ট্যাচুর মতো নির্বিকার হয়েছে। তোমাকে আমি চিনি না?

আবার ক্রাচ্ খটখটিয়ে চলে গেল।

অন্ধকার রাত্রে সরু গলি দিয়ে পা টিপে টিপে চলেছে সেই ছেলেটা। সেই যে ছেলেটা মায়ের কাছে মার খেয়ে কাঁদছিল, যার মা, মারতে মারতে টেনে বার করে দিয়েছিল তাকে রাস্তায়—সেই ছেলেটা। এখন একটু বড় হয়েছে। এখনও প্যাংলা, খালি গা, খালি পা, ছেঁড়া হাফ-প্যান্ট-পরা, জীর্ণশীর্ণ। পাঁজরা গোনা যায়। চোখ দুটো কিন্তু জ্বলন্ত, দুটো টর্চ যেন। সূচীভেদ্য অন্ধকারে ওই টর্চ দুটোই তার সম্বল। পা টিপে টিপে একটা বাড়ির পিছন দিকে

গিয়ে দাঁড়াল, চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ। তারপর একটা নালী বেয়ে উপরে উঠতে লাগল গিরগিটির মতো। দোতলায় খোলাজানালা ছিল একটা। ঢুকে পড়ল তার ভিতর কার্নিসে পা রেখে সার্কাসি কায়দায়। তারপর জানালা গলিয়ে ফেলে দিল কয়েকটা জামা কাপড়। তরতর করে নালী বেয়ে নেমে এল আবার। নেমেই জামাকাপড়গুলো বগলদাবা করে বাঁই বাঁই করে ছুটল। তীক্ষ্ণ সুরে সিটি বেজে উঠল কোথায় একটা। ছেলেটাকে আর দেখা গেল না। হারিয়ে গেল সেই অন্ধকারের অন্ধলোকে যেখানে চুরি করাই নিয়ম, অশ্লীলতাই যেখানে ভাষার অলঙ্কার, যেখানে রাস্তাই ঘর-বাড়ি, গুণ্ডারা গুরু, আর বেশ্যারা পালিকা—যেখানে আইনই বে-আইনি, ভদ্রতাই অভদ্রতা যেখানে ভালো হওয়া অপরাধ মন্দ হওয়া বাহাদুরি—যেখানে, না আর ফর্দ বাড়িয়ে লাভ নেই। ওই পাতালের রাজত্বটা চেন তোমরা। ওটা তোমাদেরই সৃষ্টি, তোমাদেব সভ্যতার, তোমাদের লোভের, তোমাদের মুখোশ-পরা পশু-প্রকৃতির। এই পাতালের গুণ্ডারাই তোমাদের দুষ্কর্মে সাহায্য করবার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ে তোমাদের শত্রুর উপর। এরা তোমাদের সেনা-বাহিনী। তোমরা আলসেশিয়ান বুলটেরিয়র, বুল-ডগ যেমন পোষ, এদেরও তেমনি পোষ। এই পাতাল তোমাদের সভ্যতার কার্পেটের ওপিঠ। সেইখানেই হারিয়ে গেল ছেলেটা। কিন্তু বেশীক্ষণ নয়। একটু পরেই দেবেন বাঁড়ুয্যে চুলের মুঠি ধরে টানতে টানতে নিয়ে এলেন তাকে কার্পেটের সোজা পিঠে। দেবেন বাঁড়ুয্যে তখন কনেস্টেবল। থানায় এসেই চড় ঘুষি লাথি দিয়ে শুরু হল ছেলেটার সম্বর্ধনা। তারস্বরে চেঁচাতে লাগল ছেলেটা। তখন অনেক রাত। প্রায় দুটো। তখনও ব্রিটিশ আমল ছিল। মোটর সাইকেল চেপে হঠাৎ একজন সাহেব এসে হাজির হলেন থানায়। তাঁকে দেখামাত্রই বাঁড়ুয্যে হঠাৎ সোজা হয়ে স্যালুট করলেন। বুঝলাম ইনি হোমরা-চোমরা অফিসার একজন। তখন হোমরা-চোমরা পুলিস অফিসারও রাত্রে রোঁদ দিত। সাহেব ছেলেটার দিকে তাকিয়ে দেবেন বাঁড়ুয্যেকে কি বললেন তা বুঝতে পারলাম না। ছেলেটা হাত জোড় করে, থর থর করে কাঁপছিল কেবল। তার দুগাল বেয়ে ঝরে পড়ছিল চোখের জল। হঠাৎ সাহেব ছেলেটার দিকে চেয়ে সাহেবী বাংলায় জিগ্যেস করলেন—'কে টুমি, কোঠায় ঠাক!'

ছেলেটার কেমন যেন মনে হল ত্রাণকর্তা এসেছেন। দলের নেতা ঘন্টি ঘোষের বারণ ছিল—জান যায় সো ভি আচ্ছা, সত্যি কথা কখনও বলবি না। ছেলেটার কিন্তু মনে হল ত্রাণকর্তার কাছে মিছে কথা বলা চলবে না। অকপটে সব বলে ফেলল সে কাঁদতে কাঁদতে। বলল—মা বাবা কেউ নেই হুজুর, খেতে পাই না, তাই চুরি করি।

"কাজ করিবে?" জিজ্ঞেস করলেন সাহেব।

ছেলেটা বলল—"করব, যে কোন কাজ করব, আমাকে বাঁচান।"

"কাম অন, দেন।"

সাহেবের মোটর সাইকেলে একটা সাইড কার ছিল। তাতেই চড়ে বসল ছেলেটা। নিয়ে গেলেন আপিসে। সেখানে একজন বাঙালী সাহেব ছিলেন। মিস্টার ডাটা। তাঁর হাতে সমর্পণ করলেন ছেলেটাকে। যা বললেন—তার মর্মার্থ বোধহয়—এ কাজ করতে চায়। একে কোনও কাজ দিন। ও চোর, ভালো হতে চায়। ওর ভার নিন। রিবিল্ড্ হিম।

মিস্টার ডাটা হাত কচলাতে লাগলেন এই অনুগ্রহের জন্য।

সেকালে সাহেবদের সামনে সবাই হাত কচলাতো।

'ইয়েস সার ইয়েস সার ইয়েস সার—'

কথাগুলো এখনও শুনতে পাচ্ছি যেন—দেখতে পাচ্ছি ডাটার কৃতজ্ঞতা-গদগদ মুখচ্ছবি। আমিই যে সেই ছেলেটা তা হয়তো বুঝতে পেরেছেন বুদ্ধিমান পাঠকরা। সোজাসুজি সে কথাটা গোড়াতেই কেন বলিনি? কায়দা মশাই। কায়দা করলাম একটু। অবশ্যই নকল কায়দা, আমাদের কোন্ কায়দাটাই বা আসল, সব নকল। আমাদের মেয়েগুলো আজকাল বর্মিদের কায়দায় লুঙ্গি পরছে দেখেননি? সেই রকম আর কি। আসল কথাটা হচ্ছে আমার সেই অধঃপতিত অবস্থায় দেবেন বাঁড়ুয্যে আমায় দেখেছিল। শুধু দেখেনি। বারবার আমার খোঁজ রেখেছিল। হঠাৎ যখন ভাগ্যভানুমতী আচমকা খেল দেখিয়ে আমাকে লাখপতি বানিয়ে দিলে, আমার ব্যবসা হল, আপিস হল তখন হঠাৎ দেবেন বাঁড়ুয্যে আমার আপিসে এসে দর্শন দিলেন একদিন। তখন তিনি রিটায়ার করেছেন, তাঁর টেবো গাল তুবড়ে গেছে, মাথায় টাক, ভুরু পাকা। আমি চিনতে পারিনি প্রথমে। পরিচয় পেতেই উঠে গিয়ে প্রণাম করলাম। বললেন—অর্থকষ্ট হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে একশ টাকা দিয়ে দিলাম। তারপর থেকে প্রায়ই মাঝে মাঝে আসতেন, আমার প্রণাম নগদ একশ টাকা নিয়ে যেতেন। এমনি চলছিল, হঠাৎ একদিন আমার কৃতজ্ঞতায় চিড় খেয়ে গেল। শুনলাম আমার অফিসের এক কেরানীকে তিনি বলেছেন—আমাকে টাকা কি সাধে দেয়, না দিলে আমি হাটে ওর হাঁড়ি ভেঙে দিতে পারি। আর সে হাঁড়ি ভেঙে দিলে তোমরা নাকে কাপড় দিয়ে ছুটে পালাবে। কেমন করে শুনলাম? আমার ওই কেরানীটি বাঙালী যে। সেই একদিন কথাটা চুপিচুপি বললে এসে আমাকে আমার মনোরঞ্জন করবে বলে। আমার ফিকে-নজরকে নেক-নজর করবার আশায়। সঙ্গে সঙ্গে দূর করে দিয়েছিলাম তাকে। আর তারপর যেদিন বাঁড়ুয্যে এসেছিল তাকে প্রণামও করিনি, টাকাও দিইনি। সেই রাগে এখনও ফুলছে লোকটা। রেলে পা কাটা গিয়েছিল এ খবরটাও শুনেছিলাম। কিন্তু আর সে আসেনি আমিও খোঁজ করিনি। এতদিন পরে হঠাৎ এল—আশ্চর্য! এল, চলেও গেল। রেখে গেল কিন্তু সুরমাকে।

মিস্টার ডাটা, যাঁর আসল নাম পরাণ দত্ত— তিনি আমার কাজের ব্যবস্থা করেছিলেন একটা। করতে হয়েছিল। বড় সাহেবের হুকুম তামিল না করে কি উপায় ছিল তাঁর? তাঁর ক্লাবের ইয়ার আকাশ-ছোঁয়া বড়লোক, নামকরা জুয়াড়ি ও. সি. গোহোর হাতে সমর্পণ করেছিলেন আমাকে। ভদ্রলোকের পুরো নামটা এখনও জানি না। সুরমা তাঁরই বিবাহিতা ধর্মপত্নী, সুরমার ফাই-ফরমাস খাটবার জন্যে বাহাল হয়েছিলাম আমি।

টিউ—টিউ—টিউ—

আঃ আবার হলদে পাখিটা এসে জ্বালাতন শুরু করল। না—না—না আমি তোমার সোনার ছটায় মুগ্ধ হতে চাই না এখন। আমি এখন সুরমার কথা বলব।

টিউ—টিউ—

লিয়াকৎ—লিয়াকৎ—গুলি কর তো পাখিটাকে।

কি আশ্চর্য আবার লিয়াকৎকে ডাকছি—বারবার ভুলে যাই লিয়াকৎ মরে গেছে! কি হল আমার? পাখিটা—কই আর ডাকছে না তো। লিয়াকতের নাম শুনেই বোধহয় ভয়ে

পালিয়েছে। হ্যাঁ সুরমার কথা বলছিলুম। সুরমারা কার্পেটের সোজা দিকে থাকে। বড়লোকের গৃহিণী। সাজে সজ্জায় অনুপম। হাতভরতি সোনার চুড়ি, মুখ ভরতি হাসি, গলা-ভরতি হার আর পাউডার। ঐশ্বর্যের রূপ উথলে উঠছে তাঁর চারিদিকে। সে রূপে চোখ ধাঁধিয়ে যায় ইতরজনের। তাঁর মোটরের বাহার, শফারের ইউনিফর্ম, হীরেমন পাখির মিষ্টি বুলি, অ্যালসেশিয়ানের চীৎকার, তাঁর প্রাসাদের মতো বাড়ি, তাঁর স্বামী-গর্ব, পুত্রগর্ব, কন্যা-গর্ব, জামাতা-গর্ব। হ্যাঁ, গর্ব করবার মতো অনেক কিছুই ছিল তাঁর। কিন্তু তবু অন্তরের নির্জনতায় তিনি ছিলেন অসহায়া ভিখারিনী। একথা বুঝেছিলাম অনেকদিন পরে যখন তিনি মহাপুরুষের কাছে গিয়েছিলেন। আমি পাশের ঘর থেকে লুকিয়ে শুনেছিলাম কি বলছেন তিনি। তাঁর কাছে বেশী দিন থাকতে পারিনি। চুরি করে গোলাপ-জলে ভিজোনো কিশমিশ খেতে গিয়ে ধরা পড়েছিলাম, তারপরই দুর করে দিয়েছিলেন তিনি আমাকে। সঙ্গতভাবেই দিয়েছিলেন। কিন্তু আমার মতো হতভাগ্য একটা ছোঁড়াকে কোলে করে যদি আদর করতেন তার বদলে—তাহলে—তাহলে—তাহলে—হা-হা-হা—তাহলে পৃথিবী উলটে যেত—ওটা নিয়ম নয়—নিয়ম নয়। পৃথিবী নিয়মমাফিক চলে। মহাপুরুষও আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু সে সব কথা পরে হবে। ড্যাম ইট, পরের কথা আগে মনে আসছে কেন। এ দেখছি আর এক ধরনের হলদে পাখি। পাশের ঘর থেকে আড়ি পেতে যা শুনলাম তাতে বুঝলাম—সুরমা মহাপুরুষের দূর-সম্পর্কের আত্মীয়া। মহাপুরুষের সুখ্যাতি শুনে এসেছেন তাঁর কাছে 'মন্তর' নিতে। স্বপ্নে তাঁর মৃতা জননী তাঁকে নাকি বলেছেন—তুই ওঁর কাছ থেকে 'মন্তর' নিলে শান্তি পাবি। শান্তির আশায় এসেছিলেন তিনি। মন্তরের নৌকোয় চড়ে অশান্তির অকূল সমুদ্র পার হয়ে শান্তির কূলে পৌঁছবেন বলে। কিন্তু মহাপুরুষ রাজি হলেন না। বললেন—আমি সামান্য লোক। কাউকে মন্তর দেবার স্পর্ধাও নেই, ক্ষমতাও নেই। তুমি ভগবানকে ডাক আর ওই জিনিসগুলো নিয়ে যাও। একগাদা জিনিস এনেছিল সুরমা। গরদের কাপড়, গরদের চাদর, রুপোর বাসন, নানারকম মিষ্টি, একগাদা ফল, বেশ বড় একটা কার্পেট, সব ফিরিয়ে দিলেন মহাপুরুষ। চোখের জল মুছতে মুছতে চলে গেল সুরমা। আড়াল থেকে সুরমার কথা শুনে মনে হয়েছিল সত্যি, ও হতভাগিনী। বড় অসহায়। পায়ের তলায় শক্ত মাটি নেই, মাথার উপর উদার আকাশ নেই, আশেপাশে আপনজন কেউ নেই। একটা অতলস্পর্শী গহ্বরের সামনে দাঁড়িয়ে সে মাঝে মাঝে পা বাড়িয়ে দেখেছে, পায়ের তলার মাটি কিন্তু খুঁজে পাচ্ছে না। মুখ তুলে চাইছে আকাশ নেই, খালি অন্ধকার। সব আছে, তবু যেন কিছু নেই, একটা অস্পষ্ট আশঙ্কা, একটা বিরাট শূন্যতা, একটা করাল ইঙ্গিত যেন ঘিরে আছে তাকে। মনের ভিতর থেকে কেবল তাকে বলছে—সত্যি তুই বড্ড গরীব। তোর দিকে কেউ ফিরে দেখে না, দেখে শুধু তোর ঐশ্বর্যটা। সবাই তোর কাছে আসে স্বার্থের জন্য, তোর জন্য কেউ আসে না। তোকে কেউ চেনে না, চিনতে চায়ও না। এই অস্বস্তিকর অনুভূতির কথা সে বলতে পারে না কাউকে। মুখে ফুটিয়ে রাখতে হয় একটা হাসি-হাসি সপ্রতিভতা, মেকী সুখী-সুখী ভাব। মাঝে মাঝে মনে পড়ে শাশুড়ীর ঠাকুর-ঘরটাকে। সে ঠাকুরঘর এখন নেই। ধর্মের আবহাওয়াই নেই বাড়িতে। উচ্ছৃঙ্খল উদ্দাম বিলাসে ঝাঁপাই ঝুড়ছে সবাই কামনারে খরস্রোতে। বাড়িতে রাজনীতির চর্চা

হয়, শেয়ার মার্কেটের চর্চা হয়, সিনেমার চর্চা হয়, দিল্লীর লোকসভা নিয়ে মাথা ঘামায় কেউ কেউ। দেশের ভবিষ্যৎ যে অন্ধকার এ নিয়েও দুশ্চিন্তা করে অনেকে। আন্তরিকতাহীন মেকী দুশ্চিন্তা সব। বাড়িতে বড় বড় সাহিত্যিক চিত্রকর মাঝে মাঝে আসেন নিমন্ত্রিত হয়ে কারও জন্মদিনে বা বিবাহ-উৎসবে। তাদের ঘিরে একটা অন্তঃসারশূন্য ভদ্রতার আড়ম্বরও ঘনিয়ে ওঠে দু'এক ঘণ্টার জন্য। কিন্তু সব মেকী, সব অভিনয়। সাহিত্যের কেউ ধার ধারে না, ছবিরও নয়। ওদের নিমন্ত্রণ করতে হয় নিজেদের জৌলুস বাড়াবার জন্যে। এ সব তবু আছে, নেই কেবল ধর্মের আবহাওয়া। ধর্মকে সবাই মনে করে কুসংস্কার। বাড়িতে ঠাকুরঘর নেই। তাঁর সেকেলে শাশুড়ি ঠাকুরঘরে ঠাকুরের সামনে উপুড় হয়ে শুয়ে থাকতেন। নীরবে হয়তো সেই কথাই বলতেন যা আর কাউকে বলা যায় না। কিন্তু সুরমা মনের কথা কি করে বলবে? সোফায় ঠেস দিয়ে মাঝে মাঝে সে চোখ বুজে নিরাকার ভগবানের একটা সাকার রূপ মনে মনে খাড়া করবার চেষ্টা করেছে। চেষ্টা সফল হয়নি। ভগবানের কথা মনে জাগেনি— জেগেছে মাতাল স্বামীর কথা, আমেরিকাবাসী ছেলের কথা, যে ছেলে এদেশে আর ফিরবে না, মনে পড়েছে বিধবা মেয়ের উচ্ছৃঙ্খলতার কথা, আর তার নানা জাতের বয় ফ্রেন্ডাদের চেহারাগুলো। ভগবানের ছবি ফুটে ওঠেনি। ঠাকুরঘরে শাশুড়ির মতো উপুড় হয়ে পড়ে থাকলে হয়তো ফুটতো। কিন্তু ঠাকুরঘর নেই বাড়িতে। ড্রেসিংরুম আছে, ড্রইংরুম আছে, বক্সরুম আছে, স্লিপিং রুম আছে, কুকুরের ঘর আছে, শফারের ঘর আছে, মোটরের ঘর আছে, চাকরদের ঘর আছে, নেই কেবল ঠাকুরঘর। একটা ঠাকুরঘরও হোক এ কথা বলবারও সাহস নেই সুরমার। আধুনিকতার হাই-হিল জুতো পায়ে দিয়ে পিঠকাটা ব্লাউজ পরে স্বামীর ল্যাংবোট হয়ে সে হোটেলে গিয়ে মখাদ্য কুখাদ্য খেয়েছে। ঠাকুর ঘর হোক এ দাবি করবার মুখ নেই তার।

"আপনি মশাই সুরমার কথা অত সাতকাহন করে বলছেন ব্যাপার কি! তার সম্বন্ধে দুর্বলতা হয়েছিল না কি কিছু—"

'কে আপনি? সামনে আসুন। আসবেন না? বেশ, তবে শুনেই যান জবাবটা। যদিও আমার জীবনে বহু সুষমা, সুশীলা, সুদীপা, সুলেখা, সুতপা এসেছে গেছে—বস্তুত আমার সমস্ত জীবনটাই যদিও সু-স্টোর হয়ে গেছে একটা—তবু আমি ওই সুরমাকে ভালবেসে ছিলুম। ও যদিও আমার মায়ের বয়সী ছিল, কিন্তু তবু ওই মোটা প্রৌঢ়াকে ঘিরে স্বপ্ন রচনা করেছিলাম আমি। ও যদি আমাকে কোলে বসিয়ে একটা চুমু খেত তাহলে আমি স্বর্গ হাতে পেতুম—হ্যাঁ স্বর্গ, হেভেন, প্যারাডাইস। আপনি ফ্রয়েড পড়েছেন না কি। তাহলে নিশ্চয় মুচকি হেসেই সবজান্তার মতো মাথা নাড়ছেন—প্লীজ স্টপ ইট্। বিদেশীদের আঁস্তাকুড়ে এঁটো-পাতা-চেটে-খাওয়া নেড়ী কুত্তা আপনারা, আপনাদের মুরোদ আমি জানি। আপনারা মুখস্থ-করা বিদ্যে ফেরি করে বেড়ান চাকরির লোভে, পুরস্কারের লোভে তেল দিয়ে বেড়ান হোমরাচোমরা গাড়োলদের পায়ে—ইউ আর এন অ্যারান্ট ফুল। গেট আউট। যোগীন্দর সিং গেট বন্ধ কর দেও।

ও গীটার এসেছ? কি এনেছ? কমলালেবুর রস? হ্যাঁ খাব খাব। বড্ড তেষ্টা পেয়েছে।

"মুখ অমন করেছেন কেন বাবা। খুব টক না কি।"

"জোঁদা। শোন, শোন এসেই চলে যাও কেন। একটা কথা বল দিকি? সুরমা নামে কোন মহিলার সঙ্গে তোমাদের কোনও সম্পর্ক ছিল কি? ছিল না? বেশ মোটাসোটা গোলগাল, ফরসা, থেবড়ি থুবড়ি এক মুখ হাসি? চেনো না তাকে? যাক, তাহলে হারিয়ে গেল সে। তোমার সঙ্গে তার কোথায় যেন একটু মিল আছে মনে হয়েছিল—মানে—যাক্ গে—।"

ঝনাৎ করে পিঠে চাবির গোছাটা ফেলে চলে গেল গীটার।

ওরা কেউ থাকতে চায় না আমার কাছে। আমি পাগল তো। যদি কামড়েটামড়ে দিই! দোটানায় পড়েছে বেচারী—একদিকে কর্তব্য, অন্যদিকে ভয়।

কিন্তু মশাই একটা সত্যি কথা বিশ্বাস করবেন? আমি পাগল নই। ন্যাংটো হয়ে ধেই ধেই করে নাচিও না, অকারণে হিহি করে হাসিও না, হুহু করে কাঁদিও না। আমি খাই, ঘুমোই, লিখি, পড়ি। মুশকিল হয়েছে কি জানেন, ওই নোনা-ধরা দেওয়ালগুলো আমি বরদাস্ত করতে পারি না। ছাতটাতেও নোনা ধরেছে, মাঝে মাঝে চাপড়া ভেঙে পড়ছে। অথচ আমার মার্বেলের তৈরি ঘর ছিল। সুজন বলেছে আমি সেই ঘরেই বসে আছি। তার মানে—হি ইজ এ লায়ার। মার্বেলের দেওয়ালে কখনও নোনা লাগে? ও আমাকে পাগল বানাতে চায়। কেন চায় এ রহস্য কিন্তু আমি ভেদ করতে পারিনি। ঔরংজেব শাজাহানকে বন্দী করেছিল রাজ্যলোভে। দারা, সুজা, মুরাদ তার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। কিন্তু সুজনের তো কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। ওই তো একমেবাদ্বিতিয়ম্। ও হো—বুঝতে পেরেছি। না, না, ব্যাপারটা অতো সোজা নয়। তুমি ইডিয়ট্ তুমি শয়তান তাই ও কথা ভাবছ। তোমার মনে হচ্ছে—সুজন তোমার মতো কুকাণ্ড করে বেড়াচ্ছে চারদিকে আর সেটা পাছে তুমি জানতে পার তাই তোমাকে বন্দী করে রেখেছে পাগল সাজিয়ে। অ্যাব্সার্ড। সুজন যে সত্যই সুজন এর প্রমাণ কি আমি পাইনি? আমার মদের বোতল থেকে একদিনও মদ চুরি যায়নি, আমার সিগারেট কেস থেকে একটি সিগারেটও নেয়নি কোনদিন, যে সব পরী হুরী অপ্সরারা আমার মনোরঞ্জন করতে মাঝে মাঝে আমার বাড়িতে ধাওয়া করত—তাদের মধ্যে দু'একজন ওকে বাগাতে চেষ্টা করেছিল আমি জানি, কিন্তু পারেনি। সুজন দুধের চেয়েও সাদা, ইস্পাতের চেয়েও কঠিন, সুজন a man of principles—সেকেলের সিক্কা মোহর—ওর মধ্যে ভেজাল নেই। তাহলে—ব্যাপারটা কি দাঁড়াচ্ছে? সুজন কুজন হল কেন? আলমগিরী পদ্ধতিতে বাপকে বন্দী করে ফেলল কেন হঠাৎ। নিশ্চয়ই ভিতরে একটা ব্যাপার আছে কিছু। যাক গে—যা বোঝা যাচ্ছে না তা বুঝতেও চাই না। বদ্ধ দুয়ারের সামনে মাথা কুটে মাথাটাই রক্তাক্ত হবে কেবল। কিন্তু—কুয়াশা হয়েছে কি চারধারে! সব যে ঢেকে যাচ্ছে। ওই আমেরিকান পিলগুলো আমার দৃষ্টির দরজায় খিল এঁটে দিচ্ছে না কি। চমকে উঠলাম হঠাৎ। গীটার এল আবার।

"আমার বাবা এসেছেন। আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন। নিয়ে আসব?"

"আসবে না কেন। এই জবাবদিহিটা আগে দিয়ে তবে নিয়ে এস তাঁকে।"

গীটারের চোখে কেবল একটা নির্বাক্ বেদনা ফুটে উঠল। কিচ্ছু না বলে চলে গেল সে। মনে হচ্ছে বেফাঁস কিছু বলে ফেলেছি। কিন্তু বললাম কি করে? আমার চারদিকেই তো ফাঁস। বেফাঁস হওয়ার তো উপায়ই রাখেনি ওরা। কিন্তু বেয়াই তো আসছেন না। গীটার এসেছিল কি

সত্যি? না ওটা আমার কল্পনা। সত্যি, বড্ড কল্পনাবাজ হয়েছি আজকাল। আবার এ কি। আবার কুয়াশা? ও বাবা—এ যে একেবারে নিবিড় নিশ্ছিদ্র।

ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

কিন্তু কি আশ্চর্য, মনে হচ্ছে ঘুমোইনি। ঘুমের মধ্যে হাজির হল সেই মার্কিন মেয়েটা যে একটা Poodle নিয়ে নানারকম কাণ্ডকারখানা করে শেষকালে একটা বই লিখে ফেলেছে। খুব কাটতি সে বইয়ের। বইটা মাঝে মাঝে পড়ি, কিন্তু শেষ করতে পারি না—যেই মনে হয় উঃ কি অসহ্য ন্যাকামি, অমনি ছুঁড়ে ফেলে দি। হঠাৎ দেখি আবার সেটা টেবিলের উপর এসে হাজির হয়েছে। গীটার কখন তুলে রেখে গেছে—বুঝতে পারিনি। ফলে আবার খানিকটা পড়তে হয়। এবং তার ফলে অদা ওই মার্কিন মহিলার আমার ঘুমের মধ্যে অপ্রত্যাশিত আবির্ভাব। আর কি আশ্চর্য, বাংলা ভাষায়, পরিষ্কার কলকাতিয়া ভাষায় এলুম গেলুম করে আলাপ জুড়ে দিলেন আমার সঙ্গে।

বললেন—''আপনি আমার বইটা বারবার পড়ছেন তাই আপনার কাছে এলুম। আমার যোশী কিন্তু ভারি মিষ্টি—সত্যি যদি দেখতেন তাকে—''

আমি অবাক্ হয়ে দেখছিলুম মেয়েটাকে। লম্বা মুখ, ঘাড়-ছাঁটা, হাসলে নাকের দু'পাশে বিশ্রী খাঁজ পড়ে, দাঁতগুলি সম্ভবত নকল, কটা চোখের দৃষ্টি দিয়ে আমাকে খোশামোদ করছে মনে হল। দৃষ্টি দিয়ে খোশামোদ করবার আশ্চর্য ক্ষমতা দেখলাম মেয়েটির। কত রকম সুরেই যে চাইছিল আমার দিকে।

''কুকুর আপনি নিশ্চয় ভালবাসেন—''

বললাম—''আমি গাই ভালবাসি, কুকুর আমার তেমন প্রিয় নয়। ওরা খালি ল্যাজ নাড়ে আর কিছু করে না। তোমরা ওদের চুম খাও। আমরা পারি না। চোরদের হাতে খাবার খেয়ে চোরদের বাড়িতে ঢুকতে দিয়েছে এ খবরও জানি। মনিবকে কামড়ে তার জলাতঙ্ক রোগ ধরিয়ে দিয়েছে এ-ও শুনেছি—''

'উ হু হু হু হু—'

চমকে উঠেছিলাম, পরে দেখলাম হাসছে।

''মিস্টার চ্যাটার্জি আপনি যা বলছেন আমার যোশী তা কখনও করবে না। তাছাড়া আপনি গাই ভালবাসেন বলছেন, গাইও তো গুঁতিয়ে দিতে পারে, কিংবা গাই বাঁজাও হতে পারে, কিংবা—''

হঠাৎ টেম্পার লুজ করে চেঁচিয়ে উঠলাম—শাট্ আপ। লিয়াকৎ, লিয়াকৎ—

কি আশ্চর্য লিয়াকৎ এসে হাজির হল। সেই গালের উপর কাটা-দাগ, হাতে পিস্তল, চিবুকে কাঁচা-পাকা নূর। মেমসাহেব দেখি অন্তর্ধান করেছে।

লিয়াকৎ কি খবর তোমার?

সেলাম করে বললে—খবর ভালোই হুজুর। আমি আপনার গোলাম তখনও ছিলাম, এখনও আছি। আপনার টাকায় আমার বালবাচ্চারা আরামে আছে, আপনাকে দোয়া করছে। ও হ্যাঁ, আর একটা মজার খবর আছে। সেই দারোগাটার সঙ্গে দেখা হয়েছিল, সেই বেকুব

দারোগাটার সঙ্গে, যাকে এক লাখ টাকার লোভ দেখিয়ে কাবু করতে না পেরে শেষে গুলি করতে হয়েছিল, যে জন্যে আমার ফাঁসি হয়ে গেল হুজুর, সেই বোকা দারোগাটার সঙ্গে দেখা হয়েছিল হঠাৎ একদিন। দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলাম। তার খোপড়ি আমি নিজে হাতে উড়িয়ে দিয়েছিলাম, এখন দেখলাম, খোপড়ি ঠিক আছে। এখন দাগটি পর্যন্ত নেই। আগেকার মতোই নিখুঁত। জিজ্ঞেস করলাম—দারোগা সাহেব খুলিটি এমন চমৎকার করে কোথায় সারালে? দারোগা হেসে কি বলল জানেন? বলল—আমার মাথার খুলি তোমার গুলিতে ভাঙেনি। যেটা ভেঙে ছিল সেটা আমার মাথার খুলি নয়, সেটা একটা নশ্বর মানুষের মাথার খুলি। আমার মাথার খুলিকে যিনি বরাবর রক্ষা করছেন তিনি আমার বুকের ভিতর আছেন। দেখবে তাঁকে? বললাম, দেখব। তিনি বুক চিরে দেখালেন। দেখলাম ভিতরে হীরের মতো দপদপ করে কি একটা যেন জ্বলছে। জিজ্ঞেস করলাম কি ওটা? উনি বললেন—আমার ইজ্জত। ওরই হুকুমে আমার ছেলেমেয়ে পরিবারকে অকূলে ভাসিয়ে দিয়ে আসতে পেরেছি। তোমার ব্ল্যাকমার্কেটিয়ার মনিবের দেওয়া লাখ টাকা নিলে ওরা সুখে থাকত, কিন্তু আমার ইজ্জৎ চলে যেত, আর আমার আসল মাথার নিখুঁত খুলিটাও খতম হয়ে যেত। লিয়াকৎ সেলাম করে চলে গেল। আমি হতভম্ব হয়ে বসে রইলাম। মনে হল লিয়াকৎ যেন এক জোড়া টাইট জুতো আমায় পরিয়ে দিয়ে গেল। আর সে জুতোর সুকতলায় একটা কাঁটা খচখচ করছে যেন। দারোগার ছেলেমেয়েরা অকূল পাথারে ভাসছে?

এখনও ভেসে থাকতে পেরেছে কি? না, ডুবে গেছে? সুজন সুজন, সুজন। টং করে একটা শব্দ হল। সুজন চেঁচিয়ে 'যাচ্ছি' বলে সাড়া দেয় না, টং করে ঘণ্টা বাজিয়ে জানায় শুনতে পেয়েছি ডাক। একটু অপেক্ষা করতে হবে। ও হাতের কাজটা সেরে তারপর আসবে। ম্যান অব প্রিন্সিপল। তাড়াতাড়ি এলোপাতাড়ি কিছু করে না। অপেক্ষা করতে হবে এখন। যাব্ আসছেন বাবাজীবন। ঠিক মায়ের মতো মুখ হয়েছে।

"সুজন যে দারোগাকে খুন করে লিয়াকৎ ফাঁসি গিয়েছিল তার নামটা তোমার মনে আছে কি? মনে নেই? তাহলে তো মুশকিল হল। আমারও নেই। নামটা খুঁজে বার করা অসম্ভব হবে না বলছ? তাহলে তাই কর। আর শোন, একটু দাঁড়াও না বাপু! তার নামটা আমার তত দরকার নেই—যে মরে গেছে তার নাম ক'জনই বা দরকারী মনে করে, করা উচিতও নয়—কিন্তু তার নামটা দরকার তার পরিবারবর্গের খোঁজ নেওয়ার জন্য। তারা না কি অকূলে ভাসছে। সে যদি লাখ টাকা নিত তাহলে ভাসত না। লিয়াকৎও মরত না। কিন্তু he was an ইজ্জৎ-mad fool। সব গোলমাল করে দিয়ে গেল। তছনছ। কিন্তু শোন বাবা—অকূলে ভাসার মর্মটা কি তা আমি বুঝি। আমার বাবা ভিখারী ছিল—a musician mendicant, আর আমার মা ছিল ঝি রাঁধুনী and what not—দজ্জাল হিংসুটে, মারকুণ্ডা—কিন্তু শেষ পর্যন্ত গুণ্ডাদের হাতেই মারা পড়ল—কেন জান—she had a robust bumptious youth, তাছাড়া বেওয়ারিশ একটা বিধবাকে পবিত্র বঙ্গভূমির গুণ্ডারা ছাড়বে কেন? ছাড়েনি। আরে শোন শোন চলে যাচ্ছ কেন। আমার মা যখন অন্ধকারে লোপাট হয়ে গেলেন তখন আমি অকূল পড়ে গেলাম। এ দেশের সতী সাবিত্রী দময়ন্তী সীতারা আমাকে কোলে তুলে নিলে না। আমাদের পাশের বাড়ির, যে মহিলাটিকে মাসীমা বলে ডাকতুম অনেক ইতস্তত করার পর

তাঁর বারান্দায় গিয়ে উঠেছিলুম। তিনি দড়াম করে কপাট বন্ধ করে দিলেন মুখের উপর। আমাকে আশ্রয় কে দিলে জান? ঘন্‌টি ঘোষ, ঘন্‌টি ঘোষ দি গ্রেট। সে আমাকে শুধু খেতে পরতে দিলে না, সে আমাকে পকেট কাটতে শেখালে, চুরি করতে শেখালে—আমি—। আরে সুজন চলে গেছে দেখছি। সুজন—সুজন—সুজন—। আবার টং করে ঘণ্টা পড়ল। ছোকরা বাজে কথা একদম বরদাস্ত করতে পারে না। সব কথা টু দি পয়েন্ট বলতে হবে। কিন্তু আমি যে নিজেকে থামাতে পারি না। মনের কপাট খোলা, কথাগুলো গলগল করে বেরুচ্ছে ক্রমাগত। থামাতে পাচ্ছি না। সুজন এসেছ? শোন কাজের কথাটা আগে বলে ফেলি। ওই দারোগার পরিবারবর্গ অকূলে পড়েছে—আমি যেমন একদিন পড়েছিলাম—ওদের কূলে টেনে তুলতে হবে। ওই দারোগাকে আমি যে এক লাখ টাকা দিতে চেয়েছিলাম সেটা ওর পরিবারবর্গকে দাও। চেক বুকটা নিয়ে এস, আমি তোমার নামেই এক লাখ টাকার চেক লিখে দিচ্ছি একটা। আমার ব্যাঙ্ক ব্যালান্স কত এখন?

সুজন বলল—যা ছিল তাই আছে—আমি ঠিক জানি না—

বললাম—তোমার হাতে যখন ব্যবসা তুলে দি তখন পঁচাত্তর লাখ ছিল—

"তাহলে তাই আছে—"

"তুমি কিছু খরচ কর নি? তোমার আমার নামে জয়েণ্ট অ্যাকাউণ্ট ছিল—"

"আমি কিছু খরচ করিনি।"

"ব্যবসা থেকে আর আয় হয়নি?"

"আমি ব্যবসা বন্ধ করে দিয়েছি। ও ব্যবসা চলাবার সামর্থ্য আমার নেই।"

"সংসার চালাচ্ছ কি করে তাহলে—"

"প্রফেসারি করি—"

"প্রফেসারি কর? প্রফেসারিতে কপয়সা আয় হয় তোমার? তাই বুঝি নোনা-ধরা বাড়িটায় টেনে এনেছ সব্বাইকে। জগদম্বা-মন্দির বিক্রি করে দিয়েছ না কি—বিক্রি করে দিয়েছ না কি—বল, বল শিগ্‌গির বিক্রি করে দিয়েছ না কি—"

"বাড়ি যে বিক্রি করিনি তা তো আপনি দেখতেই পাচ্ছেন—"

"না পাচ্ছি না। আমি দেখছি নোনা-ধরা দেওয়াল, ছাদ থেকে চুন-বালির চাপড়া খসে খসে পড়ছে—সেই শ্বেত-পাথরের বাড়ি—সেই জগদম্বা-মন্দির আমি দেখতে পাচ্ছি না—সেটা তুমি বেচে দিয়েছ, তুমি জোচ্চর তুমি আরাংজেব—তুমি—"

সুজন ভয় পেয়ে গেল। একটা বিপন্নভাব ফুটে উঠল মুখে। ছুটে চলে গেল। তার পরই হ্যালো—হ্যালো—। ফোন করছে। আর গীটার—হঠাৎ একটা ছবি মনে পড়ে গেল। একবার আমার ঘরে চড়ুইপাখি আটকা পড়ে গিয়েছিল একটা—এ দেওয়াল ও দেওয়াল করে ছট্‌ফট্‌ করছিল পাখিটা। এখন গীটারের সেই অবস্থা। যা দেখছি টুকে ফেলছি তাড়াতাড়ি। এঃ চুন-বালির চাপড়া খসে পড়ল আবার লেখার উপর। ইস্‌ সব গোলমাল হয়ে গেল। সব ঝাপসা। ঝাপসা—কিন্তু কুয়াশা নয়—অদ্ভুত ধরনের ঝাপসা— মানে—। ওই গুঁফো ডাক্তারটাকে ফোন করছে। সে এসে এইবার বোধহয় ইলেকট্রিক শক দেবে—কি করি, পালাবার উপায় নেই। প্রথমে অজ্ঞান করবে, মুখের ভিতর 'গ্যাগ্‌' ঢোকাবে, তারপর দু'দিকের রগে ইলেকট্রিক

বোতাম বসিয়ে 'শক' দেবে। আমার সমস্ত দেহে একটা প্রচণ্ড আক্ষেপ হতে থাকবে। তারপর...অজ্ঞান...তারপর?...কি হবে জানি না। ঔরংজেব শাজাহানকে ইলেকট্রিক শক দিয়েছিল কি? কে জানে! না দেয়নি। তখন তো ইলেকট্রিসিটি ছিল না।

ইলেকট্রিক শক দিয়েছিল। ভূমিকম্পের মতো ব্যাপার একটা। সাংঘাতিক ব্যাপার নিশ্চয়ই। আমি কিন্তু টের পাইনি। ওইখানেই বিজ্ঞানের বাহাদুরী। সে সাংঘাতিক সাংঘাতিক কাণ্ড করে কিন্তু টের পায় না কেউ। বিহারের ভূমিকম্প আমি দেখেছি। দুদ্দাড় করে তিন মিনিটের মধ্যে কত লোকের বড় বড় বাড়ি ধূলিসাৎ হয়ে গেল। ফেটে গেল কত জায়গা। আমার ভিতরও ও রকম কিছু হয়েছে একটা না কি? হয়েছে। আভাস পাচ্ছি। আমার ভিতরও তো কত রকম কি ছিল। কত বড় বড় অট্টালিকা—অট্টালিকা? হ্যাঁ অট্টালিকাই ছিল। প্রত্যেক মানুষই তো এক একটা অট্টালিকা। কত মানুষের স্মৃতিভরা আমার জীবন—বিরাট একটা নগর তো। সব ভেঙেচুরে গেছে না কি? না, ওই তো জগদম্বা দাঁড়িয়ে ঘুঁটে দিচ্ছে। ভূমিকম্প ওর তো কিছু করতে পারেনি। মহাপ্রলয়ও ওর কিছু করতে পারবে না। কিন্তু জগদম্বা, তুমি কি খালি ঘুঁটেই ঠুকে যাবে? আচ্ছা, তোমার নামে যে জগদম্বা-মন্দির বানিয়েছিলাম তাতে কি তুমি একবারও এসেছ? উত্তর দিচ্ছে না, পিছন ফিরে ঘুঁটেই ঠুকে যাচ্ছে। ওই ওর স্বভাব। জগদম্বা, মাছের তেল-কাঁটা দিয়ে তুমি যে রকম পুঁইশাকের চচ্চড়ি করতে সে রকম চচ্চড়ি আর খেতে পাই না। গীটার চেষ্টা করে কিন্তু পারে না—বিলিতী রান্না নানারকম জানে—। জগদম্বা চলে গেল। ওটা কিসের শব্দ? মনে হচ্ছে কে যেন চিৎকার করছে। ওহো, সেই মেওয়াওলাটা নয় তো! বিহারের ভূমিকম্পে একটা মেওয়াওলা দোকান-সুদ্ধ চাপা পড়ে গিয়েছিল। চাপা পড়ে গিয়েছিল কিন্তু মরেনি। তার মস্ত বড় ফলের দোকান আর একটা রুলের কল ঢাকা পড়ে গিয়েছিল দু'পাশের বড় বড় বাড়ি পড়ে, মেওয়াওলাটা মরেনি। তাকে আমরা পনেরো দিন পরে উদ্ধার করেছিলাম। চিৎকার শুনে উদ্ধার করেছিলাম। সে দিনরাত চেঁচাত। দিনের বেলা তার চিৎকার শুনতে পাইনি, রাত্রে পেয়েছিলাম হঠাৎ একদিন। গভীর নিস্তব্ধ রাত্রে ভূগর্ভ থেকে কে যেন চেঁচাচ্ছে—বাবু হো, বাবু হো—। ডেব্রি সরিয়ে বার করলাম তাকে। বেঁটে মোটা তাগড়া কাবুলী একটা। এক দোকান মেওয়া পনেরো দিন ধরে খেয়ে বেশ মোটা হয়েছে। কিন্তু সে তো ছাড়া পেয়ে গিয়েছিল সে চিৎকার করবে কেন। ওই আবার! মেয়েমানুষের গলা মনে হচ্ছে। সীতা নয় তো? সীতার পাতাল-প্রবেশও হয়তো ভূমিকম্পের ব্যাপার। সীতার অপমানে বসুন্ধরা কেঁপে উঠেছিল, ফেটে গিয়েছিল, সেই ফাটলে ঢুকে গিয়েছিল সীতা। সেইটেই কবি-কল্পনায় সীতার পাতাল-প্রবেশ-কাব্য হয়েছে। বিহারের ভূমিকম্পে আমি জীবন্ত লোককে ফাটলে ঢুকে যেতে দেখেছি। তাদের আর্তনাদও শুনেছি। ফাটল খুঁড়ে বেরও করেছি দু'এক-জনকে। সীতা কি তাহলে বেরিয়ে আসতে চাইছে? কেন? এই লম্পট-লম্পটীদের দেশে সীতা বেরিয়ে আসতে চাইছে কেন! তাছাড়া আমার মতো লম্পট-শিরোমণির কানে সীতার ডাক পৌঁছবেই বা কেন? আমার কানে পৌঁছবে লারেলাপ্পা, সীতার আর্তনাদ শোনবার কান কি আমার আছে এখনও? বিশ্বাস হচ্ছে না। আমি নেপাল

চাটুজ্যে—যার ডাক নাম ছিল ন্যাপলা—যাকে আদর করে কেউ কেউ নিপুও বলত—আমি জানি সে কি মাল। এ-ও জানি এই মালকেই বেসামাল হয়ে সেলাম করেছে দেশের অনেক লেবেল-দেওয়া জ্ঞানী-গুণী-সাহিত্যিক-শিল্পীরা দুটো পয়সার লোভে। করেনি কেবল ওই দারোগাটা, করেননি যামিনি ঘোষাল আর করেননি মহাপুরুষ। তিনি যেই দেখলেন আমি একটা উটকো মেয়েকে এনে দোতলায় তাঁর লাইব্রেরী ঘরে বসিয়েছি অমনি দূর করে দিলেন আমাকে। মুখে বললেন না যদিও—দূর হয়ে যাও, কিন্তু এমনভাবে চাইলেন—ও গড়্— সে চাহনিতে হতাশা আর ভর্ৎসনা এমনভবে মূর্ত হয়ে উঠল যে আমি পালিয়ে গেলাম। জগদম্বা তখন বছর এগারোর, বাপের বাড়িতে ছিল। সেখানেই চলে গেলাম আমি। মেয়েটাও ফিক্ করে হেসে দুদ্দাড় করে নেমে গেল সিঁড়ি দিয়ে। পাড়ারই মেয়ে, বালবিধবা একটা। সে-ও নিজের বাড়িতে ফিরে গেল সম্ভবত। কোন হৈচৈ হল না, উচ্চবাচ্য হল না, কেউ জানতে পারল না। মহাপুরুষ কাউকে কিছু বলেননি। সেই জন্যেই তিনি মহাপুরুষ। আমার শ্বশুর আগেই মারা গিয়েছিলেন। জগদম্বা ছিল তার পিসীর কাছে। রাত্রে আমার কাছে শুতে এল না। পিসীর কাছে গিয়ে শুয়ে রইল। তার পরদিন সকালে বলল—আমাদেরই খেতে কুলোয় না। তুমি আবার এসে হাজির হলে কেন! বলিহারি তোমার আক্কেলকে। বেরিয়ে গেলাম শ্বশুরবাড়ি থেকে। সোজা চলে গেলাম সিম্সন সাহেবের কাছে। খেতু ভট্চাজ, কানাই সমাদ্দার বা হাবুল ঘোষের কাছে যাইনি, ওরা সবাই আমার ইয়ার ছিল, পরস্পরের মুখ থেকে এঁটো বিড়ি নিয়ে ফুঁকতাম আর পথচলতি মেয়েদের দেখতাম, আর রাজনীতির তর্ক করতাম, আমরা ছিলাম যেন ডিজরেলি, ভলটেয়ার, মার্কস, গ্ল্যাডস্টোন, চার্চিল, লিংকনদের নির্যাস দিয়ে তৈরি এক একটি অবতার, তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিতাম সব্বাইকে, আর নানারকম গুজব আর পরের-মুখে-শোনা গল্প নিয়ে ইতিহাস তৈরি করতাম মহাত্মা গান্ধী, সরোজিনী নাইডু, সুভাষ বোস আর যতীন সেনগুপ্তদের নিয়ে। রাজা-উজিরদের মুণ্ডহীন শব ছড়ানো থাকত আমাদের চারপাশে। কিন্তু নিজে যখন অকূল পাথারে পড়লাম তখন খেতু-কানাই-হাবুলের ওপর নির্ভর করতে সাহস হল না—মনে মনে জানতাম ওরা সব দন্তগজভুক্ত ফোঁপরা কয়েৎ বেল—গেলাম সিম্সনের কাছে। সিম্সন আমার কাছে একদা সংস্কৃত পড়তেন। এসেছিলেন অবশ্য মহাপুরুষের শিষ্য হয়ে। মহাপুরুষ তাঁকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। যথাসাধ্য যত্ন করে পড়িয়েছিলাম তাঁকে। তাঁর মতো অধ্যবসায় তো আর দেখিনি আমি। ছিনে জোঁকের মতো। উপক্রমণিকা থেকে আরম্ভ করে কালিদাস ভবভূতি পড়ে ফেললেন এক বছরের মধ্যে। তারপর আরম্ভ করলেন উপনিষদ। আমার মনে হল ওঁর কাছে গেলে উনি হয়তো আমাকে সাহায্য করবেন। গিয়ে অকপটে সব খুলে বললাম। বললাম—তুমি মেঘদূত, ঋতুসংহার পড়েছ, কীটস শেলীও পড়েছ, সুতরাং আমার বেদনা তোমার বোঝা উচিত। মহাপুরুষের বাড়ি আর যাওয়া যাবে না, শ্বশুরবাড়িও না, ট্যাঁক গড়ের মাঠ, এ অবস্থায় হে উপনিষদজ্ঞ শ্বেতকেতো, তুমিই আমাকে পথ দেখাও। পথ দেখালেন তিনি। বললেন—আমার এক বন্ধু এখানে আছেন। পাটের ব্যবসা করেন। একটা চিঠি লিখে দিচ্ছি সেটা নিয়ে তাঁর কাছে যাও তুমি। গেলাম। তিনি বললেন ভেরি গুড্। আর্থার যখন তোমাকে সাহায্য করতে বলেছে তখন আমি নিশ্চয় সাহায্য করব তোমাকে। প্রথমে টাকা ধার করতে হবে। আমিই নামমাত্র সুদ নিয়ে

টাকা দেব তোমাকে। আর বলে দেব আমাদের কোম্পানী মণ পিছু হাইয়েস্ট কত টাকা দরে পাট কিনবে। তুমি ওর চেয়ে যত কম দরে পার পাট কিনে আমাদের সাপ্লাই কর। আমরা সব কিনে নেব। দশ হাজার টাকা নিয়ে আপাতত কাজ আরম্ভ কর। আমি একজন অভিজ্ঞ কর্মচারীকে তোমার কাছে পাঠিয়ে দেব, সে তোমাকে ব্যবসার ঘাঁত-ঘোঁৎ সব বুঝিয়ে দেবে। কোথায় গিয়ে কি করে পাট কিনতে হয়, কাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হয় সব বলে দেবে সে। তুমি লেগে পড়। লেগে পড়লুম। হ্যাঁ মশাই, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, বিহারীলাল, রবীন্দ্রনাথ, দেবেন সেন, সত্যেন দত্ত, শেলী কীটস্ ব্রাউনিং শেক্সপিয়ারদের শিকেয় তুলে রেখে ছুটলাম পাটের বাজারে। ছুটলাম নোয়াখালি, ধুবড়ি, পাথরগামা, ঢাকা, ফরিদপুর, গেঁওখালিতে। প্রাণের বন্ধু হল জিতু, খগেন, নুরুদ্দিন, চুনি মিএগ, ছবিলাল আর জমিরুদ্দিন, আর—না, মনে পড়ছে না তাদের নাম, আশ্চর্য একটারও নাম মনে নেই—যারা আমার যৌন-ক্ষুধা মিটিয়েছিল—তারা—

"চাই অল ঝাড়ু—অল ঝাড়ু—"

মন থেকে সব মুছে যাচ্ছে যেন। ঝাড়ুওয়ালাটা ঝাড়ু দিয়ে সব পরিষ্কার করে দিলে না কি। ঘরের দেওয়ালগুলো এগিয়ে আসছে। মনে হচ্ছে ঝুঁকে যেন দেখছে আমি লিখছি। এ কি হঠাৎ ওরা আবার সরে গেল কেন। গীটার আসছে। সঙ্গে তার বাবা। গীটারকে দেওয়ালগুলো ভয় করে না কি! গীটারের বাবা অনেকদিন থেকে আসছেন আমার কাছে—যেন বহুযুগের ওপার হতে—শামুকের মতো মন্থরগতিতে। এতদিনে বোধহয় এসে পৌঁছলেন। লোকটা সাহিত্যিক, লোকে বলে সুসাহিত্যিক, আমি অবশ্য ওর একটা বইও পড়িনি, যদিও মুখে বলেছি পড়েছি পড়েছি। চমৎকার, চমৎকার। কিন্তু লোকটাকে শ্রদ্ধা করি আমি। কেউ ওর গায়ে আলকাতরার ছাপ দিতে পারেনি এখনও। ও পুরস্কার পায়নি একটাও। এ যুগে এটা কম কৃতিত্ব নয়। সুজন ওঁর লেখার খুব ভক্ত। বিয়ের আগে থেকেই ভক্ত ছিল। ওর লাইব্রেরীতে প্রায়ই দেখতুম যামিনী ঘোষালের বই। প্রবন্ধ, কবিতা, গল্প সব রকম। কৌতূহল হল। জিগ্যেস করলাম একদিন—এর লেখা কেমন? সুজন সংক্ষেপে বললে—চমৎকার। খুব পপুলার বুঝি? মোটেই না। সাহিত্য নিয়ে আছেন অনেকদিন। কিন্তু শুনেছি, এর থেকে রোজগার হয় না বেশী। কেরানীগিরি করেন। আর কিছু বললে না। আমি কিন্তু বাছাধনের দুর্বলতার রন্ধ্রটুকু টের পেয়ে গেলাম। একটা কথা জানেন কি? প্রত্যেক ভালো লোকের সঙ্গে প্রত্যেক মন্দ লেকের একটা শত্রুতা থাকে? প্রত্যেক মন্দ লোকই প্রত্যেক ভালো লোককে ঘায়েল করতে পারলে ভারী খুশি হয়। এই থিয়োরি অনুসারে সুজন আমার শত্রু। তাকে আমি ভয় করি। কিন্তু তাকে ঘায়েল করবার প্রবৃত্তি আমার হয়নি, কারণ সে আমার ছেলে। একমাত্র ছেলে। বরং এটাও খুব আশ্চর্য ব্যাপার—তাকে আমি খোশামোদ করবার সুযোগ খুঁজতাম, কিন্তু পেতাম না। সত্যি বলছি আমি মনে মনে মিনতি-ভরা চোখে ভিক্ষা করতাম তার করুণা, তার কৃতজ্ঞতা। তার এই শয়তান বাপটাকে সে একটু ভালবাসুক,—হয়তো সে বাসতো— কিন্তু তার কোনও প্রমাণ পেতাম না আমি। এই প্রমাণের জন্য লোলুপ হয়ে উঠেছিলাম। তাই নিজেই চলে গেলাম একদিন যামিনী ঘোষালের খোঁজে, যে যামিনী ঘোষালকে সুজন ভক্তি করে। হ্যাঁ মশাই যা ভাবছেন তাই—ঈর্ষার তাড়নাতেই ছুটে গিয়েছিলাম। তারপরেই পা পিছলে আলুর দম।

গীটারের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। আমার অহংকারের বেলুনটা চুপসে গেল হঠাৎ। আমতা আমতা করে বললাম—"যামিনীবাবু বাড়িতে আছেন?"

বললে—"বাবা তো রাত দশটার আগে বাড়ি ফিরবেন না।"

"এত রাত পর্যন্ত আপিস?"

"আপিসের পর টিউশনি করেন দু জায়গায়—"

আরও চুপসে গেলাম।

তবু বললাম—"তিনি তো একজন বড় লেখক। লেখেন কখন?"

"রাত তিনটের সময় ওঠেন। বেলা ৭টা পর্যন্ত লেখেন।"

"কখন দেখা হবে তাঁর সঙ্গে?"

"রবিবার সকালে।"

তারপরই বললে—রবিবার সকালেও কোন কোন দিন বেরিয়ে যান। আমার কেমন যেন জেদ চেপে গেল একটা। আমি তখন লাখ লাখ টাকা রোজগার করছি। পাটের ব্যবসার সঙ্গে হীরে জহরতের ব্যবসা শুরু করেছি। এদেশ থেকে হীরে জহরত কিনে পাচার করছি বিদেশের বাজারে চোরা-পথ দিয়ে। শুরু করেছি লোহার ব্যবসা, শুরু করেছি মদের ব্যবসা, চিনির ব্যবসা, মেয়েমানুষের ব্যবসা, জগদম্বা মন্দির তৈরি করেছি মার্বেল দিয়ে। তখন আমার রক্ত টগবগ করছে, শির আশমানে ঠেকেছে, আমার সঙ্গে দেখা করতে পেলে কত লোক ধন্য হয়ে যায়, আর এই কেরানীটার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে আমাকে—নেপাল চাটুজোকে —পাঁচদিন অপেক্ষা করতে হবে? রোঁক চেপে গেল। বললাম—আচ্ছা আমি রাত দশটার সময়েই আসব।

গীটার একটু ইতস্তত করে বললে—"বাবা রাত দশটায় বড় ক্লান্ত হয়ে ফেরেন। তখন তাঁর সঙ্গে কেউ দেখা করুক এটা আমি চাই না। উনি এসেই খেয়ে শুয়ে পড়েন। ভোর তিনটেতেই আবার উঠতে হয় কিনা—আপনি আগামী রবিবারেই আসবেন, ওঁকে আমি বলে রাখব। আপনার নামটা কি—"

"আমার নাম নেপাল চাটুজ্যে। আমি আজই দেখা করব তাঁর সঙ্গে। দু'মিনিট কথা বলেই চলে যাব"

"বসুন তাহলে—"

বলেই চলে যাচ্ছিল। আমার কি মনে হল জানেন? ও যেন আমার মাথায় হাতুড়ি মারল। আপনারা ভদ্র ভাষায় বলবেন হয়তো—আমাকে অভিভূত করে ফেলল,—কিন্তু অভিভূত কথাটা দিয়ে—সেই নিদারুণ হকচকানো ভাবটা ফোটানো যায় না ঠিক। তাই হাতুড়ি বলছি, হাতুড়ি উপমাটাও অবশ্য ঠিক হচ্ছে না, কারণ ওই ছিপছিপে মৃদুভাষিণী মেয়েটির ভদ্র ব্যবহারকে হাতুড়ি বলা চমৎকার মিহিদানাকে করাতের গুঁড়ো বলার মতো হাস্যকর তা বুঝতে পারছি, তবু বলছি মনে হল আমার মাথায় যেন একটা হাতুড়ি মারলে কেউ। I was stunned.

বললাম—'শোন, আমি এখানে বসব না। আমি আমার মোটরে গিয়ে বসছি—"

"ও, ওই মোটরটা বুঝি আপনার?"

আমার প্রকাণ্ড ক্রাইসলার গাড়িটা যে পাড়ায় ঢুকত সেই পাড়াতেই নিঃশব্দ আলোড়ন

তুলত একটা। কিন্তু গীটার মনে হল এ বিষয়ে নির্বিকার। এতে আরও যেন চটে গেলাম আমি। নিঃশব্দে ভয়ানক চটে গেলাম। কিন্তু ভদ্রভাবে বললাম—"হ্যাঁ, আমারই।"

মোটরে গিয়েই বসলাম। একটু পরেই 'বম্'টা পড়ল। কয়েক মিনিট পরে একটা ডিসে করে দুটো সন্দেশ নিয়ে হাজির হল মেয়েটা। দুটো সাধারণ সন্দেশ, আর কাঁসার গ্লাসে জল।

"আমার খিদে পেয়েছে তুমি জানলে কি করে?"

গীটার ঘাড় হেঁট করে মুচকি হাসলে একটু।

"বাজারের সন্দেশ?"

"না। বাবা বাজারের সন্দেশ খান না"

"তোমরা কভাইবোন।"

"আমার দাদা আছে একটি। তিনি দিল্লীতে চাকরি করেন।"

"তুমি কি কর?"

"আমি এম-এ পাস করেছি।"

কথাগুলো এমনভাবে বলল যেন এম-এ পাস করাটা মস্ত অপরাধ একটা।

"পাস করে চাকরিটাকরি করছ না কি—"

"না—"

চুপচাপ বসে আছ বাড়িতে?'

প্রায় অস্ফুট কণ্ঠে সলজ্জভাবে বলল—"কবি ভারবী সম্বন্ধে একটা থীসিস লিখছি—"

'বম্' তখন বিধ্বস্ত করে ফেলেছে আমাকে। লক্ষপতি ব্যবসায়ী নেপাল চাটুজ্যে তখন finished. কিন্তু তবু হারবার পাত্র নয় সে। কারণ সে এককালে মহাপুরুষের শিষ্য ছিল তো।

বললাম—"ভারবী এককালে আমিও পড়েছিলাম। চল ঘরেই গিয়ে বসি তোমার ক্যাম্প চেয়ারে। তোমার বাবা যতক্ষণ না আসেন ততক্ষণ কবি ভারবীকে নিয়েই আলোচনা করা যাক—"

উঠে এসে ঘরের ভিতর ক্যাম্প চেয়ারে বসলাম।

"সন্দেশ দুটো আগে খেয়ে নিন।"

"সন্দেশ খেতেই হবে? না-ই বা খেলুম। সন্দেশ আমার তেমন ভালো লাগে না।"

"কেক খাবেন?"

"কেকও তুমি তৈরি করেছ না কি।"

আবার ঘাড় নীচু করে মৃদু হাসি।

"কেক তৈরি করা তো বেশ কঠিন। কি করে শিখলে?"

"বই দেখে। একটা বিলাতী রান্নার বই প্রাইজ পেয়েছিলাম। সেইটে দেখে দেখে শিখেছি। বাবা বলেন খুব ভালো হয়, কিন্তু আমি জানি ভালো হয় না খুব, আপনি সন্দেশ দুটোই খান—"

আবার সেই ঘাড় নীচু করে মৃদু হাসি। জুঁই ফুলের মতো হাসি।

আমি তখন কাৎ হয়ে গেছি। ঝানু ব্যবসাদার আমি, গণ্ডারচর্মবৎ আমার মন, কিন্তু সত্যিই কাৎ করে দিলে আমায় মেয়েটা। কাৎ হয়ে গেলেই আমি চটে যাই।

বললাম—"কেকও খাব, সন্দেশও খাব।"

খেয়ে দেখলাম দুটোই চমৎকার। সত্যিই চমৎকার, excellent. কিন্তু আমি পাজী নচ্ছার তো, চুপ করে রইলাম। একটি প্রশংসাবাক্য উচ্চারণ করলাম না। বসে রইলাম মুখ গোমড়া করে। তারপর বললাম—"বড্ড গরম। পিছনদিকের ওই জানলাটা খুলে দাও না, একটু হাওয়া আসুক—"

"পাশেই প্রকাণ্ড বাড়ি রয়েছে হাওয়া আসবে না। আমি হাওয়া করছি আপনাকে। সত্যি বড্ড গরম আজ—"

মেয়েটা একটা পাখা নিয়ে হাওয়া করতে লাগল আমাকে পিছন দিকে দাঁড়িয়ে। আমি তখন সম্পূর্ণ কাৎ। তাই ধমকের সুরে বললাম—"ভারবী নিয়ে আলোচনা করব বলে এসেছিলুম ভিতরে। তুমি পিছনে দাঁড়িয়ে থাকলে—"

গীটার চুপ করে রইল কয়েক মুহূর্ত। তারপর বললে—"বাবা বলেছেন থীসিস শেষ না হওয়া পর্যন্ত কাউকে দেখিও না। ওটা শেষ হলে আমি দেখব। যদি মনে হয় ভালো হয়েছে, তখন ইউনিভার্সিটিতে পাঠিয়ে দিও। আপনাকে কথাটা না বললেই পারতুম।"

দুর্দান্ত ভেড়া দেখেছেন কখনও? যার বাঁকানো শিং আর কোঁকড়ানো লোম দেখলে ভীতির সঞ্চার হয়, যে রেগে গেলে গুঁতিয়ে তছনছ করে দেয় সব? আমি মনে মনে তখন সেই ভেড়া হয়ে গেছি। আমার ক্রোধ তখন তুঙ্গী হয়ে জ্বলন্ত সূর্যের মতো জ্বলছে সেই ভেড়ার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে। কিন্তু কিছু করতে পারলাম না। মুখে মৃদু হাসি ফুটিয়ে বসে রইলাম। গীটার আমার পিছনে দাঁড়িয়ে হাওয়া করে যেতে লাগল। মিনিট দুই পরেই অদ্ভুত পরিবর্তন হল একটা। এ পরিবর্তন কে করে, কেমন করে করে তা জানি না। কিন্তু হল। সেই রুদ্র ভেড়াটা একটা গোবরগাদায় রূপান্তরিত হয়ে গেল। হ্যাঁ মশাই গোবর গাদায় এবং সবিস্ময়ে দেখলাম তার উপর একটা পদ্মফুল ফুটেছে। ব্যাপারটা অসম্ভব, কিন্তু দেখলাম ফুটেছে, স্বচক্ষে দেখলাম।

জিজ্ঞেস করলাম, "পাঁজি আছে তোমাদের বাড়িতে?"

"আছে।"

"নিয়ে এসো তো।"

নিয়ে এল পাঁজি। তারপর মুশকিল হল। বাংলা তারিখ মনে ছিল না। আমরা বাঙালী, কিন্তু ইংরেজী তারিখেই অভ্যস্ত।

"আজ বাংলা তারিখ কত জান?"

"আজ এগারই বৈশাখ—।"

পাঁজি দেখতে লাগলাম। দেখলাম পনেরই বৈশাখ বিয়ের দিন আছে একটা।

"পাঁজিটা রেখে দাও। আমি এখুনি ঘুরে আসছি—।"

তাড়াতাড়ি উঠে চলে গেলাম বাড়িতে। দেখলাম সুজন তখনও ফেরেনি। লকার থেকে দশটা গিনি বার করে ফিরে গেলাম আবার। ঘড়িতে তখন পৌনে দশটা। ঠিক দশটার সময়ই এলেন যামিনী ঘোষাল। প্রৌঢ় শীর্ণ-কান্তি ভদ্রলোক। খাঁড়ার মতো নাক। প্রশস্ত ললাট। স্বপ্নময় চোখ। আমি দাঁড়িয়ে উঠলাম চেয়ার থেকে। আমিই আগে নমস্কার করলুম, উনি দায়-সারা-গোছ একটু হাত তুলে সবিস্ময়ে চেয়েই রইলেন আমার দিকে।

গীটার বললে—"ইনি আপনার সঙ্গে দেখা করবেন বলে বসে আছেন অনেকক্ষণ থেকে।"

"কে আপনি, আপনাকে চিনতে পারছি না তো।"

"আমার নাম নেপাল চাটুজ্যে।"

ফ্যালফ্যাল করে চেয়েই রইলেন।

"মাপ করবেন, তবু চিনতে পারলাম না।"

আমি তখন যে জগতে বিচরণ করতাম সে জগতে আমি ছিলাম একজন দিকপাল। সব খবরের কাগজে বড় বড় অক্ষরে আমার বিজ্ঞাপন বেরুত, কিন্তু দেখলাম এ লোকটা আমার নামও শোনেনি। বেশ জোরেই হোঁচট খেলাম মনে মনে। কিন্তু মুখে হাসি ফুটিয়ে বললাম—'আমি বিখ্যাত সাহিত্যিক যামিনী ঘোষালের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।"

"দেখা করতে এসেছেন আমার সঙ্গে? কেউ তো আসে না। আপনি হঠাৎ এলেন কেন! আমি বিখ্যাতও নই, তবে সাহিত্য-চর্চা কবি একটু আধটু। আপনিও সাহিত্য-চর্চা করেন না কি?"

"আমি লেখক নই, পাঠক শুধু।"

"বসুন, আমি কাপড়জামা ছেড়ে আসি।"

"আমি বেশীক্ষণ আপনার সময় নেব না। শুনলাম আপনি খেয়ে শুয়ে পড়বেন এখুনি।"

কোনও উত্তর না দিয়ে ভিতরের দিকে চলে গেলেন। গীটার একটি মোড়া নিয়ে এল। মোড়াটি রেখেই ভিতরে চলে গেল সে আবার। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বেরিয়ে এলেন যামিনীবাবু। পরনে একটি সাদা লুঙ্গি, শুধু গা। গলায় শুভ্র উপবীত।

"এ সময় তো সাহিত্য-আলোচনা জমবে না। সত্যিই বড় ক্লান্ত এখন। আগামী রবিবার সকালে আসুন না—"

"রবিবার দিন আমারও আসবার ইচ্ছে। কিন্তু একটু অন্যভাবে আসতে চাই।"

"অন্যভাবে—মানে?"

"তাহলে ব্যাপারটা খুলেই বলি। আমার ছেলের সঙ্গে আপনার মেয়েটির বিয়ে দিতে চাই। আগামী রবিবারেই দিন আছে একটা—"

"সে কি। বিয়ে কি এত তাড়াহুড়ো করে হয়। আমার মেয়ে বড় হয়েছে, লেখাপড়া শিখেছে, তার মত নিতে হবে। আপনার ছেলে কি করেন—"

"এখন কিছু করছে না। তিনটে সাব্জেক্টে এম. এ. পাস করেছে পি. এইচ. ডি. হয়েছে—"

"নাম কি বলুন তো।"

"সুজন—"

"ও সুজন চট্টোপাধ্যায়ের বাবা আপনি। সুজন তো বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বল রত্ন একটি—"

ঈর্ষায় ঘায়েল হয়ে পড়লাম আবার। আমার নাম শোনেনি, আমার ছেলের নাম শুনেছে। রাসকেল কোথাকার! কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার সঙ্গে সঙ্গে আর একটা জিনিসও হচ্ছিল— আমি সাঁতার কাটছিলাম। কোথায় জানেন? আনন্দের সাগরে। আর আমার সঙ্গে সাঁতার কাটছিল

জগদম্বা, যে জগদম্বা অনেকদিন আগে মরে গেছে। তাকে দেখতে পাচ্ছিলাম না, কিন্তু অনুভব করছিলাম সে-ও আমার পাশে পাশে সাঁতার কাটছে। ছলাৎ ছলাৎ শব্দ হচ্ছে।

"সুজনের হাতে আমার মেয়েকে দিতে পারলে আমি কৃতার্থ হব। কিন্তু—"

খানিকক্ষণ মাথা হেঁট করে বসে রইল লোকটা। দেখলাম মাথার মাঝখানে একটু টাক আছে।

তারপর মাথা তুলে বললেন—"দেখুন, সব কথা স্পষ্ট করেই বলছি। আপনি যদি সাধারণ মধ্যবিত্ত গৃহস্থ হতেন তাহলে আমার ভয় হত না। ওই মোটরটা কি আপনার?"

"হ্যাঁ আমারই—"

"তাই একটু ভয় হচ্ছে। ধনী লোকদের আমি ভয় করি মশাই তবে সুজনের নাম শুনে লোভ হচ্ছে। বড় ভালো ছেলে—"

"ওর সঙ্গে আপনার আলাপ আছে?"

"না। ওর লেখা কয়েকটি ইংরেজী বাংলা প্রবন্ধ পড়েছি কেবল। প্রবন্ধ পড়েই ওর উপর শ্রদ্ধা হয়েছে আমার—"

আমি মনে মনে বললাম রতনে রতন চিনেছে। মুখে কিন্তু কিছু বলতে পারলাম না, এক অদৃশ্য সার্জন যেন পটপট করে আমার ঠোঁট দুটো সেলাই করে দিয়ে গেল। কানে কানে বলে গেল—তুমি পাপী, তুমি পাজী, টুঁ শব্দটি কোরো না। বিবেক আমাকে শাসাচ্ছে না কি? আমাকে! নেপাল চাটুজ্যেকে! সঙ্গে সঙ্গে খুলে গেল মুখের সেলাই।

বললাম—'ধনী লোককে ভয় করেন? কি অপরাধ করেছে তারা?"

"অপরাধ করেনি। কিন্তু আমার মনে হয় তারা মাতালের মতো। মাতালকেও বড্ড ভয় করে আমার—"

বলেই অপ্রত্যাশিতভাবে হো হো করে হেসে উঠলেন ভদ্রলোক। তারপর বললেন—"ওটা হয়তো আমাব অ্যালার্জি। অনেক ভদ্রলোক ধনী আছেন তা আমি জানি। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশের সমস্ত উন্নতির মূলে বাংলাদেশের ধনীরা ছিলেন একথাও অস্বীকার করবার উপায় নেই। কিন্তু ওই যে বললুম—ওটা আমার অ্যালার্জি। যাক ওসব কথা। আমার মেয়েকে আপনার পুত্রবধূ করবার হঠাৎ ইচ্ছে হল কেন—"

"হঠাৎই বলতে পারেন। আপনার সঙ্গে আলাপ করতে এসে আবিষ্কার করলাম আপনার মেয়েকে। কলম্বসের আমেরিকা আবিষ্কারের মতো বলতে পারেন অনেকটা। কিন্তু না, আমেরিকা আবিষ্কার করিনি। আবিষ্কার করেছি, বাংলাদেশকে যে বাংলাদেশ হারিয়ে গেছে। যে বাংলাদেশ একদা মূর্ত ছিল আমার স্ত্রীর মধ্যে। সে স্ত্রী মারা গেছেন। তারপর থেকে তাকে খুঁজেছি অনেক বনেবাদাড়ে অনেক কাদায় নর্দমায়, কিন্তু পাইনি, সেই বাংলাদেশ হঠাৎ যেন দেখা দিল আপনার ওই ছিপছিপে শ্যামলা মেয়েটির মধ্যে আজ—আমি আপনার মতো সাহিত্যিক নই। সব কথা গুছিয়ে বলতে পারছি না। যদি আপত্তি না করেন এই সামনের রবিবারেই তাহলে—"

"না, না অত তাড়াতাড়ি হয় কি এসব? আগে আমার মেয়ের মত নিই। সে যদি মত দেয়, তা হলেও সবুর করতে হবে আরও কয়েকটা দিন, আমার মাইনেটা না পাওয়া পর্যন্ত—"

"মাইনের সঙ্গে এর সম্পর্ক কি—"

"আমি স্ত্রীবিয়োগের পর থেকে ইকমিক কুকারে রেঁধে খাই। ইকমিকটা ভেঙে গেছে। আমার মেয়েই আমায় রেঁধে দিচ্ছে ক'দিন থেকে। উনুনে আমি রাঁধতে পারি না, ইকমিক কুকারটা না কিনে আনা পর্যন্ত মেয়েকে হাতছাড়া করতে পারব না—"

আবার খুব জোরে হেসে উঠলেন যামিনী ঘোষাল। তারপর একটু গম্ভীর হয়ে বললেন—"আমাদের দু'জনের মধ্যে একটা মিল দেখতে পাচ্ছি। দুজনেই বিপত্নীক। আমার স্ত্রী মারা গেছেন অনেকদিন আগে। তখন আমার ছেলেমেয়ে খুব ছোট। মেয়েটি তিন বছরের, ছেলেটি সাত। তখন থেকে আমিই ওদের রান্না করে খাওয়াচ্ছি। পড়াচ্ছিও। আমিই ওদের কুক এবং প্রাইভেট টিউটার। এখনও আমিই রাঁধি। আজকাল মেয়েটা একটু আধটু সাহায্য করে। বই দেখে নানা রকম শৌখিন রান্না শিখেছে। ইকমিকটা ভেঙে গেছে পরশু, ওটা কিনে ফেলি—"

"আপনার ছেলে কোথায়—"

"আই. এ. এস. হয়েছে সম্প্রতি। বারবার চিঠি লিখছে আমার কাছে চলে আসুন। কিন্তু আমি যাব না। আমি ইকমিকেই চালিয়ে দেব বাকি জীবনটা"—অদ্ভুত হাসি হাসলেন একটা।

বললাম—"আমি আপনাকে যতটা বুঝতে পেরেছি তার থেকে আন্দাজ করছি আমি যদি এখুনি আপনাকে একটা ইকমিক কুকার কিনে দি, আপনি নেবেন না—"

"নেব না কেন, কিন্তু ওর দামটা নিতে হবে। সেটা আমি মাইনে না পেলে দিতে পারব না। কিন্তু আপনি অত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন—"

"হচ্ছি, কারণ ওইটে আমার স্বভাব। আমি একটু ব্যস্তবাগীশ লোক। আমি ব্যবসাদার, অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করে চলাই আমার উচিত, কিন্তু পারি না। আমার সহজ বুদ্ধি, ইংরেজিতে যাকে আপনারা ইনস্টিংক্ট (instinct) বলেন, যা বলে তাই আমি শুনি। এবং কালবিলম্ব না করে শুনি—!"

"আচ্ছা, তাহলে আমার মেয়েকে জিজ্ঞেস করি। আপনিও ছেলেকে জিজ্ঞেস করবেন নিশ্চয়—"

"জিজ্ঞেস করব না। খালি বলব একজায়গায় তোমার বিয়ের ঠিক করেছি, আগামী রবিবার বিয়ে। আমি জানি আমার ছেলে আপত্তি করবে না। যেসব ছেলেরা বিয়ের সময় নিজেদের মতামত আস্ফালন করে সুজন সে ধরনের ছেলে নয়—"

কিন্তু আমি এ কি করছি। অতীতের ইতিহাস চর্বিত-চর্বণ করছি কেন। ওফ্—কি লজ্জা—বুঝেছি—বুঝেছি—কেন করছি। খোশামোদ করছি সুজনকে আর গীটারকে। আমি যা লিখি তারা তো সব নিয়ে যায়, পড়ে নিশ্চয়—আমি যদি তাদের আমড়াগাছি করি তাহলে—হ্যাঁ হ্যাঁ আমার মনের অবচেতনলোকে ওই মিথ্যে আশাটা আমার উপর ভর করেছিল। তাদের যদি প্রশংসা করি তাহলে তারা গদগদ হয়ে আমাকে ছেড়ে দেবে। হাত ফাটিয়ে হাসতে ইচ্ছে করছে। ওরে জরদগব, কি করে তুই ভাবলি এটা? খোশামোদে বিগলিত হয়ে ছেড়ে দেবে? তা কি দেয় কখনও? সাজাহান কি আরাংজেবকে কম খোশামোদ করেছিল? চার্লস্ দি ফার্স্ট কি কম তেল দিয়েছিল ক্রমওয়েলকে? মহম্মদী বেগ, আমার মা আমার ঠাকুমার স্নেহে লালিত হয়েছিলে তুমি, সেই কথা স্মরণ কর, আমায় হত্যা কোরো না—সিরাজের এই অনুনয়

অতীতের অন্ধকারে এখনও ঘুরে বেড়াচ্ছে আর ইতিহাসের পাতায় এই সত্যটাও লেখা আছে যে মহম্মদী বেগ তরোয়াল দিয়ে কুপিয়ে কুপিয়ে কেটেছিল সিরাজকে। না, খোশামোদ ওদের বাঁচাতে পারেনি। আমাকেও পারবে না। আমাকেও মরতে হবে। ওরা কাল-সাপ, ওদের অনেক দুধকলা খাইয়েছি, তবু ওরা আমাকে কামড়াবে শেষ পর্যন্ত। ফণা তুলে তুলে সুযোগ খুঁজছে খালি। আর সে সুযোগ ওরা পাবে। কেন জানেন? আমি পাপী যে। মহাপাপী। আমরা নিজেদের মৃত্যুবাণ নিজে তৈরি করে অপরের হাতে তুলে দিই। ভালো করে ইতিহাস পড়ে দেখুন বুঝতে পারবেন। সাজাহান, আরাংজেব, সিরাজ, ফ্রান্সের সেই হৃদয়হীন আধ-বোকা রাজা লুই, আর তার আদুরে রাণী—মেরি আন্‌টোনিয়েট, (উচ্চারণটা ঠিক হল ত?), রাশিয়ার জার, সব মহাপাপী ছিল। তাদের যারা খুন করেছিল সেই জেকোবিনের দলও কি নিষ্পাপ ছিল? ছিল না। তাই রোব্‌স্‌পেয়ার, ড্যানট্যান, ম্যারাট কেউ বাঁচেনি শেষ পর্যন্ত, সবাইকে প্রাণ দিতে হয়েছিল গিলোটিনের তলায়। কিন্তু লিয়াকৎ—সে দারোগাটা—ওরা মরেছে কি? এই দেখুন, ধাঁধায় পড়ে গেলাম। আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বলছে ওরা মরেছে, কিন্তু ওরা তো পাপী ছিল না, ওদের তো মরবার কথা নয়। ভুশণ্ডি কাক কোথা থেকে উড়ে এসে কা কা করে জবাব দিয়ে বসল—'কার কটা পাপের খবর রাখো তুমি? সব পাপী। সবাই মরবে।' একটা নড়বড়ে বিরাট ছাতার মতো চেহারা ভুশণ্ডির। টেলিগ্রাফের থামের উপর বসে খ্যাঁক খ্যাঁক করে হাসতে লাগল। ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করলাম—"তা হলে পুণ্যবান কেউ নেই না কি পৃথিবীতে?"

"না নেই। পাপ পুণ্যের ছাপ তোমরাই তৈরি করেছ। মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বুঝিয়েছিলেন—আত্মীয়-নিধন পাপ নয়। গীতা সৃষ্টি হবার আগে আত্মীয়-নিধন পাপ ছিল। তোমরা নিজেদের সুবিধা মতন পাপপুণ্যের আইন বদলাও। আজকালকার কথাই ধর না। কিছুদিন আগে পর্যন্ত গর্ভপাত বে-আইনি ছিল, এইবার সেটা আইনসঙ্গত হল। আগে ভ্রূণহত্যা মহাপাপ বলে গণ্য হত, এখন হবে না। একটি সারকথা জেনে রেখো। যারা জন্মগ্রহণ করে তারাই পাপী। যতদিন বেঁচে থাকে কষ্ট পায়, তারপর অক্কা পেয়ে যায় যখন মহাকালের মুষল পড়ে মাথার উপর। খ্যাঁক খ্যাক্ খ্যাক্—"

উড়ে গেল ভুশণ্ডি।

এ আর নতুন কথা কি বললে ও। এসব তত্ত্বকথা তো অনেক আগেই শুনেছি। তাছাড়া ওই ভুশণ্ডি হঠাৎ এলোই বা কেন। ওর সঙ্গে আগে তো কখনও দেখা হয়নি. ওর কথা ভাবিওনি কোনদিন। বিজ্ঞানীরা মাথা নেড়ে মুচকি হেসে বলবেন ওসব অবচেতনলোকের রহস্য। বাস্ আর কিছু বলবার উপায় নেই। বেদে যখন আছে তখন মানতেই হবে। কিন্তু—ওহ-হো, মনে পড়েছে, আসল নামটা ভুলে গেছি কিন্তু, ওর নাম দিয়েছিলাম ছ্যাঁচড়া চচ্চড়ি। নানাবেশে দেখা দিত। কখনও মুসলমানী চেকচেক লুঙ্গির উপর খদ্দরের ছেঁড়া পাঞ্জাবি, কখনও ছেঁড়া হাফশার্ট হাফপ্যান্ট, কখনও আড়ময়লা ছেঁড়া ধুতির উপর তালিমারা গলাবদ্ধ কোট—সর্বদা ছেঁড়া জিনিস পরে আসত, আজ এক ছেঁড়া ছাতার বেশ ধরে হাজির হয়েছে বলে চিনতে পারিনি। পয়সার লোভে যারা আমার চারপাশে থেকে আমার খোশামোদ করত, আমি জল উঁচু বললেই যারা বলত, শুধু উঁচু নয়, অনেক উঁচু, তাদেরই দলের লোক ছ্যাঁচড়া,

কিন্তু তাদের জাতের নয়। ছ্যাঁচড়া আমার কথার প্রতিধ্বনি করত না, প্রতিবাদ করত। জল তরল বললে, সঙ্গে সঙ্গে বলত, মনে রেখো বরফও জল। হিমালয় গগনচুম্বী বললে মেনে নিত কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে করিয়ে দিত হিমালয় একদিন সাগরের তলায় ছিল, ভূমিকম্পের গুঁতোয় গগনচুম্বী হয়েছে। তার এই প্রতিবাদ-ধর্মী খোশামোদ যে আমার ভালো লাগত তা বুঝতে বিলম্ব হয়নি তার। এ ধরনের আবোলতাবোল বলে অনেক বখশিস নিয়ে গেছে সে আমার কাছ থেকে। ওহো এইবার মনে পড়েছে, অনেকদিন আগে একটা কালো 'রেনকোট' দিয়েছিলাম ওকে। সেইটে গায়ে দিয়েই এসেছিল না কি। যাক্ গে—যাক্ গে—কিন্তু না, যাক্ গে বলে পাশ কাটিয়ে গেলে চলবে না। আমি নেপাল চাটুজ্যে আমি এ ধরনের বাজে ভাবনা ভাবছি কেন। বাজে শাক দিয়ে কোন মাছ ঢাকতে চাইছি, কার সঙ্গে মুখোমুখি হবার ভয়ে আমি এ কোণ ও কোণ করছি? নেপাল চাটুজ্যে, দি মিলিয়নেয়ার, জবাব দাও এ কথার। যদিও সামনে কোন জজসাহেব নেই, যদিও কোন উকিল তোমাকে জেরা করছে না, তবু তোমাকে জবাব দিতে হবে। নির্ভয়ে জবাব দাও। এখানে তুমিই আসামী, তুমিই ফরিয়াদী, তুমিই সাক্ষী, তুমিই বিচারক। একমেবাদ্বিতীয়ম্ তুমি। জবাব দাও। উৎকর্ণ হয়ে আছি মনে মনে। ইলেকট্রিক শক দেওয়ার পর আমার সারা দেহে মনে প্রচণ্ড ভূমিকম্প হয়ে গেছে একটা। অনেক জিনিস চাপা পড়েছে। ডেব্রির তলা থেকে অনেকের চিৎকার শোনা যাচ্ছে.....গভীর রাত্রে নির্জনে একা একা ঘুরে বেড়াচ্ছি—আর চিৎকার শুনতে পাচ্ছি—সবাই বলছে বাঁচাও বাঁচাও আমাকে বাঁচাও। কিন্তু একটি চিৎকার অন্য কথা বলছে শুধু। সে বলছে—নিপু, নিপু, নিপু, তুমি কোথায়? আমি ওই আকুল ডাকটা না শোনার ভান করছি, নানা বাজে ভাবনার ঝামেলা জুটিয়ে কালা সাজবার চেষ্টা করছি। আমি ও ডাকে সাড়া দিতে পারব না, ওঁকে ওই ডেব্রির তলা থেকে তুলব না, ওঁর মুখোমুখি দাঁড়াবার সাহস নেই আমার। ওই ডাকটাও যদি না শুনতে পেতুম—মহাপুরুষ, মহাপুরুষ দয়া কর, আমাকে আর খুঁজো না তুমি, আর ডেকো না, আমি সাড়া দিতে পারব না, আমি হারিয়ে গেছি, তলিয়ে গেছি, মরে গেছি, পচে গেছি, সম্পূর্ণ বিস্মৃতির মধ্যে গলে গলে শেষ হয়ে যেতে দাও আমাকে। তুমিও ডেব্রির তলা থেকে বেরিও না। নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই বলছি—এ দেশ ভয়ঙ্কর দেশ হয়ে উঠেছে। সবাই চোর। সবাই মতলববাজ। জীবনের সর্বস্তরে পোকা কিল-বিল করছে। অসাধু শিক্ষক, অসাধু চিকিৎসক, অসাধু পুলিস, অসাধু শাসনকর্তা, অসাধু ব্যবসাদার, অসাধু মনিব, অসাধু ভৃত্য। আমাদের দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তার মানে দেবতা তৈরি করেছি আমরা, কিন্তু সোনা-রূপো-তামা দিয়ে নয়, মাটি দিয়েও নয়, বিষ্ঠা দিয়ে, তাই দেবতার গা থেকেও দুর্গন্ধ বেরুচ্ছে। বিকট দুর্গন্ধ। মহাপুরুষ তুমি এখানে এসো না, এলেও টিকতে পারবে না, দমবন্ধ হয়ে মরে যাবে, পাগল হয়ে যাবে, না হয় আত্মহত্যা করবে। আমাকে তুমি ভালো করতে চেষ্টা করেছিলে—পারলে? তুমি যখন দুপুরে বিশ্রাম করতে তখন তোমারই লাইব্রেরী ঘরে বসে বিদেশী উপন্যাস পড়ে প্রেম করতাম আমি। না, না, প্রেম করতাম না, গুষ্টির পিণ্ডি চটকাতাম, আর গব গব করে গিলতাম সেই পিণ্ডি, মনে করতাম খুব বাহাদুরি করছি। কিন্তু সে বাহাদুরি তালপাতার সেপাইয়ের বাহাদুরি, তুমি যেই এসে দাঁড়ালে অমনি ছুটে পালাতে হল আমাকে। বাঁই বাঁই করে ভব্যতার পগার পেরিয়ে হয়ে গেলাম কালোবাজারের খোক্কস্। এ রাক্ষস খোক্কসের দেশ,

মহাপুরুষ, ছ্যাঁচড়া ছুঁচোর দেশ, তুমি এ দেশে বেমানান।

অল—ঝাড়ু—

ক্রি—টিনা—

কাগীজ, কাগীজ কাগীজ—

ব্যাস্‌ সব খেই হারিয়ে গেল। কি বলছিলাম? নেভার মাইণ্ড। কিন্তু যে খেইটা এখনও হারায়নি সেইটের কথা বলে ফেলি। যাঁরা ভাবছেন আমি অনুতাপ করছি তাঁরা ভুল ভাবছেন। ভিখারীর ছেলে নেপাল লক্ষ লক্ষ টাকার মালিক হয়েছে লক্ষ লক্ষ লোকের সেলাম কুড়িয়েছে, তার কদর্য দেহটাকে ঘিরে মেয়েমানুষের গাঁদি লেগে গেছে, ভিড় জমে গেছে পয়সা-প্রত্যাশী জ্ঞানী-গুণী সাহিত্যিক-শিল্পীদের—এতে অনুতাপের কি আছে? গরম দেশে জন্মেছি রং তাই কালো হয়েছে। পঙ্কিল পরিবেশের দুর্বার স্রোতে উজান বেয়ে তীরে উঠেছি বলেই সর্বাঙ্গে ময়লা লেগেছে। কিন্তু আমি যে কৃতী, আমি যে বীর, আমি যে জয়ী একথা সবাই স্বীকার করেছেন একবাক্যে। স্বীকার করেনি কেবল জগদম্বা। ওই যে দূরে দাঁড়িয়ে মুচকি হেসে চেয়ে আছে আমার দিকে, মনে মনে যা বলছে তাও শুনতে পাচ্ছি—অমন দাপাদাপি করছ কেন, তোমার ছেলে হয়েছে, অমন লক্ষ্মী বউ। না, ওর কাছে আমি কল্‌কে পাইনি। সুজন আর গীটারের কাছেও পাইনি। বাইরে ওরা ভারী ভদ্র, ভারী কেতাদুরস্ত, কিন্তু আমার মনে হয় ওরা গোপনে গোপনে আমাকে জরিপ করছে, মাপছে, আঁকছে, অঙ্ক কষছে। আমাকে বন্দী করে রেখেছে অথচ বলছে করিনি। ডাক্তার ডেকে ইলেকট্রিক শক দিচ্ছে, বলছে আমার ভালোর জন্যেই করতে হচ্ছে। আমার ভালো আমি বুঝি না, ওরা বোঝে। আমার কি ইচ্ছে করে জানেন? ইচ্ছে করে সব ভেঙে চুরমার করে দিয়ে ছুটে বেরিয়ে যাই কোথাও। কিন্তু কি চুরমার করব? শূন্যতাকে চুরমার করা যায় না। ওই নোনা-লাগা দেওয়ালগুলো ধরতে গেলেই সরে সরে দূরে চলে যায়। একটু অন্যমনস্ক হলেই আবার এগিয়ে আসে, মনে হয় হুমড়ি খেয়ে পড়েছে আমার উপর। দম বন্ধ হয়ে আসে।

ক্লা—ক্লা—

কলা ফেরি করছে। আশ্চর্য কথা মনে হল একটা। চৌষট্টি কলার মধ্যে আসল কলার স্থান নেই। কিন্তু—যাক্‌ গে—।

ও—মাই—গড্‌।

টিউ—টিউ—টিউ—

হলদে পাখিটা এসেছে আবার। বার বার আসছে কেন? কি যেন বলতে চায় আমাকে। কিসের ইঙ্গিত যেন বার বার দিয়ে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে যে সোনার আরাধনা করেছি সারাজীবন, সেই সোনারই যেন প্রতীক ও। মনে পড়ে গেল জন রাসকিনের লেখা সেই The King of the Golden River গল্পটা। তাতেও অফুরন্ত ঐশ্বর্যের উৎস স্বর্ণ-স্রোতস্বতীর রাজা দেখা দিয়েছিল গ্লাক্‌কে (Gluck)। কিন্তু আমি তো গ্লাকের মতো ভালো নই। হলদে পাখির স্বরূপ দেখতে পাব কি? আলবৎ পাব। আমি পাপী বলে কি ভালো থিয়েটার দেখিনি? হরিচরণ, ড্রপ তোল—ওয়ান, টু, থ্রি,—হুইসেল দাও—ড্রপ তোল। থিয়েটার হোক। শিশির ভাদুড়ী এসে পার্ট করুক। বলুক—তুমি সীতা নও, তুমি নীল আকাশের বুকে স্বর্ণকিরণ, তুমি পাহাড়ের বুকে

রোদের ঝরনা, তুমি ঘন শ্যামল অরণ্যে উড়ন্ত হলদে পাখির শোভা, তুমি সীতা নও, তুমি সীতার স্বপ্ন। সোনার স্বপ্ন হয়ে ফিরে এসেছ তুমি। সোনার হরিণ দেখে লোভ হয়েছিল তোমার, এখন তুমি নিজেই সোনা হয়ে গেছ। পাতালে প্রবেশ করে সোনার খনি হয়ে গেছ তুমি। সে খনির ভিতর থেকে নানারূপে দেখা দিচ্ছ আমাকে। আমি আর তোমাকে অগ্নিপরীক্ষার অপমানের মধ্যে নিয়ে যেতে পারব না, তুমি চিরকাল আমার নাগালের বাইরে দেখা দেবে, উদ্ভাসিত হবে, প্রদীপ্ত হবে, উড়বে কিন্তু আমি তোমাকে ধরতে পারব না। তোমাকে বনবাসে পাঠিয়েছিলাম তার শাস্তি আমাকে পেতে হবে বৈ কি।... এ কি হল। হরিচরণ আলোটা কমে আসছে কেন, শিশিব ভাদুড়ীকে দেখতে পাচ্ছি না আমি—হরিচরণ, হরিচরণ মোর লাইট্ মোর লাইট্—।

গীটার কখন নিঃশব্দ চরণে এসে দাঁড়িয়েছে বুঝতে পারিনি। ভয়ে কাঠ হয়ে গেলাম মনে মনে। জানি চেঁচামেচি করার জন্য ও বকবে না—কখনও বকে না—নীরবে দাঁড়িয়ে থাকে কেবল। কিন্তু ওর নীরব বকুনি আমি শুনতে পাই, বুঝতে পারি। সুতরাং ওর দিকে না চেয়েই জবাব দিলাম—থিয়েটার করছি তাতে ক্ষতিটা কি হয়েছে। আর মেটোর-লিংক যদি ব্লু বার্ড নিয়ে নাটক করতে পারে, তাহলে আমিই বা হলদে পাখি নিয়ে করব না কেন। হঠাৎ আমাকে মানা করতে আসবার মানে? কোন জবাব এলো না। ঘাড় ফিরিয়ে দেখি কেউ নেই। গীটার তাহলে আসেনি? আশ্চর্য কাণ্ড! নোনা-ধরা দেওয়ালগুলো এগিয়ে আসছে আবার। দেয়ালগুলোর ফাঁকে ফাঁকে চেনা হাসি ভেসে বেড়াচ্ছে কতকগুলো। জাফরাণী, পয়লা, রংকী, রেহন বাই, আর ভেসে বেড়াচ্ছে অনেক চেনা কান্নাও—মায়ের হাতে মার খেয়ে সেই যে ছেলেটা রাস্তায় বসে কাঁদত, সেই যে ভিখিরীটা রোজ গেটের ধারে এসে বুকফাটা আর্তনাদ করত, যে রমেশকে জেল খাটিয়েছিলাম তার মা আমার পায়ে ধরে কেঁদেছিল, এদের কান্নার সঙ্গে এসে মিশছে সেই আকাশ-ছোঁয়া বড়লোক ও. সি. গোহোর স্ত্রী সুরমার চাপা কান্না—হঠাৎ এ কি কাণ্ড। জগদম্বা এসে হাজিব হল ঝাড়ু হাতে। সব হাসি সব কান্নাকে ঝেঁটিয়ে সাফ করে ফিরে দাঁড়াল আমার দিকে চেয়ে। মনে হল যেন বলছে—এ সব কি করছ তুমি। আমাকে তো সারাজীবন জ্বালিয়েছ, এদেরও জ্বালাবে? দুনিয়ার আঁস্তাকুড় থেকে টাকা কুড়িয়ে এনে এক পেল্লায় বাড়ি বানিয়ে তার নাম দিয়েছ জগদম্বা-মন্দির। বাড়ি নিয়ে কি আমি ধুয়ে খাব? আঁস্তাকুড়ের টাকাতে কি মন্দির হয়? মন্দির—! যত সব ঢং। মন্দিরে দেবতারা থাকে, আমি কি দেবতা? গরীব গেরস্ত ঘরের বউ আমি, তোমার মতো স্বামীকে নিয়ে ঘর করতে হয়েছে, কত অনাচার করেছি, কত মিথ্যে কথা বলেছি, কত তঞ্চকতা করেছি, কত জিনিস লুকিয়েছি, আমাকে দেবতা বানিয়ে দিলেই হল। বাড়ির নাম বদলে দাও। মিথ্যে বেশীদিন টিকবে না।

নির্বিকার হয়ে শুনে যাচ্ছি সব। মনে হচ্ছে আমি যেন পোস্টবক্স! কত চিঠি আসছে, কত চিঠি যাচ্ছে। কিংবা আমি যেন একটা 'হল'। কে যেন দেওয়ালে ছবি টাঙিয়ে দিচ্ছে আবার সরিয়ে নিচ্ছে। কিংবা আমি যেন টেলিফোনের রিসিভার, কত রকম লোকের কণ্ঠস্বর আমার ভিতর দিয়ে আসছে যাচ্ছে। কিংবা আমি হয়তো একটা—হ্যাঁ হ্যাঁ—এইটেই ঠিক—আমি যেন একটা আগ্নেয়গিরি, আমার চুড়োটা ফেটে গেছে, গলগল করে বেরুচ্ছে লাভা-স্রোত। চারিদিক ধ্বংস করে দিচ্ছে—ভিসুবিয়াস, না, এট্না— কি আমি?

চমকে উঠলাম হঠাৎ।

'কেমন আছেন—'

সামনে দেখি গুঁপো ডাক্তারটা বসে আছে। কখন এসে সামনের চেয়ারে বসেছে কিছুই জানতে পারিনি। দেখুলম বেশ সপ্রতিভভাবে হাসি-হাসি মুখে চেয়ে আছে আমার দিকে। মূর্খটা বুঝতে পাবছে না যে সে বসে আছে একটা আগ্নেয়গিরির সম্মুখে।

'কেমন আছেন আপনি?'

সঙ্গে সঙ্গে একটা ঘুঁষি ঝেড়ে দিলাম তার গোঁপের উপর।

সাতদিন পরে আজ মুক্তি পেয়েছি। এ ক'দিন স্ট্রেট জ্যাকেটে বন্দী ছিলাম। চিৎকারও কবতে দেয়নি। ইনজেকশন দিয়ে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। আজ ছাড়া পেযেছি। কাগজ কলমও পেয়েছি। লিখতেও বসেছি। কিন্তু বাঁ গালের মাঝখানটা জ্বালা করছে। মনে হচ্ছে কে যেন লঙ্কাবাটা লাগিয়ে দিয়েছে। বড় দুর্বল হয়ে গিয়েছিলাম। উঠতে পাচ্ছিলাম না বিছানা থেকে। গীটার আর সুজন আমাকে ধরাধবি করে বসিয়ে দিলে। সেই সময় দু ফোঁটা জল পড়েছিল আমার গালের উপর। সেই জন্যেই কি জ্বালা করছে? চোখের জলে কি জ্বালা করে? গীটারের চোখে জল টলমল করছিল আমি দেখেছি; হ্যাঁ, গীটারের চোখে, সুজনের চোখে নয়। সুজন ঠোঁটের উপর ঠোঁট চেপে ছিল। ওটা কি কান্না সামলাবার চেষ্টা? না, না, সুজন গীটারের মতো ছিঁচকাঁদুনে নয়— অজ্ঞান অসমর্থ অপরিচিত একটা লোককে যদি রাস্তা থেকে তুলতে হত তাহলেও ওর ওই মুখভাব হত— he is a man of principle—he is not a sentimental fool, ও সংযত শিক্ষিত সচ্চরিত্র লোক, আমি অসংযত দুশ্চরিত্র, আমি সেন্টিমেন্টাল, কথায় কথায় কেঁদে ফেলি, টপ করে রেগে যাই, ধাঁ করে বুকে জড়িয়ে ধরি, আমার হাত চলে, পা চলে, মুখও চলে, হ্রস্বদীর্ঘ লঘুগুরু জ্ঞান থাকে না চটে গেলে। আমরা দুজনে দু'ক্যাম্পের লোক, অপোজিট্ ক্যাম্প, ও ভালো আমি মন্দ, I hate him। কিন্তু তবু আমি আশা করি কেন— না, না আশা করি না, ভুল বলছি, আশা করবার কোন সঙ্গত কারণ নেই—আমি ঠিকই দেখেছিলাম সুজনের চোখে জল ছিল না, ঠোঁটে ঠোঁট চেপে ছিল সে—জল ছিল গীটারের চোখে। কিন্তু গালটা জ্বালা করছে কেন? এটা কি গীটারের অনুশোচনার অশ্রু তাহলে? আমার পুত্রবধূ হয়েছে বলে ও কি কষ্ট পাচ্ছে মনে মনে? তাই কি ওর চোখের জল অ্যাসিডের মতো হয়ে গেছে? জ্বালা করছে, বেশ জ্বালা করছে গালটা। করুক। এটা আমার ন্যায্য পাওনা। যে কথাটা লিখব বলে বসেছি সেইটেরই খেই হারিয়ে গেল মাঝ থেকে। ও হ্যাঁ, হ্যাঁ মনে পড়েছে। আশ্চর্য ঘটনা সেটা। আমাকে যখন ওরা বেঁধে রেখেছিল তখন আমি ঢুকে পড়েছিলাম আগ্নেয়গিরিটার মধ্যে। আশ্চর্য নয়? আমিই ঢুকেছিলাম আমি রূপ আগ্নেয়গিরির ভিতর? আত্মোপলব্ধি? কিন্তু আত্মার কোনও পাত্তা তো পেলাম না সেখানে। দেখলাম বিরাট একটা সমুদ্র টগবগ করে ফুটছে। মনে হল—এ আমার অন্তর-সমুদ্র, আর আমিই সেটা দূর থেকে দাঁড়িয়ে দেখছি। হ্যাঁ ফুটছে—টগবগ করে ফুটছে। কোথাও পাঁক ফুটছে, কোথাও পুঁজরক্ত ফুটছে—কোথাও অশ্রুজল ফুটছে, কোথাও কালো রং, কোথাও লাল, কোথাও হতাশার ফ্যাকাশে রং, কোথাও আশার শিখা, কোথাও অনিশ্চয়তার ধোঁয়া। কোথাও

নর্দমার মতো ভট্‌ভট্‌ করছে, কোথাও তা উত্তাল হয়ে আকাশ ছুঁতে চাইছে। আর আমি নিজেই দূরে দাঁড়িয়ে দেখছি এসব। দাঁড়িয়ে আছি একটা অটল পাথরের উপর। পাথরটা কি আমার অন্তরতম সত্তা? সেটা কি আমার আত্মপ্রত্যয়? সেটা কিন্তু বিচলিত হচ্ছে না। অত উত্তাপের মধ্যেও সেটা উত্তপ্ত নয়। তার উপর দাঁড়িয়ে আমি শুধু যে আমার বিক্ষুব্ধ অন্তর-সাগর দেখছিলাম তা নয়, অনুভবও করছিলাম একটা নৌকো পেলে আমি অনায়াসেই এ সমুদ্র পেরিয়ে যেতে পারি। আমার এ জীবনের সমস্ত কীর্তি-অকীর্তিকে, সমস্ত আবর্জনা জঞ্জালকে ফেলে পাড়ি দিতে পারি অজানার উদ্দেশে, যে অজানা আমার জ্ঞানের বাইরে হলেও কল্পনার বাইরে নয়। কল্পনায় আমি এমন একটা জায়গায় যেতে চাইছিলাম যেখানে মানুষ নেই। Paul Satre তাঁর কোন একটা নাটকে বলেছেন—মানুষের সান্নিধ্যই নরক। আমিও অনুভব করেছি সেটা। মানুষই প্রলুব্ধ করে আবার মানুষই প্রলুব্ধ হলে শাস্তি দেয়। তারা শাঁখের করাত, আসতে কাটে যেতেও কাটে। তাদের নানা শাস্ত্র, নানা আইন, শুধু শুধু পরস্পরকে কষ্ট দেবার জন্য। যে ঘৃণা করে সে কষ্ট দেয়, আবার যে ভালবাসে সে-ও কষ্ট দেয়। যে আইন রক্ষা করে সেই আইনই আবার ধ্বংস করে। আজ যে রক্ষক কাল সেই ভক্ষক। সমাজ মানে কি জানেন? এর চোদ্দ আনা পরশ্রীকাতরতা, ঘোঁট, পরস্পরকে লেংগি মারবার চেষ্টা আর আত্মআস্ফালন। বাকি যে দু'আনা ভদ্র তাদের দুঃখের শেষ নেই। তাদের পিষছে সবাই। মানব-সমাজ একটা নিষ্ঠুর পেষণ-যন্ত্র। আমিই পিষেছি অনেককে, আমাকেও পিষেছে অনেকে। ব্যাস্‌—কুইট্‌স্‌। এবার পালাতে চাই। পালাতে চাই জনমানবহীন দেশে। হঠাৎ মনে হল জগদম্বাকেও কি তুমি চাও না? বকবকিয়ে গেলাম। তারপর চমকে উঠলাম যখন দেখতে পেলাম ওই ফুটন্ত সমুদ্র সাঁতরে জগদম্বাই আমার দিকে এগিয়ে আসছে। পঙ্কিল সমুদ্রের পাঁক লেগেছে তার চোখে মুখে। আমার অন্তরের সমস্ত দুর্গন্ধ উত্তাল হয়ে উঠেছে তাকে ঘিরে। আমার সমস্ত পাপ সাপের মতো ফণা তুলে তেড়ে আসছে তার পিছু পিছু। তবু তার মুখের টেপা হাসিটি ঠিক আছে তেমনি। তার চোখের দৃষ্টিতে ঠিক তেমনি জ্বলছে ব্যঙ্গের হাসি। সে দৃষ্টি যেন বলছে, 'অনেক বাহাদুরি তো দেখালে, এইবার ঘরে চল। কি চেহারা হয়েছে তোমার। কণ্ঠার হাড় বেরিয়ে গছে, চোখ বসে গেছে, উঁচু হয়ে উঠেছে গালের হাড় দুটো, চল বাড়ি চল।' হঠাৎ খুব কাছে এসে পড়ল। বলল—যাবে না? ওহো ভুলে গেছি, তুমি যে সাঁতার জান না। আচ্ছা তোমার জন্যে আমি নৌকো পাঠিয়ে দিচ্ছি। আবার সাঁতরাতে সাঁতরাতে চলে গেল। মাঝে মাঝে ঘাড় ফিরিয়ে চেয়ে চেয়ে দেখতেও লাগল আমাকে। হঠাৎ আমার মনে হল Paul Satre বোধহয় জগদম্বাকে দেখেনি কোনদিন। চার্বাক-নীতি-নিয়ে-মত্ত-লোকটা তাহলে Existantialism-এর অন্য মানে খুঁজে পেতো হয় তো। না, ওরা জগদম্বাকে দেখেনি।

দেখতে দেখতে মিলিয়ে গেল সে। আর তার পরই দেখলাম একটা নৌকা ভেসে আসছে আমার দিকে। সাধারণ নৌকো নয়— সোনার তরী। তার হালের দিকটা কালো, আর মনে হল নৌকোটা যেন দুটো ডানা বিস্তার করে রয়েছে দু'দিকে। যেন উড়ে চলে আসছে। কাছে আসতে দেখলাম বাই জোভ—এ যে বিরাট একটা হলদে পাখি। কাছে এসেই মিষ্টি সুরে ডেকে উঠল—টিউ—টিউ। কিন্তু আমি উঠতে পারলাম না সেই সোনার নৌকোয়। ভিড় করে এল রংকি, চিনু, সুজাতা, শ্যামা, সন্ধ্যা, সুলেখা, বিন্দু, তাদের পিছনে সার বেঁধে এল আরও

অনেকে—সবাই সমস্বরে বলল, 'আমরাও যাব, আমরাও যাব।' পালিয়ে গেল হলদে পাখি। উড়ে চলে গেল। আর তার নাগাল পেলাম না। ওরা যখন আমায় বন্দী করেছিল তখনই পেয়েছিলাম আমি মুক্তির ডাক। কিন্তু সে ডাকে সাড়া দিতে পারলাম না। কিন্তু দিতেই হবে। একটা মুশকিল হয়েছে কিন্তু। কোনটা মায়া, কোনটা ছায়া, কোনটা বাস্তব, কোনটা অবাস্তব, কোনটা ফিকশন্, কোনটা ফ্যাক্ট, কোনটা রিয়ালিটি, কোনটা ইল্যুশন— ঠিক করতে পাচ্ছি না। মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে ওরা যে আমায় স্ট্রেট্ জ্যাকেট পরিয়েছিল সেটা আমার ইল্যুশন্, আমি মনে মনে নিজেই নিজেকে বন্দী করেছিলাম অর্থাৎ সমাধিস্থ হয়ে ছিলাম। সমাধিস্থ হয়ে যা দেখেছি—ওই আবার—টিউ—টিউ। হলদে পাখিটা এসেছে। গীটার গীটার—জানলা দিয়ে দেখ তো—

গীটার সত্যি সত্যি এসে হাজির হল। কিন্তু সন্দেহ হচ্ছে সত্যি গীটাব তো? না মিথ্যে-গীটার, মায়া-গীটার?

গীটার বলল,—"বাবা আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন নিয়ে আসব তাঁকে।'

"তোমার বাবা? তিনি তো অনেকদিন থেকে আমার দিকে আসছেন। আজ এসে পৌঁচেছেন তাহলে। নিয়ে এস। আমার কলঙ্ক-লাঞ্ছিত মুখ-চন্দ্রমা দেখে কিঞ্চিৎ সাহিত্যিক অনুকম্পা বর্ষণ করে যান। নিয়ে এস। আমি চাপটালি খেয়ে বসছি। যতক্ষণ ইচ্ছে নিরীক্ষণ করুন তিনি আমাকে—"

সত্যি সত্যি সশরীরে এসে পড়লেন যামিনী ঘোষাল। চমকে গেলাম—যেন একটা ফুল, যেন একটা সুর, যেন একটা সুগন্ধ, যেন একটা আবির্ভাব। হঠাৎ ঈর্ষায় মুচড়ে উঠল বুকের ভিতরটা। উনি যে আকাশচুম্বী হিমালয়ের চূড়া আর আমি যে পাতালস্পর্শী অধঃপতনের শেষ সীমা তা বলে দিতে হল না কাউকে। উনি আসামাত্রই স্পষ্ট হয়ে উঠল সেটা। উনি নমস্কার করে কুণ্ঠিতভাবে বসলেন, যেন যা হয়েছে তার জন্য উনিই দায়ী। একটি কথাও বললেন না। চুপ করে বসে রইলেন কেবল আমার দিকে চেয়ে। তাঁর মুখভাবে যা ফুটে উঠল তা বর্ণনা করি এমন সাধ্য আমার নেই। মনে হল একটা অনিবার্য ট্রাজেডির মুখোমুখি হয়ে উনি যেন খুব কষ্ট পাচ্ছেন, উনি যেন 'হ্যামলেট' বা 'প্রফুল্ল' দেখছেন। ওঁর মুখভাবে কোনও করুণা নেই, সান্ত্বনা নেই, আছে কেবল কষ্ট। ট্র্যাজেডি শব্দের গ্রীক অর্থটাও যেন মূর্ত হয়েছে ওঁর ওই মৌন দৃষ্টিতে। গ্রীক দেবতাদের কাছে ভেড়াদের বলি দেওয়ার জন্য নিয়ে যাওয়া হত, যে সব ভেড়াকে এখনি বলি দেওয়া হবে তাদের আর্ত অসহায় চিৎকারের গ্রীক নাম 'tragedy'. মনে হল উনি যেন আমার মধ্যে দেখছেন সেই পশুকে যাকে হাড়কাঠে ফেলা হয়েছে, যার কাঁধের উপর শাণিত খড়্গ উদ্যত করে দাঁড়িয়ে আছেন মহাকাল, এই আসন্ন অনিবার্য বিরাট ট্রাজেডিটা উনি যেন অনুভব করছেন প্রাণ দিয়ে। ওঁর কষ্ট হচ্ছে, ভয়ানক কষ্ট হচ্ছে।

চীৎকার করে উঠলাম আমি।

"গীটার, গীটার শীগগির ঢেকে দাও আমাকে। লেপ কাঁথা কম্বল যেখানে যা আছে নিয়ে এস। আমাকে দেখে তোমার বাবার বড্ড কষ্ট হচ্ছে। উনি এ দৃশ্য দেখতে পারছেন না। ঢেকে দাও আমাকে শীগ্গির ঢেকে দাও।"

যামিনী ঘোষাল ভয় পেয়ে গেলেন। নমস্কার করে বেরিয়ে গেলেন তাড়াতাড়ি।

দেখলাম গীটার শশব্যস্ত হয়ে আবার ফোন করছে। আবার সেই গুঁফো ডাক্তারটাকে ডাকছে নাকি। আবার কি ইলেকট্রিক 'শক্' দেবে, আবার কি জ্যাকেট পরিয়ে রাখবে—।

"গীটার—গীটার—গীটার— শোন।"

গীটার এসে দাঁড়াল আমার কাছে।

বললাম—"দেখ এভাবে দগ্ধে দগ্ধে আমাকে মেরো না। তোমরা আরাংজেবের নকল করে বন্দী করে রেখেছ আমাকে। কিন্তু আরাংজেব তো শাজাহানকে ইলেকট্রিক শক দেয়নি, স্ট্রীট্ জ্যাকেট পরায়নি। আরাংজেবের ঠাকুর-দার বাবা যা করেছিলেন তাই করে ফেল না তোমরা। তিনি জীবন্ত আনারকলিকে গেঁথে ফেলেছিলেন তার চারদিকে পাকা দেওয়াল তুলে! তাই কর তোমরা। মারতে চাও তো তাই করছ না কেন? ওই গুঁফো ডাক্তারকে আমি কাছে ঘেঁষতে দেব না। এলেই আবার মারব—"

গীটার কোনও উত্তর দিলে না। যা করলে তা অদ্ভুত। গেলাসে জল ছিল টেবিলের উপর। হাতে করে সেই জল একটু নিয়ে, মাখিয়ে দিলে চোখে মুখে কানে। তারপর আঁচলে মুছিয়ে দিলে আমার মুখটা। তারপর আমার পাশে বসে আমার মুখটা টেনে নিলে নিজের বুকের উপর, টেনে নিয়ে আস্তে আস্তে চাপড়াতে লাগল, ঘুম পাড়াবার সময় মা ছেলেকে যেমনভাবে চাপড়ায় তেমনি করে। চড়াৎ করে ফেটে গেল পাথরটা। জল বেরিয়ে পড়ল চোখ থেকে। তার কাঁধে মাথা রেখে কাঁদতে লাগলাম। আর মনে মনে বলতে লাগলাম—'তোমরা অত্যন্ত ভালো, কিন্তু আমি যে পাপী, নিজের আগুনে আমি যে পুড়ে মরছি, আমার আগ্নেয়গিরির লাভা আমাকেই যে পুড়িয়ে ছারখার করে দিচ্ছে, তুমি আমাকে বাঁচাতে পারবে না, আমি খারাপ, খুব খারাপ, আমাকে তুমি ছুঁয়ো না আমি অচ্ছুৎ , আমি অপবিত্র, আমি কাদা- - -।'

মনে মনে বলতে লাগলাম কিন্তু মুখে উচ্চারণ করতে পারলাম না। আমি পুড়ে ছাই হয়ে গেছি তবু সেই ছাইয়ের ভিতর থেকেই অহংকার বেরিয়ে এসে আমার মুখ চেপে ধরল। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার আমার আর একটা সত্তা যেন ওর পায়ে পড়ে মিনতি করছিল—"দেখ, দেখ, আমাকে, দেখ আমার কি দুর্দশা হয়েছে, চুরমার হয়ে গেছি, টুকরো টুকরো হয়ে গেছি—"। এসব মনে মনে বলছিলাম কিন্তু। মুখ দিয়ে একটি কথাও বেরুল না গীটারের কাঁধে মাথা রেখে কাঁদতে লাগলাম শুধু। গীটার আমাকে চাপড়েই যেতে লাগল।

"বাবা, আপেলের রস খাবেন?"

আমি কোন উত্তর দিলাম না। উত্তর দেবার ক্ষমতা আমার ছিল না। আমার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল, অবশ হয়ে গিয়েছিল আমার জিভ, আমি যেন তলিয়ে যাচ্ছিলাম, আমার সমস্ত দম্ভ, সমস্ত বর্বরতা সত্ত্বেও সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করেছিলাম আমি।

"জানকী ফ্রিজের ভিতর কাচের গ্লাসে আপেলের রসে আছে। নিয়ে এসো।"

হঠাৎ আবদার করে বললুম—'আপেল সিদ্ধ কিন্তু খাব না।'

"না খেলেন। আপনার জন্যে আজ সুক্তো করেছি। মুগের ডাল আর মোচার ঘণ্টও করেছি—"

"তুমি কাকে ফোন করছিলে? ডাক্তারকে?"

"হ্যাঁ। উনি—"

"ও ডাক্তার যেন না আসে।"

"আচ্ছা, মানা করে দেব।"

ছোট ছেলেকে যেমন ভোলায় তেমনি করে ভোলাতে লাগল আমায় গীটার। আমি সব বুঝছিলাম, তবু ভুলছিলাম। বড় ভালো লাগছিল। জানকী আপেলের শরবৎ নিয়ে এল।

"এটা খেয়ে, চোখ বুজে শুয়ে পড়ুন এবার।"

ছোট ছেলের মতো পাশ ফিরে চোখ বুজে শুলাম। তারপর হঠাৎ বললাম---"ফ্যানটা বন্ধ করে দাও। হাত-পাখা নিয়ে আমায় হাওয়া কর তুমি।"

তাই করতে লাগল গীটার।

চোখ বুজে শুয়ে রইলাম । অনেকক্ষণ শুয়ে রইলাম। ঘুম কিন্তু এল না। গীটার হাওয়া করে যাচ্ছে। তার হাতের চুড়ির রুনঠুন্ শুনতে পাচ্ছি। একটু পরে বন্ধ হয়ে গেল শব্দটা। মনে হল গীটারের বোধহয় হাত ব্যথা করছে তাই থেমে গেছে। একটু পরেই আবার হাওয়া করবে। পাশ ফিরেই শুয়ে রইলুম মটকা মেরে। কিন্তু চুড়ির শব্দ আর হল না, হাওয়াও পেলাম না আর। গরম বোধ হতে লাগল। পাশ ফিরে দেখি গীটার নেই। বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে আছে জগদম্বা।

"আমাকে তো সারাজীবন জ্বালিয়েছ। বউটাকেও জ্বালাবে?"

গীটার কি করে জগদম্বায় রূপান্তরিত হল এ প্রশ্নই জাগল না আমার মনে, আমি বিস্ফারিত-নয়নে চেয়ে রইলাম জগদম্বার দিকে। মনে হল—হ্যাঁ, ওই তো আসবে এখন।

জগদম্বা বলতে লাগল—"ও বেচারিকে নিয়ে পড়েছ কেন। আমিই তো আছি তোমার মনের মধ্যে। মনটি তো তপ্ত সমুদ্র, টগবগ করে ফুটছে। তবু আছি সেখানে। নৌকোও পাঠিয়েছিলাম একটা। এলে না কেন, শেষ পর্যন্ত তো আসতেই হবে...

জগদম্বা অন্তর্ধান করল। সঙ্গে সঙ্গে ঘরের দেওয়ালগুলো হঠাৎ এগিয়ে এল আমার দিকে। হুমড়ি খেয়ে ঘিরে দাঁড়াল আমাকে । উপর থেকে আবার খানিকটা চাপড়া পড়ল আমার খাতায়। টিউ---টিউ---টিউ---হলদে পাখিটা ডাকছে ক্রমাগত। কি বলতে চাইছে ও?

অন্ধকারে উৎকর্ণ হয়ে বসে আছি। প্রতীক্ষা করছি নৌকো পাঠাবে। আমার অন্তরের মহাসমুদ্র ফুটছে। ধস ভাঙার শব্দ পাচ্ছি। মাঝে মাঝে একটা চাপা আর্তনাদও শুনতে পাচ্ছি যেন। গর্জনও। একটা সিংহকে লোহার খাঁচায় বন্দী করে কে যেন খোঁচাচ্ছে বল্লম দিয়ে। আমি কি সেই সিংহ? না, না, আমি কুকুর, কুকুরের চেয়েও অধম। ওই আবার ধস ভাঙল। গর্জন আর আর্তনাদ চাপা পড়ে গেল ঝড়ের শব্দে। প্রলয় হচ্ছে। এই প্রলয়ে যদি নৌকো আসে সে নৌকো কি সমুদ্র পার হতে পারবে? পারবে, যদি হলদে পাখি নৌকো হয়ে আসে। হলদে পাখীই তো নৌকো হয়ে এসেছিল, ওরা ভিড় করে এলো বলেই চলে গেল। এখন ভিড় নেই। এখন আমি নিঃসঙ্গ। গীটারও আর আসেনি। সুজনও আসেনি। গুঁফো ডাক্তার বলে পাঠিয়েছে সে আর আমার চিকিৎসা করবে না। বাঁচা গেছে। আশেপাশে কেউ নেই। আবার ধস ভাঙার শব্দ। বৈতরণীর ধস ভাঙছে না কি? আবার সমুদ্র কি বৈতরণীর খাতে ঢুকেছে? নৌকো তো আসছে না। এই গভীর অন্ধকারে এই নিশীথ রাত্রে হলদে পাখি কি নৌকো হয়ে আসতে

পারবে? হলদে পাখিরা তো রাত্রে ঘুমোয়। কিন্তু জগদম্বা কি তাকে ঘুমোতে দেবে? কিন্তু তবু ভয় হচ্ছে হয়তো সে আসবে না। হয়তো জগদম্বা তার নাগাল পাবে না। হলদে পাখির নাগাল পাওয়া শক্ত। ভয় হচ্ছে। এতক্ষণ নিঃসঙ্গ ছিলাম। এইবার ভয়টা আমার সঙ্গী হল। অবয়বহীন কি একটা কালো যেন সামনে এসে দাঁড়াল। আমার সারা জীবনের পুঞ্জীভূত ভয়—ধরা পড়ার ভয়, বিবেকের ভয়, কলঙ্কের ভয়, আরও কত নাম-না-জানা ভয়—সবাই একসঙ্গে এসে হাজির হল যেন। অন্ধকারের মধ্যে ঘনতর আর একটা অন্ধকারের স্তূপ। ওটা তো আমার ভিতরে ছিল, বাইরে এল কি করে। এগিয়ে আসছে...হ্যাঁ, এগিয়ে আসছে...মনে হচ্ছে বিরাট একটা ভালুক পিছনের পায়ে দাঁড়িয়ে উঠেছে... খুব কাছে এসে পড়ল যে। লিয়াকৎ—লিয়াকৎ—। গলা দিয়ে স্বর বেরুচ্ছে না আমার। লিয়াকৎ শুনতে পাচ্ছে না আমার ডাক। গীটার—গীটার—নাঃ স্বর বেরুচ্ছে না।

"ভয় পাবেন না। আমি আপনার অনিষ্ট করব না।"

"কে আপনি।"

"আমি সেই দারোগা যাকে আপনার লিকায়ৎ খুন করেছিল।"

স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

তারপর মনে পড়ল সুজনকে সেই চেক্‌টা তো লিখে দিইনি। ওর ছেলেমেয়েরা এখনও হয়তো অকূলপাথারে ভাসছে। আরও ভয় পেয়ে গেলাম। নির্বাক একটা আতঙ্কে কাঠ হয়ে বসে রইলাম। আবার ধস ভাঙছে। একটা হাহাকার যেন বাঙ্ময় হয়ে উঠল—হু হু করে হাওয়া বইছে। অন্ধকারের স্তূপটা আবার এগোচ্ছে আমার দিকে। কাঁধের উপর লাফিয়ে পড়বে না কি। খুব কাছে এসে সে কিন্তু যা করল তা আশ্চর্য। চুপি চুপি বলল—"আলোটা জ্বালুন। আলো জ্বললে আর ভয় থাকবে না।"

বেড্‌সুইচ্‌টা হাতড়ে টিপে দিলাম। মনে হল একটা পুড্‌ল (poodle) কুকুর যেন ছুটে পালিয়ে গেল। একটা মেমসায়েবকেও যেন দেখতে পেলাম আবছা। তারপর নজর পড়ল বেড্‌সুইচ্‌টার তারের উপর। হলদে রং, হলদে পাখির মতো হলদে। নির্নিমেষে চেয়ে রইলাম সেটার দিকে। তাহলে কি জগদম্বা আবার নৌকো পাঠিয়েছে? এটা কি হলদে পাখির ছদ্মবেশ? সবই তো ছদ্মবেশ, আসল রূপ তো কারো দেখলাম না আজ পর্যন্ত। নিশ্চয়ই এটা হলদে পাখি—জগদম্বা পাঠিয়েছে। টিউ—টিউ—টিউ—ওই যে হলদে পাখি ডাকছে। যাচ্ছি যাচ্ছি। যাবার আগে যা যা ঘটেছে সব লিখে যাব। কেউ বিশ্বাস করবে না—তবু লিখে যাব।

পরদিন সকালে গীটার চা নিয়ে এসে দেখল নেপাল চাটুজ্যের মৃতদেহটা মেজের উপর পড়ে আছে। তিনি বেড্‌সুইচ্‌টা মুখের ভিতর পুরে চিবিয়েছেন।

আগ্নেয়গিরি নির্বাপিত হয়েছে।

সুজন এতদিন কাঁদেনি। এইবার কিন্তু ভেঙে পড়ল। সে গম্ভীর লোক। গীটার একদিনও তার চোখে জল দেখেনি। তার এই কান্না দেখে বিচলিত হয়ে পড়ল সে। সান্ত্বনার সুরে বলল—"কেউ তো চিরকাল থাকে না। বাবা খুব কষ্ট পাচ্ছিলেন, আর এ অসুখ তো সারত না, সব রকম চেষ্টাই তো করা হল—"

সুজন নির্বাক হয়ে চেয়ে রইল গীটারের দিকে।

তারপর বলল—"বাবা বারবার লিখে গেছেন আমি পাপী আমি পাপী। কিন্তু এখন বারবার মনে হচ্ছে আমিও পাপী। আমি বাবাকে শ্রদ্ধা করতে পারিনি। যা করেছি তা কর্তব্যের খাতিরে। ভালবাসতে পারিনি তাঁকে। ভুলে গিয়েছিলাম তিনি আমার বাবা। ভুলে গিয়েছিলাম যে পরিবেশে তিনি পড়েছিলেন সে পরিবেশে পড়লে আমিও হয়তো ওই রকম হতাম। আমি হেরে গেছি গীটার। আমি ছেলে হতে পারিনি, বিচারক সেজেছিলাম। এখন আমার বুক ফেটে যাচ্ছে, আমি পাপী মহাপাপী—"

গীটার চুপ করে রইলো। সুজন আবার বলে উঠল—"মহৎ মানুষের পক্ষে সবই সম্ভব। আমি মহৎ হতে পারিনি, সেইটিই আমার দুঃখ—"

আবার তার দু'চোখ জ্বলে উঠল।

"তোমার জন্যে একটু চা আনি?"

সুজন জবাব দিল না। গীটার চলে গেল চা আনতে।

সহসা সুজনের মনে হল গভীর অন্ধকারের মধ্যে তার বাবার মুখটা ফুটে উঠল। তিনি যেন নীরব ভাষায় বললেন—"কাঁদছ সুজন? আমিও কাঁদছি। কিন্তু আমার এ অন্তিম রোদন তোমরা কেউ শুনতে পাবে না। আমি বোবা হয়ে গেছি, লুপ্ত হয়ে গেছি অন্ধকারে।"

গন্ধরাজ

।। এক।।

ভারতবর্ষের মানচিত্র থেকে পৌরাণিক রাজ্য গর্জনগ্রামের নাম লুপ্ত হয়ে গেছে। গর্জনগ্রাম ছোট স্বাধীন রাজ্য ছিল। আয়তনে ছোট হলেও প্রতাপে সে নাকি ছোট ছিল না। গর্জনগ্রামের গর্জনে পার্শ্ববর্তী রাজ্যরা ভয়ে কাঁপত। হিমালয়ের পাদদেশে তখন যে সব রাজারা রাজত্ব কবতেন তাঁরা গর্জনগ্রামের সঙ্গে শত্রুতা করা নিরাপদ বিবেচনা করতেন না। সে যুগের ইতিহাসে গর্জনগ্রাম তার মহিমময় স্বাক্ষর রেখে গেছে। কিন্তু সে যুগও আর নেই, সে স্বাক্ষরও নিশ্চিহ্ন। ইতিহাসের কোন্ পর্বে এসব ঘটেছিল তা-ও জানা নেই। বহুকাল আগে ও রাজ্যের উত্থান এবং পতন হয়ে শেষ হয়ে গেছে সব। কিম্বদন্তী এইটুকু মাত্র শুধু বলে যে গর্জনগ্রামের রাজারা নাকি লিচ্ছবি বংশের লোক ছিলেন, যে লিচ্ছবি বংশ ইতিহাসে আলো-ছায়া-ময় অনেক কাহিনী রচনা করেছে।

মনোরম রাজ্য ছিল অরণ্যপরিবৃত পার্বত্য গর্জনগ্রাম। অনেক নদী অনেক নির্ঝরের উৎস, অনেক বৃক্ষলতাগুল্মশোভিত, নানাবিধ পার্বত্য পুষ্পে সজ্জিত, অনেক আশ্চর্য উপত্যকা-পর্বতশিখরে-সমৃদ্ধ এই জনপদ তদানীন্তন সভ্যতারও প্রতীক ছিল। অসভ্য ছিল না গর্জনগ্রামের অধিবাসীরা। সেকালেও নদী-নির্ঝরের সহায়তায় মিল চালাতো তারা। করাত দিয়ে পাহাড়ী গাছ চিরে তক্তা বানিয়ে ব্যবসা করত। নগরের নাম ছিল পার্বতী, আর তাকে কেন্দ্র করে বাদামী রঙের কাঠের-তৈরী বাড়ি থাকে থাকে গড়ে উঠেছিল পর্বতের স্তরে স্তরে ছোট ছোট পাহাড়ী গ্রামগুলিতে। ঠিক যেন ছবির মতো দেখাতো। গভীর উপত্যকার নিম্নভূমি থেকে এই সব কাঠের-তৈরী বাড়ির ছাদের সহায়তায় এবং বেগবতী বড় বড় পাহাড়ী নদীর উপর আচ্ছাদিত সেতুর উপর দিয়ে গ্রামবাসীরা নীচের গ্রাম থেকে উপরের গ্রামে যাতায়াত করত। মিলের গুরু-গুরু শব্দ, নদীর কলকলধ্বনি, দেওদার গাছের তীব্র মধুর গন্ধ, আরণ্যবৃক্ষের শাখা-প্রশাখায় স্বচ্ছন্দপ্রবাহিত বাতাসের স্বনন, শিকারীদের আগ্নেয়াস্ত্রের ক্বচিৎ বিস্ফোরণ, কাঠুরেদের কাঠ-কাটার আওয়াজ, দুরারোহ দুর্গম পথ, পথের পাশে পরিচ্ছন্ন সরাইখানায় টাটকা মাছভাজার গন্ধ, নানারকম পাখির গান আর গ্রামবাসীদের আনন্দগুঞ্জন—এই সবই ছিল গর্জনগ্রামের বৈশিষ্ট্য। যাঁরা গর্জনগ্রামে বেড়াতে যেতেন এই সবেরই স্মৃতি আঁকা থাকত তাঁদের মানসপটে।

গর্জনগ্রামের উত্তর-পূর্ব সীমান্ত ঢেউ-খেলানো পর্বতমালার রেখা ধরে নেমে এসেছিল এক বিরাট সমতল প্রান্তরে। এই প্রান্তরের সীমায় অনেকগুলি ছোট ছোট রাজ্য ছিল। অধুনা-লুপ্ত ভৈরঙ্গী ছিল তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। গর্জনগ্রামের দক্ষিণ সীমায় ছিল রোহিণীপ্রস্থ। ক্ষমতাশালী বলে খ্যাতি ছিল এ রাজ্যটির। আরও নানা অদ্ভুত ব্যাপারে খ্যাতি ছিল এর। এ রাজ্যের লোকেরা নাকি অতি সরল, অতি কোমল-হৃদয়, অত্যন্ত ভাবপ্রবণ। এ রাজ্যের ফুল নাকি বিস্ময়কর। আরও বিস্ময়কর নাকি এ রাজ্যের পাহাড়ী ভালুক। বহু শতাব্দী ধরে

গর্জনগ্রাম আর রোহিণীপ্রস্থের রাজবংশ বিবাহ-বন্ধনে পরস্পরের সঙ্গে আবদ্ধ ছিলেন। গর্জনগ্রামের শেষ রাজপুত্র, যাঁর কাহিনী আমরা এই আখ্যায়িকায় বলব, তিনি ছিলেন রোহিণীপ্রস্থের রাজা কোকনন্দকুমারের একমাত্র কন্যা স্বর্ণাঙ্গিনীর পুত্র। কোমল-হৃদয় ভাব-প্রবণ রোহিণী-রাজবংশের সঙ্গে গর্জনগ্রামের রাজবংশের এই বৈবাহিক যোগাযোগ গর্জনগ্রামের প্রজারা খুব সুচক্ষে দেখত না। তারা মন করত গর্জনগ্রামের প্রাচীন রাজাদের রুক্ষ পরুষ চরিত্র ওই রোহিণীবংশের সংস্পর্শে এসে যেন একটু মোলায়েম মেয়েলী গোছের হয়ে গেছে। গর্জনগ্রামের কয়লাওলারা, পাহাড়ী বলিষ্ঠ করাত চালিয়ে ছুতোররা, দেওদার-অরণ্য-নিবাসী বৃহৎ কুঠার-চালক কাঠুরেরা তাদের প্রবল পৌরুষকেই শ্রদ্ধা করত। তাদের রুক্ষ হাত, বলিষ্ঠ বাহু, তাদের কুসংস্কারাচ্ছন্ন অজ্ঞতা, তাদের বীরত্বময় প্রাচীন ঐতিহ্য-উপকথা—এই সবই গর্বের বস্তু ছিল তাদের। রাজবংশের কোমল নমনীয়তা মোটেই পছন্দ করত না তারা।

ঠিক কোন্ বছরে কোন তারিখে এ গল্পের আরম্ভ তা পাঠক পাঠিকারাই আন্দাজ করে নিন। কিন্তু কোন্ সময়ে, অর্থাৎ কোন ঋতুতে এ নাটকের যবনিকা উঠেছিল সেটা না বললে অশোভন হবে। ঋতুরাজ বসন্ত তখন মহাসমারোহে এসে গেছেন। গর্জনগ্রামের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে বেজে উঠেছে শিকারীদের তুরী-ভেরী। সকলে জেনে গেছে রাজপুত্র মৃগয়ায় বেরিয়েছেন। শরৎকাল না আসা পর্যন্ত এ মৃগয়া চলবে।

এই স্থানে গর্জনগ্রামের সীমান্তরেখাটা অমসৃণ। সোজা খাড়া নেমে গেছে অনেক নীচে, মাঝে মাঝে এবড়ো-খাবড়ো পাথরের চাঙড় দুর্গম করে রেখেছে জায়গাটাকে। এই উদ্ধত নিষেধের মতো বন্ধুর জটিল পর্বতের ঠিক নীচেই শ্যামল সমতল শস্যক্ষেত্র। সে সময় এখানে দুটি মাত্র পথ ছিল। যেটি রাজপথ সেটি ভৈরঙ্গী রাজ্যের রুদ্রার দিকে তির্যকভাবে নেমে এসেছিল অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য ঢালু পর্বতগাত্র বেয়ে। আর দ্বিতীয় পথটি পাহাড়ের ললাটে একটি সরু ফিতার মতো দেখা দিয়েই অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল দুর্গম গিরিসঙ্কটের নিবিড় গহনে। ছোট ছোট পাহাড়ী ঝরনার জলকণায় আপ্লুত হয়ে তা এগিয়ে গিয়েছিল গহনতর অরণ্যে। আরও কিছুদূর গিয়ে তা এসে সেই দুর্গের পাশে হাজির হয়েছিল যা ও অঞ্চলে একটি উল্লেখযোগ্য দৃশ্য। দুর্গের নাম শূলপাণি। বিরাট পর্বতের শিখরে নির্মিত আকাশচুম্বী শূলপাণি থেকে গর্জনগ্রামের পার্বত্য সীমান্ত এবং ভৈরঙ্গীর জন-সমাকীর্ণ সমতলভূমি স্পষ্ট দেখা যেত। নানাভাবে ব্যবহৃত হত এই দুর্গ। কখনও কারাগার, কখনও মৃগয়া-বিহার, কখনও বা আরও কিছু। অদ্ভুত মনে হত দুর্গটাকে। একক বলিষ্ঠ প্রহরী যেন আকাশে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে যুগযুগান্ত ধরে। রুদ্রার অধিবাসীরা পাহাড়ের গায়ে লেবু চাষ করত। তাদের কেউ কেউ কপালের উপর হাত রেখে লেবুগাছের ফাঁকে দাঁড়িয়ে দেখত— শূলপাণির গায়ে কটা জানলা রয়েছে। মনে হত যেন আকাশের গায়েই রয়েছে জানলাগুলো।

এই দুই পথের মাঝে ঘন অরণ্য। এই অরণ্যেই তুরী-ভেরীর নিনাদ উঠছিল থেকে থেকে। অবশেষে সূর্য যখন অস্তাচলচূড়াবলম্বী তখন তুমুল একটা হর্ষ-ধ্বনি উঠল। বোঝা গেল ঈপ্সিত শিকার মারা পড়েছে। প্রথম এবং দ্বিতীয় শিকারী একটু বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন দল থেকে। একটা গিরিশৃঙ্গে দাঁড়িয়ে তাঁরা চেয়ে দেখছিলেন নীচের দিকে। একটা ঢালু পাহাড়ের অংশ আর শস্য-শ্যামল সমতলভূমি দেখতে পাচ্ছিলেন তাঁরা। সূর্যের কিরণ চোখে পড়ছিল বলে হাত দিয়ে চোখ ঢেকে রেখেছিলেন তাঁরা। সূর্যাস্ত হচ্ছিল, কিন্তু তেমনি মহিমময় সূর্যাস্ত

নয়। হাজার হাজার পাহাড়ী গাছের জটিল নকশা চিত্রিত হয়েছিল আকাশ-পটে, অনেক বাড়ি থেকে ধোঁয়া উঠছিল, শস্যক্ষেত্র থেকেও কুয়াশার মতো কি উঠছিল যেন, জলচালিত কলের দুটো পাখনা দেখা যাচ্ছিল দূরে, মনে হচ্ছিল গাধার কান যেন। আর কাছেই প্রকাণ্ড একটা দীর্ঘ ক্ষতের মতো দেখা যাচ্ছিল রুদ্রার দিকে বিসর্পিত রাজপথটা, মনে হচ্ছিল সেটা যেন সূর্যের দিকেই এগিয়ে গেছে, যোগাযোগের রক্ত-ধমনী যেন।

প্রকৃতির একটি সুরে মানুষ এখনও কথা বসাতে পারেনি, গানও বাঁধতে পারেনি। 'পথের ডাক', প্রকৃতির সেই চিরন্তন সুর। এই সুর যুগ যুগ ধরে আকুল করেছে 'জিপসী'দের, বেদেদের এই সুরে মেতে আমাদের ভ্রাম্যমাণ পূর্বপুরুষরা ঘুরে বেড়িয়েছেন বনে জঙ্গলে পর্বতে মরুতে। এই সুর তখনও বাজছিল, সেই মুহূর্ত, সেই ঋতু, সেই দৃশ্য সবাই যেন সেই সুরের ঐক্যতানে তন্ময় হয়ে গিয়েছিল। আকাশে উড়ে চলেছিল অসংখ্য বিদেশগামী পাখির দল, লক্ষ লক্ষ ছোট বিন্দু যেন উড়ে চলেছে। আর নীচে ওই রাজপথ, মানুষের তৈরী পথ, তারও ওই এক আহ্বান—চলো, চলো, চলো।

কিন্তু যে অশ্বারোহী দুজন পর্বতশিখরে দাঁড়িয়ে ছিল তাদের কানে এ সুর বাজছিল না। মনে হচ্ছিল তারা দুজনেই যেন চিন্তিত এবং বিরক্ত। তন্ন তন্ন করে বনের আশে-পাশে, ঝোপের ফাঁকে-ফাঁকে দৃষ্টি দিয়ে তারা খুঁজছিল যেন কাকে। খুঁজতে খুঁজতে অধীর হয়ে পড়ছিল, হতাশ হয়ে পড়ছিল। আবার খুঁজছিল। যাকে খুঁজছে তার পাত্তা নেই।

"আমি তো তাকে দেখতে পাচ্ছি না কুনো"—প্রথম শিকারীটি বললে—"কোথাও না, তার ঘোড়ার ল্যাজের ডগাটুকু পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না। আবার সে সরে পড়েছে, বনের আড়াল থেকে অন্তর্ধান করেছে আবার। ইচ্ছে করছে কুকুর নিয়ে তার পিছু পিছু ধাওয়া করি—"

"হয়তো বাড়ি ফিরে গেছে"—কুনো বললে, একটু দ্বিধাভরে।

"বাড়ি!"—ঘৃণায় কুঞ্চিত হয়ে গেল প্রথম শিকারীর নাক মুখ—"বারো দিনের আগে সে বাড়ি ফিরবে না। বিয়ের তিন বছর আগে যে খেলা শুরু হয়েছিল তাই আরম্ভ হয়ে গেছে আবার। কি লজ্জা, কি কেলেঙ্কারি! রাজবংশের কুল-প্রদীপ! আমি বলব রাজবংশের অকাল কুষ্মাণ্ড একটি। রাজ্যের আত্মসম্মান, প্রতিষ্ঠা, মর্যাদা একটি ঘোড়ার পিঠে চড়ে সীমান্ত পার হয়ে রোজ ভৈরঙ্গীতে চলে যাচ্ছে! ছি, ছি, ছি। ওটা কি? না কিছু নয়। ও রকম রাজপুত্রের চেয়ে একটা ভালো ঘোড়া বা ভালো কুকুর ঢের বেশী নির্ভরযোগ্য। এই তো তোমার গন্ধরাজের গন্ধ!"

"আমার গন্ধরাজ কেন হতে যাবে"—অস্ফুট বিরক্ত কণ্ঠে বলল কুনো।

"তোমার যদি না হয় তাহলে কার তা-ও তো জানি না!"

"তুমি ওর জন্যে আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়তেও দ্বিধা কর না সেটা কে না জানে!"

"আমি! আমি ওকে ফাঁসিতে লটকে দিতে পারলে সুখী হব। আমি গর্জনগাঁওয়ের খাঁটি দেশপ্রেমিক লোক, সেনাবিভাগে আমি নাম লিখিয়েছি, দেশের জন্যে যুদ্ধ করে পদকও পেয়েছি—আমি সাহায্য করব তোমার ওই রাজপুত্রকে! আমি স্বাধীনতা চাই, আমি কপিঞ্জলের দিকে—"

"যাই বল, সবই বুঝি"—কুনো হেসে বলল—"তুমি এখন যা বললে তা যদি আর কেউ বলত তাহলে তুমি তার রক্তদর্শন করে ছাড়তে—এ আমিও জানি, তুমিও জান। লোকটা

দেখছি সত্যিই তোমাকে গুণ করেছে। গন্ধরাজের গন্ধে তুমি মোহিত"—প্রথম শিকারী প্রত্যুত্তর করেই বলে উঠল— "ওই যে, ওই যাচ্ছেন মহাপুরুষ—"

সত্যিই দেখা গেল, প্রায় এক মাইল নীচে একজন অশ্বারোহী একটি শাদা ঘোড়ার পিঠে চড়ে উপত্যকা বেয়ে দ্রুতবেগে অরণ্যের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

"একটু পরেই ও ভৈরঙ্গীতে পৌঁছে যাবে"—কুনো বললে—"নাঃ, ওকে আর শোধরানো গেল না। চিকিৎসার বাইরে চলে গেছে।"

"কিন্তু ও যদি অমন চমৎকার ঘোড়াটাকে জখম করে ফেলে আমি ওকে ক্ষমা করব না কিছুতে—কি রকম ছোটাচ্ছে দেখেছ!"

প্রথম শিকারী ঘোড়ার লাগাম বাগিয়ে ধরল।

তারপর তারা পাহাড় থেকে নামতে লাগল তাদের সঙ্গীদের কাছে যাবার জন্যে। সূর্য অস্ত গেল। অরণ্যে ঘনীভূত হতে লাগল সন্ধ্যাব অন্ধকার। একটা নীরব গাম্ভীর্য ঘনিয়ে এল চতুর্দিকে।

।। দুই।।

কুমার গন্ধরাজ রাত্রির অন্ধকারে ধীরে ধীরে নামছিলেন ঢালু পাহাড়ী পথ বেয়ে। পাতা আর শ্যাওলায় ঢাকা সবুজ সরু পথ। দেওদার গাছে সমাচ্ছন্ন চারিদিক। মাথার উপরে গাছের ফাঁকে ফাঁকে নক্ষত্র-খচিত কালো আকাশ। কিন্তু নক্ষত্রের আলো এ সূচীভেদ্য অন্ধকারকে আলোকিত করতে পারছিল না। বস্তুত পথই দেখতে পাচ্ছিলেন না তিনি। তাঁর ঘোড়াই তাঁকে নিজের খুশীমতো বয়ে নিয়ে চলেছিল। মোটেই খারাপ লাগছিল না তাঁর। প্রকৃতির কঠোর রূপ, পথের অনিশ্চয়তা, মাথার উপর তারা-ভরা আকাশ, বন্যবাতাসের স্নিগ্ধ স্পর্শ চমৎকার লাগছিল। সুরাপান করলে প্রথমটা যেমন একটা ঈষৎ উত্তেজনাময়-আনন্দ হয় সেইরকম একটা আনন্দ অনুভব করছিলেন তিনি যেন। অন্ধকারে কলধ্বনিমুখরা একটি নদীর আলাপও বেশ উপভোগ করতে করতে চলেছিলেন গন্ধরাজ। আশেপাশেই সে কলকলধ্বনি করে বয়ে যাচ্ছিল।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়ার বেশ কিছুক্ষণ পরে তাঁর পরিশ্রম সার্থক হল। বন থেকে বেরুতে পারলেন তিনি। রাজপথের শক্ত মাটির উপর এসে পড়লেন। পুবদিকে ঘেঁষে চলে গেছে রাজপথ নীচের দিকে নেমে, অন্ধকার ঝোপের পাশে পাশে আবছা-ভাবে দেখা যাচ্ছে তার বিসর্পিত রূপটা। গন্ধরাজ থমকে দাঁড়িয়ে চেয়ে রইলেন সেদিকে। পথ চলেছে, যোজনের পর যোজন চলেছে, আরও কত পথ এসে মিলেছে ওর সঙ্গে, সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়েছে। কখনও সমুদ্রসৈকতের পাশ দিয়ে, কখনও শহরের আলো গায়ে মেখে চলেছে চলেইছে ওই পথ দেশ থেকে দেশান্তরে। ওর উপর দিয়ে শত শত পথিক চলেছে একই উদ্দেশ্যে এবং এখন সবাই বোধহয় সমবেত হচ্ছে কোনও সরাইখানায় বা বিশ্রাম-গৃহে। নানা ছবি তাঁর মানসপটে ভিড় করে এল আর অদৃশ্য হয়ে গেল। ধমনীতে চঞ্চল হয়ে উঠল রক্তস্রোত, দুর্দম হয়ে উঠল একটা প্রবল প্রলোভন, ইচ্ছে হল ঘোড়া ছুটিয়ে বেরিয়ে পড়ি

অজানার উদ্দেশ্যে। পরমুহূর্তেই আবার সে ইচ্ছে অন্তর্ধান করল। ক্ষুধা এবং ক্লান্তি এবং অভ্যস্ত জীবনের সেই দৈনন্দিন দাবি যা আমাদের সাধারণ সাংসারিক বুদ্ধিকে নিয়ন্ত্রিত করে তাই আবার প্রাধান্য লাভ করল তাঁর মনে। দেহের এবং মনের এই দাবি মেটাবার আশায় চারিদিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলেন তিনি। বাঁ দিকে, নদী এবং রাস্তার মাঝামাঝি একটা জায়গায়, দুটি আলোকিত বাতায়ন দেখতে পেলেন।

বাঁ দিকে ঘুরে সরু একটা পাহাড়ী রাস্তা দিয়ে নেমে একটু পরেই হাজির হলেন এসে প্রকাণ্ড একটা গোলাবাড়ির সামনে। ঘোড়ার চাবুকের বাঁট দিয়ে দ্বারে আঘাত করতেই ঘেউ ঘেউ করে ডেকে উঠল অনেকগুলো কুকুর। তার পরেই শুভ্র-মস্তক দীর্ঘকায় একটি বৃদ্ধ কম্পিত-শিখা প্রদীপ হস্তে দেখা দিলেন দ্বারপ্রান্তে। বৃদ্ধকে দেখলেই মনে হয় এককালে তিনি শক্তিশালী তো ছিলেনই, সুপুরুষও ছিলেন। কিন্তু এখন তাঁর দিন ফুরিয়েছে। একটি দাঁত নেই, কণ্ঠস্বর কম্পিত এবং অস্বাভাবিক।

"ক্ষমা করবেন"—রাজকুমার বললেন—"আমি একজন পথিক, পথ হারিয়ে ফেলেছি।"

"আসুন' —গম্ভীর সম্ভ্রমপূর্ণ কণ্ঠে আহ্বান করলেন বৃদ্ধ—"আপনি রঙ্গিলা খামারে এসে পড়েছেন। পাশেই রঙ্গিলা নদী। নদীর নামেই এই খামার। আমার নাম কীর্তিভূষণ—আপনার সেবা করবার সুযোগ পেলে আমি কৃতার্থ হব। এ জায়গাটা গর্জনগাঁওয়ের উত্তরা আর ভৈরঙ্গীর রুদ্রার ঠিক মাঝামাঝি— এদিকে দশ ক্রোশ ওদিকে দশ ক্রোশ। রাস্তা চমৎকার, কিন্তু সরাইখানা বা মদের দোকান একটিও নেই। আজ রাত্রের মতো আমারই কুঁড়ে ঘরে আতিথ্য নিতে হবে আপনাকে, সম্বর্ধনা করবার মতো আয়োজন তেমন কিছু নেই, কিন্তু যা আছে তা আপনি স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করতে পারেন"—এই বলে বৃদ্ধ হাতজোড় করে প্রণামের ভঙ্গীতে মাথা নত করলেন—" অতিথি সৎকার করা পরমভাগ্য। আপনি আসুন—"

"বেশ। অসংখ্য ধন্যবাদ—"

গন্ধরাজও মাথা নত করে নমস্কার করলেন।

বাড়ির দিকে ফিরে বৃদ্ধ হাঁক দিলেন—"নন্দী, এই ভদ্রলোকের ঘোড়াটাকে নিয়ে গিয়ে আস্তাবলে বেঁধে দাও—"

তারপর রাজকুমারের দিকে ফিরে বললেন, "আসুন, ভিতরে আসুন।"

গন্ধরাজ যে ঘরটিতে ঢুকলেন সেটি বেশ বড় ঘর। একতলার প্রায় সবটাই জুড়ে আছে যেন ঘরখানা। মনে হল ঘরখানা আগে বোধহয় ভাগ করা ছিল। কারণ ঘরের ওদিকটায় কয়েকটা সিঁড়ি রয়েছে। সিঁড়ি দিয়ে একটা উঁচু বারান্দার মতো জায়গায় উঠতে হয়। তার একধারে আগুন জ্বলছে একটা প্রকাণ্ড উনুনে। তার কাছেই শাদা প্রকাণ্ড টেবিল একটা। বোধহয় খাবার টেবিল। ঘরের এ অংশটা বেশ উঁচু। কালো কাঠের উপর পিতলের কাজ করা আসবাবপত্র। শেলফে বাসনও সাজানো রয়েছে, সেকেলে ধাঁচের বাসন সব। তাছাড়া রয়েছে বন্দুক, দেওয়ালে বড় বড় হরিণের শিং, ঠাকুর দেবতার বিবর্ণ ছবি দু'একখানা। ঘটিকা-যন্ত্রও রয়েছে তাকের উপর। ঘরের কোণে পাথরের একটা বড় কলসী, তার গায়ে নল-লাগানো। গন্ধরাজের মনে হল ওতে গৃহপ্রস্তুত সুরা আছে সম্ভবত। মনে আনন্দ সঞ্চারিত হল একথা ভেবে। চমৎকার পরিবেশ, অদ্ভুত সুন্দর।

বলিষ্ঠ একটি যুবক বেরিয়ে এসে রাজকুমারের ঘোড়াটি ধরল। কীর্তি গন্ধরাজের সঙ্গে তাঁর মেয়ে উত্তমারও পরিচয় করিয়ে দিলেন। তারপর গন্ধরাজ ঘোড়ার পিছু পিছু আস্তাবলে গিয়ে হাজির হলেন ঘোড়াটার ঠিক মতো ব্যবস্থা হচ্ছে কি না দেখবার জন্যে। আচরণটা রাজকুমারের পক্ষে অশোভন হল হয়তো, কিন্তু ঘোড়াকে তিনি এত ভালোবাসতেন যে তার থাকা-খাওয়ার সুব্যবস্থা হয়েছে কি না স্বচক্ষে না দেখলে স্বস্তি পেতেন না। আস্তাবল থেকে ফিরে এসে দেখলেন টেবিলের উপর গরম ডিম-ভাজা আর কয়েক টুকরো শূকরের মাংস তাঁর জন্য অপেক্ষা করছে। তারপর এল মাংসের কোর্মা, তারপর পুরু সর-ভাজা। গন্ধরাজের ক্ষুধা নিবৃত্ত হল। সুরা-পাত্র নিয়ে সবাই আগুনের চারিপাশে সমবেত হলেন। পাছে কোনও অভদ্রতা হয় তাই কীর্তি এতক্ষণ কোনও প্রশ্ন করেননি। এইবার করলেন।

"ঘোড়ার পিঠে অনেকটা রাস্তা এসেছেন বোধহয়।"

"ঠিকই ধরেছেন। অনেকটা রাস্তাই এসেছি। ক্ষিধের বহর দেখেই বুঝতে পারছেন সেটা। আপনার কন্যার দেওয়া খাবার একটুও নষ্ট করিনি।"

"রুদ্রার দিক থেকেই আসছেন বোধহয়।"

"হ্যাঁ। রাস্তা হারিয়ে না ফেললে আমি পার্বতীতে গিয়ে রাত কাটাতাম। কিন্তু তা তো হল না।"

নির্বিকারভাবে মিথ্যা-ভাষণটি করলেন গন্ধরাজ।

"কোনও কাজের জন্যই নিশ্চয় পার্বতীতে যাচ্ছেন?"

"না, ঠিক কাজ নয়। কৌতূহল বলতে পারেন। গর্জনগাঁওয়ের প্রসিদ্ধ শহর পার্বতীকে দেখিনি,—গর্জনগাঁওয়ের নাম শুনেছি অনেক, দেখা হয়নি এখনও।"

"চমৎকার রাজ্য, দেখে সুখ পাবেন। সব ভালো, ওখানকার লোক, ওখানকার দেওদার-বন—সব ভালো। আমরা থাকি সীমান্তের এপারে তবু আমরা নিজেদের গর্জনগ্রামের প্রজা বলেই মনে করি। রঙ্গিলা নদীর জলে গর্জনগ্রামেরই স্বাদ গন্ধ। ওর প্রতি বিন্দুতে গর্জনগ্রামেরই মহিমা। চমৎকার জায়গা গর্জনগাঁও। গর্জনগাঁওয়ের লোকেরা যে কুড়ুল চালিয়ে কাঠ কাটে ভৈরঙ্গীর লোকেরা সে কুড়ুল তুলতেই পারবে না। আর সেখানকার দেওদার, উঃ কত যে দেওদার আছে ওই রাজ্যে, অগুনতি, অসংখ্য। পৃথিবীতে যত লোক আছে তার চেয়েও বেশী দেওদার আছে বোধহয় ওখানে। কুড়ি বছর আগে আমি জল-জঙ্গল পেরিয়ে গিয়েছিলাম একবার সেখানে, বুড়ো বয়সেই এখন ঘর আঁকড়ে পড়ে আছি। কিন্তু মনে হচ্ছে যেন কাল গিয়েছিলাম। রাস্তা বরাবর চলে গেছে পার্বতীতে, কোথাও উঁচু, কোথাও নীচু, কোথাও ঢেউ-খেলানো। আর চারদিকে কেবল গাছ আর গাছ, খালি দেওদার, ছোট বড় মাঝারি নানারকম। আর চারদিকেই নদীর স্রোতকে দিয়ে কাজ করিয়ে নিচ্ছে ওরা। কত কল, কত মিল। ওখানে আমাদের ছোট্ট একটুকরো বন ছিল বড় রাস্তার পাশে। বিক্রি করে দিতে হয়েছিল সেটা। কিন্তু ওইটুকু বনের বদলে একগাদা টাকা পেয়েছিলাম। হ্যাঁ, একটি গাদা। মাঝে মাঝে তাই ভাবি সমস্ত গর্জনগাঁওয়ের গাছগুলোর দাম না জানি কত?"

"ওখানকার রাজকুমার গন্ধরাজের সঙ্গে পরিচয় নেই নিশ্চয়—"

"না"— নন্দী এবার জবাব দিলে—"পরিচয় করবার ইচ্ছেও নেই।"

"কেন! ওঁকে লোকে তেমন পছন্দ করে না বুঝি—"

"পছন্দ করে না বললে ঠিক বলা হবে না"—কীর্তি বললেন—"ওঁকে সবাই ঘৃণা করে।"

"বটে!"—অস্ফুট কণ্ঠে উত্তর দিয়ে থেমে গেলেন গন্ধরাজ।

"হ্যাঁ, ঘৃণা করে"—কীর্তি একটা লম্বা পাহাড়ী চুরুট ধরিয়ে বললেন—"আর আমার মতে ঘৃণা করবার ন্যায্য কারণও আছে। ভালো কাজ করবার কত সুযোগ পেয়েছিল লোকটা। কিন্তু কি করেছে? কিচ্ছু না। শিকার করে আর বাবুর মতো সেজেগুজে বেড়ায়। সাজগোজ মেয়েদের শোভা পায়, পুরুষের পায় কি? আর শুনেছি মাঝে মাঝে অভিনয় করে। আর কিছু করে বলে তো শুনিনি।"

"ও। কিন্তু শিকার করা, সেজে-গুজে বেড়ানো বা অভিনয় করা তো নির্দোষ আমোদ। আপনাদের কি ইচ্ছে উনি যুদ্ধ করুন ক্রমাগত?"

"না, মশাই"—বৃদ্ধ বলে উঠলেন—"আমার কথাই ধরুন। এই রঙ্গিলা খামার নিয়ে আমি পঞ্চাশ বছর আছি, পঞ্চাশ বছর ধরে এর পিছনে আমি খেটেছি। রাত-দিন খেটেছি প্রত্যহ। লাঙল দিয়েছি, বীজ ছড়িয়েছি, ফসল কেটেছি, খুব ভোরে উঠেছি, অনেক রাত পর্যন্ত জেগে থেকেছি। ফল এই হয়েছে—এই খামার এতকাল আমার পরিবারকে লালনপালন করেছে এবং আমার স্ত্রীর কথা বাদ দিলে এর চেয়ে বড় বন্ধু আমার জীবনে আর পাইনি। আমি যখন চলে যাব তখন যে খামার রেখে যাব তা আমি যা পেয়েছিলাম তার চেয়ে অনেক বড়, অনেক উন্নত। আমি বলতে চাই, মানুষ যদি আন্তরিকভাবে মেহনত করে—প্রকৃতির নিয়মও তাই—তাহলে কখনও তার অন্নবস্ত্রের অভাব হয় না, সুখশান্তিও পায়, তার স্পর্শে ধুলোমুঠি সোনামুঠি হয়ে যায়। আমরা সামান্য চাষী, তবু আমাদের মনে হয় গন্ধরাজ যদি তাঁর রাজত্বের দিকে একটু মন দিতেন, যে সিংহাসন তিনি পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে পেয়েছেন সেই সিংহাসনের দায়িত্ব যদি তিনি রাজার মতন বহন করতেন, আমি যেমন জমির পিছনে খেটেছি তিনিও যদি তাঁর রাজ্যের জন্য খাটতেন, কত ভালো হত তাহলে। সবাই ধন্য ধন্য করত, রাজ্যেরও উন্নতি হত অনেক—"

"আপনি যা বললেন তা আমি মেনে নিচ্ছি"—গন্ধরাজ উত্তর দিলেন—"কিন্তু তবু আমি বলব আপনার জীবনে আর রাজার জীবনে তফাত আছে। আকাশ-পাতাল তফাত। আপনার জীবন স্বাভাবিক এবং সরল। কিন্তু রাজার জীবন কৃত্রিম এবং জটিল। আপনার জীবনে আপনি অতি সহজেই যা উচিত তা করতে পারেন। কিন্তু রাজার পক্ষে অনুচিত কাজ না করাই খুব শক্ত ব্যাপার। কোন বার আপনার ফসল যদি না হয় আপনি আকাশের দিকে চেয়ে বলবেন—ভগবান এই যদি তোমার ইচ্ছা, তবে তাই হোক। ওইখানেই ব্যাপার মিটে গেল। কিন্তু রাজার কোন চেষ্টা যদি বিফল হয়, সবাই রাজাকেই দোষ দেবে, ভগবানকে নয়। তাই আমার মনে হয় ভারতবর্ষের রাজারা যদি নির্দোষ আমোদ নিয়ে থাকেন, প্রজারা বেশী সুখে থাকবে। রাজকার্য নিয়ে বেশী মাথা ঘামালেই বিপদ—"

"ঠিক বলেছেন, ঠিক বলেছেন"—নন্দী বলে উঠল সানন্দে—"ঠারেঠোরে যা বলছেন তাতে মনে হচ্ছে আপনি আমার দলের লোক। সত্যিকাব স্বদেশ-প্রেমিক আপনি, রাজা-রাজড়াদের শত্রু।"

তাঁর কথার যে এই নির্গলিতার্থ হবে তা ভাবেননি গন্ধরাজ। একটু লজ্জিত হয়ে পড়লেন। প্রসঙ্গান্তরে আসাই সমীচীন মনে হল।

"গন্ধরাজ সম্বন্ধে যা বললেন তা শুনে বেশ আশ্চর্য লাগছে। কিন্তু আমি তাঁর সম্বন্ধে যা শুনেছি তা এতটা খারাপ নয়। আমাকে একজন বলেছিলেন গন্ধরাজ লোক ভালো। কিন্তু তিনি নিজেই নিজের শত্রু। আর কারও সঙ্গে তাঁর শত্রুতা নেই।"

"ঠিক শুনেছেন আপনি"—কীর্তির মেয়ে উত্তমা বলল—"গন্ধরাজ নাকি চমৎকার লোক। সত্যি রাজপুত্র। তাঁর জন্যে প্রাণ বিসর্জন করতে প্রস্তুত আছেন এ রকম দু'একজন লোককে জানি—"

"ও, কুনো!"—নন্দী বলে উঠল—"ও তো একটা গাড়োল—"

"হ্যাঁ, কুনো!"—কম্পিত কণ্ঠে শুরু করলেন বৃদ্ধ—"মনে হচ্ছে এ ভদ্রলোক এ অঞ্চলে আগন্তুক, গন্ধরাজের খবর জানতে চাইছেন, মনে হয় কুনোর গল্পটা ওঁর ভালোই লাগবে। দেখুন—এই কুনোকে আমরা চিনি। কুনো হল গন্ধরাজের চাকর, শিকারের সময়ে সঙ্গে থাকে। হোঁৎকা গোছের, বুদ্ধিসুদ্ধি নেই, মদও খায় খুব অর্থাৎ ভৈরঙ্গীদের ভাষায় গর্জনগাঁওয়ের নির্ভেজাল মাল একটি। আমাদের এখানে আসে প্রায়, শিকারী কুকুরগুলো যখন বনের ভিতর ছিটকে পড়ে এদিকে ওদিকে, তাদের খোঁজে আসে এখানে। আমরা অবশ্য যত্ন করি খুব। আমার বাড়িতে গর্জনগাঁও আর ভৈরঙ্গীর ভেদাভেদ নেই, বিশেষ করে, গর্জনগাঁওয়ের সঙ্গে ভৈরঙ্গীর যখন কোনও ঝগড়া নেই তখন আসা-যাওয়ারও কোন বাধা নেই। দু'দিকের পথ খোলা, আমার দুয়ারও খোলা—"

"হ্যাঁ"—গন্ধরাজ বললেন—"গর্জনগাঁও আর ভৈরঙ্গীর মধ্যে অনেকদিন ধরে শান্তি বিরাজ করছে—অনেক শতাব্দী ধরে—"

"শতাব্দীর কথা বলছেন?"—কীর্তি বললেন প্রত্যুত্তরে—"চিরকাল নয় কেন, সেইটেই তো দুঃখ! যাক, কুনোর কথা শুনুন। কুনো একদিন কি একটা দোষ করেছিল। গন্ধরাজ রগচটা লোক, চাবকাতে লাগল কুনোকে। কুনো খানিকক্ষণ সহ্য করলে, কিন্তু আর পারলে না, গন্ধরাজের হাত থেকে চাবুকটা কেড়ে নিয়ে বললে, আসুন রাজকুমার আমরা লড়ে যাই, চাবুক দিয়ে মারা বীরত্বও নয়, মনুষ্যত্বও নয়। এ অঞ্চলে মল্লযুদ্ধ করেই সাধারণত বিবাদের নিষ্পত্তি হয়। গন্ধরাজ লড়ে গেলেন কুনোর সঙ্গে। কিন্তু কুনো হল একটা বিরাটকায় পাঠ্‌ঠা পালোয়ান, তার সঙ্গে ফড়িংবাবাজী গন্ধরাজ পারবে কেন। চাকা ঘুরে গেল। যে লোকটাকে এতক্ষণ তিনি চাবকাচ্ছিলেন সেই লোকটাই তাঁকে শূন্যে তুলে দিলে একটি আছাড়। ঠাণ্ডা হয়ে গেলেন বাছাধন!"

নন্দী বললে—"কব্জির কাছটা ভেঙে গিয়েছিল, কেউ বলে নাকটাও। ঠিক হয়েছিল। হাতাহাতি যুদ্ধ হলেই প্রমাণ হয়ে যায় কার জোর বেশী।"

"তার পর?"—গন্ধরাজ প্রশ্ন করলেন।

"কুনো তারপর কাঁধে করে তাঁকে বাড়ি নিয়ে গেল এবং তারপর থেকেই হরিহরআত্মা বন্ধু হয়ে গেল দুজনে। গল্পটা বিশ্বাসযোগ্য কি না তা জানি না"—বৃদ্ধ মুচকি হেসে বললেন—" কিন্তু মজার গল্প এটা, অদ্ভুত গল্প। মানুষকে চাবুক মারবার আগে একটু ভাবা উচিত। আমার ভাইপো নন্দী যা বললে মল্লযুদ্ধেই বোঝা যায় কার মুরোদ কতখানি—"

"এ বিষয়ে আমার অভিমত যদি শোনেন"—গন্ধরাজ হেসে বললেন—"হয়তো আপনারা আশ্চর্য হয়ে যাবেন। আমার মনে হয় গন্ধরাজই জয়ী হয়েছিলেন।"

"তা এক হিসাবে ঠিক"—গম্ভীর মুখে উত্তর দিলেন বৃদ্ধ—"ভগবানের চোখে তো নিশ্চয়ই। কিন্তু মানুষের দৃষ্টি একটু অন্যরকম। তারা এ নিয়ে ঠাট্টা করে হাসাহাসি করে।"

"তারা গানই বেঁধে ফেলেছে একটা"—বলে উঠল নন্দী—"কুনো পিণ্ডি চটকেছে, গন্ধরাজকে পটকেছে—"

গানটা শোনবার ইচ্ছা ছিল না গন্ধরাজের। বাধা দিয়ে বললেন—"তবে আমার মনে হয় গন্ধরাজের বয়স তো বেশী নয়, শেষপর্যন্ত শুধরে যাবে।"

"খুব কমও নয়, মশাই"—নন্দী বলল—"মেঘে মেঘে বেশ বেলা হয়েছে। শুনেছি চল্লিশের কম নয়।"

"ছত্রিশ"—সংশোধন করে দিলেন কীর্তি।

"ও বাবা"—উত্তমার স্বপ্ন-ভঙ্গ হল যেন—"তাহলে তো বেশ বয়স হয়েছে। লোকে বলে যৌবনে তিনি নাকি খুব সুশ্রী ছিলেন।"

"সুশ্রী না ছাই। মাথায় টাক ছিল"—নন্দী টিপ্পনী কাটল।

গন্ধরাজ তাঁর চুলের ভিতর আঙুল চালালেন একবার। খুব খারাপ লাগছিল তাঁর। পার্বতীর রাজপ্রাসাদে একঘেয়ে বিরক্তিকর সন্ধ্যাগুলিও যে এর তুলনায় অনেক ভালো।

"ছত্রিশ বছর এমন কিছু বয়স নয়"—গন্ধরাজ প্রতিবাদের সুরে বললেন, "ছত্রিশ বছরে লোক বুড়ো হয়ে যায় না। আমার বয়স ছত্রিশ বছর।"

"আমার মনে হচ্ছিল, আর একটু বেশী"—বৃদ্ধ কীর্তিভূষণ মন্তব্য করলেন—"ছত্রিশ বছরই যদি আপনার বয়স হয় তাহলে আপনি মৃগেন্দ্রকুমারের সমবয়সী। আর চেহারা দেখে মনে হয় কাজও করেছেন খুব, অলসের মতো বসে থাকেননি। আমাদের মতো বুড়োর তুলনায় বয়সটা অবশ্য কমই মনে হয়, কিন্তু ছত্রিশ বছরই বা কম কি, ছত্রিশ বছরে কত কি না করা যায়। যারা কুঁড়ে আর আড্ডাবাজ তারাই ছত্রিশ বছরে শেষ হয়ে যায়। যে লোক ভগবানে বিশ্বাস করে, ভগবানের নিয়মে চলে, ছত্রিশ বছরে তার বাড়ি ঘর নাম যশ সব হয়, স্ত্রীপুত্রকন্যা নিয়ে সুখে দিন কাটায় সে, আর তার আদর্শ তার কীর্তি অমর করে রাখে তাকে—"

"গন্ধেশ্বরের স্ত্রী আছে একটি"—হো হো করে অসভ্যের মতো হেসে উঠল নন্দী।

"এতে আপনি একটা বিশেষ আমোদ অনুভব করছেন মনে হচ্ছে।"

"হ্যাঁ, কেন করছি বুঝতে পারছেন না"—অসভ্যটা উত্তর দিলে— "সারা ভারতবর্ষ তো একথা জানে। আপনি শোনেননি?" একটা মূক অশ্লীল অভিনয় করে ব্যাপারটা স্পষ্ট করবার চেষ্টা করল সে।

বৃদ্ধ বললেন, "মনে হচ্ছে আপনি কাছেপিঠে কোথাও থাকেন না। থাকলে শুনতে পেতেন। ব্যাপার কি জানেন, গর্জনগাঁওয়ের রাজপরিবারের লোকেরা আর রাজসভার সভ্যরা সবাই মহা অসভ্য আর মহাপাজি। একটি ভালো লোক নেই। সবাই রাজভোগে মহাসুখে আছে, কাউকে খেটে খেতে হয় না, আর এর যা অনিবার্য পরিণাম তাই ঘটেছে। সব দুশ্চরিত্র। গর্জনগাঁওয়ের রাণীর প্রণয়ী আছে একটি— পূর্ব হিমাচলের কোন এক প্রদেশের মহাসামন্ত না কি লোকটা। গন্ধরাজ তো নপুংসক, ওই লোকটার ধামা-ধরা হয়ে আছে সে। শুধু তাই নয়—রাণীর প্রণয়ী ওই বিদেশী মহাসামন্তটি এখন গর্জনগাঁওয়ের হর্তা-কর্তা-বিধাতা। গন্ধরাজকে মাসে মাসে কিছু মাসোহারা দিয়ে সেই রাজকার্য চালায়। সুতরাং রাজ্য রসাতলে

যাচ্ছে। এর ভয়ংকর ফল ফলবে। আমি যদিও বুড়ো হয়েছি, তবু মনে হয় সে ফল আমি দেখেই মরব।''

নন্দী এসব শুনে উত্তেজিত হয়ে পড়ল একটু।

''কপিঞ্জলের সম্বন্ধে একটু ভুল করলে তুমি''—উত্তেজিত কণ্ঠে বলল সে—''বাকি সব যা বলেছ তা ঠিক। গন্ধরাজ যদি ওই শয়তানী রাণীটাকে টুঁটি টিপে মেরে ফেলে—এখনও আমি ওকে ক্ষমা করতে রাজি আছি।''

''না, নন্দী। অন্যায় আচরণ করে মন্দকে শোধরানো যায় না। দেখুন মশাই''—বেচারা রাজপুত্রের দিকে ফিরে তিনি আবার বলতে শুরু করলেন—''সমস্ত দোষ ওই গন্ধরাজের। সে শপথ করে তার স্ত্রীর আর রাজ্যের ভার নিয়েছিল—''

''শপথ!''—বাধা দিল নন্দী—''রাজাদের শপথে তুমি বিশ্বাস কর নাকি!''

এ কথায় কর্ণপাত না করে বৃদ্ধ গন্ধরাজকে উদ্দেশ্য করেই বলতে লাগলেন—''সে শপথ ভুলে গিয়ে সে রাণী আর রাজ্যকে সঁপে দিয়ে বসল কিনা একটা বিদেশী বোম্বেটের হাতে। বোম্বেটেটা রাণীকে ভুলিয়ে এমন স্তরে নিয়ে গেছে যে প্রত্যেক মদের ভাঁটিতে ভাঁটিতে তার নাম নিয়ে ঠাট্টা মস্করা চলছে। আর রাণীর বয়স কত জানেন? মাত্র কুড়ি। তার চেয়েও কম বোধহয়। লোকটা ক্রমাগত খাজনা বাড়িয়ে চলেছে। অস্ত্রের ঝনৎকারে সবাই সন্ত্রস্ত। যুদ্ধ বাধল বলে।''

''যুদ্ধ''—বলে উঠলেন গন্ধরাজ।

''তাই তো বলছে সবাই। যারা তাদের কাজকর্ম লক্ষ্য করে তাদের তো ওই মত। যুদ্ধই বাধবে শেষটা। সমস্ত ব্যাপারটাই দুঃখের। বড়ই দুঃখের। ওই হতভাগিনী ভ্রষ্টা রাণী সকলের অভিশাপ কুড়িয়ে নরকে যাবে সেটা দুঃখের, এমন সুন্দর রাজত্বটা সুশাসনের অভাবে ছারখার হয়ে যাবে সেটাও দুঃখের। কিন্তু যে যাই বলুক আমাব ধারণা গন্ধরাজ এঁটে উঠতে পারবে না এদের সঙ্গে। তার কৃতকর্মের ফল তাকে ভোগ করতে হবেই। ভগবান ক্ষমা করুন তাকে—''

''লোকটা শপথ ভঙ্গ করেছে, সুতরাং প্রতারক। প্রজার কাছ থেকে খাজনা আদায় করেছে কিন্তু প্রজাদের প্রতিদানে কিছু দেয়নি, সুতরাং চোর। স্ত্রীকে পরপুরুষের কোলে তুলে দিয়েছে, সুতরাং আত্মসম্মানহীন বেহায়া। আর বাকী রইল কি। বুদ্ধি? জন্ম থেকেই তো ও নিরেট!''

''সুতরাং বুঝতেই পারছেন''—কীর্তিভূষণ বললেন—''কেন আমরা গন্ধরাজের উপর চটা। মানুষ তার অন্তরের ব্যক্তিগত জীবনে সৎ আর ধার্মিক হতে পারে, আবার বাইরের সামাজিক জীবনেও হতে পারে। কিন্তু কোন লোক যদি কোন দিকেই ভদ্র না হয় তাহলে ভগবান ছাড়া তাকে আর কে বাঁচাতে পারে বলুন। ওই যে কপিঞ্জল লোকটা—যার সম্বন্ধে আমাদের নন্দী এত উচ্ছ্বসিত—''

''হ্যাঁ, কপিঞ্জলই আমার আদর্শ। ওর মতো নেতা যদি ভৈরঙ্গীতেও থাকতো তাহলে আমরা বেঁচে যেতাম।''

''লোকটা কিন্তু খারাপ''—মাথা নাড়তে নাড়তে বৃদ্ধ বললেন—''খুব খারাপ। ধর্মের বিধান যারা লঙ্ঘন করে তারা কখনও কোনও ভালো কাজ করতে পারে না। তবে এইটুকু বলতে পারি লোকটা উদ্যোগী আর পরিশ্রমী— সেটাও একটা বড় গুণ।''

তর্জনী আস্ফালন করে বলে উঠল নন্দী—''ওই কপিঞ্জলই গর্জনগাঁওয়ের একমাত্র আশা-

ভরসা। তোমার সেকেলে বাসী শুকনো আদর্শের সঙ্গে না মিললেও এটা বলতেই হবে ওই হচ্ছে আধুনিক নেতা। আধুনিক যুগের আলো আর প্রগতির ওই হচ্ছে প্রতীক। ও মাঝে মাঝে ভুল করে ফেলে মানছি—কিন্তু ভুল কে না করে—কিন্তু জনসাধারণের মঙ্গল হোক এইটেই ওর একমাত্র লক্ষ্য। আপনি তো মশাই সংস্কারমুক্ত উদার লোক আর যতদূর বুঝতে পারছি ওই রাজরাজড়াদের শত্রু, আপনি একটা কথা শুনে রাখুন—কিছুদিন পরে দেখবেন ওই নপুংসক গন্ধরাজকে আর তার স্বৈরিণী রাণীকে প্রজারা ঘাড় ধরে রাজ্য থেকে বার করে দিয়ে কপিঞ্জলকে গণ-নায়করূপে বরণ করেছে। এ হবেই, দেখে নেবেন। ওদের বক্তৃতায় আমি একথা শুনেছি। রুদ্রাতে আমি একবার একটা সভায় গিয়েছিলাম। বিরাট সভা। পার্বতীর প্রায় পনেরো হাজার লোকের প্রতিনিধিরা সেখানে বক্তৃতা দিয়েছিল। পনেরো হাজার বাজে লোক নয়, সেনাদলের পদক-প্রাপ্ত পনেরো হাজার জোয়ান। তারা ঠিক এই কথাই বললে। কপিঞ্জলের প্রভাবটা কি রকম বুঝতেই পারছেন তাহলে—"

এসব কথায় বৃদ্ধ কীর্তিভূষণ কিন্তু তেমন প্রভাবিত হলেন না।

"আরে শেষ পর্যন্ত দেখ কি হয়। ওসব লম্বা-চওড়া কথা অনেক শুনেছি, বীরত্বের আর আধুনিকতার ফাঁকা আওয়াজ গুণ্ডামি আর লুটপাটে পরিণত হতে বেশী দেরি লাগে না। তবে একটা কথা ঠিক, এই কপিঞ্জল একটি পা রেখেছেন রাজার অন্দরমহলে আর একটি পা শ্রমিক প্রজাদের উঠোনে। নিজেকে উনি গণ-নায়ক বলে প্রচার করে বেড়াচ্ছেন। বিদেশী মহাসামন্ত এদেশের গণনেতা সেজেছেন!"

"সেজেছেন!"—প্রতিবাদ করল নন্দী—"সত্যিই উনি গণনেতা। যেদিন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে সেইদিনই উনি ওঁর মহাসামন্ত উপাধি পরিত্যাগ করবেন। ওঁর বক্তৃতায় এ কথা শুনেছি।"

"মহাসামন্ত ভোল বদলে গণ নেতা হবেন! নীলবর্ণ মেখে শৃগাল হবেন পশুরাজ! আমি তো থাকব না, তোমরাই দেখতে পাবে এর কি ফল হয়।"

"বাবা"—উত্তমা বৃদ্ধের কানে কানে বলল—"ভদ্রলোক বোধহয় অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। ওঁর দিকে ভালো করে চেয়ে দেখ—"

আতিথ্য সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠলেন বৃদ্ধ।

"ক্ষমা করবেন। অনেকক্ষণ বকবক করেছি। ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন মনে হচ্ছে। একটু মাধ্বী খাবেন? খাঁটি মধু থেকে মাধ্বী তৈরি করি আমরা—"

"না, ধন্যবাদ। সমস্ত দিন ঘুরে ঘুরে শ্রান্ত হয়ে পড়েছি খুব—" গন্ধরাজ বললেন—"শরীর আর বইছে না। এখন শুয়ে পড়তে চাই—"

"নিশ্চয়, নিশ্চয়। উত্তমা আলোটা দাও। মুখটা শুকিয়ে গেছে আপনার। আর একটু শরবত খাবেন? না? থাক তাহলে। আসুন আমার সঙ্গে। ওই ঘরে আপনার শোওয়ার জায়গা হয়েছে। অনেক অতিথির পায়ের ধুলো পড়েছে ওঘরে। আসুন—"

সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগলেন দু'জনে।

"ভালো খাবার, একটু ভালো মদ, ভদ্র বিবেক, আর শোওয়ার আগে একটু হালকা গল্প-গুজব—এর চেয়ে ভালো ঘুমের ওষুধ আর কিছু নেই। আসুন—"

একটি ঘরের কপাট খুলে গন্ধরাজকে নিয়ে তিনি ছোট একটি শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করলেন।

"এই আপনার বন্দর! ছোট, তবে খুব অসুবিধা হবে না। ঘরটায় ভালো হাওয়া খেলে। বিছানাপত্রও খুব খারাপ নয়, উত্তমার এসব ব্যাপারে খুব শখ—বিছানায় আতর ছেটায়! এঘরে জানলা দিয়ে রঙ্গিলাকে দেখতে পাবেন আর তার গান শুনবেন। একই গান বরাবর শুনিয়ে আসছে ও, কিন্তু কখনও একঘেয়ে হয় না। মানুষের গান বেশীক্ষণ শোনা যায় না, কিন্তু নদীর গান শোনা যায়। মনটাকে একেবারে আকাশের তলায় নিয়ে গিয়ে দাঁড় করিয়ে দেয়। আমরা বাড়িটাড়ি বানাই বটে, কিন্তু আকাশের তলায় গিয়ে দাঁড়ালেই বোঝা যায় বাজে সময় আর অর্থ নষ্ট হয়েছে। রঙ্গিলার ওই কুলুকুলু শব্দ মনে ভারি একটা আনন্দও এনে দেয়। প্রার্থনা করবার পর যে আনন্দ হয়, অনেকটা সেই রকম আনন্দ। এবার শুয়ে পড়ুন। সকালে আবার দেখা হবে!"

বৃদ্ধ মাথা নত করে অভিবাদন করলেন, তারপর নেমে গেলেন ধীরে ধীরে।

।। তিন।।

খুব ভোরে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল গন্ধরাজের পাখিদের প্রথম কাকলীতে বনভূমি সবে জেগে উঠেছে, মন্দ সমীরণে চতুর্দিক স্নিগ্ধ। নবোদিত সূর্যকিরণের তির্যক আলোতে দেওদার গাছগুলোর সুদীর্ঘ ছায়া পড়েছে পাহাড়ের গায়ে। রাত্রিটা বড় কষ্টে কেটেছিল, পবিত্র প্রভাতের এ সংবর্ধনা ভারি ভালো লাগল। মনে হল সবার আগে যখন উঠেই পড়েছি তখন এই মনোরম পরিবেশে শরীর আর মনকে একটু চাঙ্গা করে নেওয়া যাক। ভিজে ঘাসের উপর পা দিয়ে দিয়ে হাঁটতে লাগলেন। তাঁর ছায়াও অনুসরণ করতে লাগল তাঁকে।

জাফরি-ঘেরা একটা পথ নদীর দিকে চলে গেছে দেখতে পেলেন। সেই পথেই চলতে লাগলেন গন্ধরাজ। রঙ্গিলা দুর্দান্ত পাহাড়ী নদী। খামারের কাছেই একটি ছোট পাহাড়ের উপর থেকে লাফ দিয়ে নদীটি নেমেছে ঝোপ-জঙ্গলের মধ্যে, তারপর সেখান থেকে বেরিয়ে কলকল খলখল করে বয়ে চলেছে উপত্যকার মধ্যে দিয়ে। তারপর কিছুদূর গিয়ে গর্তের মধ্যে পড়ে সৃষ্টি করেছে একটা ছোট্ট জলাশয়। তার জল যেন ফুটছে! সেই জলাশয়েব ভিতর একটা বড় পাথরের চাঙড় দেখা যাচ্ছিল, মনে হচ্ছিল যেন একটা অন্তরীপ। গন্ধরাজ কোনক্রমে সেই পাথরটার উপর উঠে পড়লেন। ভাবলেন এইখানে বসেই ব্যাপারটা একটু প্রণিধান করা যাক।

একটু দূরেই দেওদার গাছের ডালপালা আর কচি কচি পাতাগুলো একটি পরদার মতো ঝুলছিল প্রপাতের উপর। সূর্য একটু উপরে উঠতেই সেই পরদার উপর আলো পড়ল, সোনালী আর সবুজের মহিমা প্রতিফলিত হল সেই ফুটন্ত জলের উপর। মনে হতে লাগল পাথরের উপর আশ্চর্য কারুকার্য যেন মূর্ত হয়ে উঠেছে হঠাৎ। সেই দুরন্ত জলধারার সঙ্গে আলো যেন খেলা করতে লাগল, জলাশয়ের ফেনিল আবর্ত মণ্ডিত হয়ে গেল উজ্জ্বল হীরক-দ্যুতিতে। গন্ধরাজ যেখানে বসেছিলেন সেখানে রোদ এসে পড়েছিল। প্রভাতের সেই মধুর আতপ্ত পরিবেশে কেমন যেন নেশার মতো লাগছিল। মনে হচ্ছিল আলো যেন সাঁতার

কাটছে, আলো যেন জলের উপর আলপনা দিচ্ছে। যে পাথরের উপর তিনি বসেছিলেন সে পাথরটাও যেন আলোর স্পর্শে রূপবান হয়ে উঠল। প্রজাপতির মতো নাচতে লাগল প্রতিফলিত আলোর অপরূপ ছবি সব। সামনের দেওদার গাছের পরদাটা দুলতে লাগল পাহাড়ী হাওয়ায়।

সমস্ত রাত বিছানায় এপাশ-ওপাশ করে কেটেছে, যা শুনলেন তাতে সমস্ত মন গ্লানিতে আর ঈর্ষায় পূর্ণ—কিন্তু এই আলো-ছায়াময় কলধ্বনি-মুখর পরিবেশে এসে তাঁর প্রাণটা যেন জুড়িয়ে গেল। পা দুটো গুটিয়ে শুয়ে পড়লেন তিনি পাথরটার উপর। মুগ্ধ স্বপ্নাচ্ছন্ন হয়ে চেয়ে রইলেন সামনের দিকে সবিস্ময়ে। অজানা দেশের অনিশ্চিত রহস্যলোকে ঘুরে বেড়াতে লাগল তাঁর মন। নদীর মতোই তরল ধারায় প্রবাহিত হতে লাগল তাঁর অস্পষ্ট চিন্তাধারা বাধা-বিঘ্ন তুচ্ছ করে,—যেন অদৃশ্য ভাগ্যের স্রোতেই ভাসিয়ে দিলেন তিনি নিজেকে ক্রীড়াচ্ছলে। ভাসতে ভাসতে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে ঘুমের দেশে চলে গেলেন যেন। নদীর আবর্ত আর গন্ধরাজ দুই যেন এক। দুজনকেই কোন শক্তি যেন পিছন থেকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে, আবার দুজনকেই যেন কোন শক্তি পৃথিবীর এক কোণে বন্দী করে রেখেছে। বিশ্বতত্ত্বের বিরাট পটভূমিকায় কি মূল্য আছে তাদের? কিছুই নেই!

সম্ভবত গন্ধরাজ একটু ঘুমিয়েই পড়েছিলেন—কার ডাকে চমকে জেগে উঠলেন।

"শুনুন"—গন্ধরাজ ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন কীর্তিভূষণের কন্যা উত্তমা ডাকছে। একটা সলজ্জ ভয় যেন মূর্ত হয়ে উঠেছে তার ব্যবহারে। মনে হচ্ছে তাঁকে এ ভাবে ডেকে সে যেন শালীনতার সীমা অতিক্রম করছে এবং অতিক্রম করছে বলে ভয়ে আর লজ্জায় অভিভূত হয়ে পড়েছে বেচারী। সাধারণ গ্রাম্য বালিকা উত্তমা। সুস্থ, সবল, সরল, সুখী এবং সৎ। সুখ এবং স্বাস্থ্য থাকলে দেহে যে রূপ বিকশিত হয় সে রূপ তার যথেষ্ট ছিল। কিন্তু এখন তার সলজ্জ সভয় ভাব তাকে যেন আরও কমনীয় করে তুলেছে।

"নমস্কার"—পাথর থেকে উঠে তার দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন গন্ধরাজ—"আমি খুব ভোরে উঠেছি। এতক্ষণ যেন একটা স্বপ্নের ঘোরের মধ্যে ছিলাম।"

"মহারাজ"—সভয়ে সানুনয়ে বলল সে—"আমার বাবাকে ক্ষমা করুন। আপনি কে তা জানলে তিনি যা বলেছেন তা কখখনো বলতেন না। তা বলবার আগে নিজের জিভ কেটে ফেলতেন তিনি। আর ওই নন্দী—কি অসভ্যের মতো যা তা বলছিল কাল। কিন্তু আমার কেমন সন্দেহ হয়েছিল কাল রাত্রেই। সকালে উঠেই তাই আমি আস্তাবলে চলে গেলাম। গিয়ে দেখলাম যা ভেবেছি তাই, ঘোড়ার রেকাবে আপনার বজ্রাঙ্কুশ আঁকা রয়েছে। আমি জানি আপনি ওদের ক্ষমা করবেন—ওরা নিতান্তই সরল আর নিরীহ। যা শোনে, তাই বলে বেড়ায়—"

গন্ধরাজ খুশী হলেন একথা শুনে।

বললেন, "কিন্তু একটা কথা তুমি বুঝতে পারছ না। দোষ তো আমারই। নাম ধাম পরিচয় গোপন করে ওদের উসকে দিয়ে ওদের মুখ থেকে নিজের সমালোচনা শোনার কোনও মানে হয়? দোষ আমারই। কিন্তু আমার অনুরোধ, ব্যাপারটা, মানে আমার এই আত্মগোপনের ব্যাপারটা, যেন ফাঁস করে দিও না তোমরা। আমাকে ভয় নেই, আমি তোমাদের কিছু করব

না। ভৈরঙ্গীতে তোমরা তো এমনিতেই নিরাপদ, আর আমার নিজের রাজত্বে আমার কোনও ক্ষমতা নেই।"

"ওকথা বলবেন না। আমি জানি শিকারীরা আপনার জন্যে প্রাণ দিতে প্রস্তুত।"

"ও, তাহলে আমাকে সুখী রাজপুত্র বলতে পার!"—হেসে বললেন গন্ধরাজ—"কিন্তু আমি জানি সৌজন্যবশতই তুমি আসল সত্যটা চাপা দেবার চেষ্টা করছ। সত্যটা হচ্ছে আমি নামেই রাজা, বাইরের একটা লোক-দেখানো মিথ্যা শোভা। কালই তো সব শুনলে পরিষ্কারভাবে। পাথরের উপর ছায়াটা নড়ছে দেখছ? আমি ওই ছায়া আর কপিঞ্জল পাথরটা। এ ছাড়া গন্ধরাজের আর কোন মূল্য দেয় না কেউ। তোমার বন্ধুদের আমার উপর যত রাগ কপিঞ্জলের উপর যদি তত রাগ থাকত! নন্দী তো ওর সম্বন্ধে একেবারে গদগদ দেখলুম। তোমার বাবা ততটা নন, তিনি বেশ জ্ঞানী লোক বলেই মনে হল আমার, সৎলোক তো বটেই—"

উত্তমা বলল— "সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ করবেন না মহারাজ। নন্দীও ভালো ছেলে। কাল ওরা যা বলছিল তা সব বাজে কথা। গাঁয়ের লোকেরা যখন গল্পগুজব করে তখন সত্য-মিথ্যার দিকে খেয়াল থাকে না তাদের। গল্প করবার জন্যেই গল্প করে। আপনি যদি আর একটা খামারে যান আর তাদের আড্ডায় বসেন শুনতে পাবেন তারা আমার বাবার বিরুদ্ধেই কত কথা বলছে। গাঁয়ের লোকেদের ওই স্বভাব! পরনিন্দা পরচর্চা করতে পেলে আর কিছু চায় না।"

"থাম, থাম"—গন্ধরাজ বাধা দিলেন—" আমার কথাটা শোন। গন্ধরাজের বিরুদ্ধে কাল ওঁরা যা বলছিলেন—"

"সব মিথ্যে—"

"মোটেই না। সব সত্যি। ওঁরা কাল যা বলছিলেন তা সব বর্ণে বর্ণে সত্যি। ওঁরা আমাকে যত খারাপ ভাবছেন আমি তার চেয়েও খারাপ!"

"বলেন কি"—সবিস্ময়ে বলে উঠল উত্তমা—"আপনি সত্যি ওই রকম? আপনি পুরুষ নন? আমাকে যদি কেউ ওরকম ভাবে গালাগালি দিত আমি কিছুতেই সহ্য করতাম না, কিছুতেই না। আমি মজাটি টের পাইয়ে দিতাম তাদের। আর আপনাকেও তাই করতে হবে যদি আপনি মাথা উঁচু করে বাঁচতে চান। ওসব কথা শুনে কাল আপনার লজ্জা হচ্ছিল না? রাগ হচ্ছিল না? আপনার পৌরুষ বলে কিছু নেই নাকি! বিশ্বাস করি না আমি।"

"তা আছে। পৌরুষ আছে বৈ কি।"

"বেশ, তাহলে আসুন আমার সঙ্গে। আপনাকে প্রমাণ করতে হবে সেটা। আশা করি আমার উপর রাগ করছেন না?"

"তোমাকে বোঝাই কি করে!"—গন্ধরাজ বিব্রত হলেন একটু—"তুমি খুব ভালো রাঁধতে পার। কাল মাংসের যে কোর্মাটি রেঁধেছিলে তা চমৎকার, খুব তৃপ্তি করে খেয়েছি। এই সুযোগে ধন্যবাদটাও দিয়ে দিচ্ছি। তুমি ভালো রাঁধুনী, কিন্তু তুমি কি দেখনি, আনাড়ী রাঁধুনীর হাতে ভালো মসলা, ভালো মাংস দিলেও তা সুখাদ্য হয় না, অখাদ্য হয়? তার হাতে পায়েস পুড়ে যায়, সন্দেশের পাক ঠিক হয় না। তরকারিতে নুনের বদলে সে চিনি দিয়ে ফেলে, গরম মসলার বদলে হলুদ। আমার অবস্থাও অনেকটা সেই রকম। আমার নাগালের

মধ্যে মালমসলা বা উপকরণের অভাব নেই, কিন্তু রান্না অখাদ্য হয়েছে। আমি বার বার সুক্তুনিতে ঝাল আর অম্বলেতে ঘি দিয়ে ফেলেছি—"

"আমি অতশত বুঝতে চাই না। আমি জানি আপনি ভালো— "সত্যি ভালো"—বলেই একটু লজ্জা পেয়ে গেল উত্তমা।

"আমি একটা কথা যদি বলি, তুমি রাগ করবে না তো"— গন্ধরাজ মৃদু হেসে বললেন, "ভালো আমি নই, ভালো তুমি। তুমি চমৎকার—"

"আপনার সম্বন্ধে সবাই ওই কথাই বলে। মেয়েদের খোশামোদ করতে আপনি খুব পটু।"

"ভুলে যেও না, আমি প্রৌঢ় প্রবীণ লোক। কি বলছ!"

গন্ধরাজের চোখে মুখে চাপা-হাসি চিকমিক করতে লাগল।

"সত্যি কথা বলব? রাগ করবেন না তো? আপনি প্রবীণ তো ননই, আপনি একটি দুষ্টু ছেলে। রাজা হোন বা যাই হোন, আমার রান্নাঘরে যদি আপনি আমাকে বিরক্ত করতে আসতেন আমি আপনাকে খুনতির ছেঁকা দিয়ে দিতাম। ওমা, কি সব বলছি আমি! রাগ করলেন মহারাজ? কিন্তু আমি যে মনের কথা চেপে রাখতে পারি না—"

"আমিও পারি না"—গন্ধরাজ বললেন—"এই জন্যেই তো সবাই গাল দেয় আমাকে—"

মনে হতে লাগল ওরা যেন প্রণয়ী-প্রণয়িনী। একটু অবশ্য তফাত ছিল, ওরা ফিসফিস করে কথা বলছিল না। জলপ্রপাতের ঝরঝর শব্দের জন্য বেশ চেঁচিয়ে চেঁচিয়েই কথা বলতে হচ্ছিল। কিন্তু পাহাড়ের উপর থেকে কেউ যদি দেখতে পেত তাহলে ওদের এই ঘনিষ্ঠতা দেখে সন্দেহ হত তার। হয়তো একটু রাগও হত। উপরের একটা ঝোপের আড়াল থেকে হঠাৎ কে যেন চীৎকার করে উত্তমার নাম ধরে ডাকতে লাগল। উত্তমার কান দুটো লাল হয়ে উঠল লজ্জায়। "নন্দী ডাকছে। আমি যাই—"

"যাও। আমার সম্বন্ধে ভয় আশা করি ভেঙে গেছে। আমি যে ভয়ংকর কিছু একটা নই তা এতক্ষণে বুঝতে পেরেছ নিশ্চয়।"

তারপর দু'হাত তুলে তিনি বিদায়-অভিনন্দন জানালেন তাকে অনেকটা থিয়েটারি ভঙ্গীতে। উত্তমা হরিণীর মতো লাফিয়ে লাফিয়ে উপরে উঠে গেল এবং উপরের ঝোপটায় অদৃশ্য হয়ে গেল একটু পরেই। অদৃশ্য হবার ঠিক আগেই হাসিমুখে ফিরে চাইল একবার, তারপর মাথার ছোট্ট একটা ঝাঁকানি দিয়ে ঢুকে পড়ল ঝোপে। হাসিমুখে চাইল তার কারণ আবার সে ভুলে গিয়েছিল যে তাদের অতিথি সামান্য লোক নন—গর্জনগ্রামের অধীশ্বর গন্ধরাজ।

গন্ধরাজ আবার তাঁর অন্তরীপে ফিরে গেলেন। তাঁর মেজাজের রংটা বদলে গিয়েছিল একটু। বেলা বাড়াতে জলাশয়ের উপর রোদ পড়েছিল, তার বাদামী রঙের উৎসারিত জলরাশির উপর প্রতিফলিত হয়েছিল নীল আকাশ আর দেওদার গাছের বাসন্তী মহিমা-মণ্ডিত পত্র-পল্লবের অপূর্ব কারুকার্য। মনে হচ্ছিল যেন আরব্য উপন্যাসের কোন পসারিণী গহনার পসরা মেলে ধরেছে সামনে। আবর্তের তরঙ্গে তরঙ্গে বিচ্ছুরিত হচ্ছিল বিচিত্র বর্ণহিল্লোল। উপত্যকার এই অপূর্ব সৌন্দর্য দেখে মনটা করকর করছিল গন্ধরাজের। জায়গাটা তাঁর রাজ্যের এত কাছে, অথচ রাজ্যের ভিতরে নয়, ঠিক বাইরে। তাঁর নিজের রাজ্যে এরকম হাজার হাজার সুন্দর জায়গা আছে, কিন্তু তাদের সম্বন্ধে তাঁর কোন মোহ নেই। কিন্তু যেহেতু

এ জায়গাটা তাঁর রাজ্যের সীমার বাইরে, যেহেতু এটা অপরের সম্পত্তি, তাই তাঁর মনে কেমন যেন একটু ঈর্ষা জাগল, কেমন যেন একটা শিল্পীসুলভ ঈর্ষা। মুখে মৃদু হাসি ফুটিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে এই মৃদু ঈর্ষার পীড়া ভোগ করছিলেন তিনি। কীর্তিভূষণ আসাতে একটু আরাম বোধ করলেন।

"আশা করি গরীবের কুঁড়ে ঘরে ঘুমুতে আপনার কষ্ট হয়নি কাল রাত্রে"—প্রথমেই বললেন কীর্তিভূষণ।

একথার জবাব না দিয়ে গন্ধরাজ বললেন—"আপনার এই সুন্দর স্থানটির শোভা উপভোগ করছি ভোর থেকে। আপনি এই জায়গায় থাকেন, আপনি সৌভাগ্যবান।"

"হ্যাঁ, সুন্দর বটে, কিন্তু জংলী জায়গা। তবে এখানকার জমিটমিগুলো ভালো। পশ্চিমদিকের জমিগুলো খুব উর্বরা। ওদিকে যদি যান আমার গমের ক্ষেতটা দেখবেন। গর্জনগাঁও বা ভৈরঙ্গী কোথাও আপনি রঙ্গিলা খামারের জোড়া পাবেন না। কোথাও বারো আনা ফসল ফলে, কোথাও বা চোদ্দ আনা। ষোল আনা ফলে এমন জায়গাও আছে দুএকটা। কিন্তু আমার কত ফলে জানেন? বিশ আনা! অন্য জায়গার জমি যে খারাপ তা নয়, কিন্তু সবাই জমির পিছনে খাটে না। খাটা চাই—'

"নদীতে মাছ আছে নিশ্চয়—"

"হ্যাঁ, ওই যেখানটায় জল জমেছে ওটা তো মাছে ভরতি। জায়গাটা সময় কাটাবার পক্ষে চমৎকার। রঙ্গিলার কলকল শব্দ, চারদিকে সবুজ গাছপালা আর পাহাড়। আর দেখেছেন, পাথরের নুড়িগুলো যেন নানারঙের দামী পাথর! সময় কাটাবার পক্ষে খুব ভালো জায়গা। কিন্তু একটা কথা বলছি, মাপ করবেন। আপনার যা বয়স এখন বাতের সম্বন্ধে সাবধান হওয়া উচিত আপনার। তিরিশ আর চল্লিশ বছরের মধ্যেই বাতের শুরু হয়। সাবধান না হলেই পেড়ে ফেলবে শেষে। এ জায়গাটা চমৎকার সন্দেহ নেই, কিন্তু বড্ড স্যাঁতসেঁতে। খালি পেটে এত সকালে এখানে বসে থাকা ঠিক নয়। যদি আপত্তি না থাকে, চলুন এবার আমার সঙ্গে—"

"না, না, আপত্তি কি। চলুন। সত্যি জায়গাটি সুন্দর। আপনার সারাজীবন কি এখানে কেটেছে?"

চলতে চলতে প্রশ্ন করলেন গন্ধরাজ।

"আমি এখানে জন্মেছি। আর এখানে মরতেও চাই। কিন্তু সব ইচ্ছা তো পূর্ণ হয় না। অদৃষ্টই চালক, সে যেখানে নিয়ে যাবে সেইখানেই যেতে হবে। সবাই বলে অদৃষ্ট না কি অন্ধ, কিন্তু আশা করি একেবারে অন্ধ নয়, আশা করি খানায় খন্দে ফেলে দেবে না আমাকে। আমার ঠাকুরদা, আমার বাবা আর আমি—আমরা এখানকার জমি চষেছি। আমার লাঙলের দাগ, তাদের লাঙলের দাগকে অনুসরণ করেছে। আমাদের বাগানের বেঞ্চিটায় তিনজনের নামই খোদাই করা আছে—কর্মভূষণ, ধর্মভূষণ আর কীর্তিভূষণ। কর্মভূষণ আর ধর্মভূষণ ওই বাগানেই দেহ রেখেছেন। বাবার একটা ছবি আমার খুব মনে আছে এখনও। রাত্রে একটা কালো টুপি পরে একটা লম্বা চুরুট ধরিয়ে তিনি চারিদিকে ঘুরে ঘুরে দেখছিলেন। সেই শেষবারের মতো দেখছিলেন। হঠাৎ আমাকে বললেন—"কীর্তি চুরুটের ধোঁয়াটা দেখছিস? মানুষের জীবনও ওই ধোঁয়ার মতো!" ওই তাঁর জীবনের শেষ চুরুট খাওয়া। আমার মনে হয় তিনি বুঝতে পেরেছিলেন সেটা। সমস্ত ফেলে চলে যাওয়ায়—অদ্ভুত ব্যাপার একটা। যে গাছ

তিনি নিজের হাতে পুঁতেছিলেন, যে ছেলেকে তিনি মানুষ করেছিলেন, যে চুরুট তিনি নিজের হাতে তৈরি করে খেতেন, যেখানে তাঁর প্রথম যৌবন প্রথম প্রেম ফুলের মতো ফুটেছিল— এই সব ছেড়ে চিরদিনের মতো চলে যাওয়া—আশ্চর্য, নয়? কিন্তু এই তো ভবিতব্য। এর পর কি আছে কে জানে। অনন্ত স্বর্গ? কে জানে সত্যি তা কোথাও আছে কি না। বিশ্বাস করতে অবশ্য ভালো লাগে, খুবই ভালো লাগে। কিন্তু অপরিচিত জায়গায়, অচেনা খাটে শুয়ে মরতে ভালো লাগে না আমার। যে পরিবেশে জীবন আরম্ভ করেছিলাম সেই পরিবেশেই তা শেষও করতে চাই—"

"করবেনই তো। করবার বাধাটা কোথায়?"

"বাধা আছে। দশ হাজার টাকা দাম উঠেছে। দু হাজার টাকা হলে মেরে কেটে আমিই কিনে ফেলতে পারতুম, না বড়াই করছি না, দু'হাজার টাকা আমি যোগাড় করতে পারতুম নিশ্চয়। কিন্তু দশ হাজার টাকা পারব না। নতুন জমিদার যিনি হবেন তিনি যদি আমাকে উচ্ছেদ করতে চান তাহলে পোঁটলাপুঁটলি গুটোতেই হবে আমাকে। গত্যন্তর নেই।"

এই সংবাদে গন্ধরাজ উল্লসিত হলেন মনে মনে। জায়গাটা তাঁর ভালো লেগেছিল, এ সংবাদ শুনে আরও ভালো লেগে গেল। যা তিনি কাল শুনলেন তা যদি সত্যি হয় তা হলে গর্জনগ্রামে তো তিনি টিকতে পারবেন না। রাজবংশের উত্তরাধিকারীকে তো আর আমলই দেবে না কেউ। গণতন্ত্র স্থাপন করতে ব্যগ্র হয়ে উঠেছে সবাই। সুতরাং তাঁকে অন্য একটা আশ্রয় খুঁজতে হবে। তাই যদি হয় তাহলে এ জায়গাটার চেয়ে ভালো জায়গা আর কোথায় পাবেন তিনি? কীর্তিভূষণকে তাঁর ভালোও লেগেছিল। তাছাড়া প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই মহত্ত্ব আস্ফালন করবার লোভ থাকে একটা। যে লোকটি কাল রাত্রে তাঁর অত নিন্দা করছিল তাকে তিনি যদি এই বিপদ থেকে বাঁচাতে পারেন তাহলে একটা মহৎ প্রতিশোধও নেওয়া হবে। কথাটা মনে হয়েছে বলে নিজের উপরই তাঁর শ্রদ্ধা বেড়ে গেল যেন।

"দেখুন, আমি একজন ভালো খরিদ্দার যোগাড় করে দিতে পারি, সে আপনাকে উচ্ছেদ করবে না। আপনি যেমন আছেন তেমনই থাকবেন।"

"পারেন না কি! সত্যি! তাহলে তো বেঁচে যাই আর কেনা গোলাম হয়ে থাকি আপনার। সারা জীবন ঈশ্বরের উপরই বিশ্বাস করে এসেছি—শেষ জীবনে হতাশ হয়ে পড়েছিলাম। মনে হচ্ছিল সবই বৃথা হল।"

"আপনি দলিলপত্র ঠিক করতে বলুন। সে দলিলে এটাও লিখিয়ে নিতে পারেন যে আপনার জীবদ্দশায় ক্রেতা আপনাকে উচ্ছেদ করতে পারবেন না।"

"কিন্তু তার পর? আপনার বন্ধু কি নন্দীর সম্বন্ধে কিছু করতে রাজি হবেন?"

"নন্দী তো এখন ছেলেমানুষ। সে আগে তার যোগ্যতা প্রমাণ করুক—"

"নন্দী আমার সঙ্গে বরাবর কাজ করেছে। সমস্ত কাজকর্ম ওর নখদর্পণে। আমি বুড়ো হয়েছি তো, আসছে বৈশাখে আটাত্তর বছরে পড়ব। আমার মৃত্যুর পর নূতন মালিকের পক্ষে আবার নূতন লোক খোঁজা কি সহজ হবে? আমার মৃত্যুর পর নন্দীই যদি এখানে থাকে তাহলে আমি শান্তিতে মরতে পারব। যিনি নূতন মালিক হবেন তিনি যদি পুরুষানুক্রমে আমাদের এ খামারে কাজ করবার অনুমতি দেন তাহলে ক্ষতি কি।"

"নন্দীর মতি-গতি কিন্তু ভালো নয়। কেমন যেন একটু উচ্ছৃঙ্খল উদ্ধত গোছের—"

"যিনি কিনবেন তিনি হয়তো—"

ঈষৎ ক্রোধের রক্তিমা ফুটে উঠল গন্ধরাজের গালে।

"আমিই কিনব—"

খুব ঝুঁকে অভিবাদন করে বৃদ্ধ সসম্ভ্রমে বললেন—"সে কথা আমার ভাবা উচিত ছিল। ভগবান আপনার মঙ্গল করুন। এই বুড়োর মনের ভার নামিয়ে দিলেন আপনি। কাল যে আমি একজন দেবদূতকে অতিথিরূপে পেয়েছিলাম তা ভাবিনি। পৃথিবীতে যারা বড় লোক— মানে যারা পদস্থ লোক—তারা যদি আপনার মতো উদার হত তাহলে গরীবদের ঘরে ঘরে আনন্দের বান বয়ে যেত—"

"বড় লোকদের সম্বন্ধে রূঢ় হতে আমি চাই না। দুর্বলতা কার নেই?"

"তা তো ঠিকই, তা তো ঠিকই। আমার নূতন জমিদারকে কি নামে ডাকব?"

গন্ধরাজের মন পড়ল তাঁর রাজসভায় এক সপ্তাহ আগে একটি বাঙালী পর্যটক এসেছিলেন, আর যৌবনে 'অংশুমালী' নামে একটি দুষ্টপ্রকৃতির বাঙালীর সঙ্গেও আলাপ হয়েছিল তাঁর।

বললেন—"আমার নাম অংশুমালী। আমি একজন বাঙালী পর্যটক। আজ মঙ্গলবার, আগামী বৃহস্পতিবারে দুপরের আগেই টাকাকড়ি নিয়ে আমি প্রস্তুত থাকব। পার্বতীতে শুকতারা নামে যে সরাইটা আছে, সেইখানেই আসুন আপনি, যদি আপনার অসুবিধা না হয়—"

"না, না, কিছুমাত্র অসুবিধা নেই। আপনি যেখানে হুকুম করবেন সেইখানে যাব। বে-আইনী কাজ ছাড়া আর সব কাজ করতে আমি প্রস্তুত। আপনি বাঙালী? মস্ত জাত বাঙালী। বাঙালী পাল রাজারা পৃথিবীখ্যাত। বাঙালী পর্যটকরাও পৃথিবীর সর্বত্র গেছেন। আপনি বাঙালী! আচ্ছা, জমি সম্বন্ধে আপনার কোনও অভিজ্ঞতা আছে তো—"

"আগে ছিল কিছু-কিছু"—গন্ধরাজ হেসে উত্তর দিলেন—"কিন্তু ওই যে আপনি বললেন অদৃষ্টই চালক। এখন এখানে এসে পড়েছি, দেখি এখানে যদি কিছু সুবিধা করতে পারি। সবই ভগবানের হাত—"

"নিশ্চয়। সে কথা আর বলতে—"

চিন্তিতমুখে দুজনেই পাশাপাশি হাঁটতে লাগলেন। গোলাবাড়ির কাছাকাছি এসে পড়েছিলেন তাঁরা, জাফরি দেওয়া রাস্তাটা ধরে উপরে উঠছিলেন। একটু উপরে কাদের কথাবার্তার শব্দ অস্পষ্টভাবে শুনতে পাওয়া যাচ্ছিল। তাঁরা যতই উপরে উঠতে লাগলেন ততই স্পষ্ট হতে লাগল সেটা। একটু পরে তাঁরা উপরে উঠে পড়লেন। দেখা গেল দূরে উত্তমা আর নন্দী রয়েছে। নন্দীর চোখ লাল, মুখ কালো, সে চীৎকার করে কর্কশকণ্ঠে কি যেন বলছে নিজের প্রসারিত করতলের উপর ঘুঁষি মেরে মেরে আর একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে উত্তমা, তারও মুখ লাল, সে-ও অনর্গল কি সব বলে চলেছে। তার বেশবাস বিস্রস্ত, চোখের দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্ত।

"কি কাণ্ড!"—কীর্তিভূষণ সেখান থেকে চলে যাওয়াই উচিত মনে করে অন্যদিকে মুখ ফেরালেন।

কিন্তু গন্ধরাজ সোজা চলে গেলেন প্রণয়ীযুগলের দিকে। ঝগড়ার কারণ তিনি বুঝতে পেরেছিলেন এবং ঝগড়ার মূল যে তিনিই এটাও অনুমান করে নিতে বিলম্ব হয়নি তাঁর। গন্ধরাজকে দেখেই নন্দী থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল, একটা মৌন প্রতিবাদ আর বিদ্রোহ যেন মূর্ত হয়ে উঠল তার সর্বাঙ্গে।

"ও আপনি এসে গেছেন!"—চীৎকার করে বলে উঠল সে—"আপনি ভদ্রলোক, আশা করি আপনি আমার কথার ভদ্র জবাব দেবেন একটা। ওখানে কি করছিলেন আপনারা? ঝোপের ধারে লুকিয়ে লুকিয়ে কি করা হচ্ছিল! ছি, ছি, ছি"—হঠাৎ উত্তমার দিকে ফিরে সে বলল—"কি কুক্ষণেই যে তোমাকে আমি ভালোবেসেছিলাম। তুমি এই তা যদি জানতাম—"

"শুনুন"—গন্ধরাজ বাধা দিলেন—"আমার সঙ্গে কথাটা আগে শেষ করে নিন। আপনি আমার কাছে এই মেয়েটির আচরণ সম্বন্ধে জানতে চাইছেন। জিজ্ঞাসা করতে পারি কি কোন অধিকারে চাইছেন? আপনি কি ওর বাবা, না দাদা, না স্বামী?"

"ওর সঙ্গে আমার যে কি সম্পর্ক তা সবাই জানে, আপনিও হয়তো আন্দাজ করেছেন। ও আমার সঙ্গিনী, ওকে আমি ভালোবাসি আর আমার ধারণা আমাকেও সম্ভবত ভালোবাসে ও। জানি না, ব্যাপারটা এখন গোলমেলে ঠেকছে। আমি সেটা ওর সামনেই স্পষ্ট করে নিতে চাই। আমারও আত্মসম্মান বলে একটা জিনিস আছে—"

গন্ধরাজ বললেন, "তাহলে প্রেম কি সেটা আপনাকে বোঝানো দরকার। মমতাই হচ্ছে প্রেমের মাপ কাঠি। আপনার আত্মসম্মান আছে বলছেন, কিন্তু ওরও আত্মসম্মান আছে হয়তো। আমি নিজের স্বপক্ষে কিছু বলব না। তবে একটা কথা জেনে রাখুন আপনার সব আচরণও যদি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করা যায় আপনি বেকায়দায় পড়ে যাবেন।"

"দেখুন, এসব তুলনার কোনও মানে হয় না"—নন্দী একটু উদ্ধত ভাবেই বলল—"আমি পুরুষ আর ও মেয়েমানুষ। আমাদের দুজনের ওজন এক নয়। পুরুষ চিরকালই শ্রেষ্ঠ আছে এবং থাকবে। এর অন্যথা কোনও কালে হবে না। হবে কি? দিন, এবার আমার কথার জবাব।"

"মানব-সভ্যতার সম্বন্ধে আর একটু জ্ঞান থাকলে আপনার মত বদলে যেত। ওজনের কথা বলছিলেন? একটা কথা আপনি ভাবেননি যে ভুয়ো বাটখারা দিয়ে আপনি আপনার ওজন বাড়িয়েছেন। নানারকম বাটখারা ব্যবহার করেন আপনারা। মেয়েদের জন্যে একরকম বাটখারা, পুরুষদের জন্যে আর একরকম। রাজা-রাজড়াদের জন্যে একরকম বাটখারা, গরীব-গুরবোদের জন্যে আর একরকম। গন্ধরাজ তাঁর স্ত্রীর সম্বন্ধে উদাসীন, তাঁর সমালোচনায় আপনি পঞ্চমুখ। কিন্তু প্রণয়ী যদি প্রণয়িনীকে অপমান করে সে সম্বন্ধে আপনি কি বলবেন? আপনি ভালোবাসা কথাটা বললেন। এ মেয়েটি আপনার মতো লোকের ভালোবাসার কবল থেকে যদি মুক্তি পেতে চায় তাহলে খুব অন্যায় হবে কি সেটা? আমি একজন বিদেশী, আপনি ওর সঙ্গে বর্বরের মতো যে ব্যবহার করেছেন, আমি যদি তার শতাংশের একাংশও করতাম তাহলে আপনি আমার মাথা ফাটিয়ে দিতেন। আর ঠিক কাজই হত সেটা, প্রণয়ী হিসাবে ওর মর্যাদা রক্ষা করা আপনার কর্তব্য। কিন্তু আমি বলছি আপনার কাছ থেকেই আগে বাঁচান ওকে। কারণ আপনার আচরণ ভদ্র নয়। ও মেয়েমানুষ বলেই ওকে অপমান করবার অধিকার আপনার নেই—"

"ঠিক বলেছেন, ঠিক বলেছেন"—বৃদ্ধ কীর্তিভূষণ মাথা নেড়ে নেড়ে সায় দিলেন—"শাস্ত্রও ওই কথা বলে।"

নন্দী একটু হকচকিয়ে গিয়েছিল। গন্ধরাজের গম্ভীর অবিচলিত ব্যবহার তো ঘাবড়ে দিয়েইছিল তাকে, সে আরও ঘাবড়েছিল নিজের ব্যবহারের জন্য। সে যে অন্যায় করেছে এটা

বুঝতে পেরেছিল সে। বিশেষ করে মানব-সভ্যতার দোহাই দিয়ে গন্ধরাজ যা বললেন তা মর্ম স্পর্শ করেছিল তার, সে সহসা যেন উপলব্ধি করল যদিও সে নিজেকে এতদিন সভ্য বলে মনে করে আত্মপ্রসাদ লাভ করে এসেছে কিন্তু মানব-সভ্যতার ধারে কাছেও যেতে পারেনি সে।

"আমি যদি অন্যায় করে থাকি স্বীকার করব সেটা"—নন্দী বলল—"তবে আমি বেদস্তুর কিছু করিনি। তবে এ কথাও আমি বলব ওই সব সেকেলে ছ্যাঁচড়ামিও আমি পছন্দ করি না। আমি যদি রূঢ় আচরণ করে থাকি, ক্ষমা চাইছি সেজন্য—"

"হয়েছে, হয়েছে, খুব হয়েছে—" বলে উঠল উত্তমা।

"কিন্তু আমি যা জানতে চাইছি তা তো তুমি বললে না। তোমরা ওখানে কি কথা বলছিলে সেইটেই আমি জিগ্যেস করছি। ও বলছে আপনার কাছে না কি ও প্রতিশ্রুতি দিয়েছে সে কথা কাউকে বলবে না। কিন্তু আমি জানতে চাই সেটা। ভদ্রতার মান অবশ্যই আমি রাখব, কিন্তু ছলচাতুরী আমি সহ্য করব না। দুজনকে যদি একসঙ্গে থাকতে হয় তাহলে ঢাক-ঢাক গুড়-গুড় চলবে না।"

গন্ধরাজ বললেন, "বেশ, আপনার বাবাকে জিগ্যেস করলেই বুঝতে পারবেন সব। আমি বাজে সময় নষ্ট করছিলাম না। আজ সকালবেলা উঠেই আমি ঠিক করেছি যে এই রঙ্গিলা খামার আর তার আশপাশের জমি জায়গা আমি কিনে নেব। এরকম অশোভন কৌতূহলকে আমি প্রশ্রয় দিই না, আপনার খাতিরে এইটুকু বললুম শুধু—"

"ও, আপনি বৈষয়িক ব্যাপারে লিপ্ত ছিলেন? তাহলে অবশ্য আলাদা কথা সেটা। কিন্তু এতে গোপন করবারই বা কি আছে তা-ও বুঝতে পারছি না। তবে আপনি যদি আমাদের খামারের মালিক হন তাহলে অবশ্য আপনার সঙ্গে কথা কাটাকাটি করতে চাই না।"

"নিশ্চয়ই না" দৃঢ়কণ্ঠে বলে উঠলেন কীর্তিভূষণ।

উত্তমা এবার রুখে উঠল। বিজয়িনীর মতো বললে—"এইবার শুনলে তো? কি বলেছিলাম আমি তোমাকে? বলেছিলাম যে তোমাদের জন্যেই আমি অনুরোধ করেছিলাম ওঁকে। এবার শুনলে তো? কি জঘন্য সন্দেহবাতিক তোমার। ছি, ছি, ছি। তোমার উচিত ওঁর কাছে আর আমার কাছে হাঁটু গেড়ে ক্ষমা চাওয়া।"

।। চার।।

দুপুরের একটু আগে গন্ধরাজ কৌশলে সরে পড়লেন রঙ্গিলা খামার থেকে। কীর্তিভূষণের সাড়ম্বর উচ্ছ্বাস এবং উত্তমার গোপন কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন এড়িয়ে গা ঢাকা দিয়ে বেরিয়ে পড়লেন তিনি, কিন্তু নন্দীকে অত সহজে এড়াতে পারলেন না। এই চতুর ছোকরাটির মনে সম্ভবত কোনও সন্দেহ জেগেছিল। সে বললে, "চলুন আমি আপনাকে কিছুদূর এগিয়ে দিই।" গন্ধরাজ 'না' বলতে পারলেন না। তাঁর মনে হল 'না' বললে উত্তমার সম্পর্কে যে ঈর্ষা আর সন্দেহ তার মনে জেগেছে সেটা বেড়ে যাবে হয়তো। কিন্তু ওর সঙ্গটা পছন্দ করছিলেন না তিনি মোটে। নন্দী কিছুক্ষণ নীরবে তাঁর ঘোড়ার সঙ্গে সঙ্গে চলল। অনেক দূর গিয়ে একটু ইতস্তত করে আত্মপ্রকাশ করল সে অবশেষে।

"আপনি কি একজন বিদ্রোহী?"

"না। বিদ্রোহী কেন হতে যাব। একথা মনে হচ্ছে কেন আপনার।"

"গোড়া থেকেই আপনার কথাবার্তা থেকে তাই মনে হচ্ছিল। ওই বুড়োর ভয়েই আপনি মুখ খোলেননি। আভাসে ইঙ্গিতে কথা বলছিলেন। ঠিকই করেছেন ঃ বুড়োরা প্রায়ই ভীতু হয়, সেকেলে ধরনধারণ নিয়মকানুনই আঁকড়ে থাকতে চায় তারা। কিন্তু আজকাল কে যে ঠিক কোন দলের তা-ও তো বোঝা কঠিন, বিদ্রোহের পথে কে যে কতটা অগ্রসর তা প্রথম প্রথম বোঝবার উপায় থাকে না। আমিও প্রথমটা ধরতে পারিনি আপনাকে, কিন্তু আপনি যখন মেয়েদের কথা আর স্বাধীন প্রেমের কথা বললেন তখনই আপনাকে চিনে ফেললাম।"

"কই না"—গন্ধরাজ বললেন—"ওসব কথা তো আমি বলিনি।"

"বলেননি! বুঝতে পেরেছি। ধরা-ছোঁওয়া দিতে চান না। কেবল বীজ ছড়িয়ে দিয়ে চলে যেতে চান। আমাদের দলপতি ওকে 'বীজ টোপ' বলেন। ঠিকই করেছেন। কিন্তু আমার চোখকে ফাঁকি দেওয়া শক্ত, আমি নানা দলের সঙ্গে পরিচিত, তাদের মতামত ধরনধারণও জানি।" তারপর নিম্নকণ্ঠে সে বললে—"আপনাকে বলতে বাধা নেই, আমিও গুপ্ত সমিতির একজন সভ্য। এই দেখুন আমার পদক।" সে সবুজ-ফিতে-দিয়ে-বাঁধা একটা দস্তার পদক বার করল। তার গলায় ঝোলানো ছিল সেটা। গন্ধরাজ দেখলেন তার একদিকে আঁকা রয়েছে একটি কোষমুক্ত কৃপাণ আর একদিকে লেখা রয়েছে—"গণ-স্বাধীনতা"।

"এখন আশা করি আর আপনার সন্দেহ নেই। আপনি আমাকে বিশ্বাস করতে পারেন। সরাইখানায় যারা মদের ঝোঁকে রাজা-উজীর মারে, আমি তাদের দলের নই। আমি একজন খাঁটি বিদ্রোহী।"

উদ্ভাসিত দৃষ্টি তুলে সে চাইল গন্ধরাজের দিকে।

"ও তাই বুঝি"—গন্ধরাজ একটু বিস্ময়ের ভান করে বললেন—"বাঃ, বাঃ, খুব আনন্দের কথা। কিন্তু একটা কথা মনে রাখতে হবে। দেশের ভালো করতে হলে আগে নিজে ভালো হতে হবে। ওইটেই প্রথম এবং প্রধান কাজ। আপনি ঠিকই ধরেছেন, রাজনীতি নিয়েই আমি মাথা ঘামাই, কিন্তু আমি নেতা হতে পারিনি, কারণ আমার মেজাজ, আমার বুদ্ধি নেতা হওয়ার মতো নয়। হয়তো উপনেতা হতে পারতুম, কিন্তু তা-ও হয়েছি কিনা জানি না। কিন্তু তবু আমাদের প্রত্যেককেই কিছু না কিছু শাসন করতেই হয়, নিজের মন-মেজাজকে নিজের চরিত্রকে শাসন করাও কম কাজ নয়। বিশেষ করে যে লোক বিয়ে করবে ঠিক করেছে তার তো এ বিষয়ে কড়া নজর রাখা দরকার। রাজার পদই বলুন আর স্বামীর পদই বলুন—দুটোই কৃত্রিম ব্যাপার। কড়া শাসন না করলে কোন পদই বজায় রাখা যায় না। একটু ঢিলে দিলেই মুশকিল। বুঝতে পারছেন আমার কথা।"

"হ্যাঁ পারছি বই কি।"

নন্দী কিন্তু এ ধরনের উত্তর আশা করেনি। মনে মনে একটু হতাশ হয়ে পড়ল বেচারা। তারপর আবার একটু সাহস সঞ্চয় করে জিজ্ঞাসা করল—"আপনি যে রঙ্গিলা খামার কিনছেন, এখানে দুর্গটুর্গ করবার ইচ্ছে আছে না কি!"

"এখনও ঠিক করিনি কিছু"— হেসে ফেললেন গন্ধরাজ—"খুব বেশী উত্তেজিত হবেন না এ নিয়ে। আর এ নিয়ে কাউকে কিছু বলবেন না। এ সব চাউর হওয়া ঠিক নয়।"

"আপনি আমাকে বিশ্বাস করতে পারেন"—গন্ধরাজ তাকে যে স্বর্ণমুদ্রাটি দিলেন সেটি ট্যাঁকে গুঁজে সোৎসাহে বলে উঠল সে—"তাছাড়া আপনি কিছুই তো বলেননি এখনও। আমি কেবল আন্দাজ করেছি, আর মনে হয় আমার আন্দাজ ভুল হয়নি। একটা কথা মনে রাখবেন এ অঞ্চলের জঙ্গলে পাহাড়ে ছোট বড় যত পথ আছে সব আমার নখদর্পণে। সে বিষয়ে আমি আপনাকে খুব সাহায্য করতে পারব।"

মনে মনে একটু হেসে অশ্বের গতিবেগ বাড়িয়ে দিলেন তিনি। নন্দীর কথাবার্তা খুব ভালো লেগেছিল তাঁর। রঙ্গিলা খামারের অন্য লোকজনদেরও মন্দ লাগেনি। ওরা এর চেয়ে খারাপ ব্যবহারও তো করতে পারত! এ অবস্থায় খারাপ ব্যবহারই তো প্রত্যাশিত ছিল। মনের আনন্দে তিনি এগিয়ে যেতে লাগলেন, আর তাঁর মনের সুরের সঙ্গে বাসন্তী প্রকৃতি আর আঁকা-বাঁকা পাহাড়ী রাস্তাও যেন সুর মেলাতে লাগল।

এঁকে বেঁকে চড়াই উতরাই পার হয়ে পার্বত্য অরণ্যভূমির ভিতর দিয়ে চওড়া রাজপথ এগিয়ে গিয়েছিল গর্জনগাঁওয়ের দিকে। পথের দুধারে দেওদারশ্রেণী নীরবে দাঁড়িয়েছিল, সবুজ শ্যাওলার সমারোহ নন্দিত করছিল দৃষ্টিকে, মাঝে মাঝে রুক্ষ পাহাড়ের বুক ভেদ করে নামছিল ঝরনাধারা। দেওদার গাছ নানা বয়সের, নানা আকারের। কেউ মহীরুহ, কেউ যেন লাবণ্যময় কিশোর, কেউ আবার আরও সরু—কিন্তু সবাই নীরবে একই ভঙ্গীতে দাঁড়িয়েছিল, মনে হচ্ছিল এক বিরাট সেনা-বাহিনী রাজাকে যেন নীরবে অভিবাদন জানাচ্ছে।

রাজপথ দু'পাশের শহর এবং গ্রামকে একটু দূরে রেখেই এগিয়ে চলেছিল। একটু দূরে এখানে-ওখানে, কখনও বা অনেক নীচের কোনও উপত্যকায় গন্ধরাজ দেখতে পাচ্ছিলেন ছাতের সারি, কখনও বা অনেক উপরে—হয়তো কোনও পাহাড়ের কাঁধের উপর কাঠুরেদের কাঠের তৈরী ঘরও চোখে পড়ছিল। রাজপথ আন্তর্জাতিক ব্যাপার, তার লক্ষ্য দূরের শহরের দিকে, গর্জনগাঁওয়ের ছোট ছোট গ্রাম বা নগরের জীবনধারাকে অগ্রাহ্য করে সে যেন চলেছিল দূরের দিকেই কেবল। তাই পথ খুব নির্জন। গর্জনগ্রামের সীমান্তে পৌঁছে গন্ধরাজ দেখতে পেলেন তাঁরই একটা সৈন্যদল ধুলো উড়িয়ে আসছে। গন্ধরাজকে দেখে তারা জয়ধ্বনি করল—গন্ধরাজের মনে হল একটু ক্ষীণভাবেই করল যেন। গন্ধরাজ পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেলেন। এর পর অনেকক্ষণ একাই রইলেন তিনি। পথের দু'ধারে প্রকাণ্ড বন ছাড়া আর কেউ সঙ্গী রইল না তাঁর।

তাঁর মনের প্রসন্নভাব কিন্তু বেশীক্ষণ রইল না। পোকার মতো ঝাঁকে ঝাঁকে চিন্তারাশি তাঁর মন জুড়ে বসল আর গতরাত্রে যা শুনেছিলেন তা যেন চড়-কিল-লাথির মতো আঘাত করতে লাগল তাঁকে এখন। সান্ত্বনার আশায় এদিক ওদিক চাইতে লাগলেন তিনি । দেখতে পেলেন একটু দূরে একটি উঁচু খাড়া পাহাড় থেকে সরু রাস্তা বেয়ে খুব সন্তর্পণে একজন অশ্বারোহী নামছেন। মরুভূমিতে ঝরনা দেখলে যে আনন্দ হয় সেইরকম আনন্দ হল গন্ধরাজের। মনে মনে একজন মানুষের কামনা করছিলেন তিনি। গন্ধরাজ ঘোড়ার রাশ টেনে ধরে অপেক্ষা করতে লাগলেন। লোকটি যখন কাছাকাছি এল তখন গন্ধরাজ বুঝতে পারলেন লোকটি তাঁর রাজ্যেরই অধিবাসী একজন। লোকটির টকটকে লাল মুখ, পুরু ঠোঁট। ঘোড়ার জিনের দু'ধারে জিনিসপত্রে ঠাসা দুটি থলি ঝুলছে আর কোমরে বাঁধা আছে একটি বড় বোতল। গন্ধরাজ

যখন তাকে ডাকলেন তখন সে উৎফুল্লকণ্ঠে সাড়া দিলে বটে, কিন্তু গন্ধরাজের মনে হল কণ্ঠস্বর একটু জড়িত। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সে একটু টাল খেয়ে সামলে নিলে। গন্ধরাজ বুঝলেন মদ খেয়েছে।

"আপনি পার্বতীর দিকে যাচ্ছেন নাকি"—প্রশ্ন করলেন গন্ধরাজ।

"হ্যাঁ যাচ্ছি। কিন্তু জঙ্ঘা পর্যন্ত। আপনি যাবেন আমার সঙ্গে?"

"হ্যাঁ। আপনার জন্যেই অপেক্ষা করে ছিলাম। চলুন।"

পাশাপাশি চলতে লাগলেন দুজনে। সাধারণ লোকের যা স্বভাব লোকটি প্রথমেই গন্ধরাজের ঘোড়াটাকে তার ঝাপসা দৃষ্টি দিয়ে খুঁটিয়ে দেখল। "আরে, চমৎকার ঘোড়াটি তো আপনার— বাঃ বাঃ"—তারপর সে দৃষ্টি ফেরাল গন্ধরাজের মুখের দিকে, ফিরিয়েই চমকে উঠল সে।

"মহারাজ!"

বলেই সে অভিবাদন করল এবং তা করতে গিয়ে আবার একবার টাল সামলাল।

"আপনাকে চিনতে পারিনি মহারাজ, ক্ষমা চাইছি।"

গন্ধরাজ একটু বিরক্ত হলেন। তাঁর মনের সাম্য যেন বিচলিত হল একটু।

"আপনি যখন আমাকে চিনতে পেরেছেন তখন আমরা আর পাশাপাশি যেতে পারি না। আমি এগিয়ে যাচ্ছি, আপনি পিছু পিছু আসুন।"

তিনি এগোতে যাচ্ছিলেন কিন্তু ওই অর্ধ-মত্ত লোকটা এক কাণ্ড করে বসল। একটু ঝুঁকে গন্ধরাজের ঘোড়ার লাগামটা ধরে ফেলল সে।

"শুনুন, আপনি মহারাজা হোন আর যা-ই হোন, এমন অভদ্রতা করে আপনাকে চলে যেতে দেব না। আপনি ছদ্মবেশে আমার সঙ্গে যেতে চাইছিলেন, বোধহয় আমার মনের কথা বার করে নেবার মতলব ছিল, কিন্তু যে-ই ধরা পড়ে গেলেন অমনি এগিয়ে সরে পড়তে চাইছেন। আপনি মহারাজা না গুপ্তচর?"

মদের ঝোঁকে আর আহত আত্মসম্মানের ক্ষোভে আরও লাল হয়ে উঠল লোকটার চোখ-মুখ। মনে হল কথাগুলো সে যেন থুতুর মতো ছুঁড়ে দিল গন্ধরাজের মুখে।

একটু থতমত খেয়ে গেলেন গন্ধরাজ। বিভ্রান্ত হয়ে পড়লেন। বুঝলেন তিনি ভুল করেছেন, তিনি যে 'মহারাজ' এ নিয়ে আস্ফালন করাটা অশোভন হয়েছে। তাছাড়া তাঁর ভয়ও হল একটু। লোকটা বেশ বলিষ্ঠ আর ষণ্ডা, তাছাড়া মাতাল হয়েছে।

"আমার লাগাম ছেড়ে দিন"—শান্ত গম্ভীর কণ্ঠে বললেন তিনি। একটা আদেশের সুর ধ্বনিত হল তাতে। একটু অবাকও হলেন, লোকটি যখন সত্যিই লাগাম ছেড়ে দিলে।

"আপনার সঙ্গে পাশাপাশি যেতে আমার আপত্তি ছিল না, আপনি যদি বুদ্ধিমান ধীর স্থির লোক হতেন, তাহলে আপনার মুখ থেকে আমার সমালোচনা শুনলেও আমি খুশী হতাম, কিন্তু এখন আমাকে মহারাজা জেনে যে সব অসার চাটুবাক্য আপনি বলবেন তা শোনবার তেমন আগ্রহ নেই আমার।"

"আপনি কি মনে করেন আমি মিথ্যে কথা বলব?"

আরও লাল হয়ে উঠল তার মুখ।

"আমি জানি আপনি বলবেন"—এইবার আত্মস্থ হয়েছিলেন গন্ধরাজ—"এ-ও জানি আপনি গলায় যে পদকটি ঝুলিয়ে রেখেছেন তা-ও আমাকে দেখাবেন না।"

গন্ধরাজ লোকটির গলায় সবুজ ফিতেটা দেখতে পেয়েছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুত পরিবর্তন হল। বিবর্ণ হয়ে গেল তার মুখটা। মোটা মোটা আঙুল দিয়ে গলার ফিতেটা ঢাকবার চেষ্টা করল সে। নেশা ছুটে গেল।

"আমার কোনও পদক নেই।"

"বিশ্বাস করলাম না আপনার কথা, মাপ করবেন। আপনার পদকে কি আঁকা আছে তা-ও বলে দিতে পারি—একদিকে একটা খোলা তলোয়ার আর এক দিকে 'গণ-স্বাধীনতা'। তাই না?"

লোকটি নির্বাক হয়ে রইল।

গন্ধরাজ হেসে বললেন—"আপনি অদ্ভুত লোক দেখছি। যাকে হত্যা করবার ষড়যন্ত্র করছেন তার কাছ থেকে ভদ্রতা প্রত্যাশা করছিলেন!"

"হত্যা!"—প্রতিবাদ করে উঠল লোকটা—"না, কখনও নয়। ওসব নোংরা কাজের মধ্যে আমি নেই।"

"ষড়যন্ত্র মানেই নোংরা কাজ, আইনত ওতে মৃত্যুদণ্ড হতে পারে। ধরা পড়লে মৃত্যুদণ্ড হবেই এতে কোনও সন্দেহ নেই। ঘাবড়াবেন না অত, কারণ আমি গোয়েন্দাবিভাগের লোক নই। কিন্তু এ ধরনের রাজনীতি করতে গেলে অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করে দেখা উচিত। জানা উচিত এর পরিণাম কি হতে পারে—"

"মহারাজ—" কম্পিতকণ্ঠে শুরু করছিল লোকটা। কিন্তু গন্ধরাজ তাকে থামিয়ে দিলেন।

"মহারাজ? মহারাজ কথাটা তো আপনার মুখে মানাচ্ছে না। আপনি গণতন্ত্রে বিশ্বাসী, আপনার মুখে মহারাজ-টহারাজ বেমানান নয় কি? চলুন যাওয়া যাক। আপনার যখন এত ইচ্ছে চলুন পাশাপাশিই যাই। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞেস করছি আপনাকে। শুনেছি আপনারা দলে বেশ ভারী, প্রায় পনের হাজার লোক আপনাদের দলে আছে কথাটা সত্যি?"

লোকটার গলায় একটা ঘড়-ঘড় শব্দ হল শুধু।

"আপনারা দলে যখন এত ভারী তখন সোজা আমার কাছে এসে আপনাদের দাবী জানালেই পারতেন। আরও স্পষ্ট করে বলছি, আমাকে আদেশ করলেই পারতেন। আপনাদের কি ধারণা আমি সিংহাসন আঁকড়ে থাকতে চাই? মোটেই না। আপনাদের দল যদি সংখ্যা-গরিষ্ঠ হয় আমাকে দেখিয়ে দিন সেটা, আমি এখনই সিংহাসন ত্যাগ করছি। আপনাদের দলের লোকেরা আমার নানা দোষ দেখতে পেয়েছে, কিন্তু তাদের বলুন যে তারা এজন্য আমাকে যতটা দোষী করেছে তার চেয়ে অনেক বেশী দোষী করেছি আমি নিজেকে। তারা আমাকে রাজা হিসেবে যত অনুপযুক্ত মনে করে তার চেয়ে অনেক বেশী অনুপযুক্ত মনে করি আমি নিজে। আমি জানি ভারতবর্ষের মধ্যে আমি অতি ওঁছা রাজা। এর চেয়ে খারাপ ধারণা নিশ্চয়ই নেই তাদের। সিংহাসনের ঝামেলা পোয়াবার আমার ইচ্ছে নেই। আমি নির্বিবাদী লোক। আপনারা যদি গণতন্ত্র স্থাপন করতে চান করুন, আমার কিচ্ছু আপত্তি নেই।"

"না, না, আপনি এসব কি বলছেন। আমার দ্বারা—" আবার আরম্ভ করল লোকটা।

"কি কাণ্ড! আপনি আবার আমার দিকে হয়ে গেলেন নাকি"—সবিস্ময়ে বলে উঠলেন গন্ধরাজ—"তাহলে শুনুন। ওসব ষড়যন্ত্র টড়যন্ত্র ছেড়ে দিন। দেখছি, আমার যেমন রাজা হওয়ার যোগ্যতা নেই আপনারও তেমনি চক্রান্ত করবার যোগ্যতা নেই!"

"একটা কথা শুনুন, সত্যি কথা এটা"—মরিয়া হয়ে বলে ফেলল লোকটা—"আপনার উপর আমাদের ততটা রাগ নেই, আমাদের রাগ আপনার রাণীর উপর।"

"না, কোনও কথা শুনতে চাই না"—গন্ধরাজ থামিয়ে দিলেন তাকে। তারপর একটু রাগতকণ্ঠে বললেন—"আমি আবার আপনাকে বলছি রাজনীতি আপনি ছেড়ে দিন। ওপথে চলবার যোগ্যতা আপনার নেই। আর এর পর যখন আপনার সঙ্গে দেখা হবে তখন আপনাকে মাতাল অবস্থায় যেন না দেখি। সকালে উঠেই যে মদ খায় আমার মতো হতভাগা রাজাকেও বিচার করবার যোগ্যতা নেই তার।"

"আমি বেশী খাইনি, দু এক ঢোক মাত্র খেয়েছি"—লোকটার চোখ মুখ উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল হঠাৎ—"আর যদিও বা খেতাম তাতেই বা কি! কেউ কি আমার কথা ভাবে? আমার কারখানাটা বন্ধ হয়ে আছে। এর জন্যে দোষী কে জানেন? আপনার রাণী। আর শুধু কি আমারই কারখানা বন্ধ? ঘুরে ঘুরে জিগ্যেস করুন গিয়ে। দেখবেন সব ব্যবসা বন্ধ; যারা ব্যবসা চালায় তারা সব উধাও। বাজারে টাকা নেই। দেশটার যেন পক্ষাঘাত হয়েছে। কেন এমন হল! কার দোষে এই অরাজকতা? আপনাদের। আপনাদের দোষের জন্যই আমরা মারা যাচ্ছি, আমরা গরীবরা। আমাদের দুঃখ আপনারা কি বোঝেন? মদ খাই বা না খাই একটা জিনিস কিন্তু স্পষ্ট বুঝতে পারছি, দেশ উচ্ছন্ন যাচ্ছে আর কেন যাচ্ছে কার জন্যে যাচ্ছে তা-ও জানি। মাপ করবেন, মনের কথা সরল ভাবে বলে ফেললুম—এর জন্য আমাকে যদি গারদে পুরতে চান, পুরুন। আপত্তি করব না। যা সত্য তাই বলেছি, আর সত্যকেই আঁকড়ে থাকব। আমি আর মহারাজকে বিব্রত করতে চাই না, যদি অনুমতি দেন এবার আমি যাই।"

ঘোড়ার লাগামটা টেনে ধরে সে অভিবাদন করল গন্ধরাজকে, যদিও সেটা দেখতে শোভন হল না তেমন।

"আপনি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন, আমি আপনার নাম ধাম জানতে চাইনি। আশা করি নির্বিঘ্নে আপনি আপনার ঠিকানায় পৌছে যাবেন। নমস্কার।"

লোকটা দ্রুতবেগে ঘোড়া চালিয়ে চলে গেল।

গন্ধরাজ কিন্তু মুষড়ে পড়লেন মনে মনে। হারিয়ে দিয়ে গেল তাঁকে লোকটা, অপ্রস্তুত করে দিয়ে গেল। প্রথমে তাঁর ভদ্রতার খুঁত ধরল, শেষে তাঁকে তর্কেও হারিয়ে চুপ করিয়ে দিলে। লোকটার প্রতি ঘৃণা হল খুব, রাগও হল। কিন্তু সত্যকে তিনি অস্বীকার করতে পারলেন না। হ্যাঁ, হেরে গেছেন তিনি! সমস্ত মন বিষিয়ে উঠল, একটু আগে যে সব তিক্ত চিন্তা মনে জাগছিল, আবার তারা যেন ভিড় করে আসতে লাগল। অপরাহ্নে একটা চৌরাস্তার মোড়ে পৌঁছে ঠিক করলেন রোহিণীর দিকে যাবেন। সেইখানেই খাওয়া-দাওয়া করবেন। পথ চলতে আর ভালো লাগছিল না তাঁর।

রোহিণীর এক পান্থশালায় ঢুকেই তিনি দেখতে পেলেন একটি যুবক আহারে ব্যাপৃত রয়েছেন যদিও, কিন্তু তাঁর সামনে একটি বই খোলা রয়েছে। খেতে খেতে পড়ছেন তিনি। যুবকটির চোখেমুখে বুদ্ধির দীপ্তি দেখে ভালো লাগল তাঁর। যুবকটির পাশেই তাঁকে খেতে দেওয়া হল। তিনি আলাপ করবার জন্যেই প্রশ্ন করলেন, "কি বই পড়ছেন অত মন দিয়ে?"

"এটা? পার্বতীর রাজপাঠাগারের অধ্যক্ষ এবং গর্জনগাঁওয়ের মহারাজা গন্ধরাজের খুল্লতাত পুত্র ইন্দীবর ভারতীর লেখা বই এটা। এটাই তাঁর শেষ বই। তাঁর লেখার বৈশিষ্ট্য আছে। তিনি বিরাট পণ্ডিত, কিন্তু নীরস নন। রসের নানা পরিচয় আছে তাঁর রচনায়।"

"ইন্দীবর ভারতীর সঙ্গে আমার পরিচয় আছে"—ভদ্রভাবে বললেন গন্ধরাজ—"কিন্তু তাঁর কোন বই আমি পড়িনি।"

"ও। তাহলে তো আপনি মহাসৌভাগ্যবান। তাঁকে প্রত্যক্ষ দেখেছেন এটা একটা সৌভাগ্য। পরোক্ষে আর একটা সৌভাগ্য অপেক্ষা করছে যখন তাঁর বইগুলো পড়বেন—"

"ইন্দীবর ভারতীকে তাঁর পাণ্ডিত্যের জন্যে সবাই খুব খাতির করেন নয়?"

"বুদ্ধির আর বিদ্যার শক্তি যে কত সুদূরপ্রসারী হতে পারে তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত ইন্দীবর ভারতী। তাঁর খুড়তুতো ভাই গন্ধরাজ যদিও মহারাজা কিন্তু আমরা যুবকরা তাঁর সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানি না। কিন্তু ইন্দীবর ভারতীকে কে না চেনে? বিদ্বানকে বুদ্ধিমানকে সবাই শ্রদ্ধা করে।"

গন্ধরাজ সসম্ভ্রমে বললেন—"মনে হচ্ছে কোন ছাত্রের সঙ্গে আলাপ করবার সৌভাগ্য হল আমার। ছাত্র, না কোন গ্রন্থকার?"

যুবক একটু লজ্জিত হলেন।

"আমি ছাত্র, গ্রন্থকার দুইই। আমার নাম কুণাল। রাজনীতি সম্বন্ধে কয়েকখানা বই লিখেছি।"

"বটে! বাঃ আপনার সঙ্গে আলাপ হয়ে খুব আনন্দ হল। আপনার কাছে একটা কথা জেনেও নি তাহলে। শুনেছি গর্জনগাঁওয়ে না কি বিদ্রোহের আগুন ধোঁয়াচ্ছে? আপনি তো এসব বিষয়ে পণ্ডিত, বলুন তো এতে কি ভালো হবে শেষ পর্যন্ত?"

যুবকটি ঈষৎ অধীরভাবে ঘাড় বেঁকিয়ে ফিরে বসলেন।

"দেখছি, আমার ছোটখাটো বইগুলো আপনি পড়েননি। আমি শক্তিশালী শাসনতন্ত্রে বিশ্বাসী। যাঁরা নানারকম উদ্ভট আজগুবী কল্পনা করে আত্মপ্রবঞ্চনা করেন এবং মূর্খ জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করেন, আমি তাঁদের দলে নই। ওসব উদ্ভট কল্পনার দিন চলে গেছে কিংবা যাচ্ছে—"

"কিন্তু আমি চারিদিকে যখন চেয়ে দেখি—"

"তখন আপনি দেখেন কেবল মূর্খ জনসাধারণকে"—বাধা দিয়ে বললেন যুবকটি—"কিন্তু যে মন্দিরে সব রকম মতবাদ জ্ঞানের আলো দিয়ে বিশ্লেষণ করা হয় সেখান থেকে ওসব উদ্ভট মিথ্যা কল্পনা বহু আগেই নাকোচ হয়ে গেছে। আমরা প্রাকৃতিক স্বাভাবিক নিয়মের দিকেই ফিরে যাচ্ছি এবং চিকিৎসকরা যেমন বলেন, আশা করছি প্রাকৃতিক নিয়মেই সমাজের ব্যাধি আস্তে আস্তে সেরে যাবে। কিন্তু আমাকে ভুল বুঝবেন না। আপনার এই গর্জনগাঁওয়ের যা অবস্থা আর আপনাদের ওই গন্ধরাজের যা মতিগতি তা আমরা মোটেই সমর্থন করি না। ওরা যুগের সঙ্গে পা ফেলে চলতে পারছে না, অনেক পেছিয়ে পড়েছে। কিন্তু বর্বরের মতো বিদ্রোহ করে সব উলটেপালটে দিলেই এর প্রতিকার হবে তা-ও আমি মনে করি না। আমার মতে স্বাভাবিক ভাবে, মানে, প্রকৃতির রাজ্যে যেমন সর্বদা হচ্ছে—একটি ভালো রাজা এসে যদি সিংহাসনে বসেন তাহলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। ভালো মানে, শক্তিমান, সুদক্ষ। আপনি

হয়তো বলবেন ভালো রাজা মানে কি''—হেসে বলতে লাগলেন যুবকটি—''আমরা যারা গ্রন্থ-কীটের মতো ঘরের কোণে বসে বই পড়েছি, আমরা এ কাজের উপযুক্ত নই। আমরা নানারকম পরস্পরবিরোধী মতামত পড়ে বিভ্রান্ত হয়ে বসে আছি। আমার মনে হয় না কোন বিরাট পণ্ডিত যদি সিংহাসনে বসেন তিনি রাজ্য চালাতে পারবেন। যদিও এটা আমি স্বীকার করি রাজাকে পরামর্শ দেবার জন্যে সিংহাসনের কাছাকাছি কোনও বিদ্বান লোক থাকলে ভালো হয়। আমি কি রকম রাজা চাই জানেন? লোকটি খুব নয়, কিন্তু মোটামুটি বুদ্ধিমান হবে, খুব গভীর বা গম্ভীর হবার দরকার নেই, কিন্তু সজীব প্রাণবন্ত হওয়া চাই। আচরণ ভদ্র হবে, তোষণ করবার এবং শাসন করবার দুরকম ক্ষমতাই তার থাকবে। অর্থাৎ বেশ সমঝদার, চৌকশ, দিলদরিয়া হওয়া চাই লোকটি। আপনাকে আমি গোড়া থেকেই লক্ষ্য করছি। আমি যদি গর্জনগাঁওয়ের প্রজা হতাম তাহলে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতাম তিনি যেন আপনার মতো একজন লোককে এখানকার সিংহাসনে বসান।''

''বলেন কি মশাই!''—সবিস্ময়ে বলে উঠলেন গন্ধরাজ।

হো হো করে হেসে উঠলেন যুবকটি।

''আমি জানি আপনি আশ্চর্য হয়ে যাবেন। এও জানি এখানকার জনসাধারণ আপনার মতো লোককে পছন্দ করবে না।''

''নিশ্চয়ই করবে না।''

''আজ না করতে পারে। কিন্তু ভবিষ্যতে করবে, করতে হবে। জনসাধারণের মতিগতিও ভালো হচ্ছে ক্রমশ।''

''মাপ করবেন, আপনার সঙ্গে একমত হতে পারলাম না।''

''বিনয় অবশ্যই প্রশংসাযোগ্য''—যুবক মৃদু হেসে বললেন—''কিন্তু আমি বলছি আপনার মতো রাজার পাশে যদি ইন্দীবর ভারতীর মতো মন্ত্রী থাকেন তাহলে আমি অন্তত খুশী থাকব। আমার মতে ওই হবে আদর্শ যোগাযোগ।''

এইভাবে অনেকক্ষণ গল্প হল, অনেকটা সময় আনন্দে কেটে গেল। যুবকটি কিন্তু বেশীক্ষণ পান্থশালায় থাকতে পারলেন না, বললেন রোহিণী গ্রামে একজনের বাড়িতে শোবেন তিনি। রাত্রে আর কোথাও যাবেন না। একটানা ঘোড়ার পিঠে থাকতে তাঁর ভালো লাগে না। রাস্তায় বিশ্রাম করে করেই চলা তাঁর অভ্যাস। যুবকটি চলে যাওয়ার পর একলা পড়ে গেলেন গন্ধরাজ। এদিকে ওদিকে চেয়ে সঙ্গী খুঁজতে লাগলেন। একটু দূরে দেখতে পেলেন তাঁরই রাজ্যের একদল কাঠের ব্যবসায়ী একজায়গায় বসে গুলতানি করছে কয়েক বোতল মদকে কেন্দ্র করে। তাদেরই সঙ্গে গিয়ে ভাব করলেন গন্ধরাজ এবং অবশেষে তাদের দলেই ভিড়ে গেলেন।

তাঁরা যখন ঘোড়ার পিঠে চড়লেন তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। বারুণীর প্রভাবে ব্যবসায়ীরা ঈষৎ বেসামাল হয়েছিলেন। হাসাহাসি ঠাট্টামস্করা বেশ জোরে জোরেই চলছিল। নিজেদের ঘোড়া নিয়ে হুড়োহুড়ি করেও যেন একটু বিশেষ আমোদ পাচ্ছিলেন তাঁরা। সমবেতকণ্ঠে গানও গাইছিলেন মাঝে মাঝে গন্ধরাজের কথা সব সময়ে মনে থাকছিল না তাঁদের। তাই গন্ধরাজ মাঝে মাঝে। একা হয়ে পড়ছিলেন, আবার মাঝে মাঝে ওদের সঙ্গও পাচ্ছিলেন। ওদের হাসি ঠাট্টা বাজে বকবক গল্প শুনছিলেন মাঝে মাঝে, আবার মাঝে মাঝে

অন্যমনস্ক হয়ে দুপাশের আরণ্য পরিবেশে মগ্ন করে দিচ্ছিলেন নিজেকে। নক্ষত্রের আলোকে ঈষৎ-স্বচ্ছ অন্ধকার, বনের রহস্যময় মর্মর, খপ্ খপ্ খপ্ খপ্ অশ্ব-ক্ষুরোত্থিত বেখাপ্পা সঙ্গীত, সমস্ত মিলে এক বিচিত্র রসে পরিপূর্ণ করে তুলেছিল তাঁর মনকে। পার্বতীর প্রান্তে যে সুদীর্ঘ পর্বতটি আছে তার চূড়ায় যখন তাঁরা উঠলেন তখনও তাঁর মনের সুর কাটেনি।

অনেক নীচে অরণ্য-কুন্তলা পার্বতীকে দেখা যাচ্ছিল। বনের ফাঁকে ফাঁকে দেখা যাচ্ছিল তার আলো, দেখা যাচ্ছিল তার আলোকিত পথঘাট। মনে হচ্ছিল একটা ছবি যেন। ডান দিকে আলোক-মণ্ডিত রাজপ্রাসাদ দাঁড়িয়েছিল একক মহিমায়।

গর্জনগাঁওয়ের অধিবাসী হলেও একজন ব্যবসায়ীও গন্ধরাজকে চিনতেন না। রাজপ্রাসাদের দিকে আঙুল বাড়িয়ে তিনি বললেন, ''এতক্ষণ আমরা রোহিণী পান্থশালায় ছিলাম, এইবার ওই দেখুন স্বৈরিণী পান্থশালা।''

আর একজন হো হো করে হেসে উঠে বললেন—''আরে ওর ওই নামকরণ করেছ না কি তুমি!''

''হ্যাঁ ভদ্রভাষায় ওই নাম দিয়েছি। আসলে তো ওটা একটা বেশ্যার আড্ডা'' বলেই তিনি গান ধরে দিলেন একটা। মনে হল গানটা সকলেই জানে, কারণ সকলেই গেয়ে উঠল সঙ্গে সঙ্গে। গর্জনগাঁওয়ের রাণী, মহামান্যা সুরূপিণী, হায় হায় হায়, সুধাভাণ্ড উজাড়িয়া কপিঞ্জল পিপাসা মিটায়। হায় হায় হায়, রাণী বড় রসবতী, আহা রাণী বড় রসবতী—হায় হায় হায়।'' এই হল গানের গোড়ার দিকটা। লজ্জায় গন্ধরাজের মাথা কাটা গেল যেন। কানের ডগা দিয়ে আগুন বেরুতে লাগল। তিনি ঘোড়ার লাগাম টেনে, স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন ঘোড়ার উপর। প্রমত্ত বণিকের দল গান গাইতে গাইতে নীচে নামতে লাগল। গন্ধরাজ তাদের সঙ্গে গেলেন না।

গানের সুরটা প্রপাতের মতো নামতে লাগল। গানের কথাগুলো যখন অস্পষ্ট হয়ে এল তখনও সুরটার দোলা যেন বার বার দুলে দুলে অপমান করে যেতে লাগল গন্ধরাজকে। তিনি আর সেখানে থাকতে পারলেন না। কাছেই পাহাড়ের গা বেয়ে একটা সরু পথ নেমে গিয়েছিল রাজপ্রাসাদের দিকে এঁকে বেঁকে ঘন অন্ধকারের ভিতর দিয়ে। সেটা বেয়ে গন্ধরাজ রাজপ্রাসাদের সামনের উদ্যানে এসে হাজির হলেন। বিকেল বেলা এখানটা বেশ জমজমাট থাকে। রাজসভার লোকেরা, স্বদেশী বিদেশী নাগরিকেরা এখানে সমবেত হয়ে মহারাজাকে অভিবাদন জানান। কিন্তু এখন এত রাত্রে এখানে কেউ নেই, আছে কেবল গাছের শাখায় শাখায় ঘুমন্ত পাখিরা। খরগোশদের খশ খশ শব্দ শোনা যাচ্ছে মাঝে মাঝে। পাথরের মূর্তিগুলো এখানে ওখানে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সেই একই ভঙ্গীতে। উদ্যানের দুই একটা মন্দিরে প্রতিহত হয়ে ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ অদ্ভুত শোনাতে লাগল। কিছুক্ষণ পরেই তিনি নিজের বাগানের সীমায় এসে পৌঁছলেন। এখানে একটা পুলের কাছে ছোট ছোট কয়েকটা আস্তাবল আছে বাগানের দিকে মুখ করে। শুনতে পেলেন প্রহরী ঘণ্টা বাজাচ্ছে দূরে দুর্গশিখরে, সে ঘণ্টার শব্দ প্রতিধ্বনিত হচ্ছে দূর থেকে দূরান্তরে। আস্তাবলে ঘোড়ার পায়ের আওয়াজ ছাড়া আর কোন শব্দ নাই। চারিদিক নিস্তব্ধ। গন্ধরাজ ঘোড়া থেকে নামলেন। অনেকদিন আগেকার একটা স্মৃতি জেগে উঠল মনে। চোর সহিসগুলো ঘোড়ার দানা কি

ভাবে সরিয়ে সস্তায় পাচার করে এটা অনেকদিন আগে দেখেছিলেন তিনি লুকিয়ে। হঠাৎ সেটা মনে পড়ে গেল। পুল পার হয়ে তিনি একটা জানলায় একটা বিশেষ ধরনে ছ'সাত বার আঘাত করলেন ঠুক ঠুক করে। জানলা ফাঁক হয়ে গেল, মানুষের মুণ্ড বেরিয়ে এল একটি।

"আজ মাল নেই।"

"একটা আলো আন।"

"এ কি কাণ্ড"—বলে উঠল সহিসটা—"কে তুমি?"

"আমি, আমি গন্ধরাজ। আলো আন একটা। ঘোড়াটাকে ভিতরে নিয়ে যাও আর বাগানে ঢোকবার কপাটটা খুলে দাও।"

লোকটা নির্বাক হয়ে রইল ক্ষণকাল।

"মহারাজ!"—সবিস্ময়ে বলে উঠল তারপর—"আপনি ওভাবে জানলায় শব্দ করলেন কেন বুঝতে পারছি না।"

"পার্বতীতে একটা কুসংস্কার আছে যে ওই রকম শব্দ করলে ঘোড়ার দানা সস্তা হয়ে যায়।"

ঢোঁক গিলে মুণ্ডটা টেনে নিলে সহিস্। যখন আলো নিয়ে ফিরে এল তখন সে বিবর্ণ, হাত কাঁপছে। কোনরকমে সে ঘোড়ার লাগামটা ধরে ভিতরে নিয়ে এল তাকে।

"মহারাজ"—হঠাৎ সে বলে ফেলল—"ঈশ্বরের দোহাই—" এ পর্যন্ত বলে আর কথা সরল না তার মুখে।

"ঈশ্বরের দোহাই দিয়ে কি বলছ! ভয়ের কি আছে। ঘোড়ার দানা যদি ঈশ্বরের কৃপায় সস্তা হয়ে যায় ভালই তো হবে।"

বাগানের ভিতর ঢুকে পড়লেন গন্ধরাজ। সহিস প্রস্তরমূর্তিবৎ দাঁড়িয়ে রইল।

ধাপে ধাপে সিঁড়ি নেমেছে বাগানের দিকে। বাগানের মাঝখানে যে মীন-দীঘিটা আছে সেই দীঘির পাড়ে এসে থেমেছে সিঁড়িগুলো। দীঘির ওপার থেকে আবার শুরু হয়েছে সিঁড়ি, সে সিঁড়ি পৌঁছেছে প্রাসাদ পর্যন্ত পিছন দিক দিয়ে। প্রাসাদের উঁচু-নীচু ছাদ, ত্রিকোণ প্রাচীর অন্ধকারে আবছাভাবে দেখা যাচ্ছিল। প্রাসাদের বড় বড় স্তম্ভ, নাটমঞ্চ, পাঠাগার, প্রমোদগৃহ, গন্ধরাজের শয়নকক্ষ, বিরামকক্ষ প্রভৃতি রাজকীয় কক্ষের সারি পিছন থেকে কিছুই দেখা যায় না। সেগুলোর মুখ সব নগরের দিকে। পিছন দিকটা সেকেলে গোছের, এখানে জাঁকজমক বিশেষ কিছু নেই। বেশ অন্ধকারও। কয়েকটা পিছনের জানলা থেকে আলো এসে পড়েছে কেবল সিঁড়ির উপর। বিরাট চতুষ্কোণ তোরণদুর্গটি ক্রমশ সরু হয়ে উপরের দিকে উঠেছে দুরবীক্ষণ যন্ত্রের মতো। তার উপর পতাকাটি যেন ঝুলে আছে, উড়ছে না।

রাত্রির নক্ষত্রালোকিত অন্ধকারে পিছনের এই বাগানটি আমোদিত হয়ে উঠেছিল জুঁই চামেলী আর হাস্‌নুহানার গন্ধে। অন্ধকারের রহস্যময় আবরণের তলায় যেন গোপন চঞ্চলতার সাড়াও পাওয়া যাচ্ছিল মাঝে মাঝে। সিঁড়ি বেয়ে দ্রুতপদে নামছিলেন গন্ধরাজ, তাঁর বিক্ষুব্ধ মনের চিন্তাগুলোই যেন তাড়া করে নিয়ে যাচ্ছিল তাঁকে। কিন্তু হায়, এ চিন্তা থেকে তাঁকে রক্ষা করবে এমন আশ্রয় কি কোথাও আছে পৃথিবীতে? কিছুদূর নেমে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন তিনি। প্রমোদগৃহ থেকে গানের সুর ভেসে আসছে, রাজসভার সভাসদরা নাচগানে মত্ত হয়ে আছেন ওখানে। ছাড়া ছাড়া ভাবে গানের টুকরো ভেসে আসছে। হঠাৎ এ

গানকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল আর একটা গান, সেই মত্ত ব্যবসায়ীর দল একটু আগে যে গান গাইতে গাইতে পাহাড় থেকে নামছিল—রাণী বড় রসবতী, আহা, রাণী বড় রসবতী, হায় হায়, হায়—গানের এই ধুয়োটা আবার যেন স্পষ্ট শুনতে পেলেন তিনি। সমস্ত মন অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে গেল। এতদিন পরে তিনি বাড়ি ফিরছেন। রাণী নাচ-গানে মাতোয়ারা, তিনি একটা সামান্য সহিসকে ধাপ্পা দিয়ে চোরের মতো বাড়ি ঢুকলেন। চারিদিকে ঢিঢি পড়ে গেছে, প্রজারা হাসাহাসি করছে সবাই। তিনি সত্যিই কি মহারাজা? সত্যিই কি স্বামী? গন্ধরাজ কি হয়েছ তুমি! দ্রুতপদে নামতে লাগলেন তিনি আবার।

কিছুদূর নেমেই অপ্রত্যাশিতভাবে সাক্ষাৎ পেলেন একজন প্রহরীর। কিছুদূর গিয়ে আর একজন প্রহরী গতিরোধ করল তাঁর। মীন-দীঘির উপর সাঁকোটা যখন পার হচ্ছিলেন তখন একজন পদস্থ সামরিক কর্মচারী আবার দাঁড় করালেন তাঁকে। মনে হল তিনি যেন এ দিকটায় বিশেষ পাহারায় নিযুক্ত হয়ে আছেন। পাহাবার এমন বাড়াবাড়ি দেখে একটু অবাক হলেন গন্ধরাজ। কিন্তু কোনও প্রশ্ন জাগল না মনে। তাঁর মনে কোন কৌতূহল আর ছিল না যদিও বার বার বাধা পাওয়াতে বিরক্ত হচ্ছিলেন খুব। প্রাসাদের পশ্চাৎভাগে যে রক্ষী পাহারা দিচ্ছিল, সে তাঁকে সিংহদরজা খুলে দিল এবং তাঁর বিস্রস্ত বেশবাস দেখে চমকে উঠল একটু। সেখান থেকে দ্রুতপদে এগিয়ে গেলেন তিনি প্রাসাদের দিকে এবং গুপ্ত সিঁড়ি দিয়ে গোপনে হাজির হলেন এসে নিজের শয়নকক্ষে। কেউ দেখতে পেল না। গিয়েই তিনি গায়ের পোশাক পরিচ্ছদ টেনে খুলে ফেলে অন্ধকারে শুয়ে পড়লেন নিজের বিছানায়। প্রমোদগৃহে নাচ-গান বাজনা তখন উদ্দাম হয়ে উঠেছে, কিন্তু সব ছাপিয়ে গন্ধরাজের কানে বাজতে লাগল সেই অর্ধমত্ত ব্যবসায়ীদের গানের সুর—অশ্বক্ষুরের বেসুরো বাজনার সঙ্গে সেই গান—রাণী বড় রসবতী—হায় হায় হায়।

।। পাঁচ।।

খুব ভোরে ইন্দীবর ভারতী রাজপাঠাগারের পাঠকক্ষে এসে নিজের কাজ শুরু করে দিয়েছিলেন। পাশেই ছিল এক পাত্র মাধ্বী সুরা, আর আশেপাশে দেখা যাচ্ছিল সারি সারি আবক্ষ কয়েকটি মর্মরমূর্তি আর বহুবর্ণবিচিত্র পুস্তকের সংগ্রহগুলি। তিনি আগের দিন যা লিখেছিলেন তাই সংশোধন করছিলেন বসে বসে। ইন্দীবর ভারতীর বয়স প্রায় চল্লিশ, মাথার চুল পাতলা হয়ে এসেছে, মার্জিত বুদ্ধিদীপ্ত মুখমণ্ডলেও ক্লান্তির ছাপ এসেছে একটা, চোখের উজ্জ্বল দৃষ্টিও তত উজ্জ্বল নেই আর। খুব সকাল সকাল শুয়ে খুব ভোরে ব্রাহ্মমুহূর্তে শয্যাত্যাগ করাই তাঁর বহুকালের অভ্যাস আর নেশা মাত্র দুটি। বিদ্যাচর্চা আর মাধ্বী সুরা। তাঁর সঙ্গে গন্ধরাজের একটা প্রাচীন বন্ধুত্ব আছে, আত্মীয়তাও আছে। কিন্তু সেটাকে সুপ্ত বা অদৃশ্য বললেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁদের দেখা হয় ক্বচিৎ। কিন্তু যখনই হয় তখনই যেন পুরাতন সুরটি আবার বেজে ওঠে। বাণীমন্দিরের নিষ্ঠাবান ব্রহ্মচারী পুরোহিত ইন্দীবর তাঁর খুল্লতাত-পুত্র গন্ধরাজের উপর ঈষৎ ঈর্ষান্বিত হয়েছিলেন (অবশ্য মাত্র একবেলার জন্য) যখন গন্ধরাজ সুরূপিণী দেবীকে বিয়ে করে আনেন। তিনি রাজা হয়েছেন বলে তাঁর কোন ঈর্ষা হয়নি। সিংহাসনের উপর লোভ ছিল না তাঁর।

গর্জনগাঁওয়ের লোকদের বই পড়ার আগ্রহ বিশেষ নেই। পাঠাগারে কেউ আসত না। সুতরাং এই বৃহৎ, আলোকিত, মর্মরমূর্তি-শোভিত, সুন্দর পুস্তক সংগ্রহশালাটি ইন্দীবর ভারতী একাই ভোগ করতেন। মাঝে মাঝে কেউ কখনও ক্বচিৎ গবেষণার জন্য ইন্দীবরের শিষ্য হতেন এসে।

সেদিন সকালে কিন্তু তাঁর পাণ্ডুলিপি পাঠে বাধা ঘটল। অপ্রত্যাশিত ভাবে দ্বার খুলে গেল। গন্ধরাজ প্রবেশ করলেন। ইন্দীবর চেয়ে রইলেন তাঁর দিকে। পাঠাগারের বড় বড় বাতায়নের পাশ দিয়ে আসছিলেন গন্ধরাজ, প্রভাতরৌদ্র যেন আলিঙ্গন করে অভ্যর্থনা করছিল তাঁকে। তাঁর চালচলন প্রসাধন-পরিচ্ছদেও যে আভিজাত্য পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল তা দেখে মুগ্ধ হওয়া উচিত ছিল ইন্দীবরের, কিন্তু তিনি যেন চটে গেলেন মনে মনে।

"ইন্দীবর কেমন আছ"—একটা আসনে বসে পড়লেন গন্ধরাজ—"অনেকদিন দেখা হয়নি—"

"আরে তুমি! খুব সকালে উঠেছ দেখছি। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল না কি. না অভ্যাস বদলাচ্ছ।"

"হ্যাঁ, এবার বদলাবার সময় এসেছে বৈ কি।"

"ও! কিন্তু আমি বিশ্বাস করতে পারছি না"— হেসে বললেন ইন্দীবর—"আমি নাস্তিক-প্রকৃতির লোক, নীতি-শাস্ত্রে আস্থা নেই। যখন যৌবন ছিল তখন আদর্শ-টাদর্শ নিয়ে অনেক মাতামাতি করেছি। এখন বুঝেছি ওসব আলেয়া, আশার ইন্দ্রধনুতে রঙের খেলা মাত্র।"

"তুমিই জান"—গন্ধরাজ বললেন—"আমি জনপ্রিয় রাজা নই" বলেই তিনি এমনভাবে চাইলেন ইন্দীবরের দিকে যেন তিনি ইন্দীবরের কাছ থেকে এর সমর্থন বা প্রতিবাদ প্রত্যাশা করছেন।

"জনপ্রিয়? কিন্তু জনপ্রিয়তার রকমফের আছে।"

ইন্দীবর তাঁর আসনটিতে ভালো করে হেলান দিয়ে বসলেন, তারপর দু'হাতের আঙুলের ডগাগুলিকে হালকাভাবে পরস্পরের সঙ্গে ঠেকিয়ে সহাস্য দৃষ্টি চেয়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত। তারপর বললেন—"জনপ্রিয়তা অনেক রকমের আছে। বই-পড়া পাণ্ডিত্যের জনপ্রিয়তা আছে একরকম, বই পড়ে যে কোনও লোক পণ্ডিত হতে পারে। ওতে ব্যক্তিত্বের বিশেষ কোন প্রকাশ নেই, আর অনেক সময় তা দুঃস্বপ্নের মতো অলীক। আর একরকম জনপ্রিয়তা আছে রাজনৈতিক নেতাদের, সেটা কিন্তু গোলমেলে গোছের। আর একরকম জনপ্রিয়তা, যা নিতান্ত ব্যক্তিগত, তা হচ্ছে তোমার। মেয়েমানুষ তোমাকে দেখলেই প্রেমে পড়ে, চাকরবাকররা তোমাকে তুষ্ট করবার জন্যে পাগল। ভালো কুকুরকে দেখলেই তাকে আদর করে তার পিঠ চাপড়ে দেওয়ার ইচ্ছেটা যেমন স্বাভাবিক তোমাকে দেখলেই ভালো-লাগাটা তেমনি স্বাভাবিক। তুমি গর্জনগাঁওয়ের কোনও কাঠুরে বা কাঠের ব্যবসায়ী হলে নিঃসন্দেহে তুমি সবচেয়ে বেশী জনপ্রিয় নাগরিক হতে। কিন্তু রাজা হিসাবে তুমি অচল, একদম বেমানান। আর সেটা স্বীকার করাই হয়তো বুদ্ধিমানের কাজ, যা তুমি করেওছো—"

"হয়তো বুদ্ধিমানের কাজ?"—সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন গন্ধরাজ।

"হ্যাঁ, হয়তো। আমি জোর করে কিছু বলতে চাই না।"

"হয়তো বুদ্ধিমানের কাজ, কিন্তু ধর্মসঙ্গত কি?"

"বীরধর্মসঙ্গত নয় অন্তত।"

গন্ধরাজ তাঁর আসনটি আরও কাছে টেনে এনে টেবিলের উপর দুই কনুই দিয়ে ইন্দীবরের মুখোমুখি হয়ে বসলেন।

"তার মানে? পুরুষোচিত নয়?"

একটু ইতস্তত করে ইন্দীবর বললেন, "তাও বলতে পার।"

তারপর হেসে বললেন—"তুমি নিজের পৌরুষ আস্ফালন করতে এত ব্যগ্র তা আমার জানা ছিল না তো। আর এই জন্যেই বিশেষ করে ভালো লাগত তোমাকে । তার চেয়েও বেশী—এই জন্যেই মনে মনে তারিফ করতাম তোমাকে। ধর্মসঙ্গত আচরণ করবার জন্যে সবাই লালায়িত। সব রকম ধর্মের পোশাক একসঙ্গে পরতে চায় সবাই, তা সে যতই না বেমানান হোক। আমরা দুঃসাহসী নির্ভীক বীরও হতে চাই আবার পরিণামদর্শী সংসারীও হতে চাই। আমরা অহঙ্কার আস্ফালন করে হুহুঙ্কারও ছাড়ি আবার বিনয়ে গদগদ হয়ে ধুলোয় লুটিয়েও পড়ি। ধর্মের পাল্লায় পড়ে একই লোক বিপরীত আচরণ করে। কিন্তু তুমি কখনও তা করনি। তুমি নির্জলা তুমিই আছ, কোনও কিছুর সঙ্গে কখনও আপোস করনি। আমি বরাবরই বলেছি গন্ধরাজের মধ্যে কোন ভণ্ডামি নেই। গন্ধরাজ চিরকালই গন্ধরাজ।"

"ভণ্ডামি নেই, কিন্তু কোন উদ্যমও নেই"—বলে উঠলেন গন্ধরাজ—"একটা মরা জানোয়ারের চেয়েও বেশী নির্জীব আমি। কিন্তু যে জিনিসটা তোমার কাছে জানতে এসেছি ইন্দীবর সেইটের উত্তর দাও— চেষ্টা করলে এবং কৃচ্ছ্রসাধন করলে আমি একটা চলনসই গোছের রাজাও হতে পারব না?"

"না, কদাপি নয়"—গম্ভীরভাবে বললেন ইন্দীবর—"ও চিন্তাই কোরো না। তাছাড়া, আমি জানি তুমি চেষ্টাই করবে না।"

"না, ইন্দীবর, আমাকে তুমি নিরস্ত করতে পারবে না, একটা হেস্ত-নেস্ত না করে আমি ছাড়ব না। রাজা হবার যোগ্যতা যদি আমার না থাকে তাহলে প্রজাদের টাকা নেবার কি অধিকার আছে আমার, এই প্রাসাদে বাস করবার কি অধিকার আছে, এত সৈন্যসামন্তের উপর, এত দেহরক্ষীর উপর প্রভুত্ব করবারই বা কি অধিকার আছে! আমি তো চোর তাহলে, অপরাধীকে আইনত শাস্তি আমি তাহলে দেব কি করে?"

"হ্যাঁ মুশকিল আছে বটে, সেটা মানছি।"

"আমি কি চেষ্টা করতে পারি না?"—গন্ধরাজ উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন—"ধর্মত আমি কি চেষ্টা করতে বাধ্য নই? আমি যদি চেষ্টা করি আর তুমি যদি আমাকে পরামর্শ আর সাহায্য দাও—"

"আমি!" বলে উঠলেন ইন্দীবর—"রক্ষে কর!"

গন্ধরাজ যদিও উত্তেজিত হয়েছিলেন তবু হেসে ফেললেন তিনি।

"কাল রাত্রে কিন্তু সত্যিই একজন আমাকে বলেছে যে আমার মতো একজন লোক যদি ইন্দীবর ভারতীর মতো মাঝিকে হালে বসিয়ে পাল তুলে দেয় তাহলে রাজ্যের তরণী ঠিক তীরে ভিড়ে যাবে—"

"যে তোমাকে বলেছে সে হয় উন্মাদ, না হয় মতলববাজ পিশাচ—"

"সে তোমারই সগোত্র, একজন লেখক। নাম কুণাল—"

"কুণাল? হ্যাঁ তাকে চিনি, সে তো মহামূর্খ একটা—বই পড়েছি তার—"

"কিন্তু সে তোমার একজন ভক্ত।"

"তাই না কি?"—ক্ষণকাল চুপ করে রইলেন ইন্দীবর— "তাহলে তো দেখছি ছোকরা খুব নিরেট নয়। তার বইটা আর একবার পড়ে দেখব। তার মতের সঙ্গে আমার মতের কিছুমাত্র মিল নেই, এ সত্ত্বেও যদি সে আমার ভক্ত হয় তাহলে ওর ভিতর বস্তু আছে কিছু। ওকে কি আমার মতে আনতে পেরেছি? কিন্তু না, ওসব কাণ্ড তো রূপকথার পরীর দেশে হয়।"

"তুমি কি রাজতন্ত্রে বিশ্বাসী?"

"আমি? মোটেই না। আমি বিদ্রোহী। লাল রঙের বিদ্রোহী—"

"তাহলে আমার পরের কথাটা শোন এইবার। সত্যিই যদি আমাকে সিংহাসনে বসবার অনুপযুক্ত মনে কর, এই যদি সত্যই আমার বন্ধুদের মত হয়, আমার প্রজারা যদি সত্যিই আমাকে সিংহাসন থেকে টেনে নামিয়ে দিতে চায়, বিদ্রোহ যদি সত্যিই আসন্ন হয়ে থাকে তাহলে এই অনিবার্য পরিণতির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এই ভয়ঙ্কর বিভীষিকা আর হাস্যকর পরিস্থিতির অবসান ঘটানো কি উচিত নয়? সংক্ষেপে সিংহাসন ত্যাগ করাই কি এখন একমাত্র কর্তব্য নয় আমার? বিশ্বাস কর, ইন্দীবর, সকলের বিদ্রূপ গালাগালি আমি আর সহ্য করতে পারছি না। আমার সহ্যের সীমা অতিক্রম করে গেছে। কিন্তু আমার মতো বাজে মহারাজাদের সিংহাসন ত্যাগ করার কি মূল্য আছে। সিংহাসন ত্যাগ করবার আগে প্রমাণ করতে হবে যে ওই সিংহাসনে সত্যিই আমার কিছু অধিকার ছিল, সংক্ষেপে আগে সাড়ম্বরে মহারাজার অভিনয় করে তারপর সিংহাসন ত্যাগ করতে হবে।"

"ঠিক। কিংবা যেমন আছ তেমনি থাকতে হবে! আচ্ছা, তোমার আজ কি হয়েছে বল তো! তুমি কি করছ তা জানো? তুমি অজান্তে আনাড়ীর মতো জ্ঞানরাজ্যের সেই পবিত্র তীর্থে এসে পড়েছ যেখানে পাগলেরা থাকে। হ্যাঁ, পাগলেরা। আমাদের জ্ঞানের মন্দিরে গোপনতম নির্জন কক্ষে আমরা তালা দিয়ে যা বন্ধ করে রাখি, তা কি জান? মাকড়শার ঝুল। খুঁটিয়ে দেখলে দেখা যাবে সমস্ত মানুষ—সমস্ত বাজে, অত্যন্ত বাজে। অত্যন্ত অনাবশ্যক, একেবারে অপ্রয়োজনীয়। প্রকৃতি আমাদের দয়া করে সহ্য করেন, আমরা প্রকৃতির কোনও কাজে লাগি না। আমরা সেই ফুল যাতে ফল ফলে না। দরিদ্র ঘর্মাক্তকলেবর শ্রমিক থেকে শুরু করে তিলকমালাধারী মহাপুরুষরা পর্যন্ত সবাই একদলের, সবাই সমান অনাবশ্যক। কেউ কোন কাজে লাগি না। আমরা সবাই বালি দিয়ে দড়ি পাকাবার চেষ্টা করছি কিংবা তাস দিয়ে কেল্লা বানাচ্ছি। ও আলোচনা থাক। করলে পাগলদের কথা এসে পড়বে আবার।"

ইন্দীবর আসন থেকে উঠে পড়লেন। আবার বসে পড়লেন হঠাৎ। তারপর একটু হেসে বললেন, "ভায়া, দৈত্য-দানবদের সঙ্গে যুদ্ধ করা আমাদের কর্ম নয়, ফুলের মতো ফুটে থাকাই আমাদের কাজ। তুমি ওটা পারো বলেই তোমাকে ভালোবাসি। ওইই কর। ওই শোভন ওই সুন্দর। নিজের মৌজে মশগুল হয়ে গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়িয়ে বেড়াও। ধর্মটর্ম বিবেক-টিবেক চুলোয় যাক। কপিঞ্জল যেমন রাজ্য শাসন করছে করুক। লোকে বলে ও নাকি ভালই শাসন করছে। আর এসব করে ও নাকি খুশীও আছে, ওর দেমাকের কিছু খোরাকও পেয়েছে!"

"ইন্দীবর কি বলছ তুমি এসব? আমরা বাজে, আমরা অনাবশ্যক? না, আমি অন্তত

অনাবশ্যক নই, বাজেও নই। আমি হয় কোন কাজে লাগব, না হয় অকাজ করব। হয় গড়ব না হয় ভাঙব। স্থির হয়ে থাকা আমার ধাতে নেই। আমি মানছি রাজা-রাজত্ব এ সবই হাস্যকর ব্যাপার, সবই প্রহসন, কিন্তু এও ঠিক যে সাধারণ গৃহস্থরা যারা খেটে-খুটে খায় তারাই সমাজের ধারক আর বাহক। তিন বচ্ছর আমি রাজ্যের দিকে ফিরে তাকাইনি—সমস্ত দায়িত্ব, সমস্ত সম্মান, সমস্ত আমোদ-প্রমোদ, ঐশ্বর্যের সমস্ত সমারোহ কপিঞ্জল আর সুরূপিণীর হাতে ছেড়ে দিয়েছিলাম। ফল কি হয়েছে জান? প্রজাদের খাজনা বেড়েছে, সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে, কামান কেনা হয়েছে—অর্থাৎ রাজ্য বারুদের স্তূপে রূপান্তরিত হয়েছে। একটি স্ফুলিঙ্গ পড়বার অপেক্ষা কেবল। প্রজাদের শান্তি নেই। ক্ষেপে রয়েছে সবাই। যুদ্ধের কথাও শোনা যাচ্ছে—এই ছোট্ট চায়ের পেয়ালাতেও তুফান উঠবে বলছে সবাই। পেজোমি আর বোকামির এমন জটিল সমন্বয় আগে দেখেছ কখনও? এ লজ্জা এ অপমান সহ্য করা যায় না। এর অনিবার্য পরিণাম বিদ্রোহ যখন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠবে তখন ভগবানের কাছে জবাবদিহি করতে হবে কাকে? আমাকে। এই সাক্ষীগোপাল মহারাজা গন্ধরাজকে। লোকে আমাকেই জবাই করবে, আমাকেই দায়ী করবে—"

ইন্দীবর বললেন, "আমার ধারণা ছিল লোকমতকে তুমি গ্রাহ্য কর না।"

"আগে করতাম না, এখন করছি"—গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন গন্ধরাজ—"এখন বয়স বেড়েছে। তাছাড়া, ওই সুরূপিণী, তার খবর রাখ? তাকে সকলে ঘৃণা করে। বিয়ে করে যে দেশে তাকে আমি এনেছিলাম সে দেশে তার কিছুমাত্র সম্মান নেই। বুঝতে পারছি, আমারই দোষে নষ্ট হয়েছে সে। এই রাজ্যটা তাকে আমি খেলনার মতো উপহার দিয়েছিলাম, কিন্তু খেলনাটা সে ভেঙে ফেলেছে। ফেলবেই! যেমন দ্যাবা, তেমনি দেবী। আচ্ছা ইন্দীবর, তার জীবন কি নিরাপদ এ রাজ্যে?"

"হ্যাঁ, এখন নিরাপদ"—উত্তর দিলেন ইন্দীবর—"তবে জিজ্ঞাসা করছ যখন তখন খুলেই বলছি। আজ নিরাপদ, কিন্তু কাল কি হবে বলতে পারি না। তোমার রাণীর পরামর্শদাতা যিনি তাকে চালিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছেন, তিনি মোটেই ভালো লোক নন।"

"কে তিনি? তিনিই তো কপিঞ্জল। আর তুমি বলছ ওরই হাতে শাসনভার থাকুক। অদ্ভুত পরামর্শ তোমার! আমি এ ক'বছর যে পথে চলে এসেছি সে পথ আমাকে শেষে যে এখানে এনে ফেলবে তা ভাবতে পারিনি। তুমি বলছ সুরূপিণীর পরামর্শদাতা লোক ভালো নন। শুধুই কি তিনি পরামর্শদাতা? না, এ নিয়ে ঢাকঢাক গুড়গুড় করে লাভ নেই। লোকে তার সম্বন্ধে কি রটাচ্ছে জান?"

ইন্দীবর ঠোঁটে ঠোঁট চেপে বসেছিলেন, তিনি শুধু মাথা নাড়লেন।

"আমি রাজা হিসেবে যে কত বাজে সে সমালোচনায় তুমি পঞ্চমুখ। কিন্তু আমি স্বামী হিসেবে কেমন সে কথা তো তুমি একবারও বলনি।"

"না"—ইন্দীবর বললেন—"ও তো অন্য প্রসঙ্গ। আমি চিরকুমার প্রৌঢ় মানুষ। ও বিষয়ে কথা কইবার বা পরামর্শ দেবার অধিকার আমার নেই।"

"আমি পরামর্শ চাইও না"—উঠে দাঁড়ালেন গন্ধরাজ—"কিন্তু এসব আর চলবে না। এ বন্ধ করতেই হবে।"

পিছনে দু'হাত দিয়ে পদচারণা শুরু করলেন তিনি।

"গন্ধরাজ, ভগবান তোমার সহায় হোন, আমি পারব না" কিছুক্ষণ নীরব থেকে ইন্দীবর বললেন অবশেষে।

হঠাৎ থেমে গন্ধরাজ ফিরে দাঁড়ালেন।

"এর মানে কি? কি বলব একে। আত্ম-অবিশ্বাস? উপহাসের ভয়? ছদ্ম আত্মম্ভরিতা? নাম যাই হোক কিন্তু কি শোচনীয় অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছি। দেখ ইন্দীবর, ভুয়ো ব্যাপার নিয়ে আমি কখনও মাথা ঘামাইনি। এই খেলনা-সিংহাসন যখন আমি পেলাম তখন আমি আনন্দিত হইনি লজ্জিত হয়েছিলাম। এই রাজাগিরিতে, এই অসম্ভব হাস্যকর ব্যাপারে, আমার যে কিছুমাত্র আস্থা আছে তা লোকে বিশ্বাস করুক এ আমি মোটেই চাইনি। যা হাসিমুখে সহজভাবে করা যায় না তা আমি কখনও করি না। সত্যিই আমার একটা রস-বোধ আছে, আমার স্রষ্টা ভগবান সেটা জানেন কি না জানি না, কিন্তু আমি জানি। আমি বেরসিকের মতো কিছু করি না। বিয়ের ব্যাপারেও ঠিক তাই। যখন বিয়ে হল তখন বুঝলাম এ মেয়ে আমাকে কোনদিন ভালবাসবে না, সুতরাং তার পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার কোনও ম্যানে হয় না, আমি যে ওর জীবনে কাঁটা হয়ে থাকতে চাই না এটা ভড়ং করে বজায় রাখতে হবে। তাই করেছি। কিন্তু কি করেছি! লোকে আমাকে অক্ষম নপুংসক বলছে। ছি, ছি—"

"দেখ"—ইন্দীবর একটু হেসে বললেন—"আমাদের একই বংশে জন্ম, আমাদের দুজনের শরীরেই এক রক্ত বইছে। তাই বুঝতে পারছি অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে তুমি যে ছবিটি আঁকলে সেটি একটি সন্দেহবাদী দার্শনিকের অপূর্ব আলেখ্য—"

"দার্শনিকের? ভীরুর"—চীৎকার করে উঠলেন গন্ধরাজ—"হ্যাঁ ভীরুর। মেরুদণ্ডহীন, নতজানু ভীরুর, যার মাথায় গোবর ছাড়া আর কিছু নেই।"

গন্ধরাজের মুখ থেকে গুলির মতো এই কথাগুলো যখন ছুটছিল ঠিক সেই সময় একটি বেঁটে মোটা বৃদ্ধ ভদ্রলোক ইন্দীবরের পিছন দিকের একটি কপাট খুলে নিঃশব্দে প্রবেশ করলেন। গুলিগুলো যেন তাঁরই মুখে লাগল। একটু হকচকিয়ে গেলেন তিনি। শুকচঞ্চুর মতো নাক, চাপা ওষ্ঠাধর, ঠিকরে-পড়া চোখ ভদ্রলোকের। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে তিনি যেন ভব্যতার প্রতিমূর্তি। সাধারণত তিনি যখন তাঁর বিরাট ভুঁড়ির পিছনে সদর্পে ঘুরে বেড়ান তখন তাঁকে জ্ঞান-গম্ভীর অবিচল চরিত্রের লোক বলেই মনে হয়, কিন্তু একটু বেগতিক দেখলেই তাঁর চেহারা বদলে যায়, হাত কাঁপতে থাকে, পা নড়বড় করে। তখন বোঝা যায় মূলেই গোলমাল আছে কোথাও। পার্বতীর বিখ্যাত গ্রন্থশালায়—যেখানে সাধারণত নিশ্ছিদ্র নীরবতাই বিরাজ করে—সেখানে তিনি যে এমন সগর্জনে অভ্যর্থিত হবেন তা তাঁর কল্পনার অতীত ছিল। দুহাত তুলে মেয়েমানুষের মতো চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি, মনে হল সত্যিই বুঝি তাঁর মুখে গুলি লেগেছে।

"ও—" সভয়ে চীৎকার করে উঠলেন তিনি—"ও, আপনি, মহারাজ। বুঝতে পারিনি ঠিক। ক্ষমা করুন আমাকে। কিন্তু এত সকালে আপনি এখানে? ব্যাপারটা একেবারে ধারণার অতীত ছিল আমার—সত্যিই অপ্রত্যাশিত—মানে—"

"মহাধ্যক্ষ মশাই না কি। নমস্কার। হ্যাঁ, আজ একটু সকাল সকালই এসেছি এখানে।"

"আমি এখনি চলে যাচ্ছি। ভারতীমহাশয়কে কাল কিছু কাগজ দিয়ে গিয়েছিলাম সেটা নিয়ে যাব। ওগুলো দেখা হয়ে গেছে নিশ্চয় আপনার। দিন তাহলে নিয়ে চলে যাই। আপনাদের আলাপে বাধা দেব না।"

ইন্দীবর ভারতী একটি বাক্সের তালা খুলে একগোছা পাণ্ডুলিপির কাগজ তাঁকে দিলেন। কাগজগুলি হস্তগত করেই মহাধ্যক্ষ সসম্ভ্রমে নমস্কার করে চলে যাচ্ছিলেন।

"চলে যাচ্ছেন কেন"—বাধা দিলেন গন্ধরাজ—"এতদিন পরে যখন দেখাই হয়ে গেল তখন বসুন, একটু গল্প করা যাক।"

গর্জনগাঁওয়ের মহাধ্যক্ষ কুজ্ঝটিকুমার অভিবাদন করে বললেন—"মহারাজের এ অনুগ্রহে সম্মানিত হলাম।"

"আমি চলে যাওয়ার পর কোন গোলমাল হয়নি তো?"

গন্ধরাজ আসনে উপবেশন করলেন।

"আগে যেমন ছিল তেমনিই আছে"—উত্তর দিলেন কুজ্ঝটিকুমার—"সামান্য ইতরবিশেষ হয়েছে হয়তো কোথাও কোথাও। ওই সামান্য হয়তো না দেখলে বড় কিছু হয়ে পড়ত। কিন্তু তা হয়নি। মহারাজের আদেশ সর্বতোভাবে পালিত হচ্ছে।"

"আমার আদেশ?" গন্ধরাজ বিস্মিত হলেন—"আমি আবার কবে আপনাকে আদেশ দিয়ে বিব্রত করলাম! আমার বদলে হয়তো অন্য কেউ আদেশ দিয়ে থাকবেন। কিন্তু ও কথা যাক—ওই যে সামান্য ইতরবিশেষ কি কি হয়েছে বলছিলেন কি সেগুলো—"

"মহারাজ, আপনি রাজ্যের ধারাবাহিক কাজকর্ম থেকে নিজেকে বুদ্ধিমানের মতো সরিয়ে নিয়ে গিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন, তাই—"

"আমার বিশ্রামের কথা বাদ দিন। কি কি হয়েছিল তাই বলুন।"

"ওই যে বললাম রাজ্যের ধারাবাহিক কাজকর্মই"—আমতা আমতা করে আবার বললেন তিনি।

"আশ্চর্য কাণ্ড দেখছি। সোজা প্রশ্নের সোজা উত্তর দিতে পাচ্ছেন না আপনি? আপনি এ রাজ্যের মহাধ্যক্ষ, আপনার কাছে এ রকম অস্পষ্টতা আশা করিনি। সন্দেহ হচ্ছে এর পিছনে কোনও মতলব লুকোনো আছে। আমি আপনাকে প্রশ্ন করেছি আমার অবর্তমানে রাজ্যের শান্তি অটুট ছিল কি না। অনুগ্রহ করে এ কথাটার জবাব দিন—"

"হ্যাঁ, ছিল, ছিল বই কি, শান্তি অটুট ছিল—"

যে ভাবে থেমে থেমে হোঁচট খেয়ে হোঁচট খেয়ে কথাগুলো বললেন কুজ্ঝটিকুমার তাতে মনে হল সত্য গোপন করছেন তিনি।

"এই কি তাহলে আমাকে মনে করতে হবে"—গম্ভীরভাবে বললেন গন্ধরাজ—"আপনি মহাধ্যক্ষ, আমার কাছে জানাচ্ছেন যে আমি চলে যাওয়ার পর রাজ্যে এমন কিছু ঘটেনি যা উল্লেখযোগ্য, যা আমার জানা উচিত?"

"না, না, ভারতী মশায় সাক্ষী আছেন, এরকম কোন কথা আমি বলিনি মহারাজ।"

"চুপ করুন"—থামিয়ে দিলেন তাঁকে গন্ধরাজ।

তারপর একটু থেমে বললেন—"দেখুন মহাধ্যক্ষ মশায়, আপনি বৃদ্ধ হয়েছেন। আমার অধীনে কাজ করবার আগে আমার বাবার অধীনেও আপনি কাজ করেছেন। আপনার মুখে এ ধরনের এলোমেলো কথা শোভা পাচ্ছে না, মনে হচ্ছে আপনি যেন কোনও অছিলায় সত্য গোপন করতে চাইছেন। আমি এ রাজ্যের মহারাজা, আমি প্রত্যাশা করি আমার মহাধ্যক্ষ তাঁর মর্যাদার উপযুক্ত হবেন। আপনি স্থির হয়ে একটু ভাবুন এবং যে, সব কথা গোপন করবার

চেষ্টা করেছেন তা খুলে বলুন। হয়তো আর কারও প্ররোচনায় আপনি এ হীন কাজে প্রবৃত্ত হয়েছেন—কিন্তু আমি অনুরোধ করছি, আপনি আত্মস্থ হোন।''

ইন্দীবর শাস্ত্রী তাঁর পাণ্ডুলিপির উপর ঝুঁকে পড়ে সম্ভবত কিছু সংশোধন করছিলেন কিন্তু তাঁর স্কন্ধযুগলের আন্দোলন থেকে মনে হল তিনি গোপনে হাসছেন। আঙুলে রুমাল জড়াতে জড়াতে অপেক্ষা করতে লাগলেন গন্ধরাজ।

''মহারাজ, আমাকে ক্ষমা করুন। আমার কাছে এখন কোনও কাগজপত্র নেই, আপনার অবর্তমানে যে গুরুতর ঘটনাটি ঘটেছে সে সম্বন্ধে এখানে এভাবে দাঁড়িয়ে কিছু বলা যাবে না—কারণ সেটা রীতিবিরুদ্ধ। কারণ যা ঘটেছে তা কেন ঘটেছে সেটা আপনাকে বোঝাতে হলে সরকারী কাগজপত্র চাই। তা না হলে আমার ভয় হচ্ছে, আপনি সুবিচার করতে পারবেন না।''

''আমি কোনও সমালোচনাই করব না''—গন্ধরাজ বললেন—''আপনার আর আমার মধ্যে ভয়ের ছায়া থাকুক, এটাও আমি চাই না। কারণ আমি ভুলিনি আমার সঙ্গে আপনার কি সম্পর্ক। বহুদিন থেকে আপনি এ রাজ্যের বিশ্বাসী কর্মচারী। কাগজপত্রের দরকার নেই, আপনি যদি মনে করেন ও বিষয়ে আমার হস্তক্ষেপ করা অনুচিত—তাও আমি করব। কিন্তু আপনার হাতেই তো এখন একগোছা কাগজ রয়েছে। কি এগুলো? দেখি। আশা করি ওগুলোর সম্বন্ধে আলোকপাত করতে আপনার আপত্তি নেই।''

''এগুলো?''—বলে উঠলেন কুজ্ঝটিকুমার—''এগুলো বাজে কাগজ। গোয়েন্দা আর আরক্ষী বিভাগের লোকেরা পাঠিয়েছিল। ওই যে বাঙালী পর্যটকটি এসেছেন তাঁরই কিছু কাগজপত্র বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। আমরা ভারতী মশাইয়ের কাছে দেখবার জন্য দিয়ে গিয়েছিলাম।''

''বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে?''—গন্ধরাজ বলে উঠলেন—''কি রকম? খুলে বলুন সব।''

ইন্দীবর ভারতী বললেন—''রাঢ়ের ভগীরথ শর্মাকে কাল সন্ধ্যায় এখানে বন্দী করা হয়েছে।''

''সে কী! এ কথা কি সত্যি?''

মহাধ্যক্ষ কুজ্ঝটিকুমারের দিকে ফিরে প্রশ্ন করলেন গন্ধরাজ।

''হ্যাঁ, সেইটেই সঙ্গত বলে বিবেচিত হয়েছে''—একটু কুণ্ঠিত হয়ে পড়লেন যেন মহাধ্যক্ষ—''বেআইনী কিছু হয়নি। মহারাজেরই ছাপ মোহর আর মহারাণীর দস্তখত অনুসারে আইনত সব কিছু করেছেন ওঁরা। আমি ভৃত্য মাত্র, আমার বাধা দেবার কি অধিকার আছে মহারাজ!''

''ভগীরথ শর্মা আমার রাজ্যের সম্মানিত অতিথি। তাঁকে বন্দী করেছেন আপনারা? কি দোষে? কোন অছিলায়?''

মহাধ্যক্ষ আমতা আমতা করতে লাগলেন।

ইন্দীবর ভারতী বললেন—''মহারাজ হয়তো ওই পাণ্ডুলিপি থেকেই বুঝতে পারবেন সেটা।''

কলম দিয়ে দেখিয়ে দিলেন তিনি পাণ্ডুলিপিটা।

গন্ধরাজ ইন্দীবরের দিকে সহাস্য দৃষ্টিতে চেয়ে মহাধ্যক্ষকে বললেন, "দিন তাহলে ওটা, দেখি—"

মহাধ্যক্ষ কিন্তু ইতস্তত করতে লাগলেন।

"মহাসামন্ত কপিঞ্জল এ ব্যাপারটা নিজের হাতেই রাখতে চান। এক্ষেত্রে আমি বাহক মাত্র। এ পাণ্ডুলিপি হস্তান্তরিত করবার হুকুম নেই। ইন্দীবর ভারতী আশা করি আমাকে সমর্থন করবেন।"

"দেখুন মহাধ্যক্ষ মশাই, এসে থেকে ক্রমাগতই আপনি আবোল-তাবোল বকছেন। কিন্তু এখন যা বললেন তা মাত্রা ছাড়িয়ে গেল। দিন, দিন ওগুলো। আমি আদেশ করছি আপনাকে। দিন—"

কুজ্ঝটিকুমার আর পারলেন না।

"তাই হোক। আমার আবধ্যতার জন্য বার বার ক্ষমা প্রার্থনা করছি, কিন্তু কি করব, আমি নাচার। যদি অনুমতি করেন তাহলে আমি এবার মন্ত্রণালয়ে যাই। সেখানে রাজকার্যের—"

"ওই চেয়ারটা দেখছেন? ওইটের উপরই বসুন এখন। ওইখানে বসেই রাজাকার্য করুন আপাতত। না, না, আর কোন কথা বলবেন না"—কুজ্ঝটিকুমার কথা বলবার জন্যে মুখ খুলেছিলেন —" নতুন মনিবের যে আপনি বিশ্বস্ত চাকর তার অনেক প্রমাণ তো দিলেন। কিন্তু আমার সহ্যেরও তো একটা সীমা আছে।"

মহাধ্যক্ষ মশাই বিনাবাক্যব্যয়ে বসে পড়লেন চেয়ারটাতে।

"দেখা যাক এবার এতে কি আছে"—পাণ্ডুলিপির কাগজগুলো ওলটাতে লাগলেন গন্ধরাজ—"ও বাবা, এ যে দেখছি প্রকাণ্ড বই একটা।"

"হ্যাঁ"—ইন্দীবর বললেন—"ওটি একটি ভ্রমণকাহিনী। উনি নানা রাজ্যে ঘুরে ঘুরে যা দেখেছেন তাই লিখেছেন এতে।"

"তুমি পড়েছ বইখানা?"

"না। আমি সূচীপত্রটা দেখেছি কেবল। বইটা কিন্তু খোলা অবস্থায় পেয়েছিলাম। আর ও সম্বন্ধে কোনও গোপনতা বা সতর্কতার কথাও তো আমাকে বলা হয়নি।"

গন্ধরাজ কুজ্ঝটিকার দিকে একটা ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন।

"হুঁ—গন্ধরাজ পাতা ওলটাতে ওলটাতে বললেন—"পৃথিবীর ইতিহাসের এই সন্ধিক্ষণে গর্জনগাঁওয়ের মতো অতি ক্ষুদ্র অতি নগণ্য একটা রাজ্যে একজন গ্রন্থকারের লেখা পাণ্ডুলিপি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে—এর চেয়ে অকীর্তিকর মূর্খতা আর কি হতে পারে!"

তারপর কুজ্ঝটিকুমারের দিকে চেয়ে বললেন—"এরকম একটা ঘৃণ্য কাজে আপনি হাত দিয়েছেন? আমার প্রতি আপনি সুবিচার করেছেন, না, অবিচার করেছেন সে কথা এখন থাক, কিন্তু আপনি, গর্জনগাঁওয়ের মহাধ্যক্ষ, গুপ্তচর হয়েছেন শেষে? তাছাড়া একে আর কি বলব! একজন গণ্যমান্য ভদ্রলোককে বন্দী করে, তাঁর ব্যক্তিগত কাগজপত্র, তাঁর সারাজীবনের সাধনা এই গ্রন্থ কেড়ে নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করে যা করেছেন আপনি, তা কি কোনও ভদ্রলোকে করে কখনও? এই ভগীরথ শর্মা আমার সম্মানিত অতিথি। বঙ্গরাজ প্রসন্নপল্লবের পরিচয়পত্র নিয়ে তিনি এসেছিলেন আমার রাজ্য পরিদর্শন করতে। তিনি শুধু বড় পণ্ডিতই নন, বড় যোদ্ধাও একজন। প্রসন্নপল্লব লিখেছিলেন উনি অভিজাত বংশের সন্তান, শস্ত্র এবং শাস্ত্র উভয়

ক্ষেত্রেই পারঙ্গম। কিন্তু ওঁর দেশভ্রমণ করবার বাতিক আছে, তাই সারা ভারতের নানা রাজ্যে ঘুরে বেড়ান। আমি ওঁকে সসম্মানে অভ্যর্থনা করেছিলাম। আমার অবর্তমানে তাঁকে কোন্ সাহসে অপমান করেছেন আপনারা? কেন ওঁর গ্রন্থ বাজেয়াপ্ত করেছেন? গ্রন্থ নিয়ে কি করব আমরা? ইন্দীবর ভারতী হয়তো বলতে পারবেন গ্রন্থটি ভালো কি মন্দ, কিন্তু যদি মন্দই হয় তাহলে তা নষ্ট করবার অধিকার আমাদের আছে কি? তা যদি থাকতো তাহলে তো পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে ভাঁড়ের ভূমিকায় আমরা প্রথম হতাম!''

এ সব কথা বলতে বলতে গন্ধরাজ পাণ্ডুলিপিটি উলটে-পালটে দেখছিলেন। দেখলেন মলাটের উপর লেখা রয়েছে—''ভারতের নানা রাজ্যের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বিবরণ। ভগীরথ শর্মা বিরচিত।'' এরপরই সূচীপত্র। কোন্ কোন্ রাজ্যে তিনি গেছেন তারই একটা তালিকা। গন্ধরাজ দেখলেন ঊনবিংশ পরিচ্ছেদটি তিনি গর্জনগাঁওয়ের সম্পর্কে লিখেছেন।

''গর্জনগাঁও সম্বন্ধেও লিখেছেন দেখছি। মজার হবে নিশ্চয়ই খুব।''

পড়বার জন্যে কৌতূহলী হয়ে উঠলেন তিনি।

'' ভদ্রলোকের লেখার বৈশিষ্ট্য আছে একটা। তিনি প্রত্যেক রাজ্যে থেকে সে রাজ্য সম্বন্ধে লেখা আরম্ভ করেছেন এবং সে লেখা শেষ করে তবে সে রাজ্য ত্যাগ করেছেন। মানে, সবই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। বইটা যখন প্রকাশিত হবে তখন আমি যোগাড় করব একটা।''

''এটা কি পড়া উচিত হবে।''

ইন্দীবর ভ্রূকুঞ্চিত করে জানলার দিকে চেয়ে রইলেন। গন্ধরাজ অনুভব করলেন ইন্দীবরের ইচ্ছে নয় যে তিনি পড়েন।

''একবার একটু দেখেনি উলটে পালটে, তাতে আর ক্ষতিটা কি''—একটু হেসে আড়চোখে ইন্দীবরের দিকে চেয়ে পাণ্ডুলিপিটি প্রসারিত করে বসলেন তিনি।

।। ছয়।।

ভগীরথ শর্মা ঊনবিংশ পরিচ্ছেদটি এই ভাবে আরম্ভ করেছিলেন।

''আপনারা সঙ্গতভাবেই প্রশ্ন করিতে পারেন যে হিমালয়ের পাদদেশে তো গর্জনগাঁওয়ের মতো অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য আছে, সকলেই একরকম নামেমাত্র রাজ্য সকলেই স্থূল-রুচি, সকলেই নীতি-বিবর্জিত,—তবে গর্জনগাঁওকেই আমি নির্বাচন করিলাম কেন। ঘটনাচক্র ইহার জন্য দায়ী, আমি স্বেচ্ছায় ইহা করি নাই। কিন্তু ইহাও বলিব, এজন্য আমার দুঃখও হয় নাই। এই ক্ষুদ্র রাজ্যের ক্ষুদ্র সমাজে শিক্ষণীয় কিছু পাইলাম না, নিজেদের বিকৃতির জারকরসে ইহারা ক্রমশই গলিত বিগলিত হইতেছে। এখানে শিখিবার কিছু নাই। কিন্তু এখানে আমি অনেক মজার জিনিস দেখিলাম। এখানে আমোদের অনেক উপকরণ মিলিয়াছে।

এখানকার যিনি মহারাজা—মহামহিম মহিমার্ণব শৈলসুত শ্রীমন গন্ধরাজ বর্মন, তিনি, আমার মনে হয় তেমন শিক্ষিত লোক নহেন। তাঁহার সাহসের অভাব আছে, কর্ম-প্রেরণাও নাই। তাঁহার প্রজাদের চক্ষে তিনি ঘৃণিত এবং হেয়। অনেক কষ্টে আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ লাভ করি। কারণ তিনি প্রায়ই রাজসভায় থাকেন না, বাহিরে বাহিরে ঘুরিয়া বেড়ান।

রাজসভায় কেহ তাঁহাকে গ্রাহ্য করে না। রাজসভায় যখন থাকেন তখন তাঁহাকে মহারাণীর প্রণয়-লীলায় আববণ স্বরূপ থাকিতে হয়। এতদ্ব্যতীত রাজসভায় তাঁহার অন্য ভূমিকা নাই। তৃতীয়বারের চেষ্টায় আমি যখন সাক্ষাৎকারের অনুমতি পাইয়া রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করি তখন মহারাজাকে ওই ভূমিকাতেই দেখিয়াছিলাম। তাঁহার একপাশে মহারাণী, আর একপাশে মহারাণীর প্রণয়ী কপিঞ্জল। মহারাজ কুদর্শন ব্যক্তি নহেন। মাথায় কালো কুঞ্চিত কেশদাম, চোখের তারা নীলাভ। কালো চুল আর নীলাভ চোখের সমন্বয় চারিত্রিক বা মানসিক দৌর্বল্য সূচিত করে। হয়তো এ দৌর্বল্য উত্তরাধিকারসূত্রে তিনি পাইয়াছেন বলিয়া মনে হয়। তাঁহার শারীরিক সৌষ্ঠবে ছন্দ নাই, কিন্তু রূপ আছে। নাকটি ঈষৎ ছোট, মুখটি নারী-সুলভ। তাঁহার কথাবার্তা বলিবার ভঙ্গী মনোরম, তিনি সার্থকভাবে নিজের মনোভাব প্রকাশ করিতেও সক্ষম। কিন্তু তাঁহার এই মনোহর বহিরাবরণ ভেদ করিয়া অন্তরে প্রবেশ করিলে হতাশ হইতে হয়। সেখানে কোনও উৎকৃষ্ট গুণ নাই। আছে শিথিল নীতির আভাস, আছে চপলতা, আছে পরস্পরবিরোধী উদ্দেশ্যহীন অসংলগ্ন চিন্তাধারা। বর্তমান যুগের অবক্ষয়-বৃক্ষের তিনি একটি পাকা ফল। মাকাল ফল। সব-জান্তা পল্লবগ্রাহী গোছের লোক তিনি। নানা বিষয়ে অনেকক্ষণ বক্‌বক্ করিলেন, দেখিলাম একটি বিষয়েও তাঁহার সম্পূর্ণ জ্ঞান নাই। তিনি বলিলেন, "আমি এক জিনিস নিয়ে বেশীক্ষণ থাকতে পারি না"—হাসিমুখেই কথাটা বলিলেন, যেন তাঁহার এই অক্ষমতা, এই চারিত্রিক দীনতা একটা বাহাদুরি, একটা গর্বের বস্তু। তাঁহার এই ঢিলা-ঢালা কান্ত কোমল দুর্বল চরিত্রের প্রভাব সর্বক্ষেত্রে পরিস্ফুট। তিনি অসিযুদ্ধ করেন, কিন্তু তিনি প্রথম শ্রেণীর অসি-যোদ্ধা নহেন। অশ্বারোহী, নর্তক, শিকারী—তিনি সবই, কিন্তু দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীর। তিনি গানও করেন—আমি তাঁহার গান শুনিয়াছি—মনে হয় ছোট ছেলে গান গাহিতেছে। তিনি ভুল সংস্কৃতে বাজে কবিতাও লেখেন। অভিনয়ের শখও আছে, কিন্তু কৃতিত্ব নাই, নৈপুণ্য নাই, প্রতিভা নাই। সংক্ষেপে, তিনি বহুরকম ব্যাপারে লিপ্ত থাকেন, কিন্তু কোনটাই ভালো করিয়া করিতে পারেন না। একটিমাত্র পুরুষোচিত গুণ আছে তাঁহার, সেটি শিকার। এককথায়, তিনি নানা দুর্বলতার সঙ্গমক্ষেত্র। মনে হয় আসলে তিনি বোধহয় থিয়েটারের সখী, তামাশা করিয়া কেহ বুঝি তাঁহাকে পুরুষবেশে সাজাইয়া ঘোড়ার পিঠে চড়াইয়া দিয়াছে! আমি দূর হইতে এই নকল-মহারাজাকে, এই মহারাজার অপচ্ছায়াকে, অশ্বপৃষ্ঠে কয়েকবার দেখিয়াছি। কখনও একাই চলিয়াছেন, কখনও বা দুই চারিজন শিকারী হয়তো সঙ্গে আছে। কেহ তাঁহাকে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনিতেছে না। ব্যর্থ বিষণ্ণ এই চিত্রটি দেখিয়া আমি নিজেই বড় দুঃখ বোধ করিয়াছি। মহৎ রাজবংশের অন্তিমকালে হয়তো এইরূপ দুর্বল প্রতিভূদেরই আবির্ভাব ঘটে।

মহারাণী শতশ্রী সুরূপিণী, কপিলবাস্তুর মহারাজাধিরাজ উৎফুল্লগৌরবের কন্যা। স্বামীর মতোই তাঁহাকেও হয়তো নগণ্যা বলিতাম, কিন্তু তিনি একজন উচ্চাভিলাষী পুরুষের হস্তে শাণিত অস্ত্রের মতো হইয়া রহিয়াছেন বলিয়া তাঁহার অস্তিত্ব নিতান্ত তুচ্ছ করিবার মতো নহে। বয়সে তিনি গন্ধরাজ অপেক্ষা অনেক ছোট। শুনিয়াছি মাত্র বাইশ বৎসর বয়স তাঁহার। উপর-চালাক, দেমাকের মরাই, কিন্তু আসলে নির্বোধ এই যুবতীটি যে খুব একটা রূপসী তাহাও নহেন। চক্ষু দুইটি বেশ বড় বড়, কিন্তু মুখের সহিত বেমানান, তারা দুইটি কালো নহে বাদামী। চক্ষু দুইটি ক্ষণকালও স্থির থাকে না, সর্বদাই ঘুরিতেছে। মহারাণীকে ঘূর্ণিতলোচনা আখ্যা দিলে

অত্যুক্তি হয় না, চোখের দৃষ্টি হইতে মনে হয় মেয়েটি চপল এবং দুর্দান্ত। কপালটি বেশ উঁচু এবং অপ্রশস্ত। দেহের গঠনসৌষ্ঠবও চমৎকার নহে। খুব রোগা এবং একটু কোল-কুঁজা ধরনের। সর্বদাই যেন সামনের দিকে একটু ঝুঁকিয়া আছেন। তাঁহার ধরন-ধারণ, কথাবার্তা, তাঁহার রুচি, এমন কি তাঁহার উচ্চাকাঙ্ক্ষা পর্যন্ত কোনটাই যেন স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয় না। মনে হয় যেন অভিনয় করিতেছেন। আর অভিনয়টাও অপটু বলিয়া সমস্তটাই কুৎসিত এবং দৃষ্টিকটু। কোন বগী বা বিন্দী দ্রৌপদীর ভূমিকায় অবতরণ করিলে যে হাস্যকর ব্যাপার ঘটে, এ যেন তাহাই ঘটিয়াছে। সত্যের সম্বন্ধে বা শালীনতা বিষয়ে ইঁহার কোনও নিষ্ঠা আছে বলিয়া মনে হয় না। সমাজে এই জাতীয় মেয়েরাই গোপনে প্রণয়ীপরিবৃত হইয়া সংসারের সুখশান্তি নষ্ট করে এবং হয়তো স্বামীপরিত্যক্তা হইয়া অবশেষে স্বৈরিণী-জীবনের নরককুণ্ডে নিপাতিত হয়। মহারাণীর মধ্যে অসাধারণ কোনও গুণই নাই এবং ছিদ্রান্বেষী নারী-বিদ্বেষী ছাড়া আর কেহ যে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইবেন তাহাও মনে হয় না। কিন্তু সিংহাসনে বসিয়া এই রমণী কপিঞ্জলের মতো লোকের দ্বারা চালিত হইলে জনসাধারণের গুরুতর ক্ষতি ও অনিষ্ট সাধন করিতে পারে।

কপিঞ্জলই বর্তমানে এই হতভাগ্য রাজ্যের আসল রাজা। কপিঞ্জল ব্যক্তিটি জটিল চরিত্রের লোক। গর্জনগাঁওয়ে তিনি বিদেশী, সে হিসাবে এখানে তাঁহার পদ-মর্যাদা মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত। তথাপি সে পদ-মর্যাদা তিনি যে ভাবে রক্ষা করিতেছেন তাহাকে ধৃষ্টতা ও দক্ষতার একটা আশ্চর্য কীর্তি ছাড়া আর কি বলা যায়! প্রবল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন চতুর লোক তিনি। তাঁহার কথাবার্তা, তাঁহার মুখভাব, তাঁহার নীতি––সবই কপটতাপূর্ণ। মুড়া এবং ল্যাজা একসঙ্গে। অতিবড় বুদ্ধিমান লোকও ঠাহর করিতে পারিবেন না তাঁহার আসল অভিপ্রায়টা কি। তবু আমি সাহস করিয়া একটা আন্দাজ করিতেছি। মনে হয় তিনি দুই নৌকাতেই পা দিয়া অপেক্ষা করিতেছেন ভাগ্যের অনুকূল পবন কোন নৌকার পালে লাগে। যেটাতে লাগিবে সেইটাই তিনি বাহিবেন। বুদ্ধিমান লোকেদের উপর ভাগ্যবিধাতার কৃপা প্রায়ই অকৃপণ ধারায় বর্ষিত হয়।

অপদার্থ গন্ধরাজের প্রধানমন্ত্রীরূপে এবং প্রণয়-বিহ্বলা সুরূপিণীকে অস্ত্র এবং মুখপাত্রী হিসাবে ব্যবহার করিয়া কপিঞ্জল এখন স্বেচ্ছাচার-ক্ষমতা-দৃপ্ত এবং রাষ্ট্রীয় উন্নতি বিধানে বদ্ধপরিকর। রাজ্যের সমস্ত সমর্থ পুরুষকে তিনি সেনাদলে ভরতি করিয়াছেন। অনেক কামান কেনা হইয়াছে এবং বিদেশ হইতে অনেক রণ-নিপুণ সেনানায়কও তাঁহার প্ররোচনায় গর্জনগাঁওয়ের সেনা-বিভাগে যোগদান করিতে প্রলুব্ধ হইয়াছেন। আন্তর্জাতিক রঙ্গমঞ্চে প্রচ্ছন্নভাষায় তর্জনগর্জন করিয়া এখন তিনি যাহা করিতেছেন তাহা গুণ্ডাকেই মানায়। তিনি ঘোষণা করিয়াছেন গর্জনগাঁও এবার দিগ্বিজয়ে বাহির হইবে। গর্জনগাঁওয়ের মতো ক্ষুদ্র রাজ্য তাহার পরিধি বিস্তার করিবে ইহা বাতুলতা বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু গর্জনগাঁওয়ের একটা সুবিধা আছে। যদিও সে আয়তনে ছোট কিন্তু পর্বত-অরণ্য পরিবৃত হইয়া এমন স্থানে সে অবস্থিত যে সামরিক দৃষ্টিতে তাহাকে নিরাপদই বলা চলে। তাহার পার্শ্ববর্তী ছোট ছোট রাজ্যগুলিও অরক্ষিত এবং অসহায়। যদি কোন সময়ে হিমাচল প্রদেশের শক্তিমান রাজ্যগুলি পরস্পরের হিংসায় অন্ধ হইয়া পড়ে, আর গর্জনগাঁও যদি সেই সুযোগে একটু তৎপরতা দেখায় তাহা হইলে অনায়াসেই তাহার রাজ্যের সীমানা এবং জনসংখ্যা দ্বিগুণ হইয়া যাইতে

পারে। গর্জনগাঁওয়ের রাজধানী পার্বতীর রাজসভায় এখন ইহা লইয়াই জল্পনাকল্পনা চলিতেছে এবং ব্যক্তিগতভাবে আমি ইহাকে নিতান্ত অবাস্তব বলিয়াও মনে করি না। অনেক ছোট রাজ্য যে এই ধরনের সুযোগ সুবিধার সহায়তা লইয়া বৃহৎ শক্তিশালী রাজ্যে পরিণত হইয়াছে ইহার উদাহরণ ইতিহাসে বিরল নহে। যদিও এখন হাওয়া বদলাইয়াছে এবং যদিও এখন দিগ্বিজয়ের কাহিনী পৌরাণিক আখ্যায়িকায় পর্যবসিত হইয়া আমাদের অবসর-বিনোদন করিতেছে, তবু একথাও অস্বীকার করা যায় না যে অপ্রত্যাশিত ঘটনা এখনও ঘটে, ভাগ্যের অঙ্গুলি-হেলনে এখনও অনেক রাজ্যের এবং জাতির উত্থান-পতন নির্ণীত হয়। গর্জনগাঁওয়ে যুদ্ধের প্রস্তুতি চলিতেছিল, সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছিল করবৃদ্ধি এবং স্বাধীন মতামতের কণ্ঠরোধ। তিন বৎসর পূর্বে যে দেশে সুখ-শান্তির প্রাচুর্য ছিল সে দেশ এখন নিষ্ক্রিয়, প্রাণহীন। দেশের সমস্ত স্বর্ণ অন্তর্ধান করিয়াছে, দেশের সমস্ত নির্ঝরিণীচালিত যন্ত্রগুলি অচল। সমস্ত সমর্থ লোককে সেনাদলে যোগ দিতে বাধ্য করা হইয়াছে।

কপিঞ্জল এখানকার আপোষ-নিষ্পত্তির বিচারক। সে ভূমিকাতেও তিনি আর এক কাণ্ড করিতেছিলেন। রাজ্যের বড় বড় পান্থশালায় বিচারের ওজুহাতে অবতারের মর্যাদায় সম্বর্ধিত হইয়া তিনি সংঘবদ্ধ সভাগুলিতে যাহা করিতেছিলেন তাহা বিচার নহে, ষড়যন্ত্র, তাহা রাজার বিরুদ্ধে বিষোদগার। অবশ্য সভা না বলিয়া এগুলিকে আড্ডা বলাই সঙ্গত। এখানে আসিবার বহু পূর্বে হইতেই আমি রাজতন্ত্রবিরোধী আন্দোলনের সমর্থক। কোথাও কোন মন্তব্য বা আচরণ দ্বারা ইহার প্রতিকূলতা আমি করি নাই। তাই এ ধরনের অনেক আড্ডায় আমার স্বচ্ছন্দ গতিবিধি ছিল। সুতরাং যাহা লিখিতেছি তাহা গুজব-মাত্র নহে, প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ। একটি সভায় গণতন্ত্রের সংবিধান কিরূপ হইবে তাহা লইয়া বিশদ আলোচনা চলিতেছিল। লক্ষ্য করিলাম সে আলোচনায় সকলেই কপিঞ্জলকেই সর্ববিষয়ে কর্ণধাররূপে মানিয়া লইতেছে। মনে হইল কপিঞ্জল ইহাদের সকলকেই সম্মোহিত করিয়াছে। তিনি প্রচার করিতেছেন যে মহারাণী সুরূপিণীর মোহিনীশক্তির বিরুদ্ধে তিনি আর কত যুদ্ধ করিবেন, তাঁহার শক্তির একটা সীমা আছে তো। নানারূপ ভুয়া যুক্তি দর্শাইয়া ইহাও তিনি বার বার বলিতেছেন ঠিক এই মুহূর্তে বিপ্লবের দামামা বাজানো সমীচীন হইবে না। কিন্তু তিনি যে রাজনীতিতে বিচক্ষণ এবং প্রজাদের হিতৈষী ইহা জাহির করিবার জন্য তিনি ইহাও বলিতেছেন যে দামামা না বাজাইলেও বিপ্লবের জন্য প্রস্তুতি দরকার। প্রত্যেক সমর্থ লোককে তিনি সৈন্যদলে জোর করিয়া টানিয়া আনিয়াছেন, ইহাতে অনেকের মনে অশান্তির সৃষ্টি হইয়াছে। সেই ক্ষতের উপর এই বলিয়া তিনি মলম লাগাইতেছেন যে সৈন্যদলে ভরতি হইলে সকলেরই একটা সামরিক শিক্ষা ও নিপুণতা হইবে—যাহা না থাকিলে কোনও বিদ্রোহই কখনও সফল হয় না। বিদ্রোহ করিয়া এই রাজতন্ত্রকে ধ্বংস করাই যদি উদ্দেশ্য হয় তাহা হইলে প্রত্যেককেই শিক্ষিত সৈনিক হইতে হইবে। সেদিন আর একটা গুজব শুনিয়া অবাক হইলাম। গর্জনগাঁও নাকি নিরীহ প্রতিবেশী রাজ্য ভৈরঙ্গীকে আক্রমণ করিবে। মনে হইল—প্রজারা এইবার বোধহয় কপিঞ্জলের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়া উঠিবে। অনিচ্ছুক নির্বিরোধী প্রতিবেশী ভৈরঙ্গীর উপর জোর করিয়া যুদ্ধ চাপাইয়া দেওয়া বর্বরতার নামান্তর মাত্র। গর্জনগাঁওয়ের প্রজারা নিশ্চয় ইহা সহ্য করিবে না। কিন্তু বাজারে গিয়া যাহা শুনিলাম তাহাতে আরও অবাক হইতে হইল। গর্জনগাঁওয়ের উদারপন্থী রাজনৈতিক দলও দেখিলাম কপিঞ্জলের জাদুমন্ত্রে

বশীভূত হইয়া বলিতেছে—"যাক না, ছোঁড়াগুলো আসল যুদ্ধ কাকে বলে তা দেখে আসুক। হাতে-কলমে কাজ শেখাই তো ভালো।" সকলেরই মুখে এই কথা, সকলেই বর্বর কপিঞ্জলের ভুয়া যুক্তি মানিয়া লইয়াছে, সকলেই মন্ত্রমুগ্ধ। সকলেরই মুখে শুনিলাম—"ওরা ভৈরঙ্গী আক্রমণ করে হাতে-কলমে যুদ্ধটা শিখে আসুক। ভৈরঙ্গীকে আমাদের সীমানা-ভুক্ত করাই তো ভালো। তাতে আমাদের শক্তি বাড়বে। চাই কি এর পর আমরা আরও এগিয়ে যেতে পারব। আমাদের স্বাধীন গণতন্ত্র আরও শক্তিশালী হবে। ভারতবর্ষের সব রাজারাও যদি একজোট হয়ে আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়ায় তাহলেও আমাদের কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারবে না কেউ।" সব শৃগালের মুখেই ওই একই 'হুক্কা হুয়া'। আমি কিসের বেশী প্রশংসা করিব ভাবিয়া পাইতেছি না—গর্জনগাঁওয়ের প্রজাপুঞ্জের সরলতার, না, ভাগ্যান্বেষী এই লোকটার ধৃষ্টতার। ধূর্তটা সত্যই নানা ছলনার জাল বিস্তার করিয়া গর্জনগাঁওয়ের সকলকে নিজের কুক্ষিগত করিয়াছে। অবশ্য এই সর্পিল বিপদসঙ্কুল পথে তিনি কতদিন নিরাপদে চলিতে পারিবেন তাহা জানি না। মনে হয় বেশীদিন পারিবেন না। কিন্তু ইহাও সত্য গত পাঁচ বৎসর ধরিয়া তিনি এই জটিল গোলকধাঁধায় স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতেছেন এবং যতদূর জানি, রাজসভায় এবং জনসাধারণের মধ্যে তাঁহার প্রভাব কখনও কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই।

আমার সহিত তাঁহার ব্যক্তিগত পরিচয়ের কিঞ্চিৎ সুযোগ ঘটিয়াছে। অদ্ভুত চেহারা ভদ্রলোকের। কদাকার গড়ন। প্রকাণ্ড নড়বড়ে শরীর, মনে হয় শরীরের কোথাও যেন মজবুত বাঁধুনি নাই, লম্বাচওড়া খাপছাড়া তাঁবুর মতো একটা চেহারা। অথচ যে কোনও সময়ে ইচ্ছা করিলে তিনি এই শরীরটাকে টানিয়া টুনিয়া গুটাইয়া নৃত্যের আসরের উপযোগী করিয়াও তুলিতে পারেন। তাঁহার বর্ণ এবং মেজাজ দুইই কবিরাজী ভাষায়—পিত্তপ্রধান। চোখের দৃষ্টি সর্বদাই অপ্রসন্ন। ক্ষৌরীকৃত গণ্ড এবং চিবুক ঘননীল। চোয়ালটা যেন সামনের দিকে ঠেলিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছে। দেখিলেই বোঝা যায় তিনি সকলকে ঘৃণা করেন, এমন কি তাঁহার দলের লোকদেরও। অথচ নিজে তিনি সাধারণ স্তরের ঊর্ধ্বে উঠিতে পারেন নাই, সাধারণ লোকের মতই তিনি উচ্চাকাঙ্ক্ষী এবং প্রশংসালোলুপ। লক্ষ্য করিয়াছি কথাবার্তা বলিবার সময় নানারকম খবর সংগ্রহ কবিবার জন্যই তিনি বেশী উৎসুক, নিজে তেমন কিছু বলিতে চান না, কেবল শুনিতে চান, বিশেষত খাঁটি কথা এবং সার সত্য শুনিবার আগ্রহটা খুবই প্রবল। মামুলী রাজনৈতিক নেতারা সাধারণত অদূরদর্শী হন, সে মানদণ্ডে মাপিলে কপিঞ্জলকে দুরদর্শী বলা চলে। গুণ তাঁহার আছে কিন্তু মহিমা নাই, লাবণ্য নাই, দ্যুতি নাই। সমস্তই যেন তাঁহার ওই জবড়জং চেহারার মধ্যে হারাইয়া গিয়াছে। তাঁহার সহিত আমার অনেকবার সাক্ষাৎ হইয়াছে, আলাপ করিবার সময় তাঁহার সসম্ভ্রম ব্যবহারও লক্ষ্য করিয়াছি, কিন্তু তাঁহার ওৎ-পাতা-ভাবটা আমি সহ্য করিতে পারি নাই। প্রত্যেকবারই মনে হইয়াছে তিনি আমার আলাপ হইতে কৌশলে কি যেন বাহির করিয়া লইতে চান। মোট কথা লোকটাকে ভদ্রলোক বলিয়া মনেই হয় না। কথাবার্তায় রসের অপেক্ষা কষই বেশী। শোভনতাও নাই। সুরূপিণী যে তাঁহার প্রেমাস্পদা এটা তিনি খুব সাড়ম্বরে বিজ্ঞাপিত করিতে চান। কোন ভদ্রলোক এরূপ করিত না, গন্ধরাজ যে তাঁহাকে এতদিন ধরিয়া সহ্য করিতেছেন ইহার প্রতিদানে কোনও ভদ্রলোক তাঁহাকে এমনভাবে অপমান বা অবজ্ঞাও করিত না। কপিঞ্জল এত অভদ্র যে গন্ধরাজের নানারকম হাস্যকর নামকরণ করিয়া সেটা বাজারে চালু করিয়াছেন। ক্যাবলাকান্ত,

গন্ধ-গোকুল প্রভৃতি নাম লইয়া গর্জনগাঁওয়ের লোকেরা নিত্যই হাসা-হাসি করে। কপিঞ্জলের চরিত্রে এই ধরনের একটা গ্রাম্য চাষাড়ে ভাব বর্তমান, অথচ তাঁহার মনে মনে অহঙ্কারও খুব যে তিনি উচ্চকুলোদ্ভব একটা হোমরাচোমরা বুদ্ধিমান ব্যক্তি। গর্জনগাঁওয়ের রাজসভায় এই অসভ্য, কদর্য, স্বার্থপর জানোয়ারটা বিরাট দুঃস্বপ্নের মতো জাঁকাইয়া বসিয়া আছে।

ইহাও হয়তো সম্ভব যে নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য লোকটা মাঝে মাঝে কোমলও হইতে পারে। যদিও ব্যক্তিগতভাবে আমি কোন প্রমাণ পাই নাই কিন্তু ইহা সুনিশ্চিত যে এই কাষ্ঠপ্রতিম রাজনীতিবিদটি প্রয়োজন হইলে অনুগ্রহভিক্ষা করিবার জন্য যে কোনও লোকের কাছে যে কোনও ভাবে নিজেকে অবনত করিতে ইতস্তত করেন না। সম্ভবত এই জন্যই এখানে একটা গুজব প্রচলিত আছে যে গোপনে গোপনে কপিঞ্জল একটি খলিফা এবং খেলোয়াড় প্রেমিক। বিহার প্রদেশে চলিত কথায় যাহাকে 'লুচ্চা' বলে, তাহাই। সুরূপিণীর সঙ্গে তাঁহার সম্পর্কটা খুবই আশ্চর্যজনক। কপিঞ্জল গন্ধরাজের অপেক্ষা বয়সে অনেক বড়, চেহারাতেও ঢের বেশী কুৎসিত, নারীদের চিত্ত জয় করিতে হইলে যে সব গুণ দরকার তাহাও তাঁহার মধ্যে নাই অথচ ইহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, এই লোকটিই রাণীর সমস্ত চিত্ত এবং কর্মকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া লোকচক্ষে তাঁহাকে হেয় প্রতিপন্ন করিয়াছে। অসতী বলিয়া দুর্নাম হইয়াছে বলিয়াই তাঁহাকে হেয় বলিতেছি তাহা নহে, অনেক রমণীর কাছে অসতীত্বটাই অলঙ্কার স্বরূপ। কিন্তু এই রাজসভায় আর একটি শিথিল-সুনাম মহিলাও আছেন। রাণী রঞ্জাবতী তাঁহার নাম, জানি না তিনি কোন্ অজ্ঞাতকুলশীল রাজার বিধবা অথবা সধবা পত্নী, তাঁহার যৌবনও বিগতপ্রায়, দেহে রূপের রশ্মিও ম্লান হইয়া আসিয়াছে কিন্তু এসব সত্ত্বেও তিনি এই রাজসভায় প্রকাশ্যভাবে এবং অবিসংবাদিতরূপে কপিঞ্জলের রক্ষিতা উপপত্নীরূপে স্বীকৃতা। আমি প্রথমে মনে করিয়াছিলাম আসল পাপীয়সীকে আড়াল করিবার জন্যই বোধহয় এই মহিলাকে ভাড়া করিয়া আনা হইয়াছে। কিন্তু রাণী রঞ্জাবতীর সহিত কিছুক্ষণ আলাপ করিয়াই আমার এ ভ্রম দূর হইয়াছে। কাহারও কলঙ্ক ঢাকিবার বিন্দুমাত্র প্রবৃত্তি নাই কলঙ্কিনীর, কলঙ্ক ফলাও করিবার দিকেই তাঁহার ঝোঁক বেশী। তিনি যে ভাড়া-করা পরদামাত্র নহেন তাহাও বুঝিলাম যখন জানিলাম যে টাকা-কড়ি মান-সম্মান প্রতাপ-প্রতিপত্তি অর্থাৎ যে সব বখশিস এ ধরনের মেয়েদের প্রলুব্ধ বা ভূষিত করে—সে সব জিনিসের প্রতি তাঁহার বিন্দুমাত্র লোভ নাই। তিনি অনাচ্ছাদিত, নির্ভেজাল শয়তানী। গর্জনগাঁওয়ের রাজসভায় এই অনাবৃতা নগ্না প্রকৃতির সহিত আলাপ করিয়া আমার কিন্তু ভালোই লাগিয়াছিল।

সুরূপিণীর উপর কপিঞ্জলের প্রভাব সুতরাং সীমহীন। এই লোকটির স্তুতিতে বিগলিত হইয়া সুরূপিণী তাঁহার পবিত্র বিবাহ-বন্ধনকে কলঙ্কিত করিয়াছেন, জনসাধারণের শ্রদ্ধা হারাইয়াছেন কিন্তু যাহা সর্বাপেক্ষা বেশী আশ্চর্যজনক যে নারীসুলভ ঈর্ষা নারীত্বের প্রধান লক্ষণ তাহাও যেন তাঁহার মধ্যে নির্বাপিত। যদিও তিনি একটা আহামরি সুন্দরী নন, তবুও তিনি যুবতী তো, তিনি পিতৃকুল এবং শ্বশুরকুল উভয় দিক দিয়া একজন অভিজাতবংশীয়া রাজকুমারীও, তিনি ওই আধা-বুড়ী, মায়ের বয়সী, নীচকুলোদ্ভবা রঞ্জাবতীর সদম্ভ প্রতিদ্বন্দ্বিতার নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছেন—ইহা বড়ই আশ্চর্যের ব্যাপার। বাস্তবিকই ইহা একটি রহস্য। গুপ্ত প্রণয়ের অগ্নি ইন্ধন পাইলে শেষে দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া ওঠে, বেশী দিন তাহা গুপ্ত

থাকে না। এই হতভাগিনী সুরূপিণীর মতিগতি এবং চরিত্র দেখিয়া মনে হয় উচ্ছন্নের শেষ সীমা পর্যন্ত যাইতে ইনি কুণ্ঠিত হইবেন না। সে সম্ভাবনাটা অন্তত স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।'

।। সাত।।

পড়তে পড়তে গন্ধরাজের নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত হয়ে উঠেছিল। চোখের দৃষ্টি থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছিল ক্রোধের স্ফুলিঙ্গ। শেষে তিনি আর পড়তে পারলেন না—ঠেলে সরিয়ে দিলেন খাতাখানা। ক্রোধে আত্মহারা হয়ে দাঁড়িয়ে উঠলেন।

"এ লোকটা দেখছি শয়তান"—বলে উঠলেন তিনি—"এ লেখার যেমন ভাব তেমনি ভাষা। নানারকম কেচ্ছা সংগ্রহ করে বই লিখেছে! আশ্চর্য! কোথায় একে রেখেছেন মহাধ্যক্ষ মশাই?"

"আমাদের পতাকা-বুরুজে রাখা হয়েছে ওঁকে"—উত্তর দিলেন কুজ্ঝটিকুমার—"ধীমান-মহলে আছেন উনি।"

"আমাকে নিয়ে চলুন সেখানে"—গন্ধরাজ বললেন,—তারপর আর একটা কথা মনে হওয়াতে প্রশ্ন করলেন—"এইজন্যেই কি বাগানে প্রহরীর সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে?"

"তা তো আমার জানা নেই। প্রহরীরা কোথায় থাকবে তা ঠিক করা তো আমার কর্তব্য নয় মহারাজ।"

গন্ধরাজ সক্রোধে তাঁর দিকে ফিরে দাঁড়িয়েছিলেন, কিন্তু ইন্দীবর তাঁর বাহুতে মৃদু স্পর্শ করায়, কিছু আর বললেন না।

"বুঝলাম। এখন নিয়ে চলুন আমাকে পতাকা-বুরুজে।"

মহাধ্যক্ষ প্রস্তুত হলেন সঙ্গে সঙ্গে। একটু পরেই বেরিয়ে পড়লেন দুজনে। গ্রন্থাগার থেকে পতাকা-বুরুজ নিতান্ত কাছে নয়, পথও জটিল। রাজপ্রাসাদের যে অংশ সম্প্রতি নির্মিত হয়েছে গ্রন্থাগারটি তাতেই অবস্থিত : কিন্তু পতাকা-বুরুজ—যার উপরে গর্জনগাঁওয়ের পতাকা ওড়ে—পুরাতন প্রাসাদের সমুচ্চ প্রাকার সংলগ্ন, বাগানের ঠিক ওপরে। নানাপ্রকার সিঁড়ি আর বারান্দা অতিক্রম করে তাঁরা অবশেষে একটা বাঁধানো প্রাঙ্গণের মতো জায়গায় এসে পড়লেন। তার একধারে একটা উঁচু পাথরের জাফরি-দেওয়া দেওয়ালের ভিতর দিয়ে বাগানের শোভা দেখা যাচ্ছিল, বিশেষ করে সবুজ শোভা। ত্রিকোণ প্রাচীর সমন্বিত বড় বড় অট্টালিকার শ্রেণী ধাপে ধাপে উঠে গেছে চারিদিকে, আর পতাকা-বুরুজ সর্বোচ্চ শিখরে নীল আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে গর্বভরে। বুরুজের উপর বাসা তৈরি করছিল দাঁড়কাকেরা আর তাদের বাসার উপরে উড়ছিল গর্জনগাঁওয়ের পতাকা। বুরুজের সিঁড়ির নীচে একজন প্রহরী ছিল। সে সামরিক রীতিতে অভিবাদন জানাল। আর একটু উঠে দ্বিতীয় প্রহরীর দেখা পাওয়া গেল। আর একটু উঠে তৃতীয় প্রহরীর।

"এই মাটির ঢেলাটাকে দেখছি রত্নের মর্যাদা দিয়ে রক্ষা করা হচ্ছে"—একটু ব্যঙ্গের হাসি হেসে বললেন গন্ধরাজ।

ধীমান-মহলের একটু ইতিহাস আছে। বিখ্যাত স্থপতি ধীমানের কোনও বংশধর এটি নাকি নির্মাণ করেছিলেন গন্ধরাজের প্রপিতামহের আমলে এবং এটির নামকরণও তিনি করেছিলেন

তাঁর বিখ্যাত পূর্বপুরুষের নামানুসারে। ধীমান-মহলের ঘরগুলি বেশ বড় বড়। প্রচুর আলো-বাতাস। প্রত্যেক ঘর থেকেই বাগানের শোভা দেখা যায়। কিন্তু দেওয়ালগুলি খুব চওড়া (সেকালে এইরকমই রীতি ছিল) আর জানলাগুলিতে মোটা মোটা গরাদ লাগানো। কুজ্ঝটিকুমার প্রায় ছুটতে ছুটতে আসছিলেন গন্ধরাজের পিছু পিছু, গন্ধরাজের গতিবেগের সঙ্গে তাল রাখতে পারছিলেন না তিনি। গন্ধরাজ দ্রুতপদে পাঠাগারের এবং বিরামকক্ষের ভিতর দিয়ে গিয়ে একেবারে অশনিপাতের মতো ঢুকলেন গিয়ে শয়নকক্ষে। ভগীরথ শর্মা স্নান সেরে গা মুছছিলেন। ভগীরথ শর্মার বয়স যদিও পঞ্চাশ, কিন্তু তিনি বেশ শক্তসমর্থ। চোখে মুখে সাহসের এবং আত্মপ্রত্যয়ের দীপ্তিও সুপরিস্ফুট। এই আকস্মিক আবির্ভাবে বিশেষ বিচলিত হলেন না তিনি, বরং একটু যেন ব্যঙ্গভরেই অভিবাদন করে বললেন—"ও আপনি! এই আকস্মিক সম্মানবর্ষণের হেতু কি মহারাজ?"

"আপনি আমার অতিথি, আমি দু'হাত বাড়িয়ে আপনাকে সম্বর্ধনা করেছি, আপনি আমার অন্ন খেয়েছেন, আমার বাড়িতে সম্মানিত অতিথির মর্যাদায় স্থান পেয়েছেন। আমার আতিথ্যে কোনও ত্রুটি ছিল কি? সম্মানিত অতিথির কোনও অনুরোধ পালনে বিলম্ব ঘটেছিল কি? আপনি তার চমৎকার প্রতিদানও দিয়েছেন। এই যে—"

তিনি পাণ্ডুলিপিটি তুলে দেখালেন।

"মহারাজ কি ওটি পড়েছেন? খুবই আনন্দিত এবং সম্মানিত হলাম। কিন্তু ওটা খসড়া মাত্র, অনেক ত্রুটি আছে ওতে। আরও অনেক কিছু লিখতেও হবে। একথাটা অন্তত লিখতেই হবে যে মহারাজকে আমি অলস বলে সমালোচনা করেছি তিনি আরক্ষী হিসাবে খুবই সতর্ক এবং কর্তব্যবোধে অপ্রিয় ঘৃণ্য কাজ করতেও পরাঙ্মুখ হন না। একথাটা আমাকে লিখতেই হবে। আমাকে বন্দী করার যে প্রহসনটা হয়ে গেল আর আপনি যে এমন অপ্রত্যাশিতভাবে দর্শন দিয়ে আমাকে সম্মানিত করলেন—এসবও লিখব আমি। যে বঙ্গরাজ প্রসন্নপল্লবের পরিচয়পত্র নিয়ে আপনার রাজ্যে আমি প্রবেশ করেছিলাম তাঁকে আমি খবর পাঠিয়েছি আপনি আমার সঙ্গে কেমন সদ্ব্যবহার করেছেন। আমার বিশ্বাস, আপনি যদি আমাকে হত্যা না করেন, তাহলে আমি আপনার কারাগার থেকে এক সপ্তাহের মধ্যেই মুক্তি পাব, তা সেটা আপনাদের ভালো লাগুক বা না লাগুক। কারণ আমার ধারণা ভবিষ্যৎ গর্জনগাঁও সাম্রাজ্যের শক্তি এখনও তেমন প্রবল হয়নি যে সে সমরাঙ্গনে বঙ্গরাজের সম্মুখীন হতে পারে। আমি মনে করি আমাদের শোধবোধ হয়ে গেছে। আপনাকে কোনরকম জবাবদিহি দিতেও আমি বাধ্য নই। আপনিই ভুল করছেন। আমি ওই খাতায় যা লিখেছি তার মধ্যে সত্যিই যদি প্রবেশ করতে পেরে থাকেন তাহলে আপনারই উচিত আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া। আমি আপনার চোখ খুলে দিয়েছি। আমি এইমাত্র স্নান সমাপন করেছি, এখনও কাপড়চোপড় পরা হয়নি, সেজন্য অনুরোধ করছি আপনি এখন বাইরে যান—"

ঘরে একটা টেবিল ছিল আর তার উপর শাদা কাগজও ছিল কিছু। গন্ধরাজ একটা আসন টেনে উপবেশন করে একটা কাগজে ভগীরথ শর্মার ছাড়-পত্র লিখে ফেললেন খস্‌খস্ করে। তারপর মহাধ্যক্ষের দিকে চেয়ে বললেন—" এটাতে মোহর দিয়ে দিন।"

কুজ্ঝটিকুমারের হাতে একটি লাল রঙের থলি ছিল। তিনি তার থেকে টিকিটের মতো কি একটা বার করে সেঁটে দিলেন কাগজে। তাঁর বিচলিত মূর্তি এবং বেকুবের মতো হাবভাব

সত্যই যেন প্রহসন করে তুলল ব্যাপারটাকে। ভগীরথ শর্মা তির্যক দৃষ্টিতে নীরবে উপভোগ করতে লাগলেন দৃশ্যটা। কুজ্‌ঝটিকুমারের আনুগত্যের এই অনাবশ্যক আতিশয্যে গন্ধরাজের কানের ডগা লাল হয়ে উঠল, কিন্তু তখন রাগটা হজম করা ছাড়া আর গত্যন্তর ছিল না। মহাধ্যক্ষ মশায় অবশেষে কার্যটি সমাধা করলেন এবং আদেশের অপেক্ষা না রেখে সইও করে দিলেন।

গন্ধরাজ বললেন—"আপনি এবার আমার একটি ভালো গাড়ি ঠিক করবার ব্যবস্থা করুন। আপনি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে গাড়িতে ভগীরথ শর্মার জিনিসপত্রগুলো তুলিয়ে দিন। গাড়িটা যেন ময়ূরমহলের সামনে অপেক্ষা করে। ভগীরথ শর্মা আজই বঙ্গদেশে ফিরে যাবেন।"

মহাধ্যক্ষ সাড়ম্বরে অভিবাদন করে বিদায় নিলেন।

"এই আপনার ছাড়-পত্র"—ভগীরথ শর্মার দিকে চেয়ে গন্ধরাজ বললেন—"আপনার প্রতি অসৌজন্য প্রকাশ করা হয়েছিল বলে আমি আন্তরিক দুঃখিত।"

"বেশ, বঙ্গরাজের সঙ্গে আপনাদের আর যুদ্ধ হবে না।"

"না মশাই, অত সহজে আপনাকে রেহাই দেব না। শিষ্টাচারের দাবি আপনাকে মানতে হবে। এখন আপনি আর বন্দী নন। আপনি আমি দুজনেই এখন সমান। আমি আপনাকে বন্দী করবার আদেশ দিইনি। কাল অনেক রাত্রে আমি শিকার থেকে ফিরেছি। আপনাকে বন্দী করবার জন্যে দোষ দিতে পারবেন না, বরং যদি ইচ্ছে করেন মুক্তি দেওয়ার জন্যে ধন্যবাদ দিতে পারেন।"

"কিন্তু আপনি আমার কাগজপত্রগুলো তো পড়েছেন—"

"সেটা আমার অন্যায় হয়েছে। তার জন্যে আমিও ক্ষমাও চাইছি। আপনি তো জানেনই আমি দুর্বলচিত্ত, দুর্বলকে ক্ষমা করাই মহতের ধর্ম। আপনার কাগজপত্রও ইচ্ছে করে পড়িনি—অপ্রত্যাশিতভাবে আমার হাতে এসে গেছে। আপনি যা লিখেছেন তা যদি নির্দোষ গ্লানিহীন হত—তাহলে আমি যা করেছি তাকে বড় জোর আপনি অবিমৃষ্যকারিতা বলতে পারতেন। কিন্তু আপনি যা লিখেছেন তা আমার আত্মসম্মানকে আঘাত করেছে।"

ভগীরথ শর্মার চোখের দৃষ্টিতে একটা হাসির ঝলক ফুটে উঠল। তিনি কিছু না বলে অভিবাদন করলেন শুধু।

গন্ধরাজ বলতে লাগলেন—"আপনি এখন স্বাধীন, আপনাকে এখন আমি একটা অনুরোধ করতে চাই। আমার অনুরোধ আপনি আমার সঙ্গে একা ওই বাগানে চলুন।"

"মহারাজ যে মুহূর্তে আমার স্বাধীনতা ফিরিয়ে দিয়েছেন"—ভগীরথ শর্মা সসম্ভ্রমে বললেন—"সেই মুহূর্ত থেকে আমি মহারাজের আদেশ পালন করতে প্রস্তুত। আমি এইমাত্র স্নান সেরে উঠেছি, এখনও পোশাক পরিনি। তবু যদি আপনি আদেশ করেন, এই ভাবেই আমি আপনার সঙ্গে যেতে প্রস্তুত আছি।"

"অনেক ধন্যবাদ। আসুন তাহলে।"

অবিলম্বে বেরিয়ে পড়লেন দুজনে। গন্ধরাজ আগে আগে যেতে লাগলেন, ভগীরথ পিছু পিছু। বুরুজের সিঁড়ি ভাঙবার সময় তাঁদের পদশব্দে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হতে লাগল বুরুজের গম্বুজ। সিঁড়ি থেকে নেমে সেই জাফরি-কাটা দেওয়াল পেরিয়ে তাঁরা এসে পড়লেন বাগানের

উন্মুক্ত বাতাসে। রৌদ্রকিরণে ঝলমল করছিল চতুর্দিক, শোভা বিকীর্ণ করছিল ফুলের দল। তারপর মীন-দীঘির পাশ দিয়ে দিয়ে যেতে লাগলেন তাঁরা। ছোট ছোট চিতল মাছ এবং আরও নানারকম মাছ লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছিল জল থেকে। সে-ও এক অপূর্ব দৃশ্য। তারপর তাঁরা আবার সিঁড়ি ভাঙতে লাগলেন। সিঁড়ির চারদিকে মরসুমী ফুলের ঝাঁক, আশেপাশে পাখিরা গান ধরেছে। সিঁড়ির শেষ ধাপে উঠে গন্ধরাজ থামলেন। সেখানে একটি ছোট দ্বার ছিল। সেই দ্বার দিয়ে দেখা যাচ্ছিল একটি সবুজ সমতল মাঠের আভাস। শ্বেতপাথরের তৈরী আসনও দেখা যাচ্ছিল কয়েকটি। এই সমতল মাঠে দাঁড়ালে নীচে সারি সারি অনেক গাছের শীর্ষভাগ দেখা যায়, আর তারও ওপারে দেখা যায় প্রাসাদশীর্ষে গর্জনগাঁওয়ের পীতবর্ণ পতাকা নীল আকাশে উড়ছে। সেই মাঠে ঢুকলেন তাঁরা।

"বসুন।"

একটি শ্বেতপাথরের আসন দেখিয়ে গন্ধরাজ বললেন। কোনও কথা না বলে বসে পড়লেন ভগীরথ শর্মা। গন্ধরাজ বসলেন না, তিনি তাঁর সামনে পায়চারি করতে লাগলেন, রাগে তাঁর ভিতরটা জ্বলছিল। পাখিদের অজস্র কাকলীও তাঁর কানে ঢুকছিল না।

"দেখুন"—অবশেষে ভগীরথের দিকে ফিরে গন্ধরাজ বললেন—"বঙ্গরাজের পরিচয়পত্রের কথা বাদ দিলে আপনি আমার কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত আগন্তুক। আপনার মতিগতি আপনার চরিত্র আমি কিছুই জানি না। আমি জ্ঞানত কখনও আপনার কোন বিরুদ্ধাচরণ করিনি। আমাদের দুজনের মধ্যে যে সামাজিক ব্যবধান আছে সে কথাও আমি ধর্তব্যের মধ্যে আনছি না। আপনি আমাকে একজন সাধারণ ভদ্রলোক হিসাবেই গণ্য করুন এখন। আমি আপনার পাণ্ডুলিপিটি আপনার বিনা অনুমতিতে পড়ে অন্যায় করেছি। কৌতূহলবশেই আমি ও কাজ করেছিলাম। স্বীকার করছি এ কৌতূহল অশোভন, কিন্তু ওই পাণ্ডুলিপিতে আপনি যা লিখেছেন তা শুধু মিথ্যাই নয়, তা ভীরুতার পরিচায়ক। আপনার পাণ্ডুলিপি খুলে আমি দেখলাম—আমার স্ত্রীর সম্বন্ধে আপনি যা লিখেছেন তা সব মিথ্যা"—উত্তেজিত কণ্ঠে বলতে লাগলেন গন্ধরাজ—"হ্যাঁ মিথ্যা। ভগবান জানেন ওতে সত্যের লেশমাত্র নেই। আপনি ওর বাবার বয়সী, আপনি একজন ভদ্রলোক, শুনেছি আপনি বিদ্বান—আপনি ওই সব মিথ্যা কথার জঞ্জাল একত্র করে তা প্রচার করতে উদ্যত হয়েছেন? শুনেছি আপনি যোদ্ধাও, যোদ্ধারা নারীদের সম্মান করে। এই কি তার প্রমাণ? কিন্তু ভুলে যাবেন না, ওর স্বামী এখনও জীবিত আছে। আপনি আপনার পাণ্ডুলিপিতে লিখেছেন যে আমি অসিযুদ্ধে তেমন পারদর্শী নই। আপনাকে অনুরোধ করছি আমাকে একটু শিক্ষা দিয়ে দিন। পাশেই ওই একটা নির্জন স্থান আছে, কিছু দূরেই ময়ূরমহল, সেখানে আপনার জন্যে গাড়ি অপেক্ষা করছে। অসিযুদ্ধে আপনি যদি আমাকে মেরেও ফেলেন, কেউ তা জানতে পারবে না। আপনি তো নিজেই লিখেছেন আমার প্রজারা আমার বিশেষ খোঁজখবর রাখে না। মাঝে মাঝে গা-ঢাকা দিয়ে সরে পড়াও আমার স্বভাব। আমার অনুপস্থিতি কেউ লক্ষ্য করবে না। যখন লক্ষ্য করবে তখন আপনি আমাদের রাজ্যের সীমানা নিরাপদে পেরিয়ে গেছেন। আসুন।"

ভগীরথ শর্মা বললেন, "মহারাজ, আপনি যা বলছেন তা অসম্ভব।"

"আমি যদি আপনাকে আঘাত করি?"

"সেটা ভীরুর মতো আঘাত হবে। কারণ আমি প্রত্যাঘাত করতে পারব না। কোন স্বাধীন রাজ্যের মহারাজার বিরুদ্ধে তরবারি উত্তোলন আমার পক্ষে অসম্ভব।"

"অথচ আপনি সেই মহারাজকে অনায়াসে অপমান করেছেন তো।"

"ক্ষমা করুন"—সবিনয়ে উত্তর দিলেন ভগীরথ শর্মা—"আমার প্রতি অবিচার করবেন না। আপনি মহারাজা, আপনার সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হতে পারি না, কিন্তু আপনি মহারাজা বলেই আপনার আচরণের এবং আপনার মহারাণীর সমালোচনা করবার ন্যায্য অধিকার আমার আছে। আপনার সপক্ষে আপনার আইন আছে, সশস্ত্র সৈন্যবাহিনী আছে, গুপ্তচরদের তীক্ষ্ণ চক্ষু আছে, কিন্তু আমাদের একটি মাত্র অস্ত্রই ভরসা—সেটি হচ্ছে সত্য।"

"সত্য!"—সবিস্ময়ে বলে উঠলেন গন্ধরাজ।

কয়েক মুহূর্ত নীরবতায় কাটল।

"মহারাজ"—ভগীরথ শর্মাই নীরবতা ভঙ্গ করলেন—"আপনি আমড়া গাছে আম প্রত্যাশা করবেন না। আমি বৃদ্ধ এবং স্বভাবতই নিন্দুক। আমাকে কেউ গ্রাহ্য করে না, আমিও কাউকে করি না। কিন্তু আজ আপনার সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর বুঝেছি যে আপনার চেয়ে ভালো লোক আমি এ যাবৎ দেখিনি। আপনার সম্বন্ধে আমার মত বদলে গেছে এবং যা সাধারণত কেউ করে না তাই করছি, অর্থাৎ অসঙ্কোচে সেটা স্বীকার করছি আপনার কাছে। আপনার সামনেই ওই পাণ্ডুলিপি আমি ছিঁড়ে ফেলে দেব। যা লিখেছিলাম সেজন্য আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি, মহারাণীর কাছেও চাইছি। আমি আপনার কাছে শপথ করছি, এ বৃদ্ধের কথায় আপনি বিশ্বাস করতে পারেন, আমি আপনার কাছে শপথ করছি আমার বই যখন বেরুবে তখন তাতে গর্জনগাঁওয়ের নাম পর্যন্ত থাকবে না। যদিও আমার বইয়ের ও অধ্যায়টা একটা জবর অধ্যায় ছিল, তবু ওটাকে বাদ দিয়ে দেব। মহারাজ পাণ্ডুলিপির অন্যান্য অধ্যায়গুলো যদি পড়তেন! আমি শকুনি—গলিত মাংস খেয়ে বেড়াই। অভাবও হয় না, সমস্ত পৃথিবীটাই তো ভাগাড়, সেটা কি আমার দোষ মহারাজ?"

"আপনার চোখের দৃষ্টি একটু বেশী বাঁকা নয় তো!"

"হ্যাঁ, হতে পারে। আমি কবি নই, আমি ছোঁক ছোঁক করে পচা গন্ধ শুঁকে শুঁকে বেড়াই। আশা আছে ভবিষ্যতে হয়তো এ পৃথিবী স্বর্গরাজ্য হবে, কিন্তু এখন যে পৃথিবীকে দেখছি তার উপর বিন্দুমাত্র আস্থা নেই। তাই আমি পচা ডিমের গান গেয়ে বেড়াই। কিন্তু মহারাজ ফুল দেখলে আমি চিনতে পারি। আপনার সঙ্গে এই পরিচয়ের স্মৃতি আমার জীবনে মূল্যবান স্মৃতি হয়ে থাকবে। আজ সত্যিই এমন একজন রাজার দর্শন পেলাম যাঁর মধ্যে মনুষ্যোচিত গুণ কিছু আছে। আমিও এককালে রাজসভায় ছিলাম, আমি একজন বিদ্রোহী সংস্কারকও, আমি আজ অন্তর থেকে আপনাকে সাধুবাদ করছি। আপনি যদি আমাকে হস্তচুম্বন করতে দেন, আমি অনুগৃহীত হব।"

"আরে হস্তচুম্বন কেন! আসুন আপনাকে আলিঙ্গন করি—"

দু'হাত বাড়িয়ে জাপটে ধরলেন তিনি ভগীরথকে। তারপর বললেন, "ময়ূরমহলের কাছেই আমার গাড়ি আপনার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। ওই গাড়িতে চড়েই আপনি চলে যান এবার। আশা করি আমার এ অনুরোধ অগ্রাহ্য করবেন না। আপনি বঙ্গরাজ্যে নির্বিঘ্নে পৌঁছে যান ভগবানের কাছে এই প্রার্থনা করি।"

"উৎসাহের চোটে আপনি একটা কথা ভুলে গেছেন মহারাজ। আমি এই সবে স্নান করে উঠেছি। এখনও কিছু খাইনি।"

"ওহো, ঠিক তো! বেশ তাহলে আপনি যতক্ষণ ইচ্ছে থাকুন। কিন্তু একটা ব্যাপারে আপনাকে সতর্ক করে দিই। এখানে আপনার বন্ধুর চেয়ে আপনার শত্রুরা বেশী প্রবল। মহারাজ অবশ্যই আপনার সপক্ষে আছেন, তাঁর সদিচ্ছার কোনও অভাব নেই—কিন্তু আপনি তো আমার চেয়েও ভালো জানেন এখানকার হালচাল। এখন মহারাজই গর্জনগাঁওয়ের একমাত্র হর্তাকর্তা-বিধাতা নন।"

"কিন্তু তবু আপনি মহারাজ এখনও। কপিঞ্জল চট করে কিছু করেন না, যা করেন রয়ে সয়ে ভেবেচিন্তে করেন। তাঁর কাজকর্ম সব অন্ধকারে গোপনে গোপনে। আলোয় আসতে ভয় পান তিনি। আর আপনার এখন যে পরিচয় পেলুম তাতে আমার ভয়ও ভেঙে গেছে। হয়তো আপনিই জয়ী হবেন শেষ পর্যন্ত—"

"বলেন কি! আপনার কথায় মনে বল পেলাম।"

"আমি আর ও ধরনেব লেখা লিখব না। লোককে চেনবার ক্ষমতা আমার নেই। আমি আপনাকে ভুল বুঝেছিলাম। একটা কথা কিন্তু মনে রাখবেন। একটা লাফ দেওয়া আর সমস্ত দিন একটানা ছুটে বেড়ানোতে তফাত আছে। আপনার চেহারা দেখে কিন্তু খুব ভরসাও হয় না আমার। আপনার ওই ছোট নাক, ওই চুল আর চোখের ওই নানা রঙের দৃষ্টি থেকে মনে হয় না যে আপনি একটানা কিছু করতে পারবেন। আপনি কবি, গদি আঁকড়ে থাকবার মতো ইতর মনোভাব আপনার নেই—"

"আমি তাহলে থিয়েটারের সখী মাত্র নই?"

"না মহারাজ। আমি যা লিখেছিলাম তার জন্যে আমি লজ্জিত। ওকথা আর আমাকে মনে করিয়ে দেবেন না। আমি দুর্মুখও নই, চাণক্যও নই, আমি অক্ষম চিত্রকর মাত্র। যা আঁকি প্রায়ই তা ঠিক হয় না। ও পাণ্ডুলিপি আপনি পুড়িয়ে ফেললে আমি বাধিত হব।"

।। আট।।

খুব খুশী হয়ে এরপর গন্ধরাজ মহারাণী সুরূপিণীর সঙ্গে দেখা করবার জন্যে পা বাড়ালেন। অনুভব করলেন এ কাজটা আরও শক্ত। নিয়ম অনুসারে সোজা গিয়ে তাঁর কক্ষে ঢোকা যাবে না, পাশের ঘরে গিয়ে তাঁর সহচরী মারফত 'এত্তেলা' দিতে হবে আগে। রাজকীয় নিয়ম আর কেউ পালন না করুক রাজাকে করতেই হবে। তিনি যাওয়ামাত্র পরদা উঠে গেল এবং প্রতিহারী তাঁর নাম ঘোষণা করল। ভঙ্গীভরে সাড়ম্বরে প্রবেশ করলেন গন্ধরাজ। দেখলেন ঘরে অনেকে অপেক্ষা করছে। বেশীর ভাগই মহিলা। গর্জনগাঁওয়ের মহিলা-মহলে গন্ধরাজের খুব খাতির। একজন মহিলা রাণীকে খবর দেওয়ার জন্য পাশের ঘরে চলে গেল। গন্ধরাজ নমস্কার বিনিময় করতে করতে এগিয়ে গেলেন অন্য মহিলাদের দিকে। হাসিমুখে প্রত্যেককেই তুষ্ট করবার চেষ্টা করতে লাগলেন আন্তরিকতার দ্যুতি বিকীর্ণ করতে করতে। এই যদি তাঁর একমাত্র কর্তব্য হত তাহলে তিনি আদর্শ নৃপতি বলে নিশ্চয়ই গণ্য হতেন। মহিলার পর মহিলা তাঁর সুমিষ্ট আলাপে বিগলিত হতে লাগলেন।

একজনকে বললেন, "কি কাণ্ড বলুন তো। আপনার বয়স বাড়ছে, না কমছে? রোজই যেন আপনাকে আগের চেয়ে বেশী সুন্দর দেখাচ্ছে।"

"আপনার রঙ্ কিন্তু তামাটে হয়ে যাচ্ছে, মহারাজ। না, এ বিষয়ে আমার একটু অহঙ্কার আছে, আমাদের দুজনেরই গায়ের রঙ্ আগে একরকম ছিল। আমি সে রঙটা বজায় রাখবার চেষ্টা করেছি, মহারাজ কিন্তু রোদে রোদে ঘুরে কালো হয়ে যাচ্ছেন—"

"শুধু কালো নয়, কাফ্রীর মতো কালো। সুন্দরীদের ক্রীতদাস হতে হলে ওই রঙই তো মানানসই। গভীরা দেবী, আমাদের অভিনয় আবার কবে হবে? এইমাত্র একজনের কাছে শুনলাম যে আমি নাকি অত্যন্ত বাজে অভিনেতা।"

"ওমা,"—গভীরা দেবী বলে উঠলেন—"কোন্ গাড়োল একথা বলতে সাহস করেছে—"

"গাড়োল নয়, চমৎকার লোক, বিচক্ষণ ব্যক্তি।"

"হতেই পারে না। মহারাজ গন্ধর্বদের মতো অভিনয় করেন।"

"মানছি, তোমার কথা ঠিক। মিথ্যাকথা এমন মনোরমভাবে আর কে বলতে পারে? কিন্তু যে ভদ্রলোকটির কথা বলছি তিনি বোধহয় আমাকে মানুষের মতো অভিনয় করতে দেখলে বেশী খুশী হতেন। গন্ধর্ব টন্ধর্ব তাঁর পছন্দ নয়।"

এ কথায় হাসির একটা গুঞ্জন উঠল। গন্ধরাজ ময়ূরের মতো তাঁর পেখম বিস্তার করলেন। নারী-সঙ্গ-মধুর এই সহৃদয় পরিবেশ গন্ধরাজের বড় প্রিয়।

"অঞ্জনা দেবী, আপনার খোঁপাটি তো চমৎকার সাজিয়েছেন দেখছি।"

"হ্যাঁ, সবাই তাই বলছে"—একজন মন্তব্য করলেন।

"আপনার যে ভালো লেগেছে তাতেই আমি খুশী—"

অঞ্জনা দেবী ভঙ্গীভরে অভিবাদন করলেন গন্ধরাজকে। সঙ্গে সঙ্গে কটাক্ষের একটা বিজলীচমকও খেলে গেল তাঁর চোখ দুটিতে।

"সত্যিই চমৎকার। কাশ্মীর আমদানী? না, মিথিলার? এই কি আধুনিক ধরন?"

"একেবারে আনকোরা আধুনিক। মহারাজা আসবেন বলেই আজ এভাবে সেজেছি। সকালে উঠেই কেমন যেন আনন্দের জোয়ার লাগল মনে। আপনার আগমনের পূর্বাভাস। এমন করে আমাদের ছেড়ে চলে যান কেন মহারাজ—এ ভারী অন্যায় কিন্তু—"

"ফিরে আসার আনন্দলাভ করবার জন্যে। আমার স্বভাব অনেকটা কুকুরের মতো। খাওয়ার হাড়টাকে পুঁতে রেখে যাই, তারপর ফিরে এসে আবার সেটাকে খুঁড়ে আবিষ্কার করে আনন্দ পাই।"

"হাড়! এ কি উপমার ছিরি। বনে বনে ঘুরে বন্যস্বভাব হয়ে গেছে মহারাজের—আশা করি আমার স্পষ্ট কথায় রাগ করবেন না।"

"অনুরাগের অণুটুকু যে পর্বত-প্রমাণ। তা সরিয়ে ফেলবার সামর্থ্য কোথায়! তবে জেনে রাখুন, কুকুররা ওই করে। ওই তাদের প্রিয় কাজ। আরে, শ্রীমতী রঞ্জাবতীও রয়েছেন দেখছি—"

গন্ধরাজ ভিড় সরিয়ে অলিন্দের কাছে বাতায়নবর্তিনী মহিলাটির দিকে অগ্রসর হলেন।

রঞ্জাবতী এতক্ষণ একটি কথাও বলেননি। একটু যেন বিমর্ষই বোধ হচ্ছিল তাঁকে। গন্ধরাজকে আসতে দেখে তাঁর চোখে আলো ফুটল। তন্বী দীর্ঘাঙ্গী মহিলাটি, অনেকটা যেন

পরী-পরী ভাব, মনে হয় এখনি বুঝি উড়ে চলে যাবে। তাঁর সুন্দর মুখখানি উদ্দীপ্ত হয়ে আরও সুন্দর হয়ে উঠল, মৃদু হাসি চিকমিক করে উঠল চোখে মুখে ঠোঁটে গালে। গায়িকা হিসাবেও তাঁর সুনাম খুব। কথা বলবার সময় তাঁর কণ্ঠস্বর নানা গ্রামে ওঠা-নামা করে, উদারা থেকে তারা পর্যন্ত যে কোনও পর্দায়। যখন চুপি চুপি কথা বলেন তখনও সঙ্গীতের মৃদু গমক শোনা যায়, যখন জোরে কথা বলেন বা হাসেন তখন তো সে সঙ্গীত ঝরনার মতো উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। বহুমূল্য রত্ন একটি, নানা রঙের লীলা তাঁর সর্বাঙ্গ ঘিরে। ছলনাময়ীও, নিজের রূপকে লুকিয়ে রাখতে জানেন, তারপর সহসা ক্ষণিক সোহাগের অভিনয়ে সেটাকে শাণিত তরবারির মতো আস্ফালন করে অভিভূতও করে দিতে পারেন দর্শককে। দেখতে সাধারণ একটি ছিপছিপে রূপসী মেয়ে, কিন্তু পরমুহূর্তেই ফুলের মতো রূপে রসে গন্ধ বিকশিত হয়ে মনোহারিণী হয়ে উঠতে পারেন রঞ্জাবতী। অবাঞ্ছিত প্রণয়ভিক্ষুদের জন্য একটি ছোরাও লুকিয়ে রাখেন তিনি সর্বদা। গন্ধরাজের দিকে একটি হাস্য-দীপ্ত শর নিক্ষেপ করে তিনি বললেন, "যাক্ অবশেষে আমার কাছে এলেন আপনি মহারাজ! জানি প্রজাপতিকে পোষা যায় না তবু—যাক্— আপনার হস্ত-চুম্বনের অনুমতি পাবো তো?"

"আমিই তোমার হস্ত-চুম্বন করব রঞ্জাবতী।"

গন্ধরাজ অভিবাদন করে এগিয়ে গেলেন এবং রঞ্জাবতীর হস্ত চুম্বন করলেন।

"আমার একটি আবদারও আপনি রাখেন না।"

"রাজসভার খবর কি বল? তোমার কাছেই তো সব খবর পাই বরাবর।"

"পচা-ডোবার আবার খবর কি! সব নিঝ্‌ঝুম, সব ঘুমে ঢুলু-ঢুলু। মনে হচ্ছে অনন্তকাল ধরে সবাই ঘুমুচ্ছে। জাগরণের কোথাও কোনও সাড়া তো পাই না, কোথাও কোনও উত্তেজনা নেই। সেই কতকাল আগে আমার শিক্ষয়িত্রী আমার কান মুলে দিয়েছিলেন, তারপর থেকে উত্তেজনা-জনক আর তো কিছু ঘটেনি। কিন্তু না, নিজের প্রতি আর আপনার ওই জাদুমন্ত্রমুগ্ধ ভাগ্যহত রাজপ্রাসাদের প্রতি কিছু অবিচার করলাম বোধহয়। বলছি সব—কিন্তু এই শেষ, মনে রাখবেন সেটা—"

মুখের কাছে রঙীন পাখাটি তুলে ধরে এদিক-ওদিক চাইতে চাইতে নিপুণ বর্ণনা-কুশলতায় সব বলে গেলেন তিনি। অন্য মহিলারা এ দেখে দূরে সরে গেলেন একটু। কারণ সবাই জানেন যে রঞ্জাবতীর সঙ্গে গন্ধরাজের সম্পর্ক বেশ একটু ঘনিষ্ঠ। কাছেপিঠে থাকাটা শোভন নয়। তবু রঞ্জাবতী গলার স্বর বেশ একটু খাটো করে চুপি চুপি বলতে লাগলেন সব, জানলার ধারে গন্ধরাজের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে।

গন্ধরাজ হেসে বললেন—" একটা কথা বোধহয় তুমি জান না। তোমার মতো মনোরমা নারী পৃথিবীতে আর নেই।"

"সত্যি? এত বড় আবিষ্কার করে ফেলেছেন আপনি?"

"হ্যাঁ। বয়স যতই বাড়ছে ততই সত্যকে স্পষ্ট করে দেখতে পাচ্ছি।"

"বয়স? বয়স তো বিশ্বাসঘাতক! আপনি বয়সে বিশ্বাস করেন? দিন মাস সন তারিখ ও সব তো মিথ্যা মায়া।"

"হয়তো তাই। তোমার সঙ্গে আমার ছ'বছর ধরে বন্ধুত্ব। কিন্তু বয়সের ছাপ তো তোমার উপর পড়েনি। তোমার তারুণ্য আরও অম্লান। তুমি যেন নিত্য নূতন হচ্ছ।"

"এটা কিন্তু চাটুবাক্য হল মহারাজ"—তারপর হঠাৎ সুর বদলে—"না, চাটুবাক্য কেন, আমি নিজেও তো তাই মনে করি। এক সপ্তাহ আগে আমি আমার পরীক্ষকের সামনে দাঁড়িয়েছিলাম। আমার পরীক্ষক কে জানেন তো? আয়না। পরীক্ষক বললে—'না, এখনও দেরি আছে।' প্রতিমাসে একবার করে আমি পরীক্ষকের সামনে দাঁড়াই। দুরু দুরু বক্ষে বিস্ফারিত চক্ষে। যেদিন আয়না বলবে—'আর নয়। এইবার সময় হয়েছে'—জানি না সেদিন আমি কি করব।"

"আন্দাজ করতে পারছি না"—ইতস্তত করে উত্তর দিলেন গন্ধরাজ।

"আমিও পারছি না। কত কি করতে পারি। আত্মহত্যা, জুয়া খেলা, সন্ন্যাসিনী হয়ে যাওয়া, আত্মজীবনী লেখা, কিংবা রাজনীতির সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়া—"

"ওটা বড় বাজে জিনিস। ওতে কি তোমার মন ভরবে?"

"না, খুব বাজে নয়। ওটা আমার ভালোই লাগে। রাজনীতি পরচর্চারই বড় দাদা। পরচর্চার মতো মনরোচক আর কি আছে বলুন। ধরুন যদি আপনাকে বলি মহারাণী সুরূপিণী প্রত্যহ কপিঞ্জলের সঙ্গে ঘোড়ায় চড়ে বেরিয়ে যান কামান পরিদর্শন করতে—তাহলে এটাকে কি বলবেন রাজনীতি, না পরচর্চা? নির্ভর করবে কেমন করে কি ভাষায় বললাম তার উপর। ঘটনাগুলোকে কমিয়ে বাড়িয়ে সাজিয়ে গুছিয়ে বাঁকিয়ে চুরিয়ে ছেঁটে কেটে রূপান্তরিত করবার যে শিল্প-কৌশল, তার জাদুকরী হবার ক্ষমতা আমার আছে। আপনার অনুপস্থিতিতে রোজই তারা একসঙ্গে সর্বত্র বেড়িয়েছে—"

গন্ধরাজের মুখে ছায়া নামল, কিন্তু উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলেন রঞ্জাবতী।

"এ খবরটা জল্পনা-জগতের ছোট্ট কাদাখোঁচা একটা, কিন্তু যদি বলি তারা যেখানেই গেছে সেখানেই প্রজারা জয়ধ্বনি করেছে—অমনি কাদাখোঁচা ময়ূর হয়ে যাবে। তখন দামী রাজনৈতিক খবর হবে এটা—"

" প্রসঙ্গ বদলাও। ভালো লাগছে না ওসব কথা।"

"আমিও তাই ভাবছিলুম। ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ ছেড়ে রাজনীতিই আলোচনা করা যাক। জানেন? এই যুদ্ধটা এত জনপ্রিয় হয়েছে যে মহারাণী যেখানেই যান সেখানেই জয়ধ্বনিতে আকাশ গমগম করে।"

"হয়তো করে। সবই সম্ভব। হয়তো যুদ্ধই হবে, কিন্তু বিশ্বাস কর কার সঙ্গে হবে কেন হবে তা আমি অন্তত জানি না।"

"অথচ আপনি এটা সহ্য করছেন। আমি নীতি-টিতির ধার ধারি না মহারাজ, আমি অকপটে স্বীকার করছি ভীরু ভেড়ার চেয়ে হিংস্র বাঘকে আমি বেশী ভালোবাসি। দোহাই আপনার, ওই ভেড়া-ভাব পরিত্যাগ করুন। আমাদের অনুভব করতে দিন যে সত্যিই রাজার মতন রাজা আছেন আমাদের। মেয়েলীপনা মোটেই ভালো লাগছে না।"

"রঞ্জাবতী, আমার ধারণা ছিল তুমি ওদের দলের।"

"মহারাজ, আপনার যদি দল থাকত তাহলে আপনার দলেই থাকতাম আমি। আপনার কি কোন উৎসাহ নেই? ইতিহাসে চাণক্যের কথা পড়েছি, তিনি মৌর্য চন্দ্রগুপ্তকে সম্রাট করেছিলেন। আমি যদিও মেয়েমানুষ, কিন্তু আমিও সে ক্ষমতা রাখি মহারাজ। গর্জনগাঁওয়ের রাজকুমারকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করতে পারি অন্তত।"

"কোনদিন হয়তো তোমার সাহায্য চাইব আমাকে চাষী গৃহস্থরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে।"

"হেঁয়ালি না কি?"

"তাই ধরে নাও। আর খুব ভালো হেঁয়ালি।"

"তাহলে আমিও একটা হেঁয়ালি বলি। কপিঞ্জল কোথায় এখন?"

"আমাদের প্রধানমন্ত্রী? তিনি নিশ্চয় তাঁর কর্ম-কক্ষে আছেন।"

"ঠিক। কর্ম-কক্ষেই আছেন তিনি"—রঞ্জাবতী পাখা দিয়ে মহারাণী সুরূপিণীর ঘরটা দেখিয়ে দিলেন—"আপনি আর আমি পাশের ঘরে আছি। আপনি হয়তো ভাবছেন আপনার উপর আমার দয়ামায়া কিচ্ছু নেই। কেবল আপনাকে আঘাত করছি। কিন্তু পরীক্ষা করে দেখতে পারেন, তাহলেই আপনার ভুল ভেঙে যাবে। আমাকে কোনও একটা কাজ দিন, কিংবা কোনও প্রশ্ন করুন। আপনার জন্য হেন কাজ নেই যা করতে আমি প্রাণপণ না করতে পারি, হেন গোপন খবর নেই যা আপনার কাছে না প্রকাশ করতে পারি।"

"না, রঞ্জাবতী, সেসব কিছু করব না। তোমার বন্ধুত্বকে আমি এত মূল্যবান বলে মনে করি যে কোনও নোংরামির মধ্যে তোমাকে টেনে নিয়ে যেতে চাই না।"

গন্ধরাজ আর একবার রঞ্জাবতীর হস্ত-চুম্বন করলেন।

"জান? যখন যুদ্ধ হয়, দু'দলের সৈন্যরা যখন মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকে, তখন আড়ালে আবডালে শত্রু-পক্ষের সৈন্যের সঙ্গে বন্ধুত্বও হয় কারো কারো। কিন্তু তা বলে তারা কেউ নিজের দলের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে না। না, আমি কিছু জানতে চাই না।"

"মহারাজ"—বাঁকা হাসি হেসে বললেন রঞ্জাবতী—"আপনার মতো সবাই যদি উদার হত তাহলে নারী-জন্ম সার্থক হত আমাদের।"

কিন্তু তাঁর ভাবভঙ্গীতে মনে হল তিনি একটু যেন আহত হয়েছেন গন্ধরাজের কথায়। তিনি অন্য রকম কিছু ঘটবে আশা করেছিলেন। তিনি প্রত্যাঘাত করবার ছুতো খুঁজতে লাগলেন মনে মনে এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সেটা পেয়ে প্রফুল্ল হয়ে উঠলেন।

"মহারাজ এবার আমাকে ছুটি দিন, আর বেশীক্ষণ আমার কাছে থাকবেন না। কথাটা হয়তো অশোভন স্পর্ধার মতো শোনাচ্ছে, কিন্তু কি করি বলুন, আমার ভালুকটা যে বড় হিংসুকে।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ আমি যাচ্ছি। কৈকেয়ীর নির্দেশে রামরা সর্বদাই বনবাসে যেতে প্রস্তুত! চললুম। কিন্তু জেনে রাখ আমি চিরকালই তোমার বশম্বদ বন্ধু থাকব। শিস্ দিয়ে ডাকলেই চলে আসব কুকুরের মতো—"

গন্ধরাজ সরে গেলেন। গভীরা দেবী আর অঞ্জনা দেবীর সঙ্গে গল্প করতে লাগলেন আবার। রঞ্জাবতী অস্ত্র-কুশলা। তিনি জানেন তাঁর কোন অস্ত্রটি কোথায় কিভাবে লাগসই হবে। গন্ধরাজের হৃদয়ে তিনি একটি মোক্ষম তীর হেনেছিলেন। কপিঞ্জল ঈর্ষা-পীড়িত হতে পারে—এটা তো একটা পরম প্রীতিকর প্রতিশোধ। গন্ধরাজও রঞ্জাবতীকে যেন নূতন আলোকে দেখলেন। ওকে কেন্দ্র করে কারও ঈর্ষা জাগতে পারে না কি!

।। নয়।।

রঞ্জাবতী ঠিক কথাই বলেছিলেন। গর্জনগাঁওয়ের মহামহিম প্রধানমন্ত্রী সত্যই মহারাণী সুরূপিণীর প্রসাধন-কক্ষে বসে ছিলেন তখন। প্রসাধন শেষ হয়েছিল, সুরূপিণী সুসজ্জিতা হয়ে বসে ছিলেন একটি দীর্ঘ দর্পণের সমুখে। ভগীরথ শর্মার বর্ণনা নিদারুণভাবে সত্য। কিন্তু বর্ণনা হিসাবে সত্য হলেও ওটা যে বিদ্বেষপূর্ণ কুৎসা তাও বুঝতে দেরি হয় না। ভগীরথ শর্মার নারী-বিদ্বেষী মনের নিখুঁত প্রতিচ্ছবি ওই বর্ণনাটি। সুরূপিণীর কপালটা উঁচু ঠিকই, কিন্তু মোটেই তা বেমানান নয়। তিনি ঈষৎ কোলকুঁজো তা-ও অস্বীকার করা যায় না, কিন্তু তাঁর প্রতিটি অঙ্গ নিটোল, যেন নিপুণ শিল্পীর গড়া। তাঁর হাত, পা, কান, কমনীয় গ্রীবার উপর তাঁর সুন্দর ছোট্ট মাথাটি, তাঁর মুখের এবং চিবুকের ডোল সবই চমৎকার, কোথাও ছন্দপতন ঘটেনি। তিনি হয়তো তিলোত্তমার মতো সুন্দরী নন, কিন্তু তিনি প্রাণবন্ত, চঞ্চল, বর্ণময়ী, হাজার রকম মাধুর্যের উৎস। তাঁর চোখ দুটি একটু বেশী চঞ্চল বটে, একটু যেন বেশী ঘূর্ণ্যমান, কিন্তু প্রতিটি ঘূর্ণন অর্থপূর্ণ। তাঁর সর্বাঙ্গের মধ্যে চোখ দুটিই সব চেয়ে সুন্দর, সে চোখের দৃষ্টিতে তাঁর মনোভাবের প্রকাশ নেই কিন্তু। সে দৃষ্টি যা বলছে তা যেন তাঁর মনের কথা নয়। তাঁর অপরিণত কঠিন হৃদয়ে যে কামনা নিহিত তা নারীসুলভ নয় তা পারুষ্যধর্মী, তা ক্ষমতালাভের আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু তাঁর চোখের দৃষ্টি কখনও উদ্ধত কখনও মিনতিভরা, কখনও প্রদীপ্ত কখনও বিগলিত। দৃষ্টিতে যেন লোলুপ কুহকিনীর ছলনা। হ্যাঁ, ছলনাময়ী তিনি সত্যিই। তিনি যে পুরুষ নন, পৌরুষের মহিমায় তিনি যে উদ্ভাসিত হয়ে উঠতে পারছেন না এই ক্ষোভে তিনি তাঁর নারীত্বকে কেন্দ্র করেই যথেচ্ছাচার করবার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন, নিজের প্রভুত্ব কায়েম করতে চাইছেন গুপ্ত অভিসন্ধির পথে, খেয়াল-খুশির মেঘে ভেসে ভেসে চাইছেন নিজের প্রভাব প্রতিপত্তির বর্ষণে চতুর্দিক ভাসিয়ে দিতে। তিনি কাউকে ভালবাসেন না, কিন্তু তিনি চান সকলে তাঁর পদানত হয়ে থাকুক। যে কোনও সাধারণ মেয়েরই এই আকাঙ্ক্ষা বোধহয়। ইতিহাসে এ রকম নজির আছে। প্রেমান্ধ প্রণয়ীকে সিংহের মুখে ফেলে দিয়ে মজা দেখেছেন প্রণয়িনী। কিন্তু প্রকৃতি ছলনাময়ী। তিনি শুধু পুরুষের জন্যেই ফাঁদ পাতেন না, নারীর জন্যেও পাতেন।

মার্জার যে ভঙ্গীতে ওত পেতে বসে সেই ভঙ্গীতে কপিঞ্জল তাঁর অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে গুটিয়ে বসেছিলেন একটি নীচু কেদারায় একটু ঝুঁকে। তাঁর কাঁধ দুটো উঁচু হয়ে উঠেছিল, নীলাভ প্রচণ্ড গণ্ডে আর চোয়ালে, পীতাভ চোখের দৃষ্টিতে যে ভাব ফুটে উঠেছিল তাতে মনে হচ্ছিল যদিও তাঁর ভঙ্গীটা ওত পাতার মতো, কিন্তু ইচ্ছেটা বোধহয় তোষামোদ করবার। তাঁর শক্তিব্যঞ্জক মুখভাবে যা বিচ্ছুরিত হচ্ছিল তাতে ফুটে উঠেছিল দস্যুসুলভ স্পর্ধা, নির্জলা স্পর্ধা, কোনও আবরণ তাতে ছিল না। গোপন করবার বিন্দুমাত্র প্রয়াসও ছিল না। সুরূপিণীর দিকে চেয়ে যে হাসিটি তিনি হাসলেন তা মোহন, কিন্তু মার্জিত নয়।

বললেন, "এবার আমার বোধহয় ওঠা উচিত। মহারাজকে পাশের ঘরে অপেক্ষা করিয়ে রাখাটা আর উচিত হচ্ছে না। অবিলম্বে একটা মীমাংসায় আসা দরকার।"

"মীমাংসাটা পরে করলে হয় না? এখনই করতে হবে?"

"হ্যাঁ, এখনই, আর দেরি করা চলে না। মহারাণী নিজেই সেটা বুঝতে পারছেন। গোড়ায়

গোড়ায় সাপকে নকল করা চলতে পারে কিন্তু শেষমুহূর্তে সিংহের মতো ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। মহারাজ যদি এখন না আসতেন তাহলে ভালো হত, কিন্তু আমরা অনেকদূর এগিয়ে গেছি এখন ফেরা অসম্ভব।"

"ভাবছি, হঠাৎ মহারাজ এলেন কেন। বিশেষ করে আজকেই আসার হেতুটা কি।"

"যারা সব ভণ্ডুল করে দেয় তাদের তো ওই স্বভাব। ঠিক সময়টিতে হাজির হয়ে সব পণ্ড করে দেবে। কিন্তু ভাববার কিছু নেই। ভেবে দেখুন কত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে আমরা কতটা এগিয়েছি। এখন একটা আহাম্মক এসে—কিন্তু না—"

কপিঞ্জল মৃদু হেসে তাঁর আঙ্গুলগুলোতে ফুঁ দিলেন ভঙ্গীভরে।

"কিন্তু ওই আহাম্মকই"—উত্তর দিলেন মহারাণী—"এখনও গর্জনগাঁওয়ের মহারাজ—"

"সেটা আপনার মরজির জন্যে। আর যতক্ষণ আপনি প্রশ্রয় দেবেন ততক্ষণ উনি মহারাজ থাকবেনও। প্রকৃতির একটা নিয়ম আছে, শক্তিময়ীর কাছেই শক্তি থাকে, বীরভোগ্যা বসুন্ধরা। উনি যদি আপনার সঙ্গে টক্কর দিতে আসেন তাহলে সেই মাটির হাঁড়ি আর পিতলের হাঁড়ির গল্পের পুনরাবৃত্তি হবে—"

"আপনি আমাকে হাঁড়ি বলছেন! এটা কিন্তু অশোভন" হেসে ফেললেন সুরূপিণী।

"আপনার কীর্তি পুরোপুরি কায়েম করবার জন্যে এখন অনেক উপমা ব্যবহার করতে হবে আমাকে। পার হতে হবে অনেক সিঁড়ি—তারপর অবশ্য—"

আনন্দে সুরূপিণীর মুখটা প্রদীপ্ত হয়ে উঠল।

"গন্ধরাজ কিন্তু এখনও সিংহাসনে আসীন আছেন, চাটুকার মশাই, আপনি কি বিদ্রোহ করতে বলেন? আপনি? তাঁর প্রধানমন্ত্রী—?"

"বলবার তো আর কিছু নেই মহারাণী। যা হবার তা তো হয়েই গেছে। গন্ধরাজ এখন শুধু কাগজেকলমে মহারাজা, আসল শাসনকর্ত্রী তো আপনি, মহামান্যা মহারাণী সুরূপিণী দেবীই তো রাজ্য চালাচ্ছেন—"

তাঁর দিকে অনুরাগ-ভরা মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাইলেন কপিঞ্জল। সুরূপিণীর অন্তরে দোলা লাগল। ফুলে উঠল বুকটা। বিরাটকায় তাঁর এই ক্রীতদাসের দিকে চেয়ে ক্ষমতার মদিরা পান করলেন তিনি। ক্রীতদাসটি কিন্তু বলেই চললেন—শয়তানি ধূর্ততা যদিও তাঁকে মানাচ্ছিল না ঠিক—কিন্তু তবু তিনি বললেন—"একটি দোষ আছে কিন্তু মহারাণীর। তাঁর সমুজ্জ্বল সুমহৎ ভবিষ্যতে সেটি যে বিপজ্জনক ছায়াপাত করেছে তা দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি। বলব সেটা কি? আপনি কি আমার বেয়াদবি ক্ষমা করবেন? দোষটি আপনার মধ্যেই আছে মহারাণী—আপনার হৃদয় অতি কোমল।"

"ঠিকই বলেছেন, আমি একটু ভীরু। ধরুন আমাদের বিচারে যদি ভুল হয়ে থাকে, যদি আমরা হেরে যাই?"

"হেরে যাব, মহারাণী?" তিক্ত ব্যঙ্গ সহকারে উত্তর দিলেন কপিঞ্জল। "খরগোশের কাছে কুকুর কখনও হেরে যায়? সীমান্তে আমাদের পাঁচ হাজার সশস্ত্র সৈনিক মজুত আছে, পাঁচ ঘণ্টার মধ্যেই পাঁচ হাজার সৈন্য রুদ্রার সিংহদ্বারে আঘাত হানবে; ভৈরঙ্গীতে দেড় হাজারের বেশী সেনা নেই। এ তো অঙ্কের ব্যাপার। জয় আমাদের সুনিশ্চিত। আমাদের বাধা দেবে কে—"

"কিন্তু এতে বাহাদুরি কি আছে। একে আপনি গৌরব বলছেন? এ তো একটা শিশুকে ধরে প্রহার করার মতো। এতে সাহসের পরিচয় কোথায়?"

"মহারাণী, সাহসটা রাজনৈতিক। আমাদের এই পদক্ষেপ লঘু নয় খুব গুরুত্বপূর্ণ। এর দ্বারা সমস্ত উত্তর ভারতের দৃষ্টি আমরা আকর্ষণ করব, এই প্রথম আকর্ষণ করব। এর আগে আমরা নগণ্য ছিলাম। এর পর তিন মাসের মধ্যে যে সব সন্ধি-চুক্তি হবে তার উপর নির্ভর করবে আমাদের উত্থান কিংবা পতন। ওই সব সন্ধিচুক্তির সময় আপনার পরামর্শের উপরই ভরসা করতে হবে আমাদের"—গম্ভীরভাবে বলে চললেন তিনি—"আপনাকে যদি আমি কাজ করতে না দেখতাম, সে সময় আপনার উর্বর মস্তিষ্কের পরিচয় যদি না পেতাম, তাহলে সত্যি বলছি, এই আসন্ন বিপদে ভয়ে আমার বুক কাঁপত। বুদ্ধির ক্ষেত্রে, কৌশলের ক্ষেত্রে, প্রেরণার ক্ষেত্রে, আমাদের অক্ষমতা স্বীকার করতেই হবে। মনে করুন বিদুলার কথা, মনে করুন কৈকেয়ীর কথা, মনে করুন দ্রৌপদীর কথা। ভারতের বাইরে যে সব দেশ আছে—ফরাসীদের দেশ, রুশ দেশ, ইংরেজদের দেশ, স্পেন দেশ—যাদের আমরা ম্লেচ্ছ, ফিরিঙ্গী বা গুরুও বলি—তাদের দেশেও শুনেছি মহিমময়ী নারীদের প্রতিভাই হয় প্রকাশ্যে না হয় অন্তরালে রাজত্বের শাসনরজ্জুকে সবল হস্তে ধরে আছে। তাঁদের যে সম্মান পাওয়া উচিত ছিল সে সম্মান হয়তো তাঁরা পাননি, তাঁদের আহাম্মক স্বামীরা বা সেনাপতিরা বা মন্ত্রীরা হয়তো তা পেয়েছেন, অনেকে হয়তো হৃদয়ের দুর্বলতার জন্যও তাঁদের ন্যায্য সম্মান থেকে বঞ্চিত হয়েছেন—কিন্তু সত্য কখনও অম্লান হয়নি, কখনও হবে না।"

এই ঐতিহাসিক বক্তৃতায় সুরূপিণী কিন্তু বিশেষ বিচলিত হলেন না। মনে হল তিনি যা ঠিক করেছিলেন তা যেন আর ভালো লাগছিল না তাঁর। তিনি তাঁর অর্ধনিমীলিত চক্ষুর ফাঁক দিয়ে কপিঞ্জলের দিকে তাকিয়ে ঈষৎ অবজ্ঞাভরেই বললেন, "সত্যি, কি ছেলেমানুষ এই পুরুষরা। লম্বাচওড়া কথা বলতে পেলে আর কিছু চায় না। রাজনৈতিক সাহস। আপনাকে যদি পোড়া কড়াই মাজতে হত তাহলে সেটাকে আপনি নিশ্চয় গার্হস্থ্য সাহস বলতেন?"

"বলতাম, যদি সে কড়াইটাকে ভাল করে মাজতে পারতাম।" কপিঞ্জলও দমবার পাত্র নন—"যে কোনও গুণকে ভালো নামেই আমি ভূষিত করতে চাই, করাটাই উচিত, বিশেষণই গুণের উৎকর্ষ বাড়ায়, গুণ সব সময়ে মনোহর না-ও হতে পারে।"

"বেশ আমাদের সাহসটাকে পরীক্ষা করে দেখা যাক। কৌশাম্বী থেকে ঠাকুমা আমাদের পিঠ চাপড়েছেন, কপিলবাস্তুর জ্যাঠামশাই আমাদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন, আমাদের পরিবারের যে যেখানে আছেন সবাই বাহবা বাহবা বলেছেন। এই কি আমাদের সাহসের সম্বল? আপনার কথা শুনে আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি আমি মন্ত্রীমশাই?"

"মহারাণীর মনটা আজ ভালো নেই দেখছি।"

কপিঞ্জল পুনরায় আরম্ভ করলেন।

"বিপদটা যে কোথায় তা তিনি ভুলে গেছেন। আমরা চারিদিক থেকে উৎসাহ পেয়েছি তা ঠিক, কিন্তু মহারাণী ভালো করেই জানেন ও সব উৎসাহের ভিত্তি চোরা-বালির উপর; মহারাণী এ-ও জানেন যে প্রকাশ্য জনসভায় এইসব গোপন ইশারার কথা বলা যায় না, অনেক সময় তা চেপে যেতেও হয়। কিন্তু বিপদ যে সমূহ তাতেও সন্দেহ নেই।"

যে জিনিসটাকে তিনি চাপা দিতে চেয়েছিলেন সেইটেকে আবার খুঁচিয়ে তুলতে বাধ্য হচ্ছেন বলে মনে মনে ক্ষুব্ধ হলেন তিনি, কিন্তু থামতে পারলেন না।

"বিপদটা ঠিক যুদ্ধসংক্রান্ত নয়, কিন্তু তবু সেটা উপেক্ষণীয়ও নয়, অবশ্য সহজেই এ বিপদ কাটিয়ে ওঠা যাবে এ বিশ্বাস আমার আছে। যদি আমাদের সৈন্যদলের উপর নির্ভর করতে হত তাহলে একটু মুশকিলই হত। কারণ আপনি ঠিকই ধরেছেন অভিজিৎ এখনও সেনাপতি হিসাবে তার যোগ্যতা প্রমাণ করতে পারেনি। কিন্তু সন্ধি-চুক্তি-কূটনৈতিক কৌশলের ক্ষেত্রে আমাদের নির্ভর করতে হবে নিজেদেরই উপর। সেইখানেই বিপদ, কিন্তু আপনার সাহায্য পেলে সে বিপদকে আমি গ্রাহ্যই করি না—"

"তা হতে পারে"—দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন মহারাণী—"কিন্তু আমি বিপদ দেখছি অন্য জায়গায়। আমাদের প্রজারা—ওই লক্ষ্মীছাড়ারা—ওরা যদি হঠাৎ বিদ্রোহ করে বসে—তাহলে? উত্তর ভারতের লোকেরা কি ভাববে যখন তারা দেখবে যে আমরা যখন অপরের রাজত্ব আক্রমণ করতে যাচ্ছি, তখন আমাদের নিজেদেরই সিংহাসন টলমল?"

"না, মহারাণী"—হেসে উত্তর দিলেন কপিঞ্জল—"আপনিও ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন না এতে আশ্চর্য হচ্ছি। প্রজারা অসন্তুষ্ট কেন? অর্থাভাবে আর খাজনার চাপে। একবার যদি আমরা ভৈরঙ্গী দখল করতে পারি, খাজনা মাপ করে দেব, ছেলেরা বীরত্বের মুকুট আর লুটের মাল নিয়ে ফিরে আসবে ঘরে ঘরে শৌর্যবীর্যের মহিমায় বুক ফুলিয়ে, তখন আর কোন গ্লানি থাকবে না কারো মনে। তারা বলাবলি করবে, মহারাণী ঠিকই করেছিলেন, কি মাথা, কি দূরদৃষ্টি তাঁর, আর তো আমাদের অভাব নেই। অবশ্য, মহরাণীর কাছে এসব বলার মানে হয় না। কিন্তু মহারাণীই তো আমাকে এ পথ দেখিয়েছেন। তাঁরই নির্দেশে দুর্গম পথের যাত্রী হয়েছি আমি।"

"মন্ত্রী মশায়"—সুরূপিণী যেন একটু ঝাঁজের সঙ্গেই বললেন—"প্রায়ই আপনি আপনার নিজের কেরামতিটা মহারাণীর উপর আরোপ করেন দেখছি।"

এই অতর্কিত খোঁচায় কপিঞ্জলের ব্যক্তিত্ব টলমল করে উঠল। কিন্তু তা ক্ষণকালের জন্য। পরমুহূর্তেই তিনি সামলে নিলেন নিজেকে।

"করি না কি! হয়তো করি। মহারাণীর মধ্যেও এ প্রবণতা লক্ষ্য করেছি।"

তিনি এমন সহজভাবে বললেন কথাগুলো এবং তা এমন সঙ্গত মনে হল যে সুরূপিণী স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। তাঁর অহমিকার ভিত্তিটাই যেন কেঁপে উঠেছিল, আত্মস্থ হয়ে আরাম পেলেন।

"কিন্তু কোন কাজই তো এগোল না। ওদিকে গন্ধরাজ পাশের ঘরে অপেক্ষা করছে। কি ভাবে সম্মুখসমরে অগ্রসর হব তাই তো মাথায় আসছে না, সেনাপতি মশাই একটু উপদেশ দেবেন? কি ভাবে তার সঙ্গে কথাবার্তা কইব, আর সে যদি রাজপরিষদে যেতে চায় তাহলেই বা আমরা কি করব—"

"এখন, মানে এখনকার মতো, আমি মহারাণীকে মহারাজের কাছে রেখে যাচ্ছি। মহারাণীর উপর আমার আস্থা আছে। তাঁর কাজকর্ম আমি দেখেছি। মহারাজকে নাট্যশালায় পাঠিয়ে দিন না, অবশ্য বুঝিয়ে সুজিয়ে"—তারপর বললেন—"মহারাণী যদি এখন মাথাধরার অভিনয় করেন, কেমন হয়?"

"মাথাধরার অভিনয়? কক্ষনো না। যে সৈন্য যুদ্ধ করতে জানে সে কখনও পালায় না, যে নারী পুরুষকে আয়ত্তে আনতে জানে সে-ও কখনও রণে ভঙ্গ দেয় না। বীর তার অস্ত্রকে কলঙ্কিত করে না।"

"তাহলে মহারাণীর কাছে একটি বিনীত প্রার্থনা করে বিদায় নি। মহারাণীর একটি মাত্র গুণের অভাব আছে—করুণা। করুণাময়ীর অভিনয় করুন তাহলে—বেচারার শিকার টিকার নিয়ে একটু আলোচনা করুন। রাজনীতির ধার দিয়েও যাবেন না। অভিনয় করুন রাজ্যের শুষ্ক কর্তব্যপালন করবার পর তাঁর সঙ্গ পেয়ে যেন আপনি বর্তে গেলেন। মহারাণীর কি এ রণ-নীতি পছন্দ হল?"

"ওর জন্যে আমি ভাবছি না"— সুরূপিণী উত্তর দিলেন—"কিন্তু রাজপরিষদ—তার কি হবে?"

"রাজপরিষদ?"—কপিঞ্জল হেসে উঠলেন এবং গন্ধরাজের স্বর এবং ভঙ্গী হুবহু নকল করে ঘরের মধ্যে এক চক্কোর পায়চারি করে শুরু করলেন—"আজ পরিষদে কি কি কাজ আছে? আরে মহাধ্যক্ষ মশাই যে—গোঁফে কলপ লাগিয়েছেন দেখছি! হেঁ হেঁ আমাকে ঠকাতে পারবেন না। কলপের ব্যাপারে আমি একজন ওস্তাদ। তাছাড়া আমার চোখ রাজার চোখ, ঠকানো শক্ত। এ কাগজগুলো কিসের? ও, তাই তো। হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয় নিশ্চয়। কিন্তু আমি বাজি রেখে বলতে পারি আপনারা কলপের ব্যাপারটা ধরতে পারেননি কেউ। ওরে বাবা এতগুলো কাগজ! আপনিই সই করুন, আপনাকে তো অধিকার দেওয়াই আছে। কিন্তু দেখুন, আপনার কলপের রহস্যটা আমি ধরে ফেলেছি। ফেলিনি?" এই পর্যন্ত বলে কপিঞ্জল থামলেন। তারপর নিজের কণ্ঠস্বরে বললেন, "এটা বলতে হবে আমাদের মহারাজা তাঁর পরিষদের সভ্যদের খুব আমোদে রাখেন আর রক্ষাও করেন। এটা কম সৌভাগ্য নয়।"

এই পর্যন্ত বলে কপিঞ্জল যখন মহারাণীর দিকে দৃষ্টি ফেরালেন তখন দেখলেন তিনি যেন জমে গেছেন।

"মন্ত্রীমশায়, আপনি দেখছি রসিক লোক। কিন্তু আপনি বিস্মৃত হয়েছেন কোথায় আপনি দাঁড়িয়ে আছেন। এতক্ষণ আমাকে যে সব পরামর্শ দিলেন এবং যে সব অভিনয় করলেন তা একটাও হয়তো কাজে লাগবে না। কারণ আপনার প্রভু, গর্জনগাঁওয়ের মহারাজা গন্ধরাজ অত সহজে ভোলবার লোক নন। তিনিও অনেক সময় শক্তি এবং বুদ্ধির পরিচয় দিয়ে থাকেন।"

মনে মনে জ্বলে উঠলেন কপিঞ্জল। ভাঁড়দের অহমিকাও গগনচুম্বী হয় আর তাতে আঘাত লাগলে অত্যন্ত মর্মান্তিক হয় সেটা তাদের কাছে, বিশেষত কপিঞ্জল যে উদ্দেশ্যে এ ভাঁড়ামির অবতারণা করেছিলেন সেটা তুচ্ছ নয়, অতিশয় গভীর। তাই সুরূপিণীর এই আঘাতটা বড়ই বাজল মনে। কিন্তু কপিঞ্জল লৌহ-মানব। বাইরে কোন কিছু প্রকাশ করলেন না, সাধারণ ভাঁড় হলে সরে পড়তেন, কিন্তু তিনি তা-ও করলেন না, নিজের হাল ধরে অটল হয়ে রইলেন।

মৃদু হেসে বললেন, "তাই নাকি। তাহলে শক্তি এবং বুদ্ধির সাহায্যেই লড়তে হবে তাঁর সঙ্গে। উন্মত্ত ষাঁড়কে থামাতে হলে তার শিং দুটোই চেপে ধরতে হবে।"

"দেখা যাক"—ওড়নাটা ঠিক করে নিয়ে ওঠবার উপক্রম করলেন সুরূপিণী। চটলে অপরূপ দেখায় সুরূপিণীকে। রাগ ঘৃণা, বদমেজাজ গয়নার মতো মানায় তাঁকে। সুরূপিণীকে সত্যিই সুরূপিণী বলে মনে হতে লাগল।

'ভগবান করুন, ওদের যেন ঝগড়া হয়ে যায়'— মনে মনে ভাবলেন কপিঞ্জল—'ঝগড়া না হলে দজ্জালিনিটাকে দলে টানা যাবে না। এখানে আর আমার থাকা উচিত হচ্ছে না। মহারাজকে এবার আসতে দেওয়া উচিত। নারদ—নারদ—'

কপিঞ্জল নতজানু হয়ে সুরূপিণীর হস্ত চুম্বন করলেন। বাত ছিল হাঁটুতে ব্যথা লাগল একটু। কিন্তু তিনি সসম্ভ্রমে বললেন, "মহারাণী, আপনার ভৃত্যকে এবার বিদায় দিন। রাজপরিষদের বৈঠকের জন্য অনেক কিছু করতে হবে আমাকে এখন।"

"যান—"

সুরূপিণী উঠে দাঁড়ালেন। কপিঞ্জল পিছনের গোপন একটা দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন তাড়াতাড়ি। সুরূপিণী ঘণ্টা বাজালেন এবং সহচরীকে আদেশ দিলেন মহারাজকে খবর দিতে।

।। দশ।।

কতো মহৎ সদিচ্ছা নিয়েই না গন্ধরাজ তাঁর স্ত্রীর কক্ষে প্রবেশ করলেন। পিতার মমত্ববোধ, কোমল অনুভূতির পসরা, নীতি-বচনের মালা কিছুরই অভাব ছিল না—অনেক আশা নিয়েই প্রবেশ করলেন তিনি। সুরূপিণীও যে খুব বিরূপিণী ছিলেন তা নয়। গন্ধরাজ তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষার বিঘ্ন হয়ে দাঁড়িয়ে সব ভণ্ডুল করে দেবে এ ভয়ও আর ছিল না, কারণ তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষার সিঁড়িগুলোর পরিচয় পেয়ে বেশ ঘাবড়ে গিয়েছিলেন তিনি। কপিঞ্জলের উপর তিনি যে কেবল অপ্রসন্নই হয়েছিলেন তাই নয় তাঁর সম্বন্ধে একটা বিভীষিকাও সঞ্চারিত হয়েছিল তাঁর মনে। লোকটিকে তিনি যেন মোটেই সহ্য করতে পারছিলেন না আর। তাঁর নির্লজ্জ দাসসুলভ আচরণ থেকে এবং যে অশোভন মনোযোগ তিনি তাঁর প্রতি বর্ষণ করছেন তার অসৌজন্য থেকে তিনি হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন যে লোকটা আসলে বর্বরই। কিন্তু তবু প্রশ্রয় দিচ্ছিলেন তাকে কারণ যে ভালুক পোষে সে ভালুকের গায়ের গন্ধের জন্য তাকে ছেড়ে দেয় না। তাছাড়া তিনি গোপনে ঈর্ষাজনক এমন দু'একটা খবর পেয়েছিলেন যার থেকে বুঝেছিলেন লোকটা দুমুখো সাপও। এটা মিথ্যা নয় অবশ্য যে তিনি তাঁর সঙ্গে প্রণয়ের অভিনয় করেন, অবশ্য সেটা অভিনয়ই, আর কপিঞ্জল যেটা করেন সেটা সুরূপিণীর অহঙ্কারকে তোয়াজ। এখনি তিনি যে তাঁর সামনে তাঁর স্বামীকে নকল করে ভাঁড়ের অভিনয় করলেন এবং যে ঘৃণ্য অবস্থায় পড়ে তাঁকে সেটা মুখ বুজে দেখে যেতে হল—এর জ্বালাটা তাঁর মনে জ্বলছিল তখনও, তাছাড়া বোঝার মতো কি যেন একটা চেপেছিল তাঁর বিবেকের উপর। গন্ধরাজ যখন ঘরে ঢুকলেন তখন সুরূপিণীর মনের ভাবটা দোষী-দোষী, গন্ধরাজ তাঁকে এইসব নোংরামি থেকে বাঁচাবেন এই আশায় সুরূপিণী সাগ্রহে এগিয়ে গেলেন।

কিন্তু অদৃষ্ট মাঝে মাঝে পরিহাস করেন। এমন সাক্ষাৎকারও ফলপ্রসূ হল না। ঘরে ঢুকেই গন্ধরাজের খটকা লাগল একটা। তিনি দেখলেন কপিঞ্জল চলে গেছে, কিন্তু আয়নার খুব কাছ ঘেঁষে তখনও সেই চেয়ারটা আছে যেটায় বসেছিলেন তিনি। খচ্ করে লাগল মনে। লোকটা সুরূপিণীর প্রসাধনকক্ষে এতক্ষণ তো ছিলই, যাবার সময়েও চোরের মতন গোপনে চলে গেছে! যে সহচরী তাঁকে নিয়ে এসেছিল, একটু রূঢ়কণ্ঠে তাকে বাইরে যেতে বললেন।

"এস, এস, বস"—সুরূপিণী এগিয়ে গেলেন তাড়াতাড়ি। গন্ধরাজের রূঢ় কণ্ঠস্বরে সব কেমন যেন এলোমেলো হয়ে গেল। চেয়ারটার দিকে যে দৃষ্টিতে তিনি চেয়েছিলেন তা-ও একটু বিচলিত করল সুরূপিণীকে।

"সুরূপিণী, আমি তোমার এ ঘরে এত কম এসেছি যে এখানে আগন্তুকের বেশী কোন দাবি নেই আমার।"

"তুমি তো নিজেই নিজের পছন্দ মতো সঙ্গী-সাথীর সঙ্গে থাকতে ভালবাস।"

"সেই কথাই বলতে এসেছি"—গন্ধরাজ উত্তর দিলেন—"চার বছর আমাদের বিয়ে হয়েছে। এই চার বছরে আমি নিজেও সুখী হইনি, তোমাকেও সুখী করতে পারিনি। আমি ভালো করেই জানি আমি তোমার স্বামী হবার যোগ্য নই। আমি তোমার চেয়ে বয়সে অনেক বড়, আমার কোনও উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই, আমি খামখেয়ালী বিদূষক। তুমি যেন আমাকে ঘৃণা কর তা আমার অবিদিত নেই, এর জন্যে তোমাকে দোষও দিই না আমি সুরূপিণী। কিন্তু সুবিচার করতে হলে তোমার ভেবে দেখা উচিত তোমার প্রতি আমি কি আচরণ করেছি। যখন আমি দেখলুম এই ক্ষুদ্র রঙ্গমঞ্চে মহারাণীর ভূমিকায় অভিনয় করতে তোমার খুব ভালো লাগছে, সঙ্গে সঙ্গে কি আমি আমার খেলনার বাক্সটা, মানে গর্জনগাঁওয়ের এই রাজত্বটা তোমাকে দিয়ে দিইনি? যেই আমি অনুভব করলাম স্বামী হিসেবে তুমি আমাকে পছন্দ করছ না অমনি কি আমি সরে দাঁড়াইনি? তোমাকে এতটা স্বাধীনতা আর কোনও স্বামী দিতে পারত কি? তুমি হয়তো বলবে আমি হৃদয়হীন, আমার কোনও অনুরাগ নেই, আমি খেয়ালখুশীর হাওয়ার মুখে উড়ে বেড়িয়েছি, আমার চাল-চলন অদ্ভুত তাই আমাকে তুমি বিশ্বাস করতে পারনি। মানছি সেটা। আমি দায়িত্ব এড়িয়ে গেছি, কিন্তু এটা এবার বুঝতে পারছি, দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়া সহজ বটে, কিন্তু সঙ্গত নয়। হয়তো আমি তোমার স্বামী হিসাবে একটু বুড়ো, হয়তো তোমার পছন্দের মাপকাঠির মাপে আমার অযোগ্যতা ধরা পড়েছে, কিন্তু তবু সুরূপিণী এটা বোধহয় আমার ভোলা অন্যায় হয়েছে যে দেশে তোমাকে এনেছি সে দেশের আমি রাজা, তুমি যখন এসেছিলে তখন তুমি বালিকামাত্র, নিতান্ত শিশু। সেদিক থেকেও আমার কর্তব্য ছিল, কিন্তু সেসব কর্তব্য আমি পালন করিনি।"

বয়োজ্যেষ্ঠ হিসাবে শ্রেষ্ঠত্বের দাবি নির্ঘাত মনকে বিরূপ করে তোলে।

"কর্তব্য।"—হেসে উঠলেন সুরূপিণী—"তোমার মুখে কর্তব্যের কথা। শুনে সত্যিই হাসি পাচ্ছে গন্ধরাজ। হঠাৎ আজ এ খেয়াল? চাকরানীদের সঙ্গে প্রেম কর না গিয়ে মহারাজা হবার শখ যদি হয়ে থাকে, পুতুল-মহারাজা হও না। উপভোগ কর জীবনটা, যা বরাবর করে এসেছ। কর্তব্য আর রাজত্বের ভার আমাদের উপর থাক।"

আমাদের কথাটা গন্ধরাজের কানে বাজল।

"উপভোগ? উপভোগের চরম করেছি আমি। কিন্তু তবু এর একটা দিকও আছে আর সেটাও বিবেচ্য। তোমার ধারণা আমি শিকার নিয়েই উন্মত্ত। কিন্তু এমন এক দিন ছিল যখন যাকে লোকে সম্ভবত ভদ্রতা করেই আমার শাসন-ব্যবস্থা বলত তাতে আমি গভীরভাবে নিজেকে নিবিষ্ট করেছিলাম। একটা দাবি আমি করব, আমার সুরুচি আছে, জীবন্ত সুখ আর একঘেয়ে প্রণালীবদ্ধ জীবন যাপনের তফাত আমি বুঝতে পারি। শিকার, রাজসিংহাসন আর তোমার সঙ্গসুখের মধ্যে কোনটা আমার প্রিয় তা আমি অনায়াসে ঠিক করে নিতাম, যদি তা

ঠিক করবার সুযোগ আমার থাকত। তোমাকে যখন পেয়েছিলাম তখন তুমি বালিকা ছিলে, অর্ধ-স্ফুট কুঁড়ি একটি—''

''কি সর্বনাশ! প্রণয়ের অভিনয় শুরু হল না কি?''

''দেখ, আমার একটি মাত্র গুণ, আমি হাস্যজনক কিছু করি না। আমি যা করছি তা রীতিমত দাম্পত্য-ব্যাপার। প্রণয় অভিনয় নয়। কিন্তু এর গোড়ার দিকটা যখন মনে পড়ে তখন দুঃখ হয়, এর চেয়ে মৃদু ভাষায় তার বর্ণনা করতে পারি না। সুবিচার কর সুরূপিণী ঃ এই সব পুরোনো কাহিনীর স্মৃতি টেনে আনছি বলে তুমি হয়তো আমাকে অসভ্য ভাবছ। কিন্তু একটু সুবিচার কর, সৌজন্যর খাতিরেও স্বীকার কর যে অতীতের সেই দিনগুলোর জন্য তুমিও দুঃখিত।''

''আমি কোনও কিছুর জন্য দুঃখিত নই''—সুরূপিণী বলে উঠলেন—''আমি আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি। আমার ধারণা ছিল তুমি সুখী।''

''সুখের নানা চেহারা। কেউ বিদ্রোহ করে সুখী হয়, কেউ বা ঘুমিয়ে। মদ, নিত্যনূতন পরিবর্তন, দেশভ্রমণ এ সবেও সুখ আছে। ধর্মেও আছে নাকি শুনেছি। ওপথে আমি অবশ্য চেষ্টা করে দেখিনি কখনও। লোকে এ-ও বলে, সাবেক ধরনের, অনাড়ম্বর দাম্পত্যজীবনেও নাকি আর এক রকম সুখের সন্ধান পাওয়া যায়। সুখী, হ্যাঁ বলতে পার তুমি—আমি সুখী, কিন্তু একটা কথা বলছি যখন তোমাকে প্রথমে বিয়ে করে এনেছিলাম তখন আমি আরও সুখী ছিলাম—''

একটু যেন জো'র করে হেসে সুরূপিণী বললেন, ''তাহলে সে সুখ তোমার বেশী দিন ভালো লাগেনি বলতে হবে। দেখতে দেখতে তোমার মনের সুর বদলে গেল।''

''না, কিছুই বদলায়নি। সুরূপিণী, তোমার মনে আছে কি পথে আসতে আসতে ঝোপের মধ্যে গোলাপ দেখে যখন তোমার ভালো লেগেছিল তখন আমি ঘোড়া থেকে নেমে তুলে এনে দিয়েছিলাম সেগুলো? তখন সন্ধ্যা হচ্ছিল, আকাশে তখন স্বর্ণমহোৎসব, পাখিরা ডাকতে ডাকতে ফিরছিল নিজেদের বাসায়। নটি, হ্যাঁ নটি লাল গোলাপ তুলে দিয়েছিলাম তোমাকে এবং প্রত্যেকটির জন্য তুমি আমাকে চুমু দিয়েছিলে একটি। আমার মনে হয়েছিল যে প্রত্যেকটি গোলাপ এবং প্রত্যেকটি চুম্বনের জন্য আমাদের ভালোবাসা অন্ততঃ এক বছর অম্লান থাকবে। কিন্তু দেড় বছর কাটতে না কাটতে সব শেষ হয়ে গেল। কিন্তু সুরূপিণী তোমার কি ধারণা যে আমার হৃদয়ও বদলে গেছে—''

''আমি জানি না''—মনে হল সুরূপিণীর কণ্ঠস্বরে একটা যন্ত্র যেন কথা কইল।

''না, বদলায় নি''—গন্ধরাজ বলতে লাগলেন—''কিন্তু আমি জানি প্রেমের ব্যাপারে, এমন কি বিবাহিত স্বামীর পক্ষেও, এটা স্বীকার করা হাস্যকর যে সে সুখ-স্বপ্ন ভেঙে গেছে, চাইবারও আর কিছু নেই। ক্ষমা কর, চোরাবালির উপর সে স্বপ্নের প্রাসাদ গড়েছিলাম ঃ না, তোমার দোষ দিচ্ছি না, দোষটা হয়তো আমারই, সে চোরাবালি হয়তো আমারই অক্ষমতা। কিন্তু অনেক আশা নিয়ে গড়েছিলাম, এখনও তার ধ্বংসস্তূপ পড়ে আছে।''

''এত কবিত্ব কেন হঠাৎ''—হাসতে হাসতে সুরূপিণী বললেন। তাঁর হাসির মধ্যেও যেন প্রচ্ছন্ন কান্নার সুর বেজে উঠল। একটা নামহীন বেদনা, অজানা আকুতি ধীরে ধীরে মূর্ত হতে লাগল যেন মনের মধ্যে।

"তোমার আসল উদ্দেশ্যটা কি?"

"বলছি, কিন্তু বলতে কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু বলতেই হবে—দেখ সুরূপিণী, যাই ঘটে থাকুক, তবু আমি তোমার স্বামী, হয়তো বোকা, হয়তো অযোগ্য, কিন্তু তবু আমি তোমাকে এখনও ভালোবাসি। কিন্তু মনে রেখো"—হঠাৎ দৃঢ় পরুষকণ্ঠে বলে উঠলেন গন্ধরাজ—"আমি অনুনয় করতে আসিনি। প্রেম দিয়ে আমাকে যদি গ্রহণ করতে না পার, করুণা দিয়ে পারবে না। করুণা আমি চাই না, তা আমি প্রত্যাখ্যান করব। ঈর্ষা? ঈর্ষার কোন সঙ্গত কারণ তো দেখতে পাইনি। যে কুকুরটা বিচালির গাদার উপর বসে গরুকে বঞ্চিত করছে তার আচরণ কুকুরদেরই বিচার্য, কুকুররাই তাকে উপহাস করুক, আমি কিছু বলব না। কিন্তু জগতের চক্ষে আমি এখনও তোমার স্বামী, স্বামীর প্রতি যে ব্যবহার করা উচিত তা কি তুমি করেছ? আমি নিজেকে সম্পূর্ণ সরিয়ে রেখে তোমাকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছি, তোমার কোনও ইচ্ছা অপূর্ণ রাখিনি। প্রতিদানে কি দিয়েছ তুমি আমাকে? তুমি তো মাত্রা ঠিক রাখতে পারনি, হিসেব করে চলনি, অবিবেচকের মতো যা তা করে বসে আছ। কিন্তু আমরা যেখানে আছি, সেখানে সকলের দৃষ্টি আমাদের উপর, পান থেকে চুন খসবার জো নেই, শোভনতা শালীনতা এসব বজায় রাখতেই হবে। কেলেঙ্কারি হয়তো সহজে এড়ানো যায় না, কিন্তু ওর দংশন সহ্য করা শক্ত।"

"কেলেঙ্কারি!"—প্রায় যেন চীৎকার করে উঠলেন সুরূপিণী—"তাহলে কেলেঙ্কারির কথা বলতেই তুমি এসেছ, তাই এত ভণিতা—"

"যা অন্তর থেকে অনুভব করছি, তাই বলবার চেষ্টা করেছি। আমি বলেছি আমি তোমাকে ভালোবাসি—যদিও সে ভালোবাসা তোমার কাছে মূল্যহীন—কোনও স্বামীর পক্ষে এই তিক্ত সত্যটা মেনে নেওয়া শক্ত। কিন্তু তবু আমি কোনও কিছু গোপন না রেখে সব তোমাকে বলেছি যাতে তোমার মনে কোনও আঘাত না লাগে। যখন বলতে আরম্ভ করেছি তখন শেষ পর্যন্ত সব বলব।"

"হাঁ, বলতেই হবে। কিসের কেলেঙ্কারি?"

গন্ধরাজের মুখটা লাল হয়ে উঠল।

"যা বলতে বাধ্য হচ্ছি তা না বলাই ভালো ছিল। আমি তোমাকে অনুরোধ করছি, কপিঞ্জলের সঙ্গে মেলামেশাটা একটু কম কর।"

"কপিঞ্জলের সঙ্গে? কেন!"

"ওইটেই কেলেঙ্কারির কারণ, সুরূপিণী। চারদিকে টি টি পড়ে গেছে। নিদারুণ যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছি আমি। আমার বিশ্বাস তোমার বাবা মা যদি শোনেন তাঁরাও পাবেন।"

"তোমার মুখেই প্রথম একথা শুনলাম। এজন্যে তোমার কাছে কৃতজ্ঞ।"

"হয়তো না-শোনার একটা হেতু আছে। তোমার বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে আমিই বোধহয় একমাত্র ব্যক্তি—"

"আমার বন্ধুবান্ধবদের কথা থাক। তারা ভিন্ন জাতের লোক। তুমি এসে সাড়ম্বরে তোমার ভাবাবেগের তুফান বইয়ে দিলে। কতদিন পরে এলে বল তো? শেষবার কবে তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল? তোমার অনুপস্থিতিতে তোমার রাজ্য আমি শাসন করেছি, কারও সাহায্য না নিয়ে। যা পুরুষের কাজ তা করে করে আমি যখন ক্লান্ত এবং তোমার খেয়াল-খুশির খেলা

খেলে তুমিও যখন শ্রান্ত—তখন তুমি এসে দাম্পত্য-প্রণয়ের খুঁটিনাটি নিয়ে তিরস্কার আর বক্তৃতার আড়ম্বর করছ। একটা কথা তোমার মনে রাখা উচিত রাজ্যশাসনের কাজ চালিয়ে বধূর ভূমিকায় নিখুঁত থাকা যায় না। আমরা, রাজারাজড়ারা, কেলেঙ্কারির আবহাওয়াতেই তো অভ্যস্ত। তুমি একজন মহারাজা, তোমার এ কথাটা জানা উচিত ছিল, লোকনিন্দাই তো আমাদের অঙ্গের ভূষণ। তোমার এ ব্যবহারের প্রশংসা করতে পারলাম না। ওই কুৎসা কি তুমি বিশ্বাস কর?"

"করলে আমি কি এখানে আসতাম—"

"বিশ্বাস কর কি না আমি জানতে চাই"—হঠাৎ যেন ক্ষেপে গেলেন সুরূপিণী—"যদি বিশ্বাস করে থাক—ধর যদি বিশ্বাস করে থাক—"

"তাহলেও আমি সে বিশ্বাসকে অবিশ্বাসে রূপান্তরিত করা আমার কতর্ব্য বলে মনে করতাম।"

"বুঝতে পেরেছি। নীচতা ছাড়া তোমার মধ্যে আর কিছু নেই।"

"সুরূপিণী"—অবশেষে গন্ধরাজ যেন জেগে উঠলেন—"থাক্, ঢের হয়েছে। তুমি জেদ করে আমাকে ভুল বুঝছ, আমার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে দিচ্ছ ইচ্ছে করে। তোমার বাবা মায়ের নামে, আমার নামে আমি তোমাকে বলছি—সাবধান হও।"

"এটা কি অনুরোধ মহারাজ?"

"ইচ্ছে করলে আমি আদেশ করতেও পারতুম।"

"আইন অনুসারে বন্দীও করতে পার আমাকে। তা না করা পর্যন্ত তোমার কথা মানতে পারব না।"

"এতদিন যা করে এসেছ তাই করবে?"

"ঠিক তাই করব। এই প্রহসন শেষ হয়ে গেলেই আমি প্রধান মন্ত্রী কপিঞ্জলকে ডেকে পাঠাব। বুঝতে পেরেছ?"

"এই বলে উঠে পড়লেন সুরূপিণী, বললেন—"এ ছাড়া আর আমার কোনও বক্তব্য নেই।"

"একটি অনুরোধ তাহলে করব আবার"—গন্ধরাজ শান্ত কণ্ঠেই বললেন, যদিও তাঁর ভিতরটা রাগে পুড়ে যাচ্ছিল—"তোমার হাতটা বাড়িয়ে দাও। চল একসঙ্গে আর একবার আমাদের এই পুরোনো বাড়িটা ঘুরে আসি। বেশীক্ষণ সময় লাগবে না। এই আমার শেষ অনুরোধ।"

"শেষ? ভালোই তো, শুনে খুশী হলাম। চল—"

হাত বাড়িয়ে দিলেন তিনি, গন্ধরাজও ধরলেন সেটা, উভয় পক্ষেই যেন সাড়ম্বর অভিনয় হল একটা। কপিঞ্জল যে গোপন দরজাটা দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল সেই দরজাটা দিয়ে হাত ধরাধরি করে বেরিয়ে গেলেন তাঁরা। বাগানের ধারে দু একটা জনবিরল লম্বা দালান পার হয়ে গন্ধরাজের ঘরগুলোর কাছে এসে হাজির হলেন অবশেষে। প্রথম ঘরটিই অস্ত্রাগার, নানা দেশের নানা রকম অস্ত্র টাঙানো আছে সেখানে। ঘরের সামনেই বেশ বড় একটা নির্জন ছাদ।

"তুমি কি হত্যা করবে বলে আমাকে এনেছ?"—প্রশ্ন করলেন সুরূপিণী।

"না, শুধু দেখাবার জন্য। চল, পার হয়ে যাই এটা।"

এর পরেই গ্রন্থশালা। সেখানে একজন বৃদ্ধ কঞ্চুকী বসে ঢুলছিলেন। রাজদম্পতীকে দেখে শশব্যস্তে উঠে দাঁড়িয়ে অভিবাদন করলেন তিনি, জিজ্ঞাসা করলেন কোন আদেশ আছে কি না।

"এখানেই থাকুন আপনি, যদি কিছু দরকার হয়—"

এরপরই ছবির ঘরে ঢুকলেন তাঁরা। সামনেই সুরূপিণীর ছবিটা ঘরটাকে আলো করে টাঙানো ছিল। বধূবেশিনী সুরূপিণী, মাথায় লাল লাল গোলাপ ফুলগুলো যেন জীবন্ত। গন্ধরাজ কোন কথা না বলে সেদিকে আঙুল তুলে দেখালেন। সুরূপিণীও চোখ তুলে দেখলেন নীরবে। এরপরই তাঁরা দামী মাদুর-পাতা একটা বড় দালানে প্রবেশ করলেন। সে দালানে চারটি ঘরের চারটি দরজা। একটি দরজা গন্ধরাজের শয়নকক্ষের, আর একটি সুরূপিণীর ঘরের। এখানে এসে গন্ধরাজ সুরূপিণীর হাত ছেড়ে দিলেন। এতক্ষণ ছাড়েননি। হাত ছেড়ে এগিয়ে গিয়ে খিল লাগিয়ে দিলেন ঘরে।

"এ ঘরে অনেকদিন ভিতর থেকে খিল পড়েনি, বাইরে থেকেই পড়েছে" বললেন গন্ধরাজ।

"একটা খিলই যথেষ্ট"—তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন সুরূপিণী—"ব্যাস্, এই তো? না, আর কিছু করবে।"

"না, আর কিছু করবার নেই। তোমাকে কি আবার ফিরে রেখে আসব?"

"তোমার সঙ্গে নয়, কপিঞ্জলের সঙ্গে আমি ফিরে যেতে চাই।"

গন্ধরাজ কঞ্চুকীকে ডাকলেন।

"প্রধান মন্ত্রী কপিঞ্জল যদি প্রাসাদে থাকেন, বল মহারাণী তাঁকে ডাকছেন।"

কঞ্চুকী চলে গেলেন।

"তোমাকে খুশী করতে আর কিছু করতে পারি কি সুরূপিণী?"

"না, আর কিছুর দরকার নেই। আমার খুশির ভরা উপচে উঠেছে।"

"এইবার"—গন্ধরাজ বলতে লাগলেন—"সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে দিলাম তোমাকে। আমাকে বিয়ে করে বড়ই দুঃখ পেয়েছ তুমি।"

"দুঃখ!"—এই একটি কথা কেবল উচ্চারণ করলেন সুরূপিণী।

"অনেকে এই দুঃখের ভার লঘু করতে চেষ্টা করেছে, আমি আরও হালকা করে দিলুম। হ্যাঁ, আর একটা কথা, আমার পিতৃপুরুষের নামটা এখনও তোমার নামের সঙ্গে জুড়ে রইল। ও নামের যেন কোনও অমর্যাদা না হয় এইটি শুধু দেখো!"

"কপিঞ্জল আসতে বড়ই দেরি করছেন তো"—সুরূপিণী এর জবাবে এই শুধু বললেন।

"সুরূপিণী, সুরূপিণী"—আর কিছু বলতে পারলেন না গন্ধরাজ।

সুরূপিণী একটা জানলার কাছে এগিয়ে গিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে রইলেন। একটু পরেই কঞ্চুকী খবর দিলেন কপিঞ্জল এসেছেন। কপিঞ্জল যখন ভিতরে প্রবেশ করলেন তখন তাঁর চোখ কপালে উঠেছে, মুখ বিবর্ণ। আকস্মিক অপ্রত্যাশিত এই আহ্বানে তিনি যেন ঈষৎ দিশাহারা হয়ে পড়েছেন মনে হল। সুরূপিণী ঘুরে দাঁড়ালেন জানলা থেকে। তাঁর চোখে মুখে হাসি চিকমিক করছে। গাল আর কানের পাশ দুটো লাল হয়ে ছিল তখনও, এ ছাড়া তাঁর অন্তর্দ্বন্দ্বের আর কোন চিহ্ন বোঝা যাচ্ছিল না। গন্ধরাজকেও ঈষৎ বিবর্ণ দেখাচ্ছিল কেবল, কিন্তু তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত হননি।

''মন্ত্রীমশায়''—গম্ভীর ভাবে বললেন তিনি—''একটু কষ্ট দিলাম আপনাকে। আপনি মহারাণীকে তাঁর কক্ষে পৌঁছে দিয়ে আসুন।''

হাত বাড়িয়ে দিলেন কপিঞ্জল, যদিও তখনও তিনি অকূল পাথারে হাবুডুবু খাচ্ছিলেন মনে মনে। সুরূপিণী হাসিমুখে তাঁর হাত ধরলেন এবং পাশাপাশি যেন পাল তুলে বেরিয়ে গেলেন ছবিঘরের ভিতর দিয়ে।

তাঁরা চলে যাওয়ামাত্রই গন্ধরাজ বুঝতে পারলেন ব্যর্থ হয়ে গেল সব, হেরে গেলেন তিনি। তিনি যা করবেন ভেবে এসেছিলেন ঠিক তার উল্টোটা হয়ে গেল। বিমূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে রইলেন। এই চরম নিদারুণ পরিণতিটার মধ্যে হাসির উপাদান আছে, হঠাৎ এটা বুঝতে পেরে হো হো করে হেসেও উঠলেন, যদিও রাগে তাঁর বুক পুড়ে যাচ্ছিল। তারপরই দুঃখ হল খুব, তীক্ষ্ণ মর্মন্তুদ দুঃখ। কিন্তু দুঃখও বেশীক্ষণ রইল না। সব কথা মনে পড়ল যখন তখন রাগ হল আবার, ভয়ঙ্কর রাগ। মন-স্থির করতে পারছিলেন না তিনি। নিজের মতিভ্রম আর নপুংসকতার গ্লানি হঠাৎ যেন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল আগুনের মতো। অস্থির হয়ে উঠলেন। নিজের প্রতিই করুণা হতে লাগল।

বাঘের মতো পরিক্রমণ করতে লাগলেন তিনি ঘরের মধ্যে। মনে হতে লাগল মুহূর্তের মধ্যে হয়তো ভয়ানক একটা কিছু করে বসবেন। পিস্তল যেমন হঠাৎ খুন করে পরমুহূর্তেই পদাহত হয়ে দূরে নিক্ষিপ্ত হয়, মনে হল তিনিও বুঝি করে ফেলবেন তেমনি কিছু একটা। লম্বা দালানটায় পায়চারিই করে যেতে লাগলেন তিনি, নানা অনুভূতির দ্বন্দ্বে বিপর্যস্ত হয়ে রুমালটা দুহাতে ছিঁড়তে ছিঁড়তে। সমস্ত চেতনাকে একাগ্র উদগ্র করে তিনি মনে মনে কিছু একটা আঁকড়ে ধরতে চাইছিলেন। পিস্তলে গুলি ভরাই ছিল। ঈর্ষার তাড়না যখন মনের কোমল বৃত্তিগুলোর উপর কশাঘাত করছিল, যখন সুরূপিণীর নানাভঙ্গীর বহ্নি-মূর্তি মানসচক্ষে ভেসে উঠছিল, তখন ভয়াবহ হয়ে উঠছিল তাঁর আর্ত মুখ-ভাব। ঈর্ষাকে তিনি আমলে আনতে চাইছিলেন না, কিন্তু দংশন করতে ছাড়ছিল না তা। এই মানসিক বিপর্যয়ের মধ্যেও তিনি ভাবতে পারছিলেন না যে সুরূপিণী সত্যিই দোষী। সুরূপিণী কলঙ্কিনী নয় এই বিশ্বাসকেই তিনি প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে থাকতে চাইছিলেন; কিন্তু সন্দেহ তবু উঁকি মারছিল, সম্ভাবনাকে তিনি অস্বীকার করতে পারছিলেন না, আর সেই জন্যেই ছটফট করে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, নানা দুঃখের বোঝার উপর এই সন্দেহের শাকের আঁটিটা দুর্বহ মনে হচ্ছিল তাঁর।

এমন সময় দুয়ারে টোকা পড়ল। কুঞ্চুকী এসে একটি ছোট চিঠি দিলে তাঁকে। চিঠিটা নিয়ে হাতের মুঠোর মধ্যে পিযে ফেললেন সেটাকে, পড়লেন না। যেমন পরিক্রমণ করছিলেন তেমনি করতে লাগলেন। উদ্দাম ঝড় তেমনি বইতে লাগল মনের মধ্যে। কিছুক্ষণ পরে তাঁর চৈতন্য হল চিঠিতে কি আছে সেটা পড়ে দেখা উচিত। পেন্সিলে লেখা একলাইন চিঠি ইন্দীবর ভারতী পাঠিয়েছেন—

রাজপরিষদের অধিবেশন গোপনে এবং অবিলম্বে আহূত হয়েছে।

ই. ভা.

নিয়মিত সময়ের পূর্বে এবং গোপনে পরিষদের অধিবেশন ডাকবার মানে? একটি মানেই প্রতিভাত হল গন্ধরাজের মনে। পাছে অধিবেশনে উপস্থিত হয়ে তিনি কিছু বাধা দেন সেই

ভয়ে এ কাজ করা হয়েছে। ভয়ে ঃ কথাটা বড় আরামদায়ক মনে হল। ইন্দীবর—তাঁর বন্ধু ইন্দীবর ভারতী—যে তাঁকে বরাবর খামখেয়ালী গ্রাম্য লোক বলে ভেবে এসেছে—সে-ও তাঁকে সময়ে খবরটা দিয়ে সতর্ক করে দিয়েছে ঃ মানে, ইন্দীবরও তাঁর কাছে কিছু প্রত্যাশা করছে। বেশ, তাকে হতাশ করবেন না গন্ধরাজ। রাহুগ্রস্ত চন্দ্র এবার রাহুমুক্ত হয়ে পূর্ণ মহিমায় আত্মপ্রকাশ করবে আকাশে। তিনি তাঁর পরিচারককে ডাকলেন। পোশাক-পরিচ্ছদ ঠিক করে নিলেন সাড়ম্বরে। গোঁফের ডগা পাকিয়ে আতর লাগালেন তাতে, ঠিক করে নিলেন অবিন্যস্ত কেশদাম, অলঙ্কৃত করলেন নিজেকে। তারপর মনোহর বেশে এগিয়ে গেলেন একাই পরিষদকক্ষের দিকে।

।। এগারো।।

ইন্দীবর ভারতী ঠিকই খবর দিয়েছিলেন। ভগীরথ শর্মাকে মুক্তিদান, মহাধ্যক্ষ কুজ্‌ঝটিকুমারের দুরু-দুরু-হৃদয়ের সভয় নিবেদন এবং পরিশেষে সুরূপিণীর সঙ্গে গন্ধরাজের সাক্ষাৎকার—এই সমস্ত বিবেচনা করে ষড়যন্ত্রকারীরা শেষে সাহস করে ভীরুর মতো গোপনে এবং অসময়ে রাজপরিষদের অধিবেশন আহ্বান করাই ঠিক করেছিলেন। একটু তাড়াহুড়ো করতে হয়েছিল অবশ্য, রাজপোশাক পরিহিত পরিচারকদের চিঠি নিয়ে ছুটোছুটি করতে হয়েছিল নানা দিকে । অবশেষে সাধারণ সময়ের এক ঘণ্টা পূর্বে পরিষদকক্ষে সদস্যরা এসে সমবেত হলেন।

সদস্যসংখ্যা খুব বেশী নয়। কপিঞ্জল সদস্যসংখ্যা অনেক কমিয়ে দিয়েছিলেন। যাঁরা রাজ্যের 'হাতিয়ার' তাঁরাই অধিষ্ঠিত ছিলেন সদস্যপদে। পাশের একটি টেবিলে তিনজন সম্পাদক বসে ছিলেন। সুরূপিণী ছিলেন সভানায়িকা। তাঁর ডাক দিকে ছিলেন কপিঞ্জল, বাঁ দিকে কুজ্‌ঝটিকুমার। আর একদিকে ছিলেন কোষাধ্যক্ষ শঙ্করদেব, গভীরা দেবীর স্বামী। তাঁর পাশে ছিলেন অঞ্জনা দেবীর স্বামী রঘু বর্মন। আর তাঁদের মধ্যে সকলের বিস্ময় উৎপাদন করে বসেছিলেন ইন্দীবর ভারতী। গন্ধরাজই তাঁকে সদস্যপদে মনোনীত করেছিলেন অনেক আগে। অন্য কোনও কারণে নয়, সদস্যের বেতন পেলে তাঁর জীবনটা আর একটু স্বচ্ছন্দ হবে এই জন্য। তিনি কখনও কোনও অধিবেশনে আসতেন না, তাই সদস্যপদ থেকে তাঁকে বরখাস্ত করবার কথা কপিঞ্জলের মনেই হয়নি। অপ্রত্যাশিত ভাবে তাঁকে এই অধিবেশনে উপস্থিত দেখে সবাই যেন বিব্রত বোধ করছিলেন একটু। কপিঞ্জল ভ্রূকুটিকুটিল মুখে চেয়েছিলেন তাঁর দিকে। তাঁর পাশে রঘু বর্মন বসে ছিলেন, কপিঞ্জলের চোখের দৃষ্টি দেখে তিনি ইন্দীবরের কাছ থেকে সরে বসলেন একটু। তাঁর মনে হল যার উপর কপিঞ্জল প্রসন্ন নন তাঁর কাছে বসাটা নিরাপদ নয় ঠিক।

''মহারাণী''—কপিঞ্জল বললেন—''দেরি হয়ে যাচ্ছে, এবার আমরা কাজ আরম্ভ করব কি?''

''হ্যাঁ অবিলম্বে।''

''মহারাণী, একটু বাধা দিচ্ছি, ক্ষমা করবেন''—ইন্দীবর বললেন—''আপনারা হয়তো জানেন না মহারাজা রাজধানীতে ফিরে এসেছেন।''

''জানি, কিন্তু তিনি অধিবেশনে আসবেন না''—তাঁর কানের পাশটা লাল হয়ে উঠল একটু—''মহাধ্যক্ষ মশাই আমাদের প্রস্তাবগুলো এবার পড়া হোক একে একে। ভৈরঙ্গীর সম্বন্ধে একটা প্রস্তাব আছে না?''

একজন সম্পাদক একটা কাগজ এগিয়ে দিলেন।

''হ্যাঁ, এই যে সেই প্রস্তাব। পড়ব কি?''

''পড়বার দরকার নেই। ওতে কি আছে আমরা জানি। মহারাণীর সমর্থন আছে তো?''

''নিশ্চয়ই''

''তাহলে ওটা 'পঠিত' বলে ধরে নেওয়া হোক। মহারাণী কি স্বাক্ষর করবেন?''

মহারাণী স্বাক্ষর করলেন। কপিঞ্জল, রঘু বর্মন, শঙ্করদেব তার পর স্বাক্ষর করলেন একে একে। তারপর কাগজটা ইন্দীবরের দিকে বাড়িয়ে দিলেন তাঁরা। ইন্দীবর সই না করে ধীরে সুস্থে পড়তে শুরু করে দিলেন প্রস্তাবটা।

''আমাদের সময় বড় কম, ভারতী মশায়,''—অসভ্যের মতো বলে উঠলেন কপিঞ্জল—''যে প্রস্তাবে স্বয়ং মহারাণীর সমর্থন আছে তাতে স্বাক্ষর করতে যদি আপনার আপত্তি থাকে, তাহলে কাগজটা পাশের লোককে দিন। কিংবা যদি ইচ্ছা করেন আপনি সভাকক্ষ থেকে চলে যেতেও পারেন।''

''মাপ করবেন, আপনার অনুরোধ রক্ষা করতে পারলাম না, মন্ত্রী মশায়। আমি আবার বলছি আমাদের মহারাজা এখনও পরিষদে আসেননি''—এই বলে আবার তিনি শান্তভাবে পড়তে শুরু করলেন। বাকী সকলে রাগে গরগর করতে করতে পরস্পরের মুখের দিকে চাইতে লাগলেন ব্যর্থ আক্রোশে। পড়া শেষ করে অবশেষে তিনি বললেন, ''মহারাণী এবং সদস্যগণ, এ প্রস্তাবটি তো যুদ্ধঘোষণা ছাড়া আর কিছু নয় দেখছি।''

''আর কিছু নয়!''—সুরূপিণীর চোখের দৃষ্টিতে আগুন জ্বলে উঠল।

''গর্জনগাঁওয়ের মহারাজা এখন এখানে আছেন। আমি চাই—হ্যাঁ, জোর দিয়েই বলছি—আমি চাই যে তাঁকে খবর দিয়ে এখানে ডেকে আনা হোক। কেন বলছি তা নিয়ে বাগবিস্তার করা আমি নিরর্থক মনে করি। আশা করি এই বদ মতলবের জন্য—যা বিশ্বাসঘাতকতারই নামান্তর—আপনারা সবাই মনে মনে লজ্জিত।''

সমুদ্রের মতো উত্তাল হয়ে উঠল পরিষদ। নানা রকম চীৎকার উঠল। কপিঞ্জল সগর্জনে বলে উঠলেন—''আপনি মহারাণীকে অপমান করছেন।''

এর কোন জবাব না দিয়ে ইন্দীবর শান্ত কণ্ঠে কেবল বললেন—''আমার প্রতিবাদ থেকে এক চুলও আমি নড়ব না।''

কলরব যখন তুমুল হয়ে উঠেছে তখন সভাকক্ষের কপাটটা খুলে গেল। প্রতিহারী ঘোষণা করল—''মহারাজ এসেছেন।'' মৃদু হাসতে হাসতে খুব সহজ স্বচ্ছন্দ চালে প্রবেশ করলেন গন্ধরাজ। ফুটন্ত ডালের হাঁড়িতে যেন তেল পড়ল। মুহূর্তের মধ্যে প্রত্যেকেই বসে পড়লেন নিজের নিজের জায়গায়। কুজ্ঝটিকুমার ভান করলেন যেন তিনি কাগজপত্র নিয়েই মগ্ন ছিলেন, গম্ভীরভাবে কাগজপত্রই ওলটাতে লাগলেন। এই কপটতায় কিন্তু একটা জিনিস বিস্মৃত হলেন সকলে। মহারাজকে দেখে উঠে দাঁড়ালেন না কেউ।

''সভাসদগণ''—থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন গন্ধরাজই।

সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন সদস্যরা। আচরণের এই গাফিলতিতে সবাই আরও যেন ঘাবড়ে গেলেন, বিশেষ করে যাঁরা দুর্বলচিত্ত, তাঁরা।

গন্ধরাজ ধীরে ধীরে এগিয়ে এলেন টেবিলের দিকে। তারপর আবার থামলেন একটু। কুজ্ঝটিকুমারের দিকে চেয়ে বললেন—"অধিবেশনের সময় যে আপনারা বদলেছেন তা আমাকে জানানো হয়নি কেন?"

"মহারাজ..." মহাধ্যক্ষ বললেন, "মহামান্যা মহারাণী..."

আর কিছু বলতে পারলেন না তিনি, থেমে গেলেন আমতা আমতা করে।

সুরূপিণী বললেন—"আমার ধারণা ছিল তুমি পরিষদের অধিবেশনে যোগ দেবে না।"

এক মুহূর্তের জন্য চারিচক্ষুর মিলন হল, সুরূপিণীর চক্ষু নত হল পরমুহূর্তেই। এই মিথ্যাচারের আহূতিতে তাঁর অন্তর্নিরুদ্ধ ক্রোধবহ্নি আরও যেন জ্বলে উঠল।

"এবার আপনারা বসুন সবাই"—গন্ধরাজ নিজের আসনে উপবেশন করলেন।

"আমি অনেকদিন এখানে ছিলাম না। অনেক কাজ নিশ্চয় জমে গেছে। কিন্তু কাজে হাত দেবার আগে কোষাধ্যক্ষ শঙ্করদেবকে অনুরোধ করছি তিনি অবিলম্বে আমাকে রাজকোষ থেকে দশ হাজার টাকা এনে দিন আগে। আমার নামে খরচ লিখে রাখুন এটা—"

শঙ্করদেব সবিস্ময়ে চেয়ে রইলেন।

"দশ হাজার টাকা!"—সুরূপিণী প্রশ্ন করলেন—"কিসের জন্য?"

হেসে উত্তর দিলেন গন্ধরাজ—"আমার নিজেরই দরকার আছে।"

কপিঞ্জল টেবিলের নীচে পা চালিয়ে খোঁচা দিলেন শঙ্করদেবকে। শঙ্করদেব তো তাঁর হাতের পুতুলমাত্র। তিনি শুরু করলেন—"মহারাজ যদি জানান যে কি বাবদ টাকাটা খরচ হবে—"

"মহারাজের জবাবদিহি তলব করবার অধিকার কে দিলে আপনাকে!" সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন গন্ধরাজ।

শঙ্করদেব অসহায় ভাবে চাইলেন প্রভু কপিঞ্জলের দিকে। তিনিও সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে গেলেন তাঁর সাহায্যে। মধুর কণ্ঠে প্রতিটি কথা ওজন করে করে বললেন—"শঙ্করদেবের আচরণে মহারাজের আশ্চর্য হওয়ার সঙ্গত কারণ নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু আমি জানি আপনার সম্মান ক্ষুণ্ণ করবার কল্পনাও উনি করতে পারেন না। কিন্তু ওঁর উচিত ছিল গোড়াতেই ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলা আপনাকে। বর্তমানে আমাদের রাজকোষ অর্থশূন্য, যা অর্থ ছিল তা নিঃশেষ হয়ে গেছে, মানে সেটা অন্য একটা দরকারী ব্যাপারে আটকে পড়েছে। সেটা কি তা আপনাকে বলছি। আশা করি এক মাসের মধ্যে নিঃসন্দেহে আমরা মহারাজের আদেশ পালন করতে পারব। কিন্তু এখন, এই মুহূর্তে, ওই সামান্য দশ হাজার টাকাও দিতে আমাদের রাজকোষ অক্ষম। মহারাজকে হতাশ করতে হল বলে আমরা আন্তরিক দুঃখিত। আপনার আদেশ পালন করতে আমাদের আগ্রহের অভাব নেই, কিন্তু বর্তমানে আমাদের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ।"

"কোষাধ্যক্ষ মশাই, রাজকোষে এখন কত অর্থ আছে?"— ভ্রূকুঞ্চিত করে প্রশ্ন করলেন গন্ধরাজ।

"মহারাজ"—প্রতিবাদের ভঙ্গীতে উত্তর দিলেন শঙ্করদেব—"রাজকোষের প্রতিটি কপর্দক এখন নিতান্ত প্রয়োজন আমাদের—"

"আপনি আমার প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে যাচ্ছেন, শঙ্করদেব"—বিদ্যুতের দীপ্তি চমকে উঠল গন্ধরাজের দৃষ্টিতে। পাশের টেবিলের দিকে চেয়ে বললেন, "সম্পাদক মশাই, রাজকোষের হিসাবের খাতাটা আমাকে দিন তো।"

শঙ্করদেব বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিলেন ঃ কুজ্ঝটিকুমার ভাবছিলেন এইবার তাঁর পালা। মনে মনে ভগবানকে ডাকছিলেন তিনি। কপিঞ্জল মার্জারের মতো ওত পেতে লক্ষ্য করে যাচ্ছিলেন সব। ইন্দীবর একটু অবাক হয়ে চেয়েছিলেন গন্ধরাজের দিকে। গন্ধরাজের পৌরুষের প্রমাণ পেয়ে মনে মনে খুব খুশী হয়েছিলেন তিনি, কিন্তু বুঝতে পারছিলেন না এই সঙীন গুরুতর পরিস্থিতিতে টাকা-কড়ি নিয়ে কথাবার্তার অর্থ কি? নিজের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে এভাবে শক্তির অপব্যয় করা কি ঠিক হচ্ছে?

গন্ধরাজ হিসাবের খাতাটা দেখছিলেন।

বললেন, "দেখছি রাজকোষে এখন এক লক্ষ টাকা রয়েছে—"

"হ্যাঁ, ঠিক তাই"—কপিঞ্জল বললেন—"কিন্তু বাজারে এখন আমাদের যা দেনা আছে, যদিও সৌভাগ্যক্রমে সবটা নগদ দেনা নয়, তা এই এক লাখ টাকায় শোধ হবে না। সেইজন্যে রাজকোষ থেকে এখন একটি কপর্দকও অন্য বাবদে খরচ করা চলবে না। করলে ঘোরতর অপরাধ হবে সেটা। যদিও খাতায় এক লাখ টাকা দেখছেন, আসলে কিন্তু রাজকোষ শূন্য। যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম কেনবার জন্যে আমাদের একটা প্রস্তাবও উত্থাপিত হবে আজ—"

"যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম?" বিস্ময়ের চমৎকার অভিনয় করে বলে উঠলেন গন্ধরাজ—"যতদূর মনে পড়ছে গত মাঘ মাসে আমরা কিছু যুদ্ধের সরঞ্জাম কিনেছিলাম।"

"আরও কেনবার প্রয়োজন ঘটেছে। আমরা সম্পূর্ণ একটা গোলন্দাজবাহিনী সজ্জিত করেছি; পাঁচশ বন্দুক কেনা হয়েছে, কিছু কামানও, তাছাড়া মালবাহী অশ্বতরও সাতশো কিনতে হয়েছে। এর বিস্তারিত বিবরণ প্রস্তাবে লেখা আছে। ধূর্জটিপ্রসাদ অনুগ্রহ করে প্রস্তাবটা দিন তো—"

ধূর্জটিপ্রসাদ আর একজন সম্পাদক। তিনি তাড়াতাড়ি প্রস্তাব-পত্রটা বাড়িয়ে ধরলেন।

"ব্যাপার শুনে মনে হচ্ছে আমরা যেন যুদ্ধযাত্রা করছি।"

"হ্যাঁ, করছিই তো"—সুরূপিণী বললেন।

"যুদ্ধ!"—উত্তেজিত বিস্মিত কণ্ঠে বললেন গন্ধরাজ—"কার সঙ্গে যুদ্ধ? গর্জনগাঁওয়ের শান্তি তো বহু শতাব্দী ধরে অটুট আছে। কে আমাদের আক্রমণ করেছে, কে আমাদের অপমান করতে সাহস করলে?"

ইন্দীবর বললেন, "মহারাজ, এই দেখুন যুদ্ধঘোষণার চরমপত্র। এই চরমপত্রে যখন সকলের স্বাক্ষর সংগ্রহ করা হচ্ছিল, তখনই সৌভাগ্যক্রমে আপনি এসে পড়লেন।"

গন্ধরাজ কাগজটা তাঁর সামনে টেবিলে রাখলেন। এবং আঙুল দিয়ে টেবিলে বাজনা বাজাতে বাজাতে পড়তে লাগলেন সেটা।

"আমাকে কিছু না জানিয়েই কি আপনারা এই চরমপত্রটা পাঠাবেন ঠিক করেছিলেন?"

রঘু বর্মন ব্যাপারটাকে ঈষৎ লঘু করবার প্রয়াস পেলেন।

"শ্রীযুক্ত ইন্দীবর ভারতী এর প্রতিবাদ করেছেন। সই করেননি তিনি।"

"এ বিষয়ে যা কিছু চিঠিপত্র লেখালেখি হয়েছে সব আমাকে দিন।"

সম্পাদক মশাই সব তাঁকে দিয়ে দিলেন। তিনি তখনই নিবিষ্টচিত্তে আগাগোড়া পড়তে শুরু করে দিলেন। ধৈর্যসহকারে অনেকক্ষণ পড়লেন। সদস্যরা বোকার মতো বসে মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগলেন কেবল। যে সম্পাদক তিনটি পাশের টেবিলে ছিলেন, মনে হল তাঁদের একটু স্ফূর্তি হয়েছে। রাজপরিষদে এ ধরনের গণ্ডগোল বিরল, কিন্তু যখন হয় তখন বেশ লাগে তাঁদের।

পড়া শেষ হলে গন্ধরাজ বললেন, "পড়ে বড়ই দুঃখ পেলাম। ভৈরঙ্গীর 'উর্বরা' জনপদের উপর আপনারা যে দাবি জানিয়েছেন তা ভিত্তিহীন এবং অন্যায়। ন্যায়ের বিন্দুমাত্র সমর্থন নেই ওতে। এমন কি বৈঠকখানায় বসে ও নিয়ে ঘোঁট করবার মতোও মালমসলা নেই ওতে। আর এই নিয়ে আপনারা যুদ্ধঘোষণা করতে চাইছেন? আশ্চর্য কাণ্ড!"

"ঠিকই বলেছেন মহারাজ"—কপিঞ্জল উত্তর দিলেন সঙ্গে সঙ্গে—অন্যায়কে ন্যায় বলে প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা যে হাস্যকর তা বোঝবার মতো বুদ্ধি তাঁর আছে। বললেন, "ঠিকই বলেছেন মহারাজ। 'উর্বরা'র উপর আমাদের দাবিটা ছুতো মাত্র ভান শুধু—"

"ও, তাই না কি! মহাধ্যক্ষ মশাই, আপনি কলমটা নিন, যা বলছি তা লিখুন। রাজপরিষদ"—তিনি বলতে শুরু করলেন, তারপর হঠাৎ থেমে সদস্যদের দিকে চেয়ে বললেন—"আমি যে মাঝে পড়ে সব থামিয়ে দিলাম সে কথাটা অবশ্য আমি গোপনই রাখব"—তারপর সুরূপিণীকে সম্বোধন করে বললেন—"আমার অগোচরে তোমরা যে এতবড় একটা কাণ্ড লুকিয়ে করতে যাচ্ছিলে, সে সম্বন্ধেও আমি নীরব থাকব। আমি যে ঠিক সময়ে এসে পড়তে পেরেছি, এতেই আমি খুশী। হ্যাঁ লিখুন—রাজপরিষদ সমস্ত ব্যাপারটি পুনরায় পর্যালোচনা করিয়া এবং ভৈরঙ্গী হইতে প্রাপ্ত শেষ চিঠিটা পাঠ করিয়া সানন্দে ঘোষণা করিতেছে যে তাঁহাদের সহিত ভৈরঙ্গীর মহামান্য রাজপরিষদে অভিব্যক্ত মতের বিন্দুমাত্র অনৈক্য নাই। তাঁহাদের অভিমত এবং সৌজন্যকে আমরা শ্রদ্ধা সহকারে সানন্দে স্বীকার করিয়া লইলাম। লেখা হয়েছে? এইটেই একটু ভাল করে গুছিয়ে লিখে ভৈরঙ্গীতে পাঠিয়ে দিন।"

"মহারাজ, এ বিষয়ে আমার কিছু বক্তব্য আছে। যে সব চিঠিপত্র আপনি পড়লেন সে সবের নেপথ্যে যা আছে তা মহারাজ পুরোপুরি জানেন না। আপনি যদি এখন এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন তাহলে গুরুতর অনিষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা আছে। আপনার ওই চিঠি যদি পাঠানো হয় তাহলে ভৈরঙ্গীর সঙ্গে গর্জনগাঁওয়ের যে কূটনৈতিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে তা বানচাল হয়ে যাবে।"

"গর্জনগাঁওয়ের কূটনৈতিক সম্পর্ক! মন্ত্রীমশায়, আপনি মাত্রাবোধ হারিয়ে ফেলেছেন মনে হচ্ছে। শরবতের পেয়ালায় কেউ কি ছিপ ফেলে বা জাল ফেলে মাছ ধরবার চেষ্টা করে?"

"মহারাজ যদি কিছু মনে না করেন তাহলে একটা কথা আমাকে বলতে অনুমতি দিন। শরবতের পেয়ালায় বিষ থাকতে পারে এ কথাটা মনে রাখা উচিত। আমরা রাজ্য বাড়াবার জন্যেই যে এ যুদ্ধ করতে যাচ্ছি তা নয়, আমাদের গৌরব বাড়াবার জন্যেও নয়। মহারাজ

ঠিকই বলেছেন, ক্ষুদ্র গর্জনগাঁওয়ের পক্ষে ও সব দুরাকাঙ্ক্ষা শোভা পায় না। কিন্তু গর্জনগাঁওয়ের মধ্যে নানা রকম দল হয়েছে, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র এবং আরও নানারকম তন্ত্র মাথা চাড়া দিয়েছে, বড় দল ছোট দল নানা রকম দল গজিয়ে উঠেছে আপনার সিংহাসনের চারিপাশে।"

"সে কথা আমি শুনেছি, মন্ত্রীমশাই"—গন্ধরাজ বললেন—"কিন্তু আপনি যখন বলছেন তখন তার গুরুত্ব আছে এ কথা আমি অস্বীকার করব না।"

"আপনার একথা শুনে সম্মানিত হলাম মহারাজ"—কিছুমাত্র অপ্রস্তুত না হয়ে কপিঞ্জল বলে চললেন—"এই সব কথা ভেবেই আমরা আমাদের পররাষ্ট্রনীতি ঠিক করেছি। গর্জনগাঁওয়ের লোকেদের মনটা অন্য দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া নিতান্ত দরকার, বেকারদের কাজ পাওয়া অত্যন্ত দরকার। আপনার শাসনকে জনপ্রিয় করতে হলে এসব প্রয়োজন। আরও প্রয়োজন খাজনা কমিয়ে দেওয়া, একবারে যতটা বেশী সম্ভব কমিয়ে দেওয়া। এই যুদ্ধ— অবশ্য খুব বাড়িয়ে না বললে এটাকে যুদ্ধ বলা যায় না—এই যুদ্ধ কিন্তু এসব সমস্যার সমাধান করতে পারবে, রাজপরিষদের তাই মনে হয়েছিল। যুদ্ধের প্রস্তুতিই লোকের মনে একটা সাড়া জাগিয়েছে। এ যুদ্ধে আমাদের যদি জয় হয় তাহলে আমাদের আশা নিশ্চয়ই ফলবতী হবে এ বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই। আশার অতিরিক্তও হয়তো হবে।"

"আপনি অতি বিচক্ষণ ব্যক্তি, মন্ত্রীমশাই"—গন্ধরাজ বললেন—"আপনার কথা শুনে আমি মুগ্ধ হয়ে গেছি। এ যাবৎ আপনার সম্যক সমাদর আমি করিনি।"

একথা শুনে সুরূপিণীর চোখের দৃষ্টি উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি ভাবলেন বাজি মাৎ হয়ে গেছে। কপিঞ্জল কিন্তু অপেক্ষা করতে লাগলেন মনে মনে সশস্ত্র হয়ে। দুর্বল যখন বিদ্রোহ করে তখন সহজে তাকে নোয়ানো যায় না—এ জ্ঞান তাঁর ছিল।

গন্ধরাজ বললেন, "রাজ্যরক্ষার জন্য যে সৈন্যবাহিনীর তোড়জোড় আপনারা করেছিলেন আর যাতে আমাকে বুঝিয়ে সুজিয়ে আপনারা মত করিয়েও নিয়েছিলেন—তার গোপনে গোপনে এই উদ্দেশ্য ছিল না কি!"

"আমার বিশ্বাস তাতে সুফলই ফলেছে"—উত্তর দিলেন কপিঞ্জল—"কুচকাওয়াজ করা, ঘোড়ায় চড়ে পাহারা দেওয়া—এইসব জিনিস জনসাধারণকে ভুলিয়ে রাখে বই কি। কিন্তু একটা কথা আমি স্বীকার করব যখন রাজ্যরক্ষা সৈন্যবাহিনীর ব্যবস্থা হল, তখন কিন্তু আমি ভাবতে পারিনি যে রাজ্যের বিদ্রোহী দল এতদূর এগিয়ে গেছে। আর এ-ও আমাদের ধারণা ছিল না যে এই রাজ্যরক্ষা বাহিনীর সঙ্গে গণতান্ত্রিক দলের বেশ ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে।"

"আছে না কি?"—গন্ধরাজ প্রশ্ন করলেন—"আশ্চর্য! এ কথা কেন মনে হচ্ছে আপনার।"

"মনে হচ্ছে, কারণ নেতারা ঠিক করেছিলেন যে রাজ্যরক্ষা বাহিনীর সৈন্যরা জনসাধারণের মধ্যে থেকে নির্বাচিত হবেন। সুতরাং যদি সিংহাসনের বিরুদ্ধে জনসাধারণ বিদ্রোহ করে তাহলে এই সৈন্যবাহিনীর উপর আস্থা রাখা যাবে না। ওরা হয়তো বিশ্বাসঘাতকতা করবে।"

"ও"—গন্ধরাজ বললেন—"এইবার বুঝতে পারছি।"

"মহারাজ তাহলে বুঝতে পেরেছেন?"—বিনয়ে বিগলিত হয়ে কপিঞ্জল বললেন—"কি বুঝেছেন তা কি খুলে বলবেন মহারাজ।"

"বিদ্রোহের ইতিহাস"—গন্ধরাজ নীরস কণ্ঠে উত্তর দিলেন, তারপর বললেন—"যাক্ আপনি এসব থেকে কি সিদ্ধান্তে এসেছেন?"

"আমার সিদ্ধান্ত মহারাজ মোটেই জটিল নয়"—কপিঞ্জল খোঁচাটা হজম করে অকম্পিত কণ্ঠে বললেন—"যুদ্ধ জনপ্রিয়, লোকে যুদ্ধ চায়। কাল যদি যুদ্ধের গুজবটার প্রতিবাদ হয় অনেকেই হতাশ হবে, আর এখন চারিদিকে যে রকম উত্তেজনা সামান্য ফুলকি পড়লেই দাবানল জ্বলে উঠবে দাউ দাউ করে চতুর্দিকে। বিপদ ওইখানেই। বিদ্রোহ তো আসন্ন, আমরা একটা আগ্নেয়গিরির শিখরে বসে আছি, যে কোনও মুহূর্তে বিস্ফোরণ হতে পারে।"

"তাই যদি হয় তাহলে এখন আমাদের একত্রিত হয়ে সম্মানজনকভাবে বাঁচবার উপায় চিন্তা করতে হবে।"

ইন্দীবর ভারতী যখন যুদ্ধ-প্রস্তাবের বিরোধিতা করলেন তখন থেকে সুরূপিণী মাত্র গুটি কয়েক কথা বলেছিলেন। আরক্তবদনে আনমিত নয়নে, মেঝের উপর মাঝে মাঝে অধীর ভাবে পা ঠুকে আত্মসংবরণ করে বীরের মতো নীরবে বসেছিলেন তিনি। কিন্তু গন্ধরাজের এই কথায় তিনি আত্মসংযম হারিয়ে ফেললেন।

"উপায়!—তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলে উঠলেন তিনি—"তোমার বোঝবার অনেক আগেই তা আবিষ্কৃত হয়েছে। কাগজ তো তোমার সামনেই পড়ে রয়েছে। অবিলম্বে সই করে দাও, অযথা দেরি কোরো না।"

"মহারাণী" স্নিগ্ধ কিন্তু স্পষ্ট কণ্ঠে গন্ধরাজ বললেন—"আমি শুধু 'উপায়' বলিনি। সম্মানজনক উপায় বলেছি। আমার মতে এবং প্রধান মন্ত্রীর বিবরণ অনুসারে এক্ষেত্রে যুদ্ধ মোটেই বাঞ্ছনীয় সদুপায় নয়। আমরা যদি গর্জনগাঁওয়ের প্রজাদের সুশাসন করতে অসমর্থ হয়ে থাকি সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি ভৈরঙ্গীর লোকের রক্তপাত করে করতে হবে? না সুরূপিণী, আমার দেহে যতক্ষণ প্রাণ আছে তা হতে আমি দেব না। কিন্তু যে সব কথা আজ আমি প্রথম শুনলাম—কেন আজই প্রথম শুনলাম তার জবাবদিহি আমি চাইছি না কারো কাছে—কিন্তু যা শুনলাম তা আমার কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ—এ সমস্যার সমাধান আমাকে করতেই হবে যেমন করে হোক।"

"কিন্তু যদি না পার?"

"না পারলে তার ফল আমি নিজেই ভোগ করব। বিদ্রোহের অঙ্কুর দেখা দিলেই আমি সমস্ত প্রজাদের আমন্ত্রণ করে বলব, তোমরা যদি বল আমি এখনই সিংহাসন ত্যাগ করছি।"

রোষভরে হেসে উঠলেন সুরূপিণী—"এই লোকের জন্যে আমরা খেটে মরছি! রাজ্যে কি পরিবর্তন এসেছে তা আমরা বললাম, উনি বললেন আমি উপায় উদ্ভাবন করব। উপায়টা কি? সিংহাসনত্যাগ! যারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে তোমার রাজ্য চালাচ্ছে শেষ মুহূর্তে এসে তাদের সব কাজ পণ্ড করে দিতে তোমার লজ্জা করে না? তুমি এতদিন কি করেছ তা কি তোমার মনে নেই? আমি একা এখানে থেকে তোমার মানমর্যাদা রক্ষা করবার চেষ্টা করেছি, ভালো ভালো বিজ্ঞ লোকেদের পরামর্শ নিয়েছি, তুমি তো কেবল শিকার করে ফূর্তিতে দিন কাটিয়েছ। অনেক ভেবেচিন্তে, অনেক দূরদর্শিতা সহকারে আমি এতদিন ধরে যে উপায় ঠিক করে রেখেছি, তুমি হঠাৎ একদিন সকালে এসে তা সব পণ্ড করে দিয়ে বাহাদুরি দেখাচ্ছ"—হঠাৎ সুরূপিণীর বাক্‌রোধ হয়ে গেল ক্ষণকালের জন্য। সামলে নিয়ে আবার তিনি শুরু করলেন—"সব তছনচ করে দিয়ে আবার তো তুমি তোমার খেয়াল-খুশির স্রোতে গা ভাসিয়ে

দেবে। আবার আমরা যখন খেটেখুটে ভেবেচিন্তে সব ঠিকঠাক করব, তখন ফের তুমি হঠাৎ এসে সব উলটে-পালটে দেবে। যা করবার তোমার বুদ্ধি নেই, যা জানবার জন্যে তুমি কোনও চেষ্টা কখনও করনি তা ভেঙেচুরে দিতে এতটুকু সঙ্কোচ হয় না তোমার! এ আর সহ্য করা যায় না। আশ্চর্য, তোমার কি এতটুকু হ্রস্ব-দীর্ঘ জ্ঞান নেই? যে সিংহাসনে বসবার তোমার একটুও যোগ্যতা নেই সেই সিংহাসনের সুযোগে তুমি যা-খুশি করবে? সিংহাসনে বসে অমন সদম্ভে আদেশ জারি করতে তোমার লজ্জা করে না? তোমার জানা উচিত তোমার প্রতি শ্রদ্ধাবশত কেউ তোমার আদেশ পালন করে না। কি তুমি? এই রাজপরিষদে সত্যিই কি তোমার কোনও মর্যাদার আসন আছে। এখানে এসেছ কেন! তোমার ইয়ারবকসিদের কাছে ফিরে যাও না তুমি। তুমি যে কত বড় মহারাজা তা আর কারও জানতে বাকি নেই, রাস্তার লোকেরা পর্যন্ত তা নিয়ে হাসাহাসি করছে—"

এই ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণে ভীত চকিত হয়ে গেলেন সকলে।

কপিঞ্জল সন্তর্পণে মৃদু কণ্ঠে বললেন—"মহারাণী আত্মসংবরণ করুন।"

"যা বলবার আমাকেই বলুন আপনি। মহারাণীর কানের কাছে ওসব ফুসফুস গুজগুজ আমি সহ্য করব না"—ধমকে উঠলেন গন্ধরাজ।

সুরূপিণী কান্নায় ভেঙে পড়লেন।

"মহারাজ"—কপিঞ্জল উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—"মহারাণীর—"

"আপনি যদি আর এ বিষয়ে একটি কথা উচ্চারণ করেন আপনাকে আমি বন্দী করব কপিঞ্জলদেব—"

"মহারাজই সর্বেসর্বা —"

অভিবাদন করে সরে দাঁড়ালেন কপিঞ্জল।

"এ কথাটা সর্বদাই মনে রাখবেন। মহাধ্যক্ষ মশাই, আপনি সব কাগজপত্র নিয়ে আমার ঘরে আসুন। আর আপনারা এখন যেতে পারেন, রাজপরিষদ আমি ভেঙে দিলাম।"

নমস্কার করে গন্ধরাজ ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। তাঁর পিছু পিছু গেলেন কুজ্ঝটিকুমার আর সম্পাদক তিনজন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মহারাণীর সহচরীবৃন্দ এসে ঘরে ঢুকলেন মহারাণীকে সামলাবার জন্য।

।। বারো।।

আধঘণ্টা পরে কপিঞ্জল পুনরায় দেখা করলেন সুরূপিণীর সঙ্গে।

"মহারাজ এখন কোথা"—প্রশ্ন করলেন সুরূপিণী।

"তিনি মহাধ্যক্ষের সঙ্গে রয়েছেন। আর তাজ্জব ব্যাপার, সত্যিই কাজ করছেন তিনি—"

"আমাকে যন্ত্রণা দেওয়াই ওঁর একমাত্র কাজ। উঃ কি পতন! কি লজ্জা! এমন তুচ্ছ কারণে আমাদের অত বড় পরিকল্পনাটা নষ্ট হয়ে গেল! এখন তো আর উপায় নেই।"

"উপায় আছে মহারাণী। হতাশ হবেন না। বরং এই ঘটনার পর আর একটা পথ আমরা দেখতে পেয়েছি। আপনি আত্মস্থ হয়েছেন, মহারাজের স্বরূপ স্পষ্টভাবে দেখতে পেয়েছেন এবার। আপনার অতি-কোমল হৃদয়ের যে দুর্বলতা পরদার মতো এতদিন সত্যকে আবৃত

করে ছিল সেটা সরে গেছে। রাজ্যের সব ব্যাপারেই এতদিন আপনি যে তীক্ষ্ণ বাস্তব-বুদ্ধির পরিচয় বরাবর দিয়ে এসেছেন এ ব্যাপারেও এবার আশা করি তার পরিচয় পাব আমরা। যতক্ষণ গর্জনগ্রামের মহারাজা হিসেবে তাঁর কর্তৃত্ব আস্ফালন করবার অধিকার ছিল ততক্ষণ সাম্রাজ্যের স্বপ্নটা স্বপ্নই ছিল আমার কাছে। অনেক ভেবেচিন্তেই আমি এ পরিকল্পনা করেছিলাম, এ রকম সংঘাত যে আসবে তা-ও আমি ভেবেছিলাম এবং তার জন্যে প্রস্তুতও আছি। আমি নির্ভর করে আছি দুটি সত্যের উপর ঃ আমি জানি আপনিই মহারাণী, আদেশ করবার জন্মগত অধিকার একমাত্র আপনারই, আর আমি আপনার সেবক, আদেশ পালন করবার জন্মগত অধিকার আমার। অদ্ভুত যোগাযোগ ঘটেছে একটা—সক্ষম হাতের সঙ্গে শাণিত হাতিয়ারেব আশ্চর্য সমন্বয় এটা! গোড়া থেকেই আমি জানতাম এবং এখনও আমি জানি যে উত্তরাধিকারের ছাপ-মারা কোনও বাজে রাজার সাধ্য নেই যে এই অদ্ভুত যোগাযোগকে বিচূর্ণ করে।"

"আপনি বলছেন, আদেশ করবার জন্মগত অধিকার আমার আছে! আমার চোখের জল কি দেখতে পাননি?"

"বীরাঙ্গনারাও মাঝে মাঝে চোখের জল ফেলে। আপনার চোখের জলে স্ফুলিঙ্গ দেখে শিউরে উঠেছি আমি। বুকটা কেঁপে উঠেছিল, আমার মতো লোকেরও আত্মবিস্মৃতি ঘটেছিল ক্ষণকালের জন্য। কিন্তু তার আগে যা ঘটেছিল. আপনি কি মনে করেন তা দেখেও কি আমি অভিভূত হইনি? আপনার ওই ওজস্বিনী ভর্ৎসনা, ওই আত্মসম্বৃত ভাষণ!—সত্যিই রাজকীয় মহিমায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিলেন আপনি।"

কয়েক মুহূর্ত চুপ করলেন তিনি।

তারপর শুরু করলেন আবার—"হ্যাঁ দেখবার মতো দৃশ্য হয়েছিল একটা। আপনাকে দেখে আমি যেন আনন্দের মদিরা পান করছিলাম। নকল করতে চেষ্টা করছিলাম আপনার ওই শান্ত সৌম্য ভাব ঃ অদ্ভুত প্রেরণা জাগছিল প্রাণে, যে কোনও লোকেরই জাগত ঃ যে কোনও বুদ্ধিমান লোকই আপনার যুক্তি সমর্থন করত। কিন্তু মহারাণী, যা অনিবার্য তাই ঘটেছে, এর জন্যে দুঃখও নেই। আসুন খোলাখুলি সব আলোচনা করি এবার, আমাকে অন্তত অকপটভাবে সব বলবার অনুমতি দিন। জীবনে দুটি জিনিসকে আমি ভালোবেসেছি—গর্জনগাঁওকে আর তার অধিশ্বরীকে"—এই বলে তিনি সুরূপিণীর হস্ত চুম্বন করলেন—"হয় আমাকে মন্ত্রীত্ব বর্জন করতে হবে—যে দেশকে আমি স্বদেশ বলে বরণ করেছি, যে মহারাণীকে সেবা করব বলে স্বপ্ন দেখেছি তা ত্যাগ করে চলে যেতে হবে—কিংবা—"

আবার থামলেন তিনি।

"হায় কপিঞ্জলদেব, এরপর আর তো 'কিংবা' নেই।"

"না, মহারাণী, সে কথা মানব না। আমাকে সময় দিন। আপনাকে প্রথম যখন আমি দেখেছিলাম তখন আপনার বয়স খুব কম ছিল। আপনার মধ্যে যে শক্তি প্রচ্ছন্ন আছে তা সকলের চোখে পড়ত না। কিন্তু মাত্র দুবার আপনার সঙ্গে আলাপ করবার সম্মান এবং সুযোগ পেয়ে আমি বুঝে নিলাম যে আমার সম্রাজ্ঞীকে আমি আবিষ্কার করেছি। আমারও কিছু প্রতিভা আছে উচ্চাকাঙ্ক্ষাও আছে। কিন্তু আমার প্রতিভাটা সেবকের প্রতিভা—আমার উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে রূপ দেবার জন্যে আমি এমন একজনকে খুঁজছিলাম যিনি শাসন করতে

পারেন, যিনি শক্তির উৎস। আমাদের দুজনের আশ্চর্য এই মিলনের এইটেই হল মূল কথা। আমরা একজন আর একজনের পক্ষে অপরিহার্য। প্রভু ভৃত্যকে চিনেছে যন্ত্রী চিনেছে যন্ত্রকে, আমাদের এ যোগাযোগ অদ্ভুত, আমরা দুজনে মিলে হয়েছি সম্পূর্ণ। লোকে বলে বিধির নির্বন্ধে বিবাহ হয়। কিন্তু এই যে বিশুদ্ধ বুদ্ধির মিলন—এই যে মানসিক অন্তরঙ্গতা যার জোরে আমরা সাম্রাজ্যের বনিয়াদ স্থাপন করব তাও কি তুচ্ছ করবার মতো? বিবাহ-বন্ধনের চেয়ে তা কি কম শিথিল? তাছাড়া আরও কথা আছে। আমাদের যখন পরিচয় হল তখনই আমরা চিনতে পেরেছিলাম পরস্পরকে, বুঝতে পেরেছিলাম আমরা দুজনেই বৃহত্তর আকাশে ওড়বার জন্যে প্রস্তুত, আমাদের আলাপে আলোচনায় আমাদের সে আকাঙ্ক্ষা মূর্ত হয়েছিল নানা বর্ণে নানা রূপে। দুটি বালক বালিকার মতো আমরা যেন এক সঙ্গে বেড়ে উঠেছিলাম—হ্যাঁ মহারাণী, মনের দিক থেকে বিচার করলে একথা একটুও অতিরঞ্জিত নয়। আপনার সঙ্গে যতদিন দেখা হয়নি ততদিন আমার জীবন অর্থহীন ছিল, অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াচ্ছিলাম খালি। আপনারও কি তাই ছিল না মহারাণী? কিন্তু আমাদের দেখা হওয়ার পর আপনার দৃষ্টির পরিধি অনেক বেড়ে গেছে। মানসচক্ষে এখন আপনি আশা-রঞ্জিত সেই সম্বর্ধনাও দেখতে পেয়েছেন যার দিকে ধীরে ধীরে এগুচ্ছি আমরা, যার জন্যে আমরা নিজেদের গড়েছি, নিজেদের প্রস্তুত করেছি।"

"ঠিক বলেছেন আপনি"—সুরূপিণী বললেন—"আমিও তা অনুভব করছি। কিন্তু আপনার প্রতিভাই এসব সম্ভব করেছে, মহত্ত্বে আপনার অন্তর্দৃষ্টি আচ্ছন্ন বলে সেটা বুঝতে পারছেন না। আমি কিই বা করেছি। আমি রাণী, সেই হিসেবে, সিংহাসনের সমর্থনটুকুই আমি আপনাকে দিতে পেরেছি, অকুণ্ঠভাবে দিয়েছি অবশ্য। আমি সানন্দে এবং সোৎসাহে আপনার সমস্ত চিন্তার অংশীদার হয়েছি। আপনি আমার উপর নির্ভর করতে পেরেছেন, নিশ্চিন্ত হতে পেরেছেন যে আমার দিক থেকে অন্যায় কিছু হবে না, কোন বাধাও আসবে না। বলুন, আবার বলুন আমি আপনাকে সত্যিই সাহায্য করতে পেরেছি। পেরেছি কি?"

"না, মহারাণী, শুধু সাহায্য নয়, আপনি আমাকে নির্মাণ করেছেন। আপনিই আমার প্রেরণা। আমরা যখন রাজ্যবিষয়ে পরিকল্পনা রচনা করেছিলাম, তখন আমি প্রতিপদে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম আপনার মননশীলতা দেখে, আপনার তীক্ষ্ণবুদ্ধির পরিচয় পেয়ে, আপনার সহিষ্ণুতা ও পরিশ্রম করবার ক্ষমতা দেখে—যা অনেক পুরুষের চরিত্রেও দুর্লভ। আমি আপনাকে তোষামোদ করছি না মহারাণী, আপনি জানেন আমি যা বলছি তা সত্য। আপনি একদিনও কি বিশ্রাম করেছেন? কোনও তুচ্ছ আমোদপ্রমোদে কি কালহরণ করেছেন? আপনি তরুণী, আপনি রূপসী, কিন্তু আপনার জীবন কেটেছে বুদ্ধির ক্ষেত্রে—হয় উচ্চতর বুদ্ধির চর্চায়, না হয় বিরক্তিকর বুদ্ধির দ্বন্দ্বে। এর পুরস্কার আপনি পাবেন। ভৈরঙ্গীর পতনের সঙ্গে সঙ্গে আপনার সাম্রাজ্যের সিংহাসন স্থাপিত হবে।"

"তার মানে? কি বলছেন আপনি"—প্রশ্ন করলেন সুরূপিণী—"সব কি শেষ হয়ে যায়নি?"

"না মহারাণী। আমরা দুজনে একই কথা ভাবছি।"

"কপিঞ্জলদেব, সত্যি আমি আর কিছু ভাবছি না। ভাবতে পারছি না। চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেছি আমি।"

"আপনি অভিমানে অভিভূত হয়েছেন মহারাণী। প্রকৃতি যাঁদের ভাবপ্রবণ কোমল হৃদয়

দেন তাঁরা অপমানে বা অবজ্ঞায় সহজে কাতর হয়ে পড়েন। আপনি তাই হয়েছেন। আপনি বুদ্ধির আলোকে ব্যাপারটা দেখুন এবং বলুন কি দেখছেন।"

"আমি তো সর্বনাশ ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।"

"আপনার মনে একটি কথা নিশ্চয়ই জ্বলজ্বল করে জ্বলছে—'সিংহাসনত্যাগ'।"

"ও! ভীতু কাপুরুষটা আমার কাঁধে সমস্ত ভার চাপিয়ে মজা করে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছিল আর যখন চরমক্ষণ এল তখন আমাকে পিছন থেকে ছোরা মেরে বসল। অপদার্থ! ওর মধ্যে কিছু নেই, ভদ্রতা, ভালোবাসা, সাহস কিচ্ছু নেই। অনায়াসে তার স্ত্রীকে, তার মর্যাদাকে, তার সিংহাসনকে, তার পিতৃপুরুষের সম্মানকে ভুলে গেল।"

"হ্যাঁ, 'সিংহাসনত্যাগ'—ওই কথাটার মধ্যেই আমি যেন আশার আলোক দেখতে পাচ্ছি একটু।"

"আপনি কি ভাবছেন তা বুঝতে পারছি। কিন্তু যা ভাবছেন তা বাতুলতা, নিছক বাতুলতা। আমি মোটেই জনপ্রিয় নই, সবাই আমাকে গালাগালি দেয়। আপনি তা জানেন। প্রজারা ওঁর দুর্বলতাকে হয়তো ক্ষমা করতে পারে, হয়তো ভালওবাসতে পারে, কিন্তু আমাকে কখনও নয়। আমাকে ঘৃণা করে সবাই।"

"জনসাধারণের কৃতজ্ঞতার ওই তো রূপ মহারাণী। কিন্তু আমরা বাজে কথা বলে সময় নষ্ট করছি। আমি যা ভাবছি তা পরিষ্কার করে এইবার বলি। যে লোক বিপদের সময় সিংহাসন ত্যাগের কথা ভাবে, আমার মতে, সে তো বিষধর জন্তু। আমার এ রূঢ়তা মাপ করবেন মহারাণী। এখন কথার লালিত্য নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় নয়। ভীরু যদি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকে তাহলে সে আগুনের চেয়েও ভয়ঙ্কর। আমরা আগ্নেয়গিরির উপর বসে আছি। গন্ধরাজ যদি নিজের মতলবে চলেন তাহলে এক সপ্তাহ যেতে না যেতে গর্জনগাঁও নিরীহ লোকের রক্তে ভেসে যাবে। আপনি জানেন আমি যা বলছি তা মিথ্যা নয়, এই নিদারুণ সম্ভাবনার কথা আমরা দুজনেই ভেবেছি। ওঁর কাছে এটা কিছুই নয়, উনি সিংহাসন ত্যাগ করে চলে যাবেন। হায় ভগবান, এই দুর্ভাগা দেশের ভার কি লোকের হাতেই দিয়েছ তুমি! এদেশের পুরুষের জীবন, নারীদের সম্ভ্রম ..."

মনে হল বলতে বলতে তাঁর বাকরোধ হয়ে গেল। কিন্তু পরমুহূর্তেই তিনি সামলে নিলেন নিজেকে।

"কিন্তু মহারাণী আপনি তো অমন দায়িত্বজ্ঞানহীন নন, আমিও আপনার সঙ্গে আছি। এই আসন্ন বিপদের মুখে আমি বলছি, এবং আপনিও নিশ্চয় তার সমর্থন করবেন—এই আসন্ন বিপদের মুখে আমরা নীরব দর্শকের মতো দাঁড়িয়ে থাকতে পারি না, আমরা অনেক দূর এগিয়ে গেছি, এখন থামা অসম্ভব। সম্মান এবং কর্তব্যের আহ্বানে, আমাদের নিজেদের জীবনের নিরাপত্তার জন্যও আমাদের এগিয়ে যেতে হবে।"

সুরূপিণী ভ্রূকুঞ্চিত করে চেয়ে রইলেন তাঁর দিকে। তারপর বললেন, "আমিও সেটা অনুভব করছি। কিন্তু তা হবে কি করে? ক্ষমতা তো ওর হাতে।"

"ক্ষমতা মহারাণী? ক্ষমতা সৈন্যদের হাতে" উত্তর দিলেন কপিঞ্জল এবং সুরূপিণী কোন কথা বলবার আগেই তাড়াতাড়ি বললেন—"আমাদের বাঁচতে হবে। আমাকে বাঁচাতে হবে আমার মহারাণীকে আর মহারাণীকে বাঁচাতে হবে তাঁর মন্ত্রীকে আর আমাদের সম্মিলিত চেষ্টায় বাঁচাতে হবে ওই বাতুল মহারাজাকে। বিদ্রোহ শুরু হলে উনিই হবেন প্রথম বলি।

আমি দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি জনতা তাঁর দেহটাকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ছে। গর্জনগাঁও, দুর্ভাগা গর্জনগাঁও—তার কি দশা হবে তারপর? না, মহারাণী, আপনাকে এগিয়ে আসতে হবে, আপনিই শক্তির প্রতীক, আপনার ক্ষমতা অসীম, সে ক্ষমতা আপনি ব্যবহার করুন। তা না হলে বিবেকের কাছে আপনাকে জবাবদিহি করতে হবে।"

"দেখিয়ে দিন কেমন করে কি করব! ধরুন ওঁকে যদি কোনও রকমে আটকাই বিদ্রোহীরা তো সঙ্গে সঙ্গে আমাদের আক্রমণ করবে।"

কপিঞ্জল ভান করলেন যেন এ কথাটা উনি ভাবেননি।

"হ্যাঁ, তা সত্যি। আপনি যত পরিষ্কারভাবে দেখতে পান, আমি ততটা পাই না। কিন্তু তবু উপায় নিশ্চয় একটা আছে, সেটা বার করতেই হবে।"

উত্তরের জন্য প্রতীক্ষা করে রইলেন তিনি।

"না, গোড়াতেই তো বলেছি, আর কোন উপায় নেই। আমাদের সব আশা-আকাঙ্ক্ষার শেষ হয়ে গেছে—শেষ করে দিয়েছে ওই হতভাগা খামখেয়ালী, চপল চঞ্চল যথেচ্ছাচারী লোকটা। কালই হয়তো সে আবার ফিরে যাবে তার চাষাড়ে হৈ-হল্লার মধ্যে—"

কপিঞ্জল দেখলেন ঝড়ের সময় যে কোনও বন্দরে আশ্রয় নেওয়াই সমীচীন। যেটা পাওয়া গেল সেটাও বা মন্দ কি!

"কি বোকা আমি, কথাটা এতক্ষণ আমার মনেই পড়েনি। মহারাণী, আপনার অজ্ঞাতসারেই আপনি সমস্যার সমাধান করে দিয়েছেন।"

"কি রকম? খুলে বলুন।"

নিজেকে একটু সামলে নিলেন কপিঞ্জল। তারপর একটু হেসে বললেন, "মহারাজাকে আর একবার শিকার করতে পাঠাতে হবে।"

"যায় তবে তো। গিয়ে যদি আর না ফেরে, সেখানেই যদি থেকে যায় তাহলে আরও ভালো হয়।"

"হ্যাঁ, থেকে গেলে খুব ভালো হয়।"

কপিঞ্জল এমনভাবে চিবিয়ে চিবিয়ে কথাগুলো বললেন যে সুরূপিণীর কানে বেসুরো ঠেকল তা। তাঁর মুখের চেহারা বদলে গেল হঠাৎ। কপিঞ্জল লক্ষ্য করলেন সেটা এবং তাড়াতাড়ি বললেন, "না, আশঙ্কার কিছু নেই। এবার উনি গাড়ি করে আমাদের বিদেশী রক্ষী পরিবৃত হয়ে শিকারে যাবেন। থাকবেন গিয়ে শূলপাণিতে। জায়গাটা স্বাস্থ্যকর, পাহাড়টাও বেশ উঁচু, শূলপাণির জানলাগুলো ছোট ছোট, লোহার গরাদ-দেওয়া। বোধহয় এই উদ্দেশ্যেই কেউ কোন সময়ে তৈরি করেছিল ওটা। আমরা অঙ্গপ্রদেশের সেনাপতিকে ওঁর সঙ্গে পাঠাব। লোকটা গোঁয়ার গোছের। কোনও ভাঁওতায় ভুলবে না। মহারাজ যে এখানে নেই তা কে ধরতে পারবে? সবাই ভাববে তিনি শিকারে গেছেন। বুধবারে একদিনের জন্য ফিরে এসেছিলেন, বৃহস্পতিবারে আবার চলে গেছেন। এ রকম তো প্রায়ই যান, বুঝতে পারবে না কেউ। ইতিমধ্যে আমরা যুদ্ধটা আরম্ভ করে দি। নির্জনবাস অবশ্য মহারাজের বেশী দিন ভালো লাগবে না। তারপর আমাদের জয় যখন আসন্ন হয়ে আসবে, কিংবা তখনও উনি যদি বেঁকে থাকেন, তাহলে তারও কিছু দিন পরে বিশেষ একটা শর্ত করে ওঁকে আমরা মুক্তি দেব। ফিরে এসে উনি আবার অভিনয়-টভিনয় নিয়ে মেতে যাবেন—এ আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি—"

সুরূপিণী গুম হয়ে বসে রইলেন। মনে হল ভাবছেন। তারপর হঠাৎ বললেন, " তা না হয় হল। কিন্তু ভৈরঙ্গীর রাজদরবারে যে বন্ধুত্বসূচক প্রস্তাবটা পাঠানো হচ্ছে তার কি হবে?"

"সে প্রস্তাব রাজ্যপরিষদ থেকে শুক্রবারের আগে বেরুবে না। মহারাজ অবশ্য ব্যক্তিগত চিঠি লিখতে পারেন, কিন্তু রাজকর্মচারীরা এমন কি দূতেরাও সবাই আমারই তাঁবে। ওরা আমার বাছাই করা লোক মহারাণী। আটঘাট বেঁধে কাজ করাই আমার নিয়ম।"

"হ্যাঁ, তাইতো মনে হচ্ছে"—লোকটার উপর ক্ষণিকের জন্য একটা বিতৃষ্ণা জাগল, মাঝে মাঝে যেমন জাগে,—চুপ করে রইলেন একটু, তারপর বললেন, "কপিঞ্জলদেব, আমি অতটা করতে, মানে অতটা চরমে যেতে চাই না। এ আমার ভালো লাগছে না।"

"আমারও লাগছে না। মহারাণীর অনিচ্ছার হেতু কি তা আমি বুঝতে পারছি। কিন্তু উপায় কি বলুন? ও পথ ছাড়লে আমরা যে অসহায় একেবারে।"

"তা বুঝতে পারছি, কিন্তু এটা বড়ই আকস্মিক হবে না? তাছাড়া এটা যে মহা অপরাধ, রাষ্ট্রীয় আইনভঙ্গ—"

"ভালো করে তলিয়ে দেখুন একটু। অপরাধটা আসলে কার?"

"ওরই অপরাধ"—উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠলেন সুরূপিণী—"ভগবানের কাছে ও-ই অপরাধী। এ সবের জন্যে ওকেই আমি দায়ী করছি। কিন্তু তবু—"

"ওঁর তো কোনও অনিষ্ট করতে চাইছি না আমরা।"

"তা জানি।"

সুরূপিণীর কণ্ঠস্বরে কিন্তু আন্তরিকতার সুর বাজল না।

তারপর ইতিহাসের চিরাচরিত নিয়ম অনুসারে সাহসী বীরেরা চিরকাল যেমন সৌভাগ্যলক্ষ্মীর আনুকূল্য ও সাহায্য পেয়েছেন এ ক্ষেত্রেও তেমনি হল। ঠিক সময়ে তিনি রথ থেকে নেমে এলেন। মহারাণীর একজন সহচরী খবর পাঠালেন যে জরুরী দরকারে তিনি একবার ভিতরে আসতে চান। একটি লোক প্রধানমন্ত্রীর জন্য না কি একটি চিঠি এনেছে। দেখা গেল পেন্সিলে লেখা এই লাইন চিঠি, চতুর কুজ্‌ঝটিকুমার গন্ধরাজের তীক্ষ্ণদৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে কোনক্রমে লিখে পাঠিয়েছেন চিঠিটি। কুজ্‌ঝটিকুমার মহাভীতু লোক, ভয়ই তাঁকে উঠ-বোস করায়। তিনি যে এতটা সাহস করতে পেরেছেন এটা সত্যিই আশ্চর্য ব্যাপার। চিঠিতে কেবল একটি মাত্র খবর সংক্ষেপে লেখা ছিল—"এর পর থেকে মহারাজ নিজেই সব কাগজে সই করবেন। মহারাণীর সই আর চলবে না।"

গত তিন বছর ধরে সুরূপিণীই মহারাজের হয়ে সমস্ত কাগজপত্রে সই করেছেন। আজ থেকে তাঁর সে অধিকার কেড়ে নেওয়া হল? এর পর কোনও সরকারী কাগজে আর তাঁর স্বাক্ষর থাকবে না? এটা সামান্য অপমান নয়,—তাঁর মনে হল এটা জনসাধারণের চক্ষে তাঁকে হীন প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা। তিনি একবারও ভাবলেন না কেন এটা করা হল, গুলি খেয়ে আহত বাঘ যেমন সগর্জনে লাফিয়ে ওঠে তিনিও তেমনি উঠলেন।

"যথেষ্ট হয়েছে। আমি আদেশপত্রে সই করে দেব। কখন ওকে নিয়ে যাওয়া হবে?"

"আমার নিজের লোকজন সংগ্রহ করতে প্রায় বারো ঘণ্টা লাগবে। আর এসব জিনিস রাত্রে করাই ভালো। যদি অনুমতি দেন—কাল রাত্রি দ্বিপ্রহরে ব্যবস্থা করি—"

"ঠিক আছে। আমার ঘরের দ্বার তো আপনার জন্য সর্বদাই উন্মুক্ত। আদেশপত্র প্রস্তুত হলেই নিয়ে আসবেন, আমি সই করে দেব।"

"মহারাণী যদি অভয় দেন তাহলে একটা কথা নিবেদন করি। এ ব্যাপারে একমাত্র আপনারই প্রাণদণ্ডের কোনও আশঙ্কা নেই। যদি ধরা পড়ি আমাদের সবারই সে আশঙ্কা আছে। এই জন্যে আমি প্রস্তাব করছি যে কেবলমাত্র সই না করে সমস্ত আদেশপত্রটা আপনি নিজের হাতে লিখে ফেলুন।"

"ঠিক বলেছেন আপনি। বেশ তাই হবে—"

কপিঞ্জল তাঁর হাতে সরকারী ছাপ-মারা একটি শাদা কাগজ দিলেন। সুরূপিণী অবিলম্বে গোটা গোটা পরিষ্কার অক্ষরে লিখে ফেললেন আদেশটা। লিখে আবার পড়লেন। সহসা একটা কুটিল হাসি ফুটে উঠল তাঁর চোখে মুখে।

"ওঁর কাকাতুয়াটির কথা আমি ভুলে গিয়েছিলাম। ইন্দীবর ভারতীও ওঁর সহযাত্রী হোন। দুজনে গল্পসল্প করে ভালই থাকবেন।"

ইন্দীবর ভারতীকেও নির্বাসনের দণ্ড দিলেন তিনি এবং এ আদেশটার তলায় দাগ দিয়ে আবার সই করলেন।

"আপনার সেবকের চেয়ে আপনার স্মৃতিশক্তি আরও প্রখর দেখছি মহারাণী" এই বলে কপিঞ্জল মনোযোগ সহকারে সাংঘাতিক আদেশপত্রটি পড়লেন।

"ঠিক হয়েছে।"

"আপনি কি বৈঠকখানায় বসবেন এখন?"

"না বেশী জানাজানি হোক এটা আমি চাই না এখন। আমার উপর লোকে যদি আস্থা হারিয়ে ফেলে তাহলে ভবিষ্যতের পক্ষে ভালো হবে না সেটা।"

"তা ঠিক।"

মহারাণী তাঁর দিকে এমনভাবে হাত বাড়িয়ে বিদায় দিলেন যেন তিনি একজন সমপর্যায়ের পুরাতন বন্ধু।

।। তেরো।।

বস্তুত, তীর নিক্ষিপ্ত হয়ে গিয়েছিল। রাজ্যপরিষদে সাধারণত যা হয় তাই যদি হত তাহলে গন্ধরাজের তেজ বা রাগ এতক্ষণ স্থায়ী হত না। তিনি নিজেরই দোষ ত্রুটি সম্বন্ধে সচেতন হতেন সর্বাগ্রে, নিজের সম্বন্ধে যা সত্য তাই নিক্তি ধরে বিচার করতেন, ভুলে যেতেন সুরূপিণীর সদম্ভ উক্তি ও আচরণ এবং আধঘণ্টার মধ্যেই অনুতপ্ত পাপী যেমন ঠাকুর ঘরে ঢুকে দেবতার কাছে আত্মনিবেদন করেন, অথবা পাঁড় মাতাল যেমন শেষকালে বোতলের আশ্রয় নেন—তিনিও তাই করে ফেলতেন। কিন্তু দুটি কারণে তাঁর জেদ চড়ে গেল। প্রথম, তিনি অনুভব করলেন অনেক কাজ বাকি পড়ে আছে, অনেকদিন ধরে অনেক দরকারী কাজ তিনি করেননি। গন্ধরাজের মতো অমনোযোগী দীর্ঘসূত্রী লোক যখন কর্তব্য সম্বন্ধে অবহিত হন তখন একমাত্র কাজ করেই তিনি নিজের বিবেককে শান্ত রাখতে পারেন। সমস্ত বিকেলটা তিনি মহাধ্যক্ষ কুজ্ঝটিকুমারের সঙ্গে কাজ করলেন। অনেক দলিল পড়লেন, অনেক শ্রুতিলিখন লেখালেন, অনেক কাগজে সই করলেন এবং অনেক আদেশ জারি করলেন।

একটা অদ্ভুত আত্মপ্রসাদের দীপ্তি ফুটে উঠল তাঁর চোখে মুখে। দ্বিতীয় কারণ, তাঁর আত্মসম্মান আহত হয়েছিল। যে টাকাটা তিনি চেয়েছিলেন তা পাননি। কাল সকালে কীর্তিভূষণ হতাশ হবে, যে টাকাটা তাকে দেবার কথা ছিল তা দিতে পারবেন না। ওই পরিবারটি তাঁকে খুব সুনজরে দেখেনি, তাদের কাছে ত্রাণকর্তা বীরের ভূমিকায় অভিনয় করে তিনি যে খাতিরটুকু পাবেন আশা করেছিলেন, তা আর পাওয়া যাবে না। তারা এখন তাঁকে মিথ্যাবাদী ছোটলোক ভাববে। গন্ধরাজের মতো লোকের কাছে এটা মৃত্যুর চেয়েও নিদারুণ। এর সঙ্গে কিছুতেই তিনি নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারছিলেন না। কাজ করতে করতে—রাজ্যের খুঁটিনাটি বিরক্তিকর কাজকর্ম তিনি বেশ ভালো ভাবেই করে যাচ্ছিলেন—কিন্তু কাজ করতে করতে তিনি ভাবছিলেন কি করে এই অবাঞ্ছিত পাশাটা উল্টে দেওয়া যায়। যে মতলবটা তাঁর মাথায় এসেছিল সেটা মানুষ গন্ধরাজের পক্ষে খুবই আনন্দজনক হলেও মহারাজ গন্ধরাজের পক্ষে অসম্মানজনক। কিন্তু তরল স্বভাবের লোক তিনি, তাঁর মনে হচ্ছিল এই যে বাজে ব্যাপারে খেটে মরছি ওই মতলবটা হাসিল করতে পারলে তার মজুরি উসুল হয়ে যাবে। ভাবতে ভাবতে মনে মনে হাসছিলেন তিনি। চাপা হাসির মৃদু উচ্ছ্বাস মাঝে মাঝে প্রকাশও হয়ে পড়ছিল। কুজ্ঝটিকুমার তা দেখে বিস্মিত হচ্ছিলেন মনে মনে, তাঁর মনে হচ্ছিল সকালে রাজাপরিষদে যা ঘটেছে তারই স্মৃতি বোধহয় পুলকিত করছে মহারাজকে।

এই ভেবে, তাঁর একটু মিহি খোশমোদ করবার প্রবৃত্তি জাগল। তিনি মৃদুকণ্ঠে বললেন যে গন্ধরাজের বাবার কথা তাঁর মনে পড়ছে।

"কি বলছেন?"

গন্ধবাজ প্রশ্ন করলেন। তিনি তখন একেবারে অন্য চিন্তায় মগ্ন ছিলেন।

"রাজ্যপরিষদে মহারাজের প্রতাপের কথা ভাবছিলাম।"

"তাই না কি! ও হ্যাঁ"—অন্যমনস্কভাবে উত্তর দিলেন গন্ধরাজ।

কিন্তু এ শুনে তাঁর অহমিকা ঈষৎ স্ফীত হল. সকালে রাজ্য পরিষদের ঘটনাগুলো মানস-চক্ষে ভেসে উঠল। মনে মনে হেসে ভাবলেন—"সবাইকে ঠাণ্ডা করে দিয়েছি—"

যখন সব দরকারী কাজ শেষ হয়ে গেল তখন বেলা গড়িয়ে গেছে। গন্ধরাজ কুজ্ঝটিকুমারকে তবু আটকে রাখলেন। বললেন, "আপনি এখানেই আমার সঙ্গে খান।" প্রাচীন স্থূল মোসাহেবির সঙ্গে আধুনিক সূক্ষ্ম খোশামোদের সমন্বয় করে কুজ্ঝটিকুমার খাওয়ার টেবিলে প্রচুর আনন্দ দান করলেন গন্ধরাজকে। হীন আনুগত্যের উপরই কুজ্ঝটিকুমারের জীবনের উন্নতি প্রতিষ্ঠিত। তিনি যা কিছু সম্মান বা চাকুরি পেয়েছেন তা হামাগুড়ি দিয়ে পেতে হয়েছে তাঁকে। তাঁর প্রবৃত্তিকে বেশ্যার সঙ্গে উপমিত করলে অত্যুক্তি হবে না। খোশামোদ করবার একটা সহজাত নিপুণতাও ছিল তাঁর। আর গন্ধরাজের খুব ভালো লাগছিল সেটা। প্রথমে নারীজাতির বুদ্ধি সম্বন্ধে তিনি দু'একটা ব্যঙ্গোক্তি করে টোপ ফেললেন। তারপর আর একটু ঘনিষ্ঠ আলোচনা করলেন এ বিষয়ে এবং আহারের তৃতীয় পর্বের পূর্বেই দেখা গেল তিনি সুরূপিণীর চরিত্র কৌশলে বিশ্লেষণ করতে শুরু করেছেন এবং গন্ধরাজ ঘাড় নেড়ে নেড়ে স্মিত মুখে শুনছেন তা। কারও নাম অবশ্য উচ্চারিত হচ্ছিল না তবু সুরূপিণীর সঙ্গে তিনি যে আদর্শ চরিত্র পুরুষটির তুলনামূলক সমালোচনা করছিলেন সে ব্যক্তিটি যে কে তা বেশ স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল। এই বেতো বুড়োটিকে ভগবান অদ্ভুত শয়তানী

বুদ্ধি দিয়েছিলেন। কেবল বাক্যবলেই মানুষের হৃদয়দুর্গ অধিকার করতে পারতেন তিনি। ঘণ্টার পর ঘণ্টা শ্রোতার কানের কাছে তাঁর প্রশস্তি-পাঠ করে যাবার ক্ষমতা ছিল ভদ্রলোকের। অথচ এমন কায়দা করে সেটা করতেন যে শ্রোতার আত্মসম্মান বিচলিত হত না একটুও। গন্ধরাজের মন তো গোলাপী হয়ে উঠল, স্তাবকের স্তুতির সঙ্গে যদি নিজের বিবেকের সায় থাকে তাহলে আত্মপ্রসাদের আনন্দ উপচে পড়ে একেবারে। নিজের ব্যক্তিত্বকে এমন বিচিত্রবর্ণমণ্ডিত দেখে খুবই পুলকিত হয়ে উঠলেন গন্ধরাজ। তাঁর মনে হল কুজ্‌ঝটিকুমারের মতো লোকও সুরূপিণীর চরিত্রে যদি এত গলদ দেখতে পেয়ে থাকে এবং তিনি বিরুদ্ধ পক্ষের লোক জেনেও যদি সেটা তাঁর কানে তুলে দিতে ইতস্তত না করে— তাহলে অবহেলিত স্বামী এবং অপদস্থ মহারাজা হিসেবে তিনি যে আচরণ করেছেন তা মোটেই কঠোর নয়।

প্রসন্ন মনে বিদায় দিলেন তিনি কুজ্‌ঝটিকুমারকে। তাঁর স্তুতি-বাক্যগুলো গানের মতো বাজতে লাগল কানে। এরপর তিনি অগ্রসর হলেন বৈঠকখানার দিকে। সেখানে সুরূপিণী তো আছেই, আরও অনেকে আছে। এ সময় বৈঠকখানা জমজমাট হয়ে ওঠে। সিঁড়িতে উঠতে উঠতেই কিন্তু অনুতাপ হতে লাগল তাঁর। বৈঠকখানার প্রকাণ্ড দালানে ঢুকেই দেখতে পেলেন তিনি সুরূপিণীকে। সঙ্গে সঙ্গে বদলে গেল তাঁর মন। কুজ্‌ঝটিকুমার তাঁর মনে তোষামোদ দিয়ে যে অলীক স্বপ্ন সৃষ্টি করেছিল তা স্বপ্নের মতোই মিলিয়ে গেল। বাস্তব জীবনের কাব্যের রং রাঙিয়ে দিল মনকে। বেশ কিছু দূরে একটা উজ্জ্বল আলোর নীচে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে ছিলেন সুরূপিণী। তাঁর কোমরের অপরূপ বঙ্কিম ভঙ্গী অভিভূত করে ফেলল গন্ধরাজকে। ওই বালিকাবধূকে একদিন তিনি এনে বাহুপাশে জড়িয়ে কত আদর করেছেন, শপথ করেছেন ওকে রক্ষা করবেন। ওই তো সে, জীবনের কোনও সৌভাগ্যের সঙ্গে কি ওর তুলনা হয়?

মুহ্যমান হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন ক্ষণকাল। সুরূপিণীই তাঁকে আত্মস্থ করলেন এসে। তিনি যেন সাঁতার দিতে দিতে এলেন এবং হেসে আধ-আধ অস্ফুট কণ্ঠে বললেন—"গন্ধ, আসতে তোমার বড্ড দেরি হয়ে গেল যে—"। হাসিটা বড়ই কৃত্রিম ঠেকল গন্ধরাজের চোখে। মনে হল এটা যেন মিলনান্তক কোন নাটকের দৃশ্য। অসুখী দাম্পত্যজীবনে এ রকম অভিনয় স্বাভাবিক। সুরূপিণীর নির্লজ্জ ন্যাকামিটা অসহ্য মনে হল তাঁর।

বৈঠকখানায় কোনও কড়াকড়ি রীতি-নীতি নেই। যে যা খুশি করছে, ঢুকছে, বেরুচ্ছে। আড়ষ্টতা নেই কোনও। জানলার কাছে কাছে যে সব বসবার জায়গা আছে, পাখির মতো অনেকে বসে আছে সেখানে জোড়ায় জোড়ায়। ওদিকের কোণটাতে বেশ একটি বড় দল মহানন্দে মশগুল হয়ে গেছে পরনিন্দা পরচর্চায়। আর একটু দূরে একটা টেবিলে জুয়া চলছে তাস নিয়ে। খুব একটা দৃষ্টি আকর্ষণ করে নয়, তবে এই দিকেই ধীরে ধীরে এগুলেন গন্ধরাজ নমস্কার বিনিময় করতে করতে। রঞ্জাবতী যেখানে খেলছিলেন তারই সামনাসামনি গিয়ে দাঁড়ালেন তিনি। রঞ্জাবতীর সঙ্গে চোখাচোখি হতেই কাছেই জানলার ধারে দেওয়ালে যে ফাঁকটি ছিল সেখানে গিয়ে বসলেন তিনি। রঞ্জাবতীও হাজির হলেন সেখানে অবিলম্বে।

"ডেকে এনে বাঁচালেন আমাকে। ভূতের মতো হারছি। জুয়াই আমার সর্বনাশ করবে।"

"ছেড়ে দাও না ওসব!"

"ছেড়ে দেব!"—বলেই হেসে উঠলেন রঞ্জাবতী—"কি নিয়ে থাকব তাহলে। ওই তো

আমার নিয়তি। যক্ষ্মায় যদি মারা যেতাম তাহলে বেঁচে যেতাম। ওই একমাত্র আশা ছিল। কিন্তু তা যখন হল না তখন কোন চিলে-কোঠার ঘরে মরতে হবে।"

"মনে হচ্ছে মেজাজটা ভালো নেই।"

"ক্রমাগত হারছি আজ। লোভ যে কি বস্তু তা আপনি জানেন না।"

"দেখছি, খুব খারাপ সময়ে এসে পড়েছি তাহলে—"

"কেন কিছু করতে হবে?"—এক ঝলক হাসি ফুটে উঠল মুখে।

"রঞ্জাবতী আমি একটা দল গড়ব ভাবছি, সে দলে তোমাকে টানতে চাই।"

"রাজী" হেসে উত্তর দিলেন রঞ্জাবতী—"আমাকে পুরুষ বলে মনে করতে পারেন।"

"হয়তো এটা আমার ভুল। কিন্তু কেন জানি না আমি সত্যিই বিশ্বাস করি তুমি আমার অশুভাকাঙ্ক্ষিণী নও।"

"আমি আপনার এত শুভাকাঙ্ক্ষিণী যে তা বলবার সাহস আমার নেই।"

"তাহলে বলব কথাটা?"

"বলুন মহারাজ। আপনি যা করতে বলবেন তা নিশ্চয়ই করব।"

"সেদিন যে গৃহস্থটির গল্প করেছিলাম, আমি চাই তাকে তুমি প্রতিষ্ঠিত কর। বাঁচাও।"

"কোন গৃহস্থ? কিছুই তো বুঝতে পারছি না। যাক্ বুঝতে চাই না। আমি আপনাকে খুশী করতে চাই। ধরে নিন তাকে প্রতিষ্ঠিত করে দেব। বাঁচাব।"

"এইবার তাহলে অন্য দিক থেকে ব্যাপারটা বলি। তুমি কখনও চুরি করেছ?"

"অনেকবার। শাস্ত্রের সমস্ত উপদেশ আমি লঙ্ঘন করেছি, ফের নূতন শাস্ত্র যদি তৈরী হয় সে সবেব উপদেশও লঙ্ঘন না করা পর্যন্ত ঘুম হবে না আমার। কি করতে হবে?"

"তালা ভেঙে ঘরে ঢুকে চুরি করতে হবে। তোমাকে এ কাজ করতে বলছি কারণ আমার মনে হল তুমি দুঃসাহসিনী, এতে আমোদ পাবে হয়তো। আমিও তোমার সহকারী হব।"

"ও কাজ করিনি কিন্তু। তালাটালা ভাঙ্গিনি কখনও। ছেলেবেলায় একটা সেলাইয়ের বাক্স ভেঙে ফেলেছিলাম, অবশ্য মন ভেঙেছি অনেকের এমনি কি নিজেরও। ঘরের তালা ভাঙ্গিনি। কিন্তু তাতে কি! ভাঙব তালা, দুষ্কর্ম করা কি আর এমন শক্ত! কোথাকার তালা ভাঙতে হবে।"

"আমার কোষাগারের।"—বলে গন্ধরাজ মৃদু হাসলেন। তারপর সংক্ষেপে, হাসতে হাসতে এবং মাঝে মাঝে করুণরসের ছিটেফোঁটা দিয়ে কীর্তিভূষণের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ এবং জমি কেনার প্রতিশ্রুতির কথা বর্ণনা করে গেলেন। তারপর বললেন—"আজ সকালে রাজসভায় কোষাধ্যক্ষের কাছে টাকাটা চাইলাম, কিন্তু ওঁরা দিলেন না আমাকে টাকাটা। তাই ঠিক করেছি নিজেই নিজের কোষাগার থেকে চুরি করব।" গন্ধরাজ কোষাগারের জানলা দরজা কোথায় আছে এবং কিভাবে সেখানে ঢোকা সম্ভব, কি বিপদ হতে পারে এইসব বললেন তারপর।

"রাজসভায় আপনাকে টাকাটা দিলে না। আর আপনি সেটা মেনে নিলেন। অবাক্ কাণ্ড!"

গন্ধরাজের কানের ডগাটা লাল হয়ে উঠল একটু।

"ওঁরা কারণ দেখালেন নানারকম, আমার মনে হল ওইসব ওজনদার কারণ উলটে দেবার

ক্ষমতা আমার নেই। তাই ঠিক করেছি আমার রাজের কোষাগার থেকে আমিই চুরি করব। এতে মর্যাদা নেই কিন্তু মজা আছে।''

''মজা? ও—''

রঞ্জাবতী চুপ করে রইলেন খানিকক্ষণ। ভাবলেন কি যেন।

''কত টাকা আপনার দরকার?''

''দশ হাজার হলেই চলবে। আমার নিজের কাছেও কিছু আছে।''

''দশ হাজার? বেশ''—হালকা মিষ্টি হাসি আবার ফুটে উঠল তাঁর চোখে মুখে—''বেশ, আমি আপনার সঙ্গে যাব। কোথায় তাহলে আবার আমাদের দেখা হচ্ছে? কোন জায়গা থেকে যাত্রা করব?''

''আমার বাগানে যেখানে একটা উড়ন্ত পরীর মর্মরমূর্তি আছে সে জায়গাটা চেন? তিনটি রাস্তা এসে মিলেছে সেখানে। একটি বসবার জায়গাও আছে সেখানে। স্থানটি নির্জন এবং পরী আছে বলে মনোরম।''

''কি ছেলেমানুষ অপানি''—লীলাভরে পাখা দিয়ে সামান্য ঠোকা দিয়ে বললেন—''কিন্তু আপনি যে জায়গাটার কথা বললেন তা আপনার পক্ষে সুবিধাজনক। কিন্তু আমি কি সেখানে সহজে পৌঁছতে পারব? আমার অনেক দেরি হবে। প্রচুর সময় না দিলে যাওয়া যাবে না ওখানে। দুটোর আগে যাওয়া অসম্ভব। কিন্তু দুটোর ঘণ্টা বাজবার সঙ্গে সঙ্গেই আপনার সহকর্মিণী নির্ঘাৎ হাজির হবে আপনার কাছে—। আশা করি আপনি এতে আপত্তি করবেন না। হ্যাঁ, ভালো কথা, আর কেউ কি থাকবে সেখানে? না, লোক-লজ্জার জন্যে বলছি না আমি, অত লজ্জাশীলা নই।''

''আমার একজন সহিস থাকবে। আমার ঘোড়ার দানা চুরি করত তাকে ধরে ফেলেছিলাম একবার। সেই থেকে—''

''তার নাম কি?''

''নাম তো জানি না। দানা-চোরের সঙ্গে পরিচয় তেমন ঘনিষ্ঠ হয়নি। সম-ব্যবসায়ী হিসাবে মাত্র—''

''আমার সঙ্গে যেমন হয়েছে! উঃ কি লোক আপনি! যাক, একটি কাজ কিন্তু করবেন। পরীর কাছে যে বেঞ্চটি আছে সেখানে যেন আমি আপনাকে দেখতে পাই, সেখানে বসে আপনি আমার অপেক্ষা করবেন। যেমন ভাবে অপেক্ষা করে—''

বলেই মুচকি হাসলেন রঞ্জাবতী।

''আর আপনার ওই চোর-বন্ধুটি যেন কাছাকাছি না থাকে। দূরে যে ফোয়ারাটা আছে সেখানেই তাকে থাকতে বলবেন। এ ব্যবস্থায় রাজী তো?''

''রঞ্জাবতী, আজ তুমিই হুকুম দেবে আমি তা পালন করব। এ অভিযানে তুমিই নেত্রী, আমি আজ্ঞাবহ কর্মচারী মাত্র।''

''অভিযান সফল হবে আশা করি। আজ শুক্রবার নয়—''

রঞ্জাবতীর হাবভাব একটু যেন রহস্যময় মনে হল গন্ধরাজের। সন্দেহও হল একটু।

''আমি আমার বিপক্ষ দল থেকে সহকারী যোগাড় করলাম। এটা একটু অদ্ভুত মনে হচ্ছে না?''

"অদ্ভুত আবার কি। আপনার প্রধান গুণ কি জানেন? আপনি আপনার বন্ধুদের চেনেন।"

হঠাৎ এক কাণ্ড করে বসলেন রঞ্জাবতী। গন্ধরাজের হাতটা তুলে আবেগভরে চুম্বন এঁকেদিলেন তাতে!

"এবার যান। আর দেরি করবেন না।"

ঈষৎ বিহ্বল হয়ে সরে গেলেন গন্ধরাজ। তাঁর মনে হতে লাগল একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেল বোধহয়। রঞ্জাবতী হঠাৎ যেন রত্নের মতো চকমক করে উঠল। তাঁর পূর্ব-প্রণয়ের বর্ম ভেদ করেও যেন ধাক্কা লাগল একটা। ভয় হল একটু। কিন্তু বেশীক্ষণ সে ভয় রইল না।

সকাল সকালই গন্ধরাজ এবং রঞ্জাবতী বেরিয়ে এলেন বৈঠকখানা থেকে। একটা ছুতো করে গন্ধরাজ তাঁর দেহরক্ষীকেও বিদায় করে দিলেন। তারপর গোপন পথ দিয়ে বেরিয়ে গেলেন তিনি বাগানের দিকে সেই সহিসের খোঁজে।

গিয়ে দেখলেন আস্তাবল অন্ধকার। আগে যে কায়দায় জানলায় টোকা মেরেছিলেন এবারও মারলেন। সহিসটি মুখ বাড়াল এবং তাঁকে দেখে আবার বিবর্ণ হয়ে গেল ভয়ে।

"কি খবর! দানার একটা বোরা চাই—খালি বোরা। বোরাটা নিয়ে আমার সঙ্গে এস। সমস্ত রাত আমার সঙ্গে থাকতে হবে আজ—"

"মহারাজ, আস্তাবলে আমি ছাড়া কেউ নেই। আমি চলে গেলে ঘোড়াগুলোর—"

"যা হবার হোক। ঘোড়াদের উপর তোমার যে কত দরদ তা জানা আছে।"

হঠাৎ গন্ধরাজ লক্ষ্য করলেন লোকটা ভয়ে কাঁপছে। তখন তিনি তাঁর কাঁধে হাতটা রেখে বললেন, "ভয় কি। তোমার কোন ক্ষতি করবার জন্যে আমি আসিনি। অনর্থক ভয় পাচ্ছ কেন।"

সঙ্গে সঙ্গে আশ্বস্ত হল বেচারা। খালি বোরা নিয়ে এল। গন্ধরাজ তাকে সঙ্গে নিয়ে ছোট বড় নানারকম পথ পার হলেন গল্প করতে করতে। অবশেষে যেখানে প্রকাণ্ড একটা পিতলের মাছের মুখ থেকে বিরাট একটা চৌবাচ্চায় অনর্গল জল পড়ছিল সেখানে এসে থামলেন। বললেন, "তুমি এইখানে আমার জন্য অপেক্ষা কোরো। কোথাও যেও না।" তারপর তিনি গেলেন সেই মর্মর-নির্মিত উড়ন্ত পরীর দিকে। উলঙ্গ পরী ডানা মেলে মুখ তুলে একটা পায়ের উপর ভর দিয়ে আকাশের দিকে দুই হাত তুলে দাঁড়িয়ে আছে। মনে হচ্ছে এখনি উড়ে যাবে, কিন্তু উড়ছে না, স্থির হয়েই একই ভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে বহুকাল ধরে। আকাশে অসংখ্য তারা। বেশ গরম, একটুও হাওয়া নেই। দিগন্তে কৃষ্ণপক্ষের একফালি শীর্ণ চাঁদ উঠেছে। তাব ম্লান জ্যোৎস্নায় নক্ষত্রেরা ঢাকা পড়েনি। নক্ষত্রের আলোকেই অপরূপ হয়ে উঠেছে চতুর্দিক। গাছের বীথির ভিতর দিয়ে দূরে তিনি প্রাসাদের আলোকিত অলিন্দের একটা অংশ দেখতে পেলেন। দেখলেন প্রহরী সেখানে পাহারা দিচ্ছে। তারও ওপারে দেখা যাচ্ছে শহরের আলো আর রাস্তা। কিন্তু আশেপাশের সবুজ গাছগুলো কেমন যেন স্বপ্নাচ্ছন্ন, মৃদু নক্ষত্রালোকে অদ্ভুত অস্পষ্ট একটা রূপকথালোক মূর্ত হয়েছে যেন। ওই উড়ন্ত পরীটাকেও আর প্রাণহীন মর্মর মনে হচ্ছে না।

রাত্রির নির্জন রহস্যময় পরিবেশে গন্ধরাজের বিবেকও সহসা যেন নক্ষত্রের মতোই স্পষ্ট হয়ে উঠল। তিনি সেদিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে চাইলেন, কিন্তু পারলেন না। তাঁর চরিত্রের গলদগুলো সারি সারি এসে দাঁড়াল যেন সেই নক্ষত্রালোকে। তিনি এখানে এসেছেন

কেন? রাজকোষের অর্থ নানা অপব্যয়ে নষ্ট হয়েছে সত্য, কিন্তু তার কারণ কি তাঁরই শৈথিল্য নয়? আলস্যবশে তিনি যে রাজত্বকে সুশাসন করতে পারেননি সেই রাজত্বের পঙ্গু রাজকোষকে তিনি অসাধু উপায়ে আরও পঙ্গু করতে উদ্যত হয়েছেন। এই চুরি-করা টাকাটাও তিনি নিজের ব্যক্তিগত খামখেয়ালে ফুঁকে দেবেন। হতে পারে কাজটা মহৎ কাজ, কিন্তু তাতে কি? এটা তাঁর খেয়াল ছাড়া আর কিছু নয়। যে লোকটাকে তিনি দানা-চুরির অভিযোগে সন্ত্রস্ত করে তুলেছিলেন তাকেই তিনি রাজকোষ থেকে টাকা চুরিতে প্রবুদ্ধ করতে যাচ্ছেন! তারপর, ওই রঞ্জাবতী—সচ্চরিত্র পুরুষের পক্ষে অসতী স্ত্রীলোকের উপর যে রকম ঘৃণা হওয়া স্বাভাবিক— সেই রকম একটা ঘৃণায় ঘিন ঘিন করতে লাগল তাঁর সারা মন। অথচ ওই স্ত্রীলোকটাকেই তিনি কাজে লাগাতে চাইছেন। যেহেতু ও হীন, যেহেতু তিনি জানতেন ওকে যে কোনও পাঁকে সহজে নামানো যাবে, তাই ওকেই এই কাজে লাগিয়ে ওকে আরও হীন করবার প্রয়াস পেয়েছেন তিনি, হয়তো এজন্যে ওর সমস্ত ভবিষ্যৎই বিপন্ন হতে পারে, এ জেনেও পেয়েছেন।

গন্ধরাজ শিস দিতে দিতে পায়চারি করছিলেন দ্রুতবেগে। হঠাৎ তাঁর মনে হল পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে অন্ধকারে। গাছের ফাঁকে ফাঁকে কে যেন এগিয়ে আসছে। লাফিয়ে এগিয়ে গেলেন তিনি এবং রঞ্জাবতী আসছে ভেবে আশ্বস্ত হলেন। একা একা বিবেকের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে লড়াই করা কি সহজ? সেই মুহূর্তে তাঁর চেয়ে বেশী পাপী আর একজনের দেখা পেয়ে সত্যিই ভারি আরাম পেলেন যেন।

কিন্তু মনে হল একটি যুবক এগিয়ে আসছে, স্ত্রীলোক তো নয়। খর্বকায়, মাথায় প্রকাণ্ড পাগড়ি, চলবার ধরনটাও অদ্ভুত, ঘাড়ে একটা বোঝা। কে এ! গন্ধরাজ আত্মগোপন করতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু যুবকটি হাত তুলে মানা করল। তারপর প্রায় দৌড়তে দৌড়তে এসে বোঝাটা তাঁর পায়ের কাছে ফেলে হাঁপাতে লাগল । তারপর ধপাস করে বসে পড়ল বেঞ্চিটার উপর, তার মুখের দিকে চেয়ে গন্ধরাজ রঞ্জাবতীকে চিনতে পারলেন।

"তুমি, রঞ্জাবতী!"

"না, আমি রঞ্জাবতীর ভাই রঞ্জনকুমার। আমিও লোক খারাপ নই। হাঁপিয়ে পড়েছি। একটু দম নিতে দিন—"

"আচ্ছা, রঞ্জাবতী—"

"না, আমাকে রঞ্জনকুমার বলুন। আমার ছদ্মবেশকে উপহাস করবেন না, মেনে নিন।"

"বেশ। রঞ্জনকুমারকে তাহলে অনুরোধ করছি, আর দেরি করা ঠিক নয়, এবার রাজকোষের দিকে অগ্রসর হওয়া যাক।"

"আপনি এইখানে আমার পাশে বসুন তো"—আঙুল দিয়ে বেঞ্চিটার অপর প্রান্ত দেখিয়ে দিলেন—"এক্ষুনি যাব। বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, বুকের ভিতরটা ধড়াস ধড়াস করছে। বিশ্বাস না হয়, হাত দিয়ে দেখুন। আপনার সেই চোরটি কোথা—"

"সে ওই ফোয়ারার কাছে আছে। আলাপ করবে তার সঙ্গে? চমৎকার লোক।"

"না এখন নয়। তাড়াহুড়ো করবেন না, কথা আছে। আপনার চোরকে আমি অসম্মান করছি না। যাদেরই পাপ করবার সাহস আছে তাদেরই আমি সম্মান করি। মহারাজের সঙ্গে

প্রেমে পড়ে গিয়েই যদিও প্রথম আমি পুণ্যলোকে উত্তীর্ণ হলাম, কিন্তু তার জন্যেও পাপের সাহায্য নিতে হল।"

বিব্রত বোধ করতে লাগলেন গন্ধরাজ।

"কতক্ষণ এভাবে থাকবে এখানে?"

"যাচ্ছি, যাচ্ছি। একটু দম নিতে দেবেন না?"

আরও জোরে জোরে হাঁপাতে লাগলেন তিনি।

"কেন এত ক্লান্ত হয়ে পড়লে? ওই বস্তাটা বয়ে? আচ্ছা পাগল তো তুমি! এটা বয়ে আনতে গেলে কেন। আমি যে একটা খালি বস্তা যোগাড় করে রাখতে পারি আমার উপর এটুকু বিশ্বাসও কি নেই তোমার? আর মনে হচ্ছে, এটা তো খালিও নয়। কি পুরে এনেছ ওতে? দেখি—"

তিনি হাত বাড়িয়ে ঝুঁকতেই রঞ্জাবতী তাঁর হাতটা ধরে ফেললেন।

"গন্ধরাজ, না, না ওরকম করবেন না। আমি বলছি, অকপটেই সব খুলে বলছি। কাজ আমি হাসিল করে ফেলেছি। একাই লুট করেছি আপনার রাজকোষ। ওই বস্তায় দশ হাজার সাতশো পঁয়ষট্টি মুদ্রা আছে। আশা করি এতেই আপনার কাজ হয়ে যাবে।"

এ কথা শুনে বজ্রাহতবৎ হয়ে গেলেন গন্ধরাজ তাঁর মুখের দিকে চেয়ে। মুখ দিয়ে একটি কথা সরল না। তাঁর হাত তখনও বাড়ানো ছিল, রঞ্জাবতী তখনও ধরে ছিলেন হাতের কব্জিটা।

"তুমি? কি করে করলে—!"

তারপরই সোজা হয়ে বসলেন তিনি।

'তুমি নিশ্চয়ই তাহলে আমাকে এত অপদার্থ ভেবেছ যে আমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে সাহস হয়নি তোমার! আমি অপদার্থ তাতে সন্দেহ নেই—"

"না, এই যদি ভাবেন, তাহলে যা বললাম তা মিথ্যে! টাকাটা আমারই টাকা—সত্যি বলছি—আমারই টাকা, এখন আপনার। আপনি যা করতে চাইছিলেন তা আপনার গৌরবের সঙ্গে বেমানান। আপনার কথা শুনেই আমি ঠিক করে ফেলেছিলাম যে আপনার বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও আমি আপনার সম্মান রক্ষা করব। আমি মিনতি করছি, আপনি আমাকে সে অধিকার দিন!"

রঞ্জাবতীর কণ্ঠস্বরে আবদারের মোলায়েম সুর বেজে উঠল। "আমি হাত জোড় করে মিনতি করছি গন্ধরাজ। হতভাগিনীর তুচ্ছ কটা টাকা আপনার কাজে লাগুক। এ হতভাগিনী আপনাকে—না, ও কথা উচ্চারণ করতে লজ্জা করছে!"

"আমাকে মাপ কর রঞ্জাবতী। ও আমি পারব না। আমি চললুম—"

উঠে পড়লেন গন্ধরাজ। সঙ্গে সঙ্গে রঞ্জাবতী মাটিতে নেমে দুহাতে তাঁর হাঁটু জাপটে ধরলেন।

"না, আপনি যাবেন না। আমাকে আপনি এত ঘৃণা করেন? এ টাকা তো আমার কাছে অসার তুচ্ছ জিনিস। জুয়ার আড্ডায় দু'দিনেই শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু আপনি যদি দয়া করে নেন, ও টাকা বেঁচে গেল, আপনার কাছে জমা রইল, আপনি ভালো কাজে ব্যবহার করবেন ওটা, হয়তো ওরই জোরে নিদারুণ ধ্বংসের মুখ থেকে বাঁচতে পারব একদিন।"

গন্ধরাজ মৃদুভাবে চেষ্টা করলেন নিজেকে মুক্ত করতে।

"গন্ধরাজ"—রঞ্জাবতী আবার বললেন—"আপনি যদি আমাকে এই নিদারুণ লজ্জার মধ্যে ফেলে চলে যান, আমি আর বাঁচব না। এইখানেই মরব আমি—"

গন্ধরাজ কাতরভাবে বললেন, "না, না—তুমি—"

"হ্যাঁ মরব। আমার যে কি যন্ত্রণা হচ্ছে তা কি আপনি অনুভব করতে পারছেন? সামান্য একটা চক্ষুলজ্জা আপনাকে পীড়া দিচ্ছে, কিন্তু আমার বিচূর্ণিত আত্মসম্মান, আমার পদদলিত মর্যাদার কষ্টটা যে কি নিদারুণ তা একবার ভেবে দেখুন। আমি আমার যথাসর্বস্ব—যদিও তা নিতান্ত তুচ্ছ—আপনাকে এনে দিলাম আর আপনি তা প্রত্যাখ্যান করে চলে যাচ্ছেন! চুরি করতে আপনার দ্বিধা ছিল না, কিন্তু আমাকে আপনি এত ঘৃণ্য মনে করেন যে, আমার বুকটা মাড়িয়ে চুরমার করে দিয়ে যেতে আপনি ইতস্তত করছেন না। গন্ধরাজ, মহারাজ, এতটা নির্দয় হবেন না, দয়া করুন আমার উপর—দয়া করুন—কৃপা ভিক্ষা করছি—"

রঞ্জাবতী তখনও গন্ধরাজের হাঁটু দুটো জড়িয়ে ধরে ছিলেন। তারপর হঠাৎ হাতটা ধরে পাগলের মতো তাতে চুম্বন করতে লাগলেন। গন্ধরাজের মাথাটা ঘুরে গেল।

"ও, এতক্ষণে বুঝেছি। বুঝেছি, বুঝেছি, বুঝেছি। আমি যে বুড়ো হয়ে গেছি, আর তো আমার রূপ নেই, কিছু নেই—"

হঠাৎ তিনি হু হু করে কাঁদতে লাগলেন। এইবার গন্ধরাজের পরাজয় ঘটল। আর পারলেন না—তাড়াতাড়ি রঞ্জাবতীকে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন এবং শেষ পর্যন্ত টাকাটা নিতেও রাজী হতে হল তাঁকে। দুর্বল মানুষ স্ত্রীলোকের পাল্লায় পড়লে যা হয় তাই হল। রঞ্জাবতীর কান্না থেমে গেল। কম্পিতকণ্ঠে তিনি ধন্যবাদ দিলেন গন্ধরাজকে, তারপর বেঞ্চিতে উঠে বসলেন গন্ধরাজের পাশে।

"এখন বুঝতে পারছেন কেন আমি আপনার চোর বন্ধুটিকে দূরে রাখতে বলেছিলাম আর কেনই বা আমি একা এসেছি। টাকাটা নিয়ে আসতে কি যে বুক কাঁপছিল আমার—"

"আর বোলো না রঞ্জাবতী"—গন্ধরাজের কণ্ঠস্বরও সজল মনে হল—"আমাকে আর লজ্জা দিও না। তুমি এত ভালো, এত মহৎ তা আমি জানতাম না। তুমি যে আমার জন্যে এতটা করবে—"

"করব না? বলেন কি। শুনে অবাক লাগছে। আপনি কি নির্বুদ্ধিতাটা করছিলেন বলুন তো! এখন আপনি স্বচ্ছন্দে আপনার সেই কৃষক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করুন গিয়ে। আপনার বান্ধবীর টাকাটারও সদগতি হল একটা। বাজে চক্ষুলজ্জার জন্যে আপনি যেটা প্রকৃত কর্তব্য, আমি বলব যেটা প্রকৃত দয়া— সেইটেই ভুলে যাচ্ছিলেন আপনি। যাক্, আমি এবার খুশী হয়েছি, খুব খুশী হয়েছি। কিন্তু আপনি অমন মুখ গোমড়া করে রইলেন কেন। হাসি ফুটছে না কেন আপনার চোখে মুখে। আমি জানি সৎকার্য করলে মনটা দমে যায়। কিন্তু ভুলে যান এসব। আমার দিকে তাকান, হাসুন একটু— এখনও রাগ পড়ল না?"

গন্ধরাজ তাঁর মুখের দিকে চাইতে পারলেন না। যখন কেউ কোন নারীকে আলিঙ্গন করে তখন ইন্দ্রজালের জাদু সম্মোহিত করে দেয় তার মনকে; কিন্তু এ সময়ে গহন রাত্রির পটভূমিকায় নক্ষত্রের চিকিমিকি আলোকে নারীর যে মাধুরী ফুটে ওঠে তা অনির্বচনীয়। তার চুলে তারার আলোর ছোঁয়া হয়ে ওঠে নিপুণ তুলির স্পর্শ, তার চোখ দুটিকে মনে হয় নক্ষত্র-

মিথুন। তার মুখের রেখায় রেখায় মন যে ছবি আঁকে তা অনুরাগ-রঞ্জিত অনবদ্য চিত্র। গন্ধরাজ পরাজিত হয়েছিলেন বটে, কিন্তু তার জন্য আর ক্ষোভ ছিল না মনে। রঞ্জাবতীর উপর আর রাগ করতে পারছিলেন না। বরং অনুরাগই জাগছিল মনে।

বললেন, "না, আমি অকৃতজ্ঞ নই—"

"আপনি বলেছিলেন মজার খোরাক দেবেন আমাকে! কিন্তু আমিই দিলাম সেটা। কেমন একটা ঝঞ্ঝা-ঝটিকাময়ী নাটিকা হয়ে গেল বলুন তো—"

গন্ধরাজ হেসে উঠলেন। কিন্তু সে হাসির আওয়াজটা যেন স্বাভাবিক মনে হল না। মনে হল মেকী।

"এবার আমাকে কি দেবেন বলুন, আমার এমন বাহাদুরির বখশিস কিছু পাব না?"

"যা চাও তাই দেব।"

"যা চাই তাই দেবেন? সত্যি? মনে করুন যদি আপানর রাজমুকুটটাই চেয়ে বসি? দেবেন?"

বিজয়িনীর গর্বে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল তাঁর দৃষ্টি।

"চাও যদি, নিশ্চয়ই দেব।"

"চাইব তাহলে মুকুটটা? না, মুকুট নিয়ে কি করব আমি! ছোট্ট রাজ্য আপনার গর্জনগাঁও। অমার দুরাকাঙ্ক্ষা আরও অনেক বেশী। আমি চাই—কি চাইব—দেখছি চাইবার মতো কিছুই তো নেই! তার বদলে আমিই বরং কিছু দিই আপনাকে । নিন, চুমু খান আমার। একবার কিন্তু। সরে আসুন।"

সরে এলেন গন্ধরাজ। রঞ্জাবতী মুখটা উঁচু করলেন। দুজনেরই চোখেমুখে চিকমিক করতে লাগল হাসি। যেন একটা ছেলেমানুষি খেলা হচ্ছে। কিন্তু তাঁদের ওষ্ঠ সত্যিই যখন সংলগ্ন হল তখন গন্ধরাজের সমস্ত সত্তায় একটা প্রচণ্ড ভূমিকম্প হয়ে গেল যেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি দূরে সরে বসলেন। রঞ্জাবতীও। নির্বাক হয়ে খানিকক্ষণ বসে রইলেন দুজনেই। গন্ধরাজের ভয় হল এই নীরবতার মধ্যে হয়তো আরও কোন আসন্ন বিপদ ওত পেতে আছে, তবু তিনি নীরবতা ভঙ্গ করতে পারলেন না। কোন কথাই যোগাল না তাঁর মুখে। রঞ্জাবতীই প্রথমে কথা কইলেন।

"আপনার স্ত্রীর সম্বন্ধে একটা কথা—"

বেশ পরিষ্কার অকম্পিত কণ্ঠে শুরু করলেন রঞ্জাবতী।

"আমার স্ত্রীর বিরুদ্ধে আমি কোন কথা শুনতে চাই না। আমি তাকে ভালবাসি—"

খাপছাড়া রকম উঁচু গলায় গন্ধরাজ বলে উঠলেন ।

"আমি কি বলি তা আগে শুনুন। শেষ করতে দিন কথাটা"—হেসে উত্তর দিলেন রঞ্জাবতী—"বিনা কারণে এ প্রসঙ্গ উত্থাপন করিনি। এখনই আমাদের দুজনেরই মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ওর জন্যে অপ্রস্তুত হবেন না, এতে লজ্জারই বা কি আছে ।"

রঞ্জাবতীর কথায় ধমকের একটু আমেজ পাওয়া গেল—"লজ্জাটজ্জা নিয়ে বাড়াবাড়ি পছন্দ করি না আমি। একটু ভাবলেই আপনি বুঝতে পারবেন আমি নানাভাবে আপনাকে বাঁচাবারই চেষ্টা করছি, আপনার সুনামকে রক্ষা করবার জন্য আমি তার চারপাশে দুর্গই রচনা করছি। এটা যেন আপনি ভুলেও মনে করবেন না যে আমি আপনার প্রেমের ভিখারিণী,

মোটেই তা নই—এ কথাটা মনে রাখলে সুখী হব। হাসতে হাসতে যা করলুম, হাসির সঙ্গেই তা শেষ হোক। বিয়োগান্ত নাটকের নায়িকা হবার ইচ্ছে নেই। হ্যাঁ, আপনার স্ত্রীর সম্বন্ধে যা বলছিলাম— তিনি কপিঞ্জলের উপপত্নী নন, কখনও ছিলেন না। কপিঞ্জল তাঁর অন্দরের উঠোনে প্রবেশাধিকার পায়নি। পেলে এ নিয়ে নিশ্চয় সে ঢাক বাজিয়ে বেড়াত। আচ্ছা, চললুম। নমস্কার—"

নিমেষের মধ্যে গলির অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে গেলেন রঞ্জাবতী। গন্ধরাজ টাকার থলি নিয়ে সেই উড়ন্ত পরীর সামনে একা বসে রইলেন।

।। চোদ্দ।।

রঞ্জাবতী যুগপৎ আঘাত এবং আদর হেনে চলে গেলেন। তাঁর স্ত্রীর সম্বন্ধে যে সুসংবাদটি দিয়ে গেলেন এবং যে ভাবে এই অভিনব সাক্ষাৎকারটির সুষ্ঠু পরিসমাপ্তি হল তাতে গন্ধরাজের নিঃসন্দেহে খুশী হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু যখন তিনি টাকার বস্তাটা কাঁধে তুলে নিয়ে তাঁর সহিসটির কাছে যাবার জন্যে পা বাড়ালেন তখন যেন নানা বেদনার কাঁটা খচখচ করে বিঁধতে লাগল তাঁর মনে। অন্যায় করা এবং তারপর সংশোধিত হয়ে ন্যায়ের পথে ফিরে আসা—দুটোই পুরুষের অহঙ্কারকে আঘাত করে। সহসা তাঁর নিজের দুর্বলতা আবিষ্কার করে এবং সে রকম অবস্থায় পড়লে তাঁর পক্ষেও যে দাম্পত্য-অঙ্গীকার লঙ্ঘন করা সম্ভব এই ভেবে তাঁর আত্মবিশ্বাস কেমন যেন টলমল করে উঠল। আর ঠিক এই সময়ে তিনি শুনলেন যে সুরূপিণী অটল আছে, আর এমন লোকের মুখ থেকে শুনলেন যে তার বন্ধু নয়, শত্রু। এই অপ্রত্যাশিত সংবাদ শুনে তাঁর মনের খচখচানিটা আরও বেড়ে গেল যেন।

খানিকটা পথ হাঁটবার পর একটু স্বস্থ হলেন তিনি, পরিষ্কার ভাবে নিজের মনটা দেখতে পেলেন। দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলেন যে তিনি রেগে রয়েছেন। ক্রোধভরেই থেমে গেলেন তিনি এবং ঠিক তাঁর পাশেই যে ছোট ঝোপটা ছিল তাতে সজোরে আঘাত করলেন হাত দিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে এক ঝাঁক চড়ুই পাখি উড়ল, উড়েই আবার বিলীন হয়ে গেল অন্ধকারে। বোকার মতো চেয়ে রইলেন তিনি সেদিকে। তারা যখন অন্তর্ধান করল তখন চাইলেন নক্ষত্রের দিকে । অনেকক্ষণ চেয়ে রইলেন।

"আমার রাগ হচ্ছে"—ভাবতে লাগলেন তিনি—"কিন্তু কেন? রাগের সঙ্গত কারণ কিছু ঘটেছে কি? কিছু না।"

হঠাৎ রঞ্জাবতীর উপর রাগ হল, কিন্তু পরমুহূর্তেই অনুতাপ করলেন সেজন্য। কাঁধের উপর টাকার ভারটা বেশ ভারী বলে মনে হতে লাগল।

ফোয়ারার কাছে পৌঁছে বাহাদুরি দেখাবার জন্যে তিনি যা করলেন সেটাও খুব সুবুদ্ধির কাজ নয়।

চোর সহিসের কাছে টাকার থলিটা ধপাস করে নামিয়ে বললেন, "এটা তোমার কাছে রাখ। পরে আমি এসে নিয়ে যাব। অনেক টাকা আছে এতে। এর থেকেই বুঝতে পারছ তোমার উপর আমি রাগ করিনি।"

এই বলে গটগট করে চলে গেলেন তিনি, যেন খুব একটা মহৎ কাজ করেছেন। সঙিন উঁচিয়ে নিজের আত্মসম্মানের দুর্গে প্রবেশ করবার হাস্যকর চেষ্টা এটা, আর এসব ক্ষেত্রে যা সাধারণত হয় এক্ষেত্রেও তাই হল—এ চেষ্টাও সফল হল না। বিছানায় শুয়ে সারারাত এপাশ ওপাশ করলেন। একটুও ঘুম হল না। তারপর ভোরের দিকে, ঊষার আলো যখন পূর্বাকাশে ফুটি ফুটি করছে, তখন হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়লেন তিনি। ঘুম ভাঙল বেলা দশটায়। মনে হল এখনই যে কীর্তিভূষণের সঙ্গে দেখা করবার কথা। দেখা করতেই হবে, দেরি হয়ে গেল, তা হোক। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়লেন তিনি ঘর থেকে এবং ধাবিত হলেন সেই সহিসের উদ্দেশে। গিয়ে দেখলেন—আশ্চর্যের বিষয় এটা—সহিস ঠিক আছে, টাকার থলিও ঠিক আছে, তাড়াহুড়ো করে হাজির হলেন 'শুকতারা' সরাইখানায়, একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল অবশ্য, গিয়ে দেখলেন কীর্তিভূষণ সভ্যভব্য পোশাক পরে গম্ভীরভাবে বসে আছে তাঁর অপেক্ষায়। একজন আইনজীবীও কাগজপত্র নিয়ে প্রস্তুত হয়ে আছেন পাশের একটা টেবিলে। দলিলে সেই সহিস এবং সরাইখানার মালিক সাক্ষী হলেন। সরাইখানার মালিক গন্ধরাজকে চিনতে পেরেছিলেন এবং মহারাজের মতই খাতির করেছিলেন তাঁকে। এ দেখে অবাক হয়ে গেল কীর্তিভূষণ, এত খাতির করছে কেন। তারপর ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল তার কাছে যখন গন্ধরাজ দলিলে সই করলেন। তখন আত্মহারা হয়ে পড়ল বেচারা।

"মহারাজা"—আবেগভরে বলে উঠল সে—"মহারাজা" এই কথাটাই বার বার উচ্চারণ করতে লাগল সে। কিছুতেই যেন বিশ্বাস হচ্ছিল না তার। যখন বিশ্বাস হল তখন সে সাক্ষী দুটির দিকে ফিরে বলল, "আপনারা স্বর্গরাজ্যে বাস করছেন। আমি অনেক সদাশয় ভদ্রলোক দেখেছি কিন্তু এঁর মতো লোক আর দেখিনি— সত্যি বলছি দেখিনি। ইনি সত্যিই মহারাজা। আমি বুড়ো মানুষ, অনেক অভিজ্ঞতা আছে আমার, কিন্তু এমন ভদ্রলোক কখনও দেখিনি। সত্যি দেখিনি—সত্যি ভদ্রলোক।"

সরাইখানার মালিক মৃদু হেসে বললেন, "আমরা তা ভালো করেই জানি। ওঁকে যদি আমরা আরও কাছে পেতাম তাহলে বর্তে যেতাম।"

সহিসটিও বলতে শুরু করেছিল—"এরকম দয়ালু মহারাজা—" বলেই চুপ করে গেল সে, হঠাৎ তার চোখ দিয়ে টপটপ করে জল ঝরে পড়ল কয়েক ফোঁটা। সবাই ফিরে চাইল তার দিকে। গন্ধরাজ অবাক হয়ে গেলেন।

এরপর উকীল ভদ্রলোকটিও কিছু বললেন।

"মহারাজা, ভবিষ্যতে কি হবে তা জানি না। কিন্তু এটুকু বলতে পারি আজকের দিনটি আপনার রাজত্বের ইতিহাসে একটি উজ্জ্বল দিন। এই নিরীহ সরল লোকগুলির মুখে আপনার যে জয়ধ্বনি আজ ধ্বনিত হল তা আপনার সমস্ত সৈন্যবাহিনীর জয়ধ্বনির চেয়েও বেশী মুখর, বেশী আন্তরিক।"

এই বলে তিনি অভিবাদন করলেন, একটু পিছিয়ে গেলেন এবং একটিপ নস্যি নিলেন। মনে হল সুযোগ মতো তাক মাফিক ভালো ভালো কথাগুলো বলতে পেরেছেন বলে ভারি একটা আত্মপ্রসাদ হয়েছে তাঁর।

কীর্তিভূষণ বলল, "আপনি জীবনে অনেক আইনের কাজ করেছেন, এ কথা বলাই বাহুল্য, কিন্তু এটা নিঃসন্দেহ, আজ যা করলেন তেমনটি আর কখনও করেননি। আমি বুড়ো মানুষ আপনাকে আশীর্বাদ করছি। আপনি বড়লোক, অনেক বড় বড় সমাজে ঘোরেন, আপনার

সুখের অভাব নেই তবু আমার মতো গরীবলোকের আশীর্বাদে আশা করি আপনার আরও ভালো হবে।''

ব্যাপারটা প্রায় একটা অভিনন্দন-সভার মতো হয়ে দাঁড়াচ্ছিল, কিন্তু গন্ধরাজ আর সেখানে দাঁড়ালেন না। বেরিয়ে এসে একটা অদ্ভুত কথা মনে হল তাঁর। যেখানে গেলে নিশ্চয়ই প্রশংসা পাওয়া যাবে এ রকম একটা জায়গায় যাওয়ার জন্য মনটা আকুল হয়ে উঠল সহসা। মনে পড়ল রাজসভার কথা। সেখানে তিনি যা করেছিলেন তা প্রশংসাযোগ্য নিশ্চয়ই। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ল ইন্দীবর ভারতীর কথা। ঠিক করলেন তাঁর কাছেই যাবেন।

ইন্দীবর ভারতী যথারীতি পাঠাগারেই ছিলেন। গন্ধরাজকে দেখে মনে হল যেন একটু অসন্তুষ্ট ভাবেই তিনি কলমটা নামিয়ে রাখলেন। তারপর বললেন—"এই যে। কি খবর—"

"খবর? আমরা সেদিন বিদ্রোহটা করে ফেলতে পেরেছি, কি বল?"

"হ্যাঁ। আমারও ভয় হচ্ছে তাই।"

"ভয়? ভয় কিসের? আমি এবার আমার শক্তি আর ওদের দুর্বলতা কোথায় তা বুঝতে পেরেছি। এবার থেকে আমিই শাসন করব আমার রাজ্য—"

ইন্দীবর কোনও উত্তর দিলেন না, হেঁটমুণ্ডে নিজের থুতনিতে হাত বোলাতে লাগলেন নীরবে।

"তোমার মত নেই? আচ্ছা খামখেয়ালী লোক তুমি তো!"

"আজ্ঞে না মহারাজ। আমি যতটুকু দেখেছি তাতে আমার ভয়ই হচ্ছে। এ ভাবে চললে কিছুই হবে না।"

"কি ভাবে চললে?"

গন্ধরাজের গালে কে একটা চড় মারল যেন।

"যে ভাবে চলছ। রাজ্যশাসন করতে হলে যে শক্তি, যে চরিত্র, যে সংযম, যে ধৈর্য থাকা দরকার তা তোমার কিচ্ছু নেই। তোমার স্ত্রীর চরিত্রে এ সব আছে, অনেক বেশী আছে। যদিও সে একটা বদলোকের পাল্লায় পড়েছে, কিন্তু তার শাসন করবার ক্ষমতা তোমার চেয়ে ঢের বেশী। সে জানে কত ধানে কত চাল হবে এবং কি করে সেটা নিজের গোলায় তোলা যাবে। আর তুমি, ভাই গন্ধরাজ রাগ কোরো না, তুমি তুমিই। আমার উপদেশ তুমি তোমার খেলার মাঠে ফিরে যাও। নিজেকে কেউ অতিক্রম করতে পারে না, তুমিও পারনি। তুমি বার বার আত্মপ্রকাশ করছ। আমার কোনও কিছুতেই বিশেষ আস্থা নেই, আমি পক্ষপাতহীন নাস্তিক। তবে দুটি ব্যাপারে আমার অনাস্থা সবচেয়ে বেশী, একটি হচ্ছে রাজনীতি, আর একটি চরিত্র-নীতি। তুমি যে সব দুষ্কর্ম কর, সেগুলো আমার ভালোই লাগে, কারণ তা প্রায় সবই নেতি-বাচক, বিশেষ কারো অনিষ্ট করে না, আর আমার জীবনদর্শনের সঙ্গে মেলেও খানিকটা। তাই মাঝে মাঝে তোমার ওই দুষ্কর্মগুলোকে সৎকর্ম বলতেও দ্বিধা করিনি আমি। কিন্তু গন্ধরাজ, এখন দেখছি আমার ভুল হয়েছে। আমার নাস্তিক্যবাদ আমি বর্জন করেছি এবং দেখতে পাচ্ছি যে তোমার দোষ অমার্জনীয়। তুমি মহারাজা হওয়ার উপযুক্ত নও, স্বামী হওয়ার যোগ্যতাও নেই তোমার। একটা প্রচণ্ড গুণ্ডা যদি সব তছনছ করে দেয় তার দক্ষতাকে সহ্য করা যায় কিন্তু ভালো করবার ছুতোয় যদি কেউ আনাড়ীর মতো সব পণ্ড করতে থাকে তাহলে তা অসহ্য।"

গন্ধরাজ নীরবে গুম হয়ে শুনে যেতে লাগলেন।

ইন্দীবর শুরু করলেন আবার—"প্রথমে ছোটখাটো ব্যাপারের কথাই বলছি—স্ত্রীর প্রতি তোমার আচরণ। তুমি নাকি তোমার স্ত্রীর কাছে গিয়ে জবাবদিহি দাবি করেছিলে, এটা ভালো কি মন্দ তার আমি সমালোচনা করছি না। কিন্তু এর ফল হয়েছে তিনি চটেছেন। রাজসভায় প্রকাশ্যে তিনি তোমাকে অপমান করলেন। তুমিও উল্টে অপমান করলে তাঁকে—পুরুষ আর নারী—স্বামী আর স্ত্রী—প্রকাশ্য সভায় ইতরের মতো ঝগড়া করতে লাগলে। আমার মনে হচ্ছিল, এটা রাজসভা না মেছোবাজার। যাক্ সে সব তো চুকে বুকে গেল—তারপর শুনছি না কি—কথাটা আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়েছে চারিদিকে—শুনছি না কি দলিলপত্রে মহারাণীর স্বাক্ষর করবার অধিকারটা তুমি কেড়ে নিয়েছ। এ অপমান তিনি কি কখনও ক্ষমা করবেন? তেজস্বিনী যুবতী নারী—যিনি জানেন যে তোমার বুদ্ধির চেয়ে তাঁর বুদ্ধি অনেক বেশী—তিনি কি এ আঘাত সহ্য করবেন নীরবে? কখনও না। প্রত্যাঘাতের জন্য প্রস্তুত থাকো। পরিশেষে আর একটা কথা, তোমার দাম্পত্য জীবনের যখন এই রকম টলমল অবস্থা তখন তুমি তোমার বৈঠকখানায় ওই রঞ্জাবতীর সঙ্গে ঘেঁষা-ঘেঁষি করে জানলার খোপে বসে স্বচ্ছন্দে আড্ডা দিয়েছ। আড্ডা দেওয়া অন্যায় তা বলছি না, কিন্তু এ কাজটি প্রকাশ্যে করে তোমার স্ত্রীর মর্যাদাহানি করেছ তুমি। তাছাড়া মেয়েটি অপাঙ্গময়ী হতে পারে, কিন্তু অপাংক্তেয়। ওর সঙ্গে কি মহারাজের—"

'ইন্দীবর, রঞ্জাবতীর কোন নিন্দা আমি সহ্য করব না।"

"কোরো না, কিন্তু তার কোনও প্রশংসা আমি করতে পারব না। দেখ, তুমি যদি তোমার স্ত্রীকে নিখুঁত চারুশীলা দেখতে চাও তাহলে তোমার সভা থেকে ওই সব আঁশটে-গন্ধ দূর কর—"

'ইন্দীবর তুমিও কি তোতাপাখির মতো ছেঁদো কথা আওড়াবে? মহিলা বলেই ওর যত অপরাধ? কপিঞ্জল কি তাহলে! রঞ্জাবতী যদি পুরুষ হত—"

"আমার কাছে সব সমান। দেখ—"

ইন্দীবরের কণ্ঠস্বর একটু চড়া হল—"দেখ, যখন বুড়োখোকা এসে ভাঁড়ামি করে হেঁয়ালিতে কথা কয় আর নিজের দোষগুলো নিয়ে বাহাদুরি করতে চায়, তখন আমি মুখ ফিরিয়ে নিই। তখন আমি বলতে বাধ্য হই, তুমি ভদ্রলোক নও, তোমার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব নেই। মহিলা! মহিলা কথাটার মানে জান তুমি? রঞ্জাবতীকে তুমি মহিলা বলছ!"

"রঞ্জাবতীর চেয়ে বড় বন্ধু আমার নেই। আমি ইচ্ছা করি তার সম্বন্ধে সসম্ভ্রমে কথা বলা হোক।"

"সে যদি তোমার বন্ধু হয়ে থাকে তাহলে সেটা তোমার দুর্ভাগ্য। ও জল ওখানেই থেমে থাকবে না, অনেক দূর গড়াবে!"

"বাঃ বাঃ, তোমার উদারতা দেখে মুগ্ধ হলাম। ফলে একটু দাগ থাকলেই সেটা পচা? চমৎকার যুক্তি তোমার। কিন্তু আমি তোমাকে বলছি রঞ্জাবতীর উপর তুমি ঘোর অবিচার করছ!"

"আমাকে বলতে তোমার বাধা থাকা উচিত নয়। তুমি কি ওকে বাজিয়ে দেখেছ? ঘোড়ায় চড়েছ, না ঘোড়াটা দেখেই—"

গন্ধরাজের মুখটা লাল হয়ে উঠল।

"মুখ চোখ লাল হয়ে উঠল যে। তোমার স্ত্রীর দিকে চেয়ে লজ্জায় তোমার অধোবদন হওয়া উচিত। ও রকম মেয়েকে পেয়ে হাতছাড়া করে ফেলছ তুমি। ও রকম টকটকে রাঙা জবার মতো মেয়ে—ওর চোখে যে দীপ্তি জাজ্বল্যমান তা ওর আত্মার প্রকাশ।"

"সুরূপিণীর সম্বন্ধে সুর বদলে ফেলেছ দেখছি—"

ভুরু কুঁচকে বললেন গন্ধরাজ।

"বদলে ফেলেছি?"—উদ্দীপ্ত কণ্ঠে উত্তর দিলেন ইন্দীবর—"অন্যরকম কবে ছিল? আমি উচ্চকণ্ঠে স্বীকার করছি রাজসভায় তার যা চেহারা দেখেছি তা অপূর্ব। নীরবে বসে সে যখন পায়ের জুতো ঠুকছিল তখন বিস্মিত হয়ে গিয়েছিলাম আমি, ঝড়কে দেখে যেমন হই, তেমনি। দাম্পত্যের দুরূহ পথে যদি কখনও পদার্পণ করতে প্রলুব্ধ হই—ওই রকম মেয়ের জন্যই হব। সত্যিই প্রলুব্ধ করে, দ্রৌপদী যেমন প্রলুব্ধ করেছিল অর্জুনকে। লক্ষ্য ভেদ করা শক্ত, খুবই শক্ত, কিন্তু ও রকম মেয়েরা বীরভোগ্যাই হয়। ও রকম পুরস্কারের জন্য কৃচ্ছ্রসাধন করতে পারি। কিন্তু ওই রঞ্জাবতীর সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করা—কখনও না। কাম? ওটা আমি বর্জন করেছি। ও চুলকোনি ছাড়া কিছু নয়। কৌতূহল? শরীরতত্ত্বের বই খুললেই তা মিটে যায়—তার জন্যে—"

"কাকে তুমি কি বলছ! তুমি অন্ততঃ জান আমি সুরূপিণীকে ভালবাসি—আর কেউ না জানুক।"

"ও ভালবাসা! প্রেম! মস্ত কথা ওটা, সব অভিধানেই আছে। তুমি যদি তাকে ভালবাসতে তাহলে তার প্রতিদানও নিশ্চয় পেতে। ও তো বেশী কিছু চায় না—একটু আদর, একটু উচ্ছ্বাস, একটু উত্তাপ, একটু হাব-ভাব—"

"কিন্তু দুজনের ভালবাসা একজন কি বাসতে পারে? খুব শক্ত সেটা।"

"শক্ত বলছ? ওইটেই তো কষ্টিপাথর। কবিরা কি বলে গেছেন মনে নেই? আমরা তো মরুভূমি—কেবল ধুলো-বালি আর উত্তাপ, জীবনের শ্যাম-শোভা সেখানে নেই। প্রেমই তাকে স্নিগ্ধ করে। বিরাট পর্বতের মতো দাঁড়িয়ে প্রেম যে শীতল ছায়া বিস্তার করে সে ছায়ায় শুধু প্রণয়ী নয়, প্রণয়িনী এবং তার ছেলে মেয়েরাও আশ্রয় পায়, বন্ধু-বান্ধবরাও সে ছায়ার প্রান্তে এসে শান্তি খোঁজে। যে প্রেম গৃহস্থালীর নীড় রচনা করতে পারে না সে প্রেম প্রেমই নয়। খুঁত ধরে ঝগড়া করাকে তুমি প্রেম বল? প্রণয়িনীর পথে পদে পদে বাধা সৃষ্টি করে তার মুখের উপর প্রকাশ্যে অপমান ছুঁড়ে দেওয়াটা কি প্রেমের লক্ষণ? প্রেম!"

"ইন্দীবর, তুমি আমার উপর অবিচার করছ। আমি তখন দেশের জন্য লড়ছিলাম।"

"আর ওইখানেই সাংঘাতিক ভুল করেছ। তুমি বুঝতেও পারনি যে ভুল করছ। রাজপরিষদ যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, যতদূর এগিয়েছিল সেখান থেকে এখন পিছিয়ে আসা মানে যে সর্বনাশ এটা তোমার মাথায় ঢোকেনি।"

"কিন্তু তুমি তো আমাকে সমর্থন করেছ।"

"করেছি। কারণ আমিও তোমার মতো হাঁদা। কিন্তু এখন আমার চোখ খুলেছে। এখন বুঝতে পারছি তুমি যদি এই চালে চল, ওই কপিঞ্জল লোকটাকে যদি প্রকাশ্যে অপমান কর, এবং তোমার গৃহবিচ্ছেদের কেলেঙ্কারি যদি ঢাক ঢোল বাজিয়ে প্রচার করে বেড়াও তাহলে গর্জনগাঁওয়ের সর্বনাশ হয়ে যাবে। বিদ্রোহ হবে, বিদ্রোহ—"

"তুমি নিজেকে লাল বিদ্রোহী বল। বিদ্রোহকে এত ভয় তোমার? এসব কথা তোমার মুখে মানাচ্ছে না।"

"হ্যাঁ, আমি লালই, কিন্তু প্রজাতন্ত্রী লাল। রাষ্ট্রবিপ্লবী নই। উন্মত্ত গর্জনগাঁওয়ের জনতা অতি জঘন্য অতি ভয়ঙ্কর। মাত্র একটি লোকই ওদের ঠাণ্ডা করতে পারে, দেশকে এ বিপদ থেকে বাঁচাতে পারে—সে হচ্ছে ওই দুমুখো সাপ কপিঞ্জল। তুমি যেমন করে পার ওর সঙ্গে ঝগড়া মিটিয়ে ফেল। তাহলেই দেশে শান্তি ফিরে আসবে। তুমি তা পারবে না, তোমার সে ক্ষমতাই নেই। তোমার সুরূপিণী যা বলেছিল তাই তুমি। তুমি মহারাজাপদের সুযোগ নিয়ে নিজের খেয়ালখুশির মালমসলা সংগ্রহ করতে ব্যস্ত। কাল টাকার জন্যে তুমি নাছোড়বান্দা ভিকিরির মতো ভিক্ষে করছিলে। কেন? রাজকোষের টাকা কেন নেবে? এ কি অদ্ভুত নির্বুদ্ধিতার হেঁয়ালি! কি দরকার ছিল টাকার!"

"কোন মন্দ কাজের জন্যে নয়। একটা খামার কেনবার জন্যে।"

"খামার! খামার কেনবার জন্যে!"

"কেন, ক্ষতি কি। আমি কিনেও ফেলেছি।"

ইন্দীবর যেন লাফিয়ে উঠলেন।

"কি করে কিনলে?"

"কি করে?"

"হ্যাঁ, কি করে। টাকা পেলে কোথায়—"

গন্ধরাজের মুখটা কালো হয়ে গেল।

"পেয়েছি কোথাও থেকে। তা তুমি না-ই বা শুনলে।"

"কথাটা বলতে লজ্জা হচ্ছে তোমার। তোমার রাজ্যের যখন টাকার এত দরকার তখন তুমি খামার কিনছ, সম্ভবত তোমার ইচ্ছে সিংহাসন ত্যাগ করে সেইখানে গিয়ে বসবাস করবে! আমি বলছি তুমি টাকাটা চুরি করেছ। টাকা পাওয়ার তিন রকম উপায় নেই, মাত্র দুরকম আছে—হয় উপার্জন করা, না হয় চুরি করা। উপার্জন করবার ক্ষমতা তোমার নেই, সুতরাং তুমি চুরি করেছ, আর তা নিয়ে আমার কাছে বাহাদুরি করছ। দেখ, একটা সোজা কথা স্পষ্ট করে বলছি তোমাকে। যতক্ষণ আমি এই খামার খরিদের সম্পূর্ণ বিবরণ না জানছি, ততক্ষণ আমি আর তোমার ব্যাপারে নেই। হাত গুটিয়ে নিলাম। মহারাজা হিসাবে তুমি অযোগ্যতম হতে পার, কিন্তু ভদ্রলোক হিসাবে তোমাকে নিষ্কলঙ্ক হতে হবে।

বিবর্ণ মুখে উঠে দাঁড়ালেন গন্ধরাজ।

"ইন্দীবর তুমি আমাকে আমার ধৈর্যের সীমার ওপারে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছ। তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি—"

"তুমি আমাকে ভয় দেখাচ্ছ, বন্ধু"—গম্ভীর ভাবে প্রশ্ন করলেন ইন্দীবর—"তাহলে তো এ নাটকের অদ্ভুত উপসংহার হল।"

"ব্যক্তিগত কারণে কবে আমি আমার ক্ষমতা ব্যবহার করেছি? তুমি আমাকে যা বললে যে কোনও লোকের পক্ষেই তা অমার্জনীয় অপমান, কিন্তু আমাকে লক্ষ্য করে তুমি নিরঙ্কুশ ভাবে তীরের পর তীর চালিয়ে গেলে, কারণ তুমি জান আমি তোমায় কিছু বলতে পারব না এবং হয়তো এ আশাও করেছ যে তোমার স্পষ্টবাদিতার জন্যে তোমার কাছে কৃতজ্ঞতাও

প্রকাশ করব। বেশ, আমি তা করছি এবং এ-ও বলছি তোমাকে শুধু ক্ষমাই করলাম না, তোমার প্রশংসাও করছি, আমার মতো একজন পিশাচ-মহারাজার সঙ্গে এতদিন ছিলে বলে। কিন্তু তুমি যে নিষ্ঠুর হাতে আমাদের পুরোনো প্রেমটাকে এমনভাবে উপড়ে ফেলতে পার তা ভাবিনি। বুকটা খালি হয়ে গেল। শেষ বন্ধনটাও ছিঁড়ে গেল। ভগবান সাক্ষী আমি যা করতে চেয়েছি তা মন্দ নয়, ভালো। পাপ নয়, পুণ্য। কিন্তু তার এই পুরস্কার। কোন বন্ধু রইল না, একা হয়ে গেলাম। তুমি বললে আমি ভদ্রলোক নই, কিন্তু এতক্ষণ তোমার মুখেই গালাগালির খই ফুটেছে, আমি একটি অভদ্র কথাও উচ্চারণ করিনি। যদিও আমি বুঝতে পারছি কার জন্যে তোমার এত দরদ, তবু আমি মুখ বুজেই আছি, মুখ বুজেই থাকব।"

"পাগল হয়ে গেলে না কি তুমি!"

চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠলেন ইন্দীবর।

"যেহেতু আমি জানতে চাই যে কি করে তুমি টাকাটা পেলে এবং যেহেতু তুমি তা বলতে রাজী নও—তাই—"

"পণ্ডিতপ্রবর মহামান্য ইন্দীবর ভারতী, আমার ব্যাপারে তোমাকে আর নাক গলাতে হবে না, তোমার হিতৈষণা তোমার কাছেই থাক। আমি যা জানতে চেয়েছিলাম তা জেনেছি, তুমি আমার অহঙ্কারকে দুপায়ে পিষে চূর্ণবিচূর্ণও করেছ। আমি রাজ্যশাসন করতে পারি না, আমি ভালওবাসতে পারি না—এসব হয়তো সত্যি, তুমি অন্তত জোরের সঙ্গে তা বললে, নিশ্চয়ই তোমার বিবেকেরও সায় আছে ওতে, কিন্তু ভগবান আমাকে একটা ক্ষমতা দিয়েছেন, আমি সব জেনে সব শুনেও ক্ষমা করতে পারি। আমি তোমাকে ক্ষমা করলাম, আমার মনের এই শোচনীয় অবস্থাতেও আমি বুঝতে পারছি কি কি আমার দোষ এবং তুমি সেজন্য উদ্বিগ্ন হয়েছ কেন। ভবিষ্যতে যদি তোমার সঙ্গে বাক্যালাপ বন্ধ করি তাহলে ভেবো না যে আমি রাগ করে তা করেছি। রাগ নয়, কিন্তু তুমি আমাকে যে ভাবে যে ভাষায় আক্রমণ করেছ, তা বার বার সহ্য করবার ক্ষমতা আমার নেই। তোমার মহারাজাকে কাঁদিয়ে এবং ব্যথা দিয়ে তুমি তৃপ্তি পেয়েছ এবং যে লোকটার সুখকে নিয়ে তুমি কতবার ব্যঙ্গবিদ্রূপ করতে তাকে ধুলোয় নামিয়ে নির্জন পথের পথিক করে দিয়ে সুখ পেয়েছ—ব্যাস্। না আর কোনও কথা আমি শুনতে চাই না। মহারাজা হিসাবে শেষ কথাটা বলবার দাবি আমার আছে—সেই কথাটা বলে আমি চলে যাচ্ছি—আমি তোমাকে ক্ষমা করলাম।"

এই কথা বলে গন্ধরাজ চলে গেলেন। একা বসে রইলেন ইন্দীবর ভারতী। দুঃখ, অনুতাপ (এবং ঈষৎ আনন্দ)— পরস্পরবিরোধী এই সব মনোভাব দ্বন্দ্ব শুরু করে দিলে তাঁর অন্তরে। উঠে দাঁড়ালেন তিনি, পায়চারি করতে লাগলেন টেবিলের সামনে। মাথার উপরে দু'হাত তুলে তিনি বার বার প্রশ্ন করতে লাগলেন, এই বন্ধুবিচ্ছেদের জন্যে দুজনের মধ্যে কে বেশী দায়ী। তারপর আলমারি খুলে বার করলেন মাধ্বী সুরা আর পদ্মরাগখচিত একটি পানপাত্র। প্রথম পাত্র নিঃশেষ করে ধাতস্থ হলেন একটু। দ্বিতীয় পাত্রের পর মনে হল তিনি যেন সূর্যকরোজ্জ্বল একটা পাহাড়ের শীর্ষে দাঁড়িয়ে এই সব ঝামেলাগুলোকে নিরীক্ষণ করছেন। এইভাবে কেটে গেল খানিকক্ষণ মনোরমা মায়া-সান্ত্বনা আর মিথ্যা-সুখের মোহে অভিভূত হয়ে। ক্রমশঃ সমস্ত জীবনটাকেই তিনি যেন একটা সোনালী স্বপ্নের মতো দেখতে লাগলেন।

তারপর একটু লজ্জিত হয়ে একটু মৃদু হেসে, একটু নিঃশ্বাস ফেলে তিনি নিজের কাছে স্বীকার করলেন তাঁর ভাইটিকে তিনি যা বলেছেন তা একটু বেশী স্পষ্ট, বেশী রূঢ়। 'সে-ও সত্যি কথাই বলেছে'—অনুতপ্ত ইন্দীবর মনে মনে বললেন—'যদিও আমি সন্ন্যাসী লোক, তবু আমি সুরূপিণীকে ভালোবাসি—সন্ন্যাসীর ধাঁচেই বাসি, কিন্তু বাসি যে তাতে কোনও সন্দেহ নেই।'

কথাটা নিজের কাছে স্বীকার করেই লাল হয়ে উঠল ইন্দীবরের কানের ডগা, মনে হল তিনিও যেন চুরি করছেন। আবার বসে পড়লেন চেয়ারে এবং সুরূপিণীর উদ্দেশ্যেই পান করলেন আর এক পাত্র সুরা।

।। পনেরো।।

সেদিন রঞ্জবতী দেবী যখন বাইরে বেরুলেন তখন দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়েছে। বেলা প্রায় তিনটে। তরতর করে সিঁড়ি দিয়ে নেবে সামনের বাগানটা হনহন করে পার হতে লাগলেন তিনি। তাঁর মাথায় কাঁধে সূক্ষ্ম মসলিনের মতো খুব স্বচ্ছ, খুব সুন্দর মেঘবরণ একটি ওড়না উড়ছে, দামী নীলাম্বরী শাড়ির প্রান্তটা লুটিয়ে পড়েছে ধুলোয়।

সুদীর্ঘ বাগানটির অপর প্রান্তে রঞ্জাবতীর বাড়ির কাছেই দেখা যাচ্ছে আর একটি বৃহৎ প্রাসাদ। এই প্রাসাদে প্রধান মন্ত্রী কপিঞ্জল রাজকীয় কর্তব্য নির্বাহ এবং অবসর বিনোদন করেন। রঞ্জাবতীর বাড়ি এবং এই প্রাসাদের দূরত্বটা পার্বতীসমাজের আইন অনুসারে খুব অশোভন নয়।

রঞ্জাবতী দ্রুতবেগে পার হয়ে প্রাসাদের পিছন দিকে একটি ছোট কপাটের সামনে এসে দাঁড়ালেন। কপাটে তালা বন্ধ ছিল। রঞ্জাবতী চাবি বার করে খুললেন সেটি। খুলেই সিঁড়ি। সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠলেন এবং বিনা ভূমিকায় সোজা গিয়ে ঢুকে পড়লেন কপিঞ্জলের পাঠাগারে। বেশ উঁচু প্রকাণ্ড ঘরটি। চারদিকের দেওয়ালে থাকে থাকে বই, টেবিলের উপর, মেজেতে কাগজপত্র ছড়ানো, মাঝে মাঝে দু-একটা ছবি, পরদা-টরদার বিশেষ বালাই নেই। ঘরের এক ধারে সুদৃশ্য পাথর দিয়ে বাঁধানো একটি অগ্নিকুণ্ডে গনগনে আঁচ উঠেছে। ঘরের ছাতের উপর থেকে প্রকাণ্ড একটি গম্বুজের ভিতর দিয়ে আলো ঢুকছে ঘরে। এরই মধ্যে বসেছিলেন মহামহিম প্রধান মন্ত্রী কপিঞ্জলদেব, একটা হাত-কাটা কামিজ পরে। তাঁর সেদিনের কাজকর্ম প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছিল, বিশ্রাম করবার জন্যে একটু ঢিলে-ঢালা ভাবে বসেছিলেন তিনি। মনে হচ্ছিল তাঁর চেহারায়, এমন কি তাঁর প্রকৃতিতেও যেন একটা গুরুতর পরিবর্তন ঘটেছে কিছু। যে কপিঞ্জল প্রধানমন্ত্রীরূপে কাজকর্মে লিপ্ত থাকেন তাঁর সঙ্গে ঘরোয়া কপিঞ্জলের আকাশপাতাল তফাত। তাঁর চোখে মুখে বিশাল বপুতে যে আনন্দোচ্ছল ভাবটা ফুটে উঠেছিল তা বেশ মানিয়েছিল তাঁকে; স্থূলতার সঙ্গে স্ফূর্তির অদ্ভুত সমন্বয় ঘটেছিল যেন। তাঁর মন্ত্রীসুলভ মুখোশ, ধূর্ত কুটিল ভাব-ভঙ্গী কিচ্ছু ছিল না তখন। তিনি আগুনের সামনে খোশমেজাজে বসে আরাম করছিলেন। একটা বিরাট জানোয়ার যেন রোদ পোয়াচ্ছে।

''আরে, এই যে! এলে অবশেষে—''

রঞ্জাবতীকে দেখে বলে উঠলেন তিনি। রঞ্জাবতী কোনও উত্তর না দিয়ে এগিয়ে এসে একটা চেয়ারে বসলেন পায়ের উপর পা তুলে। তাঁর সুগঠিত পায়ের কালো মোজার খানিকটা এবং সুদৃশ্য নকশা করা সায়ারও নীচের দিকটা প্রকট হয়ে পড়ল। তাঁর মার্জিত মুখচ্ছবি, আঁটসাঁট দেহের সংযত মাধুরী সহসা যেন বিজয়িনীর মতো প্রতিষ্ঠিত করল নিজেকে—ওই প্রকাণ্ড কালো শয়তান দৈত্যটার পাশে।

''বার বার তুমি আমাকে ডেকে পাঠাও''—রঞ্জাবতী বললেন—''লোকে কি বলবে বল তো! আমার বুঝি লজ্জা করে না?''

হেসে উঠলেন কপিঞ্জল।

''এ কথায় মনে পড়ল, কোথায় ছিলে তুমি বল তো। কাল সমস্ত রাত তো তুমি বাড়িতে ছিলে না।''

''না। শিবমন্দিরে পুজো দিতে গিয়েছিলাম।''

হো হো করে হেসে উঠলেন কপিঞ্জল এবার। অনেকক্ষণ ধরে হাসলেন, তাঁর দেহের মেদবহুল অংশগুলো হাসির ধাক্কায় থলথল করতে লাগল।

''ভাগ্যে আমার ঈর্ষা-বাতিক নেই। থাকলে অন্য রকম সন্দেহ করতুম। তুমি তো আমাকে চেনো, আমার ফুর্তির জন্যে কারও স্বাধীনতা আমি ক্ষুণ্ণ করি না, স্বাধীনতা আর ফুর্তি দুই হাত ধরাধরি করে চলুক আপত্তি নেই। আমি যা বিশ্বাস করি তা আঁকড়ে থাকি, সেটা খুব বড় কিছু নয় হয়তো, কিন্তু সেটা আমি আঁকড়ে থাকি। এবার কাজের কথায় আসা যাক—আমার চিঠি পড়েছ তো?''

''না পড়তে পারিনি। খোলাই হয়নি। যা মাথা ধরেছিল—''

''ও, তাই নাকি। তবে শোন মস্ত খবর আছে। কাল সমস্ত রাত তোমার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে আমি পাগল হয়ে উঠেছিলাম। আজ সমস্ত সকালও তোমার প্রতীক্ষায় ছিলাম। মস্ত খবর আছে। কাল বিকেলে আমি কাজ ফতে করেছি, নৌকা বন্দরে এসে গেছে, একটা মোক্ষম টানেই তীরে ভিড়ে যাবে এবার। তারপর আর মহারাণী আদরিণীর হুকুম তামিল করতে হবে না আমাকে । হ্যাঁ, সব ঠিকঠাক। আদরিণী নিজের হাতে আদেশপত্র লিখে দিয়েছে। বুকে করে রেখেছি সেটা। আজ ঠিক রাত বারোটার সময় মহারাজ গোবর-গণেশকে তাঁর শোবার ঘরে বিছানায় বন্দী করে খোকার মতো পাঁজাকোলা করে চটপট রথে তুলে ফেলা হবে। পরদিন সকালে শূলপাণি দুর্গের নির্জন কারাগারে বসে মনোরম পার্বত্য দৃশ্য দেখবার সুযোগ পাবেন তিনি। তারপর যবনিকাপাত হবে গোবর-গণেশের রাজত্বের উপর। যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে, আদরিণী এসে যাবে আমার হাতের মুঠোর মধ্যে। এতদিন আমি তার অপরিহার্য ভৃত্য ছিলাম, এখন আমিই সর্বেসর্বা হব। বহুকাল থেকে'' এবার বেশ জোর দিয়ে বললেন—''হ্যাঁ, বহুকাল থেকে এই দুরাশাটাকে প্রকাণ্ড পাহাড়ের মতো কাঁধে বয়ে নিয়ে বেড়িয়েছি ! সে পাহাড় আজ নাবল। পাহাড়ের শিখরে শিখরে এখন উষার আলো ঝলমল করছে—''

রঞ্জাবতীর মুখ শুকিয়ে গেল, দাঁড়িয়ে উঠলেন তিনি।

''সত্যি বলছ?''

''সত্যি। বর্ণে বর্ণে সত্যি। পাখি ফাঁদে ধরা পড়েছে।''

"আমি বিশ্বাস করি না। মহারাণী নিজের হাতে আদেশপত্র দিয়েছেন? অসম্ভব! এ আমি কখনও বিশ্বাস করব না কপিঞ্জল—"

"আমি দিব্যি করে বলছি।"

"দিব্যিতে তোমার বিশ্বাস আছে? আমার তো নেই। তুমি কিসের নামে দিব্যি করবে? মদ, মেয়েমানুষ, না গান? ও-সবের কোন দাম নেই আমার কাছে"—এই বলে, রঞ্জাবতী কপিঞ্জলের আরও কাছে সরে গেলেন। তাঁর বাহুতে হাত রেখে বললেন—"আদেশপত্রের কথা আমি বিশ্বাস করলাম না, কখনও করব না। মরে গেলেও করব না। তোমার অন্য কোনও গোপন মতলব আছে—কি সেটা তা বুঝতে পারছি না—কিন্তু তুমি যা বলছ তার একটি বর্ণ সত্য নয়।"

"আদেশটা তোমাকে দেখাব?"

"যা নেই তা দেখাবে কি করে! আমাকে ধাপ্পা দিও না।"

"আশ্চর্য কাণ্ড! আমার কথায় তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না? আচ্ছা, দেখ তবে। দেখাচ্ছি তোমাকে আদেশপত্রটা—"

একটা চেয়ারের উপর কপিঞ্জলের গায়ের জামাটা পড়ে ছিল। সেই জামার পকেট থেকে তিনি কাগজটা বার করলেন।

"পড়।"

লোলুপহস্তে কাগজটা প্রায় ছিনিয়ে নিলেন রঞ্জাবতী। পড়তে পড়তে তাঁর চোখের দৃষ্টি থেকে যেন আগুনের হলকা ছুটে বেরুল।

"বুঝেছ, একটা রাজবংশের উচ্ছেদ হল আর তা উচ্ছেদ করলাম আমি। তুমি আর আমি এবার এ রাজত্ব ভোগ করব।"

বলতে বলতে কপিঞ্জলের বুকটা যেন বেশী চিতিয়ে গেল, মাথাটা আর একটু উঁচু হল, সমস্ত চেহারাটাই যেন স্ফীত হয়ে উঠল। তারপর একটু হেসে হাত বাড়িয়ে বললেন—"দাও ছোরাটা দাও, রেখে দি।"

রঞ্জাবতী হঠাৎ চট করে কাগজটা পিছন দিকে লুকিয়ে ঘনঘটাচ্ছন্ন মুখে ঘুরে দাঁড়ালেন কপিঞ্জলের চোখের দিকে চেয়ে।

"না, না। তোমার সঙ্গে একটা বোঝা-পড়া করতে চাই আগে। তুমি কি মনে কর আমি অন্ধ? কেবল একটি লোককেই এ রকম আদেশপত্র, ও দিতে পারে--যে ওর প্রেমিক। না, অস্বীকার কোরো না। তুমি ওর প্রেমিক, তুমি এই ষড়যন্ত্রে ওর সহকারী, তুমি ওর প্রভু, বুঝেছি, সব বুঝেছি আমি, তোমার ক্ষমতা যে কত তা আমার অজানা নেই। কিন্তু আমার স্থান কোথায়? আমাকে, যাকে তুমি প্রতারণা করেছ, আমাকে কোন জাহান্নমে পাঠাবে এখন!"

'ঈর্ষা! তোমার কাছে এটা প্রত্যাশা করিনি রনজু। বিশ্বাস কর, আমি মুক্তকণ্ঠে বলছি, আমি ওর প্রণয়ী নই। হয়তো হতে পারতাম, কিন্তু প্রেমের কথা বলতে সাহসই হয়নি আমার। মেয়েটা এমন আবছাগোছের ধোঁয়া-ধোঁয়া, এমন ছলাকলাময়ী খুকী, এমন ধরা-ছোঁয়ার বাইরে— যে ওকে প্রেমের কথা বলতে সাহস হয় না। কেবল বাইরের চাপ দিয়ে ওকে প্রেমের কথা বলতে সাহস হয় না। কেবল বাইরের চাপ দিয়ে ওকে আমি হাতে রেখেছি,

প্রেমিক কপিঞ্জল নেপথ্যে ওত পেতে দাঁড়িয়ে আছে ভবিষ্যৎ প্রয়োজনের জন্য। কিন্তু সে প্রয়োজন হয়নি। রনজু, তুমি নিজেকে সামলাও, এ সময় এসব অগ্নিকাণ্ড চলবে না। মেয়েটাকে এই বিশ্বাসে আমি ভুলিয়ে রেখেছি যে আমি তাকে পুজো করি, সে দেবী, আমি ভক্ত সেবক। এ সময় সে যদি ঘুণাক্ষরে তোমার আমার সম্পর্কের কথা টের পায়, সে যে রকম নির্বোধ, যে রকম ন্যাকা, যে রকম হিংসুকে তাহলে সে তো সমস্ত পণ্ড করে দেবে।''

''বক্তৃতাটি চমৎকার। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞেস করি—কার সঙ্গে তুমি দিনের পর দিন কাটাও? আমি কাকে বিশ্বাস করব, তোমার কথাকে, না, তোমার কাজকে?''

''কি মুশকিল রনজু, তুমি কি অন্ধ? তুমি আমাকে ভালো করেই জান। আমার পক্ষে ওরকম একটা ঠুনকো পুতুলকে ভালোবাসা কি সম্ভব? আমরা এতদিন একসঙ্গে আছি তবু তুমি যে আমাকে একটা অপদার্থ কবি বলে ভাবছ এটা সত্যিই কষ্টকর। আমি বরাবর ঘেন্না করে এসেছি ওই শাড়ি জামা গয়না জড়ানো ন্যাকড়ার পুতুলদের। আমি চাই রক্তমাংসের মেয়ে—তোমার মতো। তুমিই আমার উপযুক্ত সঙ্গিনী। আমার জন্যেই ভগবান তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, তুমিই আমার আনন্দ, প্রেরণা, সব। তোমাকে ঠকিয়ে আমার লাভ কি হবে? তোমাকে সত্যিই যদি ভালো না বাসি তাহলে তোমাকে আমার প্রয়োজনই বা কি। কিছু নেই। দিনের আলোর মতো কথাটা স্বচ্ছ।''

''সত্যিই তুমি আমাকে ভালোবাস কপিঞ্জল?''—রঞ্জাবতী যেন গলে গেলেন—''সত্যি?''

''নিশ্চয় সত্যি। আমি সবচেয়ে বেশী ভালোবাসি নিজেকে। তারপর তোমাকে। তোমাকে যদি হারাই তাহলে আমি নিঃস্ব হয়ে যাব।''

''তাহলে''—কাগজটি পরিপাটিরূপে ভাঁজ করে রঞ্জাবতী গম্ভীর ভাবে সেটি নিজের জামার ভিতর রাখলেন—''তাহলে আমি তোমাকে বিশ্বাস করব এবং তোমার ষড়যন্ত্রে যোগ দেব। আমার উপর নির্ভর করতে পার। রাত দুপুরে, বললে না? অঙ্গপ্রদেশের সেনাপতি ধূর্জটি সিং সঙ্গে থাকবেন, বুঝেছি। ঠিক লোককেই নির্বাচন করেছ। লোকটা কোন কিছুতেই পিছ-পা হবে না।''

কপিঞ্জল সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন তাঁর দিকে।

''কাগজটা তুমি নিলে কেন। ওটা আমাকে দাও।''

''না। এটা আমার কাছে থাকবে। আঘাতটা আমিই হানব, তার জন্যে প্রস্তুতি দরকার। আমি ছাড়া এ কাজ একা তুমি করতে পারবে না। আর ব্যাপারটা ভালোভাবে করতে হলে কাগজটা আমার কাছে থাকা দরকার। ধূর্জটি সিংয়ের কোথায় দেখা পাব? তাঁর ঘরে কি?''

যদিও খুব শান্তভাবে রঞ্জাবতী কথাগুলো বলবার চেষ্টা করছিলেন তবু চাপা উত্তেজনায় তাঁর গলার স্বর কেঁপে উঠছিল মাঝে মাঝে।

''রনজু''—কঠিন দৃঢ়কণ্ঠে আদেশের সুরে কপিঞ্জল কথা কইলেন এবার। এতক্ষণ যে দিলদরিয়া ঘরোয়া ভাব ছিল সেটা লুপ্ত হয়ে গেল নিমেষে। কর্কশমূর্তি প্রধান মন্ত্রী আত্মপ্রকাশ করলেন।

''রনজু, কাগজটা আমি ফেরত চাইছি—এক, দুই, তিন—''

তাঁর মুখের দিকে স্পর্ধিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে রঞ্জাবতী বললেন, ''দেখ কপিঞ্জল, কোনও হুমকি আমি সহ্য করব না।''

দুজনের চেহারাই ভয়ানক হয়ে উঠল; একটা ভয়ঙ্কর নীরবতা থমথম করতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে রঞ্জাবতীই নীরবতা ভঙ্গ করলেন একটা তীক্ষ্ণ অকপট হাসি হেসে।

"খোকার মতো অবুঝ হয়ো না কপিঞ্জল। তোমার ব্যবহারে আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি। তুমি যা যা বললে তা যদি সত্যি হয়, তাহলে আমাকে অবিশ্বাস করবার কি কারণ থাকতে পারে, আমিই বা শুধু শুধু বিশ্বাসঘাতিনী হতে যাব কোন স্বার্থে। গন্ধরাজকে প্রাসাদ থেকে চুপচাপ কোন হইচই না করে সরিয়ে ফেলাটাই শক্ত কাজ। তার দেহরক্ষীরা বিশ্বাসী, তার প্রধান-পরিচারক তার অন্ধ ভক্ত। একটি চীৎকারে সব নষ্ট হয়ে যেতে পারে।"

"তাদের কাবু করতে হবে। হাত পা মুখ বেঁধে তাদেরও চালান করে দিতে হবে মহারাজের সঙ্গে। গন্ধরাজের সঙ্গে সঙ্গে তারাও উপে যাবে।"

"সঙ্গে সঙ্গে উপে যাবে তোমার সমস্ত মতলব আর ফন্দী ফিকির। মহারাজ যখন শিকারে যান তখন এখানকার একটি চাকরকেও সঙ্গে নেন না। একটা শিশুও ধরে ফেলবে কি হয়েছে। না, তুমি যা ভেবে রেখেছ তা একদম বাজে। বুদ্ধিটা কি আদরিণী দিয়েছে? এখন আমি যা বলছি শোন। তুমি বোধহয় জান গন্ধরাজ আমার প্রেমে পাগল?"

"জানি। বেচারা গোবর-গণেশের পথে আমিই তো কণ্টক।"

"ধর, আমি যদি তাকে রাজপ্রাসাদ থেকে চুপি চুপি বার করে এনে বাগানের কোনও নির্জন জায়গায় ভুলিয়ে নিয়ে যাই—ধর ঐ উড়ন্ত পরীটা যেখানে আছে, সেইখানে। কাছাকাছি কোনও একটা ঝোপে ধূর্জটি সিং লুকিয়ে থাকুক। মহারাজের গাড়িও থাকতে পারে মন্দিরটার পিছনে। চুপচাপ নির্বিঘ্নে হয়ে যাবে সব। কাক পক্ষীটি পর্যন্ত টের পাবে না। গন্ধরাজ লোপাট হয়ে যাবেন। কি মনে হচ্ছে? আমি তোমার যোগ্য সহচরী নই? আমার এ বুদ্ধিটা কি তুচ্ছ করবার মতো? তোমার রনজুকে হাতছাড়া কোরো না কপিঞ্জল, তার ক্ষমতা আছে।"

কপিঞ্জল টেবিলের উপর ঘুষি মারলেন একটা।

তারপর বললেন—"ডাইনি! তোমার জোড়া সারা ভারতবর্ষে নেই। তুমি যা বললে তা চমৎকার। ব্যাপারটা চাকার মতো গড়গড় করে গড়িয়ে যাবে।"

"তাহলে আমাকে চুমু খেয়ে ছেড়ে দাও অবিলম্বে। গোবর-গণেশকে মাৎ করে আসি। দেরি করলে কোথাও বেরিয়ে যাবে হয়তো।"

"থাম, থাম, অত হড়বড় কোরো না। তোমাকে বিশ্বাস করতে পারলে বেঁচে যেতাম। কিন্তু তুমি—কি বলব—এমন খামখেয়ালী, এমন চপলা—যে তোমাকে বিশ্বাস করতে সাহস হয় না। না, হয় না। তুমি যা বলছ—না, অসম্ভব সেটা।"

"তুমি আমাকে সন্দেহ করছ কপিঞ্জল!"

"কথাটা ঠিক সন্দেহ নয়। কিন্তু আমি তোমাকে চিনি। একবার ওই কাগজটা নিয়ে তুমি যদি এখান থেকে কেটে পড়—তাহলে কি যে করবে কে জানে। আমি তো জানিই না, তুমিও জান না। তুমি যে একটি পাগলী, অনেক রকম বাঁদুরে বুদ্ধি খেলে তোমার মাথায়—"

"আমি তোমার কাছে শপথ করছি। ভগবানের নামে শপথ করছি—"

"তোমার শপথ শোনবার কৌতূহল নেই আমার"—হেসে জবাব দিলেন কপিঞ্জল। "তুমি কি মনে কর আমার ভগবান নেই, ধর্ম নেই, আত্মসম্মান নেই? বেশ, তাহলে

তোমার সঙ্গে তর্ক আর করব না। কিন্তু তোমাকে শেষবার বলছি এই আদেশপত্র আমাকে নিয়ে যেতে দাও, গন্ধরাজকে বন্দী করে দেব। কিন্তু এটা যদি আমার কাছ থেকে কেড়ে নাও, তাহলে সুনিশ্চিত জেনো সব ভণ্ডুল করে দেব আমি। প্রকাশ করে দেব সব। আমাকে বিশ্বাস বা ভয় যাই কর— এখনি ঠিক করে ফেল কি করবে।''

কাগজটা বাড়িয়ে দিলেন তিনি কপিঞ্জলের দিকে।

কপিঞ্জল মুশকিলে পড়ে গেলেন একটু, সহসা ঠিক করতে পারলেন না কি করবেন। দুটো বিপদের মধ্যে কোনটা বেশী বিপদ তা স্থির করতে পারলেন না চট্ করে। একবার হাত বাড়িয়ে পরমুহূর্তেই আবার টেনে নিলেন হাতটা।

''বেশ ''—ইতস্তত করে বললেন শেষে—''বিশ্বাস করতেই যখন বলছ, তখন—''

''ব্যাস্, ওখানেই থেমে যাও। আর মত বদলো না! তুমি সব না জেনেই যখন আমাকে বিশ্বাস করতে চাইছ তখন তোমাকে সব খুলে বলছি এবার। আমি এখনি গিয়ে ধূর্জটি সিংয়ের সঙ্গে দেখা করব। কিন্তু দেখা করলেই সে আমার কথা শুনবে কেন? এই কাগজটা দেখাতে হবে। তারপব কখন আমি গন্ধরাজকে লুকিয়ে বাগানে বার করে আনতে পারব তারই বা ঠিক কি? রাত দুপুর হয়ে যেতে পারে, সন্ধ্যার পরও হতে পারে, কিচ্ছু ঠিক নেই। গাড়ি যদি চালাতে হয় তাহলে ঘোড়ার রাশটা আমার হাতে থাকা দরকর। এবার তোমার সঙ্গিনী বীরাঙ্গনাকে বিদায় দাও। পরাইয়া দাও তারে কবচ কুণ্ডল—''

এই বলে দু'হাত প্রসারিত করে প্রদীপ্ত দৃষ্টিতে চাইলেন তিনি কপিঞ্জলের দিকে।

''বেশ''—জড়িয়ে ধরে চুমু খেলেন তাকে কপিঞ্জল—''প্রত্যেক লোকই ভুল করে। আমিও করলুম বোধহয়, হয়তো আমার ভুলটা খুব বেশী গর্হিত নয়। আচ্ছা, যাও এবার। মনে হচ্ছে দুষ্টু খুকীর হাতে একটা পটকা দিয়ে দিলুম।''

।। ষোল।।

বেরিয়েই রঞ্জাবতীর প্রথম মনে হল নিজের ঘরে গিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চেহারাটা একটু ঠিকঠাক করে নেওয়া দরকার। এই অভিযানের পরিণাম যাই হোক না কেন, তিনি এটা ঠিক করে ফেলেছিলেন মহারাণী সুরূপিণীর সঙ্গে একবার দেখা করতেই হবে। যাকে কেউ পছন্দ করে না সেই নারীটির সামনে খেলো-ভাবে দাঁড়াবার বাসনা রঞ্জাবতীর ছিল না। গেলে বিজয়িনীর মতোই যেতে হবে। কয়েক মিনিট মাত্র লাগল। প্রসাধন-শিল্পে রঞ্জাবতী পারদর্শিনী। যে সব মেয়েরা একগাদা প্রসাধন দ্রব্যের প্রাচুর্যের মধ্যে অসহায় ভাবে এটা ওটা নাড়াচাড়া করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে শেষে সং সেজে বেরিয়ে আসেন, রঞ্জাবতী সে দলের নন। একবার তিনি ঘাড় বেঁকিয়ে আয়নার দিকে চাইলেন, একটা অলক একটু সরিয়ে দিলেন, একটু টেনে টুনে মাথার চুলকে ইচ্ছাকৃত বিশৃঙ্খলায় মনোহর করে তুললেন, ওড়নার ভাঁজটাকে ঈষৎ এলোমেলো করে আরও সুন্দর করে ফেললেন, তারপর গালে ঠোঁটে সামান্য একটু রঙের ছোঁয়া, বুকে একটি হলদে গোলাপ—ব্যাস, চমৎকার হয়ে গেল ছবিটি।

''এই যথেষ্ট''—পরিচারিকাকে বললেন—''আমার গাড়িটাকে আমার সঙ্গে সঙ্গে যেতে বল। রাজপ্রাসাদের সামনে সেটা যেন আধঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে আমার জন্যে অপেক্ষা করে।''

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। পার্বতী নগরীর দোকানে দোকানে, বীথি-ঢাকা রাস্তায় রাস্তায় জ্বলে উঠছিল আলোকমালা। রঞ্জাবতী তাঁর অভিযানে যাত্রা করলেন পায়ে হেঁটেই। মন তাঁর আনন্দে মাতোয়ারা। কৌতূহল আর আহ্লাদের তৃপ্তিতে তাঁর রূপও যেন ডানা মেলে উড়ছে, আর সেটা তিনি অনুভবও করছেন নিজে। ভারী ভালো লাগছে। একটি বড় জহুরীর দোকানের সামনে তিনি দাঁড়ালেন একটু, তার পরে গেলেন একটা পোশাকের দোকানের সজ্জিত বাতায়নে, দু একটা পোশাকের প্রশংসাও করলেন। তারপর আরও এগিয়ে গেলেন। হাঁটতে লাগলেন জম্বীর-বীথি ধরে। জম্বীর লেবুর গন্ধে বাতাস মন্থর হয়ে এসেছে, গাছের পত্রবহুল শাখাপ্রশাখারা মাথার উপর প্রসারিত হয়ে রয়েছে খিলানের মতো। ঈষৎ আলোকিত গলিগুলোর মধ্যে পথিকদের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে মাঝে মাঝে। একটা বেঞ্চি ছিল পথের ধারে। তারই উপর বসে পড়লেন রঞ্জাবতী। নিজের খুশীর আমেজেই বিভোর হয়ে রইলেন। বেশ শীত পড়েছিল, কিন্তু রঞ্জাবতী তা অনুভব করছিলেন না, তাঁর মনের ভিতরে উদ্দীপনার আগুন জ্বলছিল। জহুরীর দোকানে চুনী পান্নাগুলোর মতো তাঁর মনের চিন্তাগুলোও যেন চকমক করছিল সেই অন্ধকার নির্জনে, পথিকদের পদধ্বনি মনে হচ্ছিল সঙ্গীত।

কি করবেন তিনি? তাঁর কাছে যে কাগজটা আছে তার উপরই তো নির্ভর করছে সব। গন্ধরাজ, কপিঞ্জল, আদরিণী, আর এই গর্জনগাঁও রাজ্যটাও তাঁর নিক্তিতে ধুলোর মতোই হালকা মনে হতে লাগল। অনায়াসেই আঙ্গুল দিয়ে ঝেড়ে ফেলতে পারেন সব। নিজের এই সু-উচ্চ মহিমার দিকে চেয়ে নিজেই তিনি স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন কয়েক মুহূর্ত। তারপর হঠাৎ হেসে উঠলেন—কি না করতে পারেন তিনি এখন। তুঙ্গ পর্বতশিখরে দাঁড়িয়ে যেমন মাথাটা ঘুরে যায় ক্ষমতার মদিরা পান করে তাঁর মাথাটাও তেমনি ঘুরে উঠল। সর্বশক্তিমত্তার পাগলামি, যে পাগলামি রোমের সীজারদের পেয়ে বসেছিল, সেই পাগলামি তাঁর বিচার-বুদ্ধিকেও বিচলিত করে ফেলল। "দুনিয়াটা কি অদ্ভুত আশ্চর্য পাগলাগারদ"—হঠাৎ মনে হল তাঁর। আবার হো হো করে হেসে উঠলেন তিনি।

মুখে আঙ্গুল ঢুকিয়ে একটি ছোট ছেলে একটু দূরে দাঁড়িয়ে বোকার মতো চেয়ে ছিল রঞ্জাবতীর দিকে। অমন হাসছেন কেন উনি। ছেলেটিকে দেখতে পেয়ে রঞ্জাবতী তাকে ডাকলেন। কিন্তু এল না সে। চোখ বড় বড় করে দাঁড়িয়ে রইল। কিন্তু রঞ্জাবতী ছাড়বার পাত্রী নন। একটা ছোট ছেলে, ডাকলে আসবে না? তিনি উঠে পড়লেন। ভুলিয়ে ভালিয়ে অনেক মিষ্টি কথা বলে নিয়ে এলেন তাকে টেনে। একটু পরেই সে তাঁর কোলের উপর বসে তাঁর হারের চকচকে লকেটটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল।

"আচ্ছা খোকা, তোমার যদি একটা মাটির ভালুক আর চীনেমাটির বাঁদর থাকে কোনটাকে তুমি আগে ভাঙবে?"

"আমার তো একটাও নেই।"

"তোমাকে টাকা দিচ্ছি। কিনে নাও দুটোই। এখনি দেব টাকাটা, কিন্তু তার আগে বল কোন্‌টা আগে ভাঙতে চাও—মাটির ভালুকটা না, চীনেমাটির বাঁদরটা—বল—"

চকচকে একটা টাকা বার করলেন রঞ্জাবতী। কিন্তু ওই উলঙ্গ ছেলেটা কোন উত্তর না দিয়ে টাকাটার দিকেই চেয়ে রইল নির্নিমেষে। রঞ্জাবতী তার মুখ থেকে যে উত্তরটা শুনতে চেয়েছিলেন তা আর পেলেন না। হতাশ হলেন একটু। তারপর তাকে ছোট্ট একটি চুমু খেয়ে

তার হাতে টাকাটা দিয়ে নামিয়ে দিলেন তাকে কোল থেকে। ছেলেটা ছুটে চলে গেল। রঞ্জাবতীও উঠে পড়লেন। লীলায়িত গতিতে অগ্রসর হলেন প্রাসাদের দিকে।

"কোনটা আমি ভাঙব?" ভাবতে লাগলেন তিনি; নিজের ঈষৎ আলুলায়িত কুন্তলে মুচকি হেসে একবার হাত বোলালেন। "কোনটা?"—আকাশের দিকে সহাস্য উজ্জ্বল দৃষ্টি মেলে প্রশ্ন করলেন—"দুজনকেই কি আমি ভালোবাসি? না, কাউকেই না? একটু?—গভীরভাবে? না, মোটেই না? দুজনকেই? না একজনকেও না? দুজনকেই বোধহয়। কিন্তু ঐ আদরিণীকে আমি থুড়ব।"

তিনি যখন লোহার সিংহদরজা দিয়ে বাগানের সিঁড়ি দিয়ে উঠে বেদি-মণ্ডপে এসে হাজির হলেন তখন বেশ অন্ধকার হয়ে গেছে। প্রাসাদের সম্মুখভাবে জানলায় জানলায় আলো জ্বলে উঠেছে, বাইরে অলিন্দেই পিল্লাগুলিতেও বড় বড় আলো উজ্জ্বলভাবে জ্বলছে। চারিদিকে আলো। এর মধ্যেও রঞ্জাবতী পশ্চিম দিগন্তের দিকে চেয়ে দেখলেন একবার। সূর্যের শেষ রশ্মির স্বর্ণাভ ছটা তখনও সম্পূর্ণ বিলীন হয়নি, সে আলোর পটভূমিকায় শোভা পাচ্ছে অসংখ্য জোনাকির নীল-সবুজ দীপালী। রঞ্জাবতী সেদিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন নিস্পন্দ হয়ে।

ভাবতে লাগলেন—"আশ্চর্য! আমি আজ নিয়তির মতো, দৈবের মতো, অমোঘ ভাগ্যের মতো এসেছি এখানে অপ্রত্যাশিত ক্ষমতার অধিকার নিয়ে, অথচ এখনও আমি জানি না কোন পক্ষ অবলম্বন করব। আর কেউ কি এ অবস্থায় আমার মতো পক্ষপাতহীন থাকতে পারত? কিন্তু ভগবান আমাকে সমদর্শী করেছেন, যা ন্যায়সঙ্গত তাই আমি করব।"

গন্ধরাজের ঘরের জানলার আলো উজ্জ্বলতম। সেদিকে চেয়ে রঞ্জাবতীর মনটা ধীরে ধীরে কোমল হয়ে এল, একটু যেন বেদনাও জাগল।

"সবাই যাকে ত্যাগ করেছে তার মনের অবস্থাটা কি রকম হয়? আহা, বেচারী। ওর আদরিণী যে কত বড জাতসাপ তা ওকে জানান দরকার। সেই জন্যেই এই আদেশপত্রটা ওকে দেখাতে হবে। মুখে বললে বিশ্বাসই করবে না—"

আর কালবিলম্ব না করে তিনি প্রাসাদে ঢুকে পড়লেন। প্রতিহারীকে বললেন তিনি মহারাজের সঙ্গে দেখা করতে চান। প্রতিহারী বলল—"মহারাজা তাঁর নিজের ঘরে আছেন। তিনি বলেছেন, তিনি একা থাকতে চান, কারো সঙ্গে দেখা করবেন না।" তবু রঞ্জাবতী তাঁর নামটা লিখে পাঠিয়ে দিলেন। সে ফিরে এসে বলল—"মহারাজ আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছেন, তাঁর এখন কারো সঙ্গে দেখা করবার ইচ্ছা নেই।"

"তাহলে এই চিঠিটা নিয়ে যাও—"

একটা কাগজে খসখস করে লিখলেন, "জীবন-মরণ-সমস্যা। মহারাজ সাহায্য করুন আমাকে। আপনি ছাড়া আর কেউ আমাকে সাহায্য করতে পারবেন না।"

এবার প্রতিহারী তাড়াতাড়ি ফিরে এসে তাঁকে ডেকে নিয়ে গেল। মহারাজা গন্ধরাজ কৃপা করে রঞ্জাবতী দেবীর সঙ্গে দেখা করতে সম্মত হলেন।

গন্ধরাজ অস্ত্রাগারে বসে ছিলেন। বিরাট অস্ত্রাগার। বিচিত্র আলোকে নানারকম অস্ত্র চারিদিকে চকমক করছিল। কেঁদে কেঁদে গন্ধরাজের চোখ মুখ ফুলে গিয়েছিল। বড়ই খারাপ দেখাচ্ছিল তাঁকে। বড়ই বিষণ্ণ এবং বিরক্ত। রঞ্জাবতী যখন প্রবেশ করলেন তখন তিনি উঠে দাঁড়ালেন না পর্যন্ত। নমস্কার করে প্রতিহারীকে চলে যেতে বললেন শুধু। যে মমতা রঞ্জাবতী

চরিত্রের বৈশিষ্ট্য, যে মমতা বরাবর তাঁর হৃদয় এবং বিবেককে নিয়ন্ত্রিত করেছে, সেই মমতা সহসা তাঁকে অভিভূত করে ফেলল। অসহায় দুর্বল গন্ধরাজকে যেন সম্পূর্ণ দেখতে পেলেন তিনি। মনে হল ও যেন একেবারে নিঃস্ব হয়ে গেছে! রঞ্জাবতী নিমেষেই ঠিক করে ফেললেন এখন কি ভূমিকায় অভিনয় করতে হবে তাঁকে। তিনি তাঁর দিকে এক পা এগিয়ে অপূর্ব ভঙ্গীতে বললেন—'উঠুন।"

"রঞ্জাবতী, তুমি তোমার চিঠিতে জীবন-মরণের কথা লিখেছ। কার জীবন বিপন্ন? পৃথিবীতে এমন কে দীন হীন রিক্ত আছে যাকে গর্জনগাঁওয়ের গন্ধরাজও সাহায্য করতে পারে?"

"প্রথমে ষড়যন্ত্রকারীদের নাম শুনুন; মহারাণী সুরূপিণী, এবং প্রধান মন্ত্রী কপিঞ্জল দেও। বাকিটা আন্দাজ করতে পারছেন না?"

গন্ধরাজ চুপ করে রইলেন।

রঞ্জাবতী বললেন—"আপনারই জীবন বিপন্ন। আপনার ধর্মপত্নী এবং আমার মহাপ্রভু দুজনে ষড়যন্ত্র করে আপনাকে নির্বাসন দণ্ড দিয়েছে। কিন্তু তারা আমাকে আপনাকে চেনে না তাই তাদের এই ধৃষ্টতা। রাজনীতি আর প্রণয়ে দল গড়তে হয়, আমরাও গড়ব মহারাজ। ওদের হাতে টেক্কা আছে কিন্তু আমরা রং দিয়ে তুরুপ করব। আসুন, দেখাব আপনাকে তাস?"

"খুলে বল। আমার মাথায় কিছু ঢুকছে না।"

"দেখুন তাহলে—"

আদেশপত্রটা বার করে দিলেন রঞ্জাবতী।

গন্ধরাজ সেটা পড়ে চমকে উঠলেন, তারপর নীরবে নিজের মুখের সামনে হাতটা রাখলেন। একটি কথা বেরুল না তাঁর মুখ দিয়ে। রঞ্জাবতী হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

"সে কি! আপনি নতমস্তকে এ আদেশ মেনে নেবেন? আপনার প্রতি ও মেয়ের দয়ামায়া প্রেম কিচ্ছু নেই। দুধের ভাঁড়ে কি মদ থাকে? মুছে ফেলুন ওই শেলেটের লেখা, মানুষের মতো উঠে দাঁড়ান। হতে পারে ওদের হাতে ক্ষমতা আছে, হতে পারে ওরা সিংহ-সিংহিনী, কিন্তু তবু বলছি ইঁদুর হয়েও আমার ওদের ওই ষড়যন্ত্রে জাল টুকরো টুকরো করে দিতে পারি। কাল রাত্রে, যখন কিছুই বিপন্ন হয়নি, যখন সবটাই নিছক কৌতুক আর মজা ছিল তখন তো আপনি বেশ তৎপর হয়ে উঠেছিলেন। এখন মুষড়ে পড়ছেন? এ কৌতুকটা যে আরও জমজমাট, আরও জীবন্ত। উঠে দাঁড়ান।"

গন্ধরাজ তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালেন। লাল হয়ে উঠল মুখটা।

"রঞ্জাবতী, সব বুঝতে পারছি, আমি অকৃতজ্ঞ নই। এটা যে তোমার অকৃত্রিম বন্ধুত্বের নিদর্শন তা আমি জানি। কিন্তু রঞ্জাবতী, তুমি যা আমার কাছে আশা করছ, তা আমি পারব না। তুমি আশা করছ আমি প্রতিবাদ করব, আমি বাধা দেব। কিন্তু কেন দেব? দিয়ে কি লাভ হবে। যে ভুলে স্বর্গের শেষ সীমাটাকে এখনও আমি বোকার মতো আঁকড়ে ছিলাম এই আদেশপত্র পড়বার পর সেটাও চুরমার হয়ে গেল। এখন গর্জনগাঁওয়ের মহারাজার নামের সঙ্গে এক নিশ্বাসে লাভ-ক্ষতির আলোচনা কি হাস্যকর নয়? আমার কোন দল নেই, শাসন-প্রণালী নেই, অহঙ্কার নেই। বড় গলা করে বলবার মতো কিছুই যে নেই আমার। তবে কেন

তুমি প্রত্যাশা করছ আমি এর বিরুদ্ধে লড়বার জন্যে এগিয়ে যাব? কোন নীতি অনুসারে যাব কি লাভ হবে তাতে? কিংবা তুমি কি চাও বন্দী নেউলের মতো ব্যর্থ আক্রোশে আমি খামচাখামচি কামড়াকামড়ি করব? না, রঞ্জাবতী। যারা তোমাকে পাঠিয়েছে তাদের গিয়ে বল, আমি নির্বাসনে যেতে প্রস্তুত এ নিয়ে আমি কোন লজ্জাকর কোলাহল করতে চাই না। আমি যাব।"

"আপনি যাবেন? স্বেচ্ছায় যাবেন?"

"স্বেচ্ছায় নয় অবশ্য। কিন্তু যাব, যত শীঘ্র সম্ভব যাব। অনেক দিন থেকেই আমি বাইরে যেতে চাইছিলুম সে সুযোগ তো এসে গেল। আমি প্রত্যাখ্যান করব কেন? ভগবান আমাকে কিঞ্চিৎ রস-বোধ দিয়েছেন, আমি এই প্রহসনকে বিয়োগান্ত নাটকের রূপ দেবার চেষ্টা করব না।"

আদেশপত্রটা টেবিলের উপর ছিল, তিনি আঙুলের টোকা দিয়ে দূরে সরিয়ে দিলেন সেটাকে।

তারপর সাড়ম্বরে বললেন—"ওদের জানিয়ে দিতে পার আমি যেতে প্রস্তুত আছি—"

"মুখে স্বীকার না করলেও মনে মনে আপনি রেগেছেন মনে হচ্ছে।"

"আমি? রেগেছি? বাজে কথা। রাগবার কোনও কারণ নেই আমার। প্রতিপদে সবাই আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছে আমি দুর্বল, আমি অস্থির, আমি খেয়ালী—আমি সমাজে বাস করবার অযোগ্য। আমি নানারকম দুর্বলতার আকর, আমি নপুংসক মহারাজা, আমি ভদ্রলোক কিনা তাতেও সন্দেহ আছে। তুমি আমার উপর প্রসন্ন, কিন্তু তুমিও দুবার আমাকে আমার লঘুতার জন্য বকুনি দিয়েছ। এতে কি আমি রাগ করব? এদের নির্মমতায় আমার কষ্ট হচ্ছে, কিন্তু এরা কেন যে এমনভাবে কোপ মারতে উদ্যত হয়েছে তা আমি বুঝতে পারছি, ততটুকু সাধারণ বুদ্ধি আমার আছে। আমি অপদার্থ, আমি অকেজো, তাই ওরা আমাকে সরিয়ে দিতে চায়। ওদের দোষ দিতে পারি না।"

"এসব কার কাছ থেকে শুনেছেন?" সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন রঞ্জাবতী—"আপনি অপদার্থ? আপনি অকেজো? দেখুন মহারাজ, আপনার রূপ আর যৌবন যদি না থাকত তাহলে আপনার মুখদর্শন করতাম না আমি। পুরুষের মুখে ওসব বিনয় বচন অসহ্য। নগণ্য সাধারণ লোকেরাও এতটা করে না। এই অকৃতজ্ঞতা—"

"ব্যাপারটা বুঝতে চেষ্টা কর রঞ্জাবতী"—গন্ধরাজের মুখে যেন ছায়া নামল—"কৃতজ্ঞতার কোন প্রশ্নই ওঠে না এতে—আত্মসম্মানেরও নয়। তুমি কেন কিভাবে এখানে এসেছ তা বুঝতে পারছি না ঠিক, কিন্তু আমার প্রতি তোমার করুণাই যে প্রধান কারণ তাতে আমার সন্দেহ নেই, কিন্তু এর সঙ্গে আমার নিতান্ত ব্যক্তিগত পারিবারিক ঘটনাও জড়িয়ে গেছে যার পুঙ্খানুপুঙ্খ খবর একমাত্র আমিই জানি। তোমার পক্ষে জানা সম্ভব নয় যে আমার স্ত্রী, তোমার মহারাণী, কি দুঃখ ভোগ করেছে। তাই তুমি এমন কি আমিও, ওর আচরণের বিচার করতে পারি না—করতে গেলে সেটা অন্যায় হবে। আমি আমার অক্ষমতা আমার অপরাধ স্বীকার করছি। যদি না করতাম তাহলে আমার ভালোবাসার কি মূল্য থাকত? যাকে ভালোবাসি তার কাছে যদি সামান্য নতি স্বীকার করতে না পারি তাহলে তো সে ভালোবাসা মৌখিক ভান মাত্র। সাধারণ বইতেও তো লেখা আছে যে প্রণয়িনীকে তুষ্ট করবার জন্য

প্রয়োজন হলে মৃত্যুবরণ করাও উচিত। আমি কারাবরণ করছি এটা কি খুব বেশী এমন একটা কিছু?"

"প্রণয়? প্রণয়ের সঙ্গে কারাবরণের কি সম্পর্ক থাকতে পারে!" রঞ্জাবতী দেওয়াল এবং ছাতকেই যেন প্রশ্নটা করলেন—"ভগবান সাক্ষী, প্রণয়ের সম্বন্ধে আমারও কিছু অভিজ্ঞতা আছে, আমার জীবনই তার জীবন্ত প্রমাণ। কিন্তু যে প্রেম প্রতিদান দেয় না আমি জানি তা প্রেমই নয়—তা অসার, ফাঁকি, মায়া, মরীচিকা।"

"রঞ্জাবতী, প্রেমকে আমি ওরকম দান-প্রতিদানের মাপকাঠিতে মাপতে শিখিনি, যদিও আমি স্বীকার করছি একজন মহিলার কাছে ওই মাপকাঠিতেই আমি অশেষ ঋণী হয়ে আছি। কিন্তু এসব আলোচনা বৃথা। প্রেম নিয়ে এখানে আমরা কবির লড়াই করছি না, গবেষণাও করছি না।"

"তবু একটা জিনিস আপনি ভুলে যাচ্ছেন। আজ উনি কপিঞ্জলের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে আপনার স্বাধীনতা হরণ করছেন, কাল আপনার সম্মানকেও কলঙ্কিত করতে পারেন।"

"আমার সম্মান?"—কথাগুলোর পুনরাবৃত্তি করলেন গন্ধরাজ—"তুমি স্ত্রীলোক হয়ে একথা বলছ? আশ্চর্য লাগছে শুনে। আমি যদি তার ভালোবাসা অর্জন করতে না পেরে থাকি, স্বামী হিসেবে যদি আমি ব্যর্থ হয়ে থাকি, তাহলে আর বাকী কি রইল? এই শোচনীয় পরাজয়ের মধ্যে কোন্ মুখে আমি কোন সম্মান দাবি করব তা তো জানি না। না, সব শেষ হয়ে গেছে। আমি এখন অপরিচিত অচেনা লোকের দলে পড়ে গেছি। আমার স্ত্রী যদি আমাকে ভালো না বাসে তাহলে আমি কারাগারেই যাবে, এই যখন তার ইচ্ছে। সে যদি আর কাউকে ভালবেসে থাকে তাহলে কারাগারই তো আমার ঠিক স্থান! আমার পক্ষে ওর চেয়ে ভালো জায়গা আর কোথা আছে পৃথিবীতে। তাছাড়া দোষ তো আমারই। আজকালকার অনেক মেয়েমানুষের মতো তুমিও পুরুষের ভাষায় কথা কইতে শিখেছ। আমার যদি পদস্খলন হত (ভগবান জানেন, হওয়া খুবই সম্ভব ছিল) তাহলে আমি ভয়ে কাঁপতাম কিন্তু এ-ও বলছি এর জন্যে তার কাছে মাপ চাইতাম, আশাও করতাম যদি সে ক্ষমা করে, যদিও সে আশা হয়তো দুরাশা হত—হয়তো—"

হঠাৎ থেমে গেলেন গন্ধরাজ। তারপর একটু বিরক্তিভরে বললেন, "দেখ রঞ্জাবতী, কোনও স্বামীর অসারতা, অতি নমনীয়তা বা বাজে রসিকতা যদি কোনও স্ত্রীর পক্ষে অসহ্য হয়, যদি তার ধৈর্য ভেঙে পড়ে তাহলে তাকে ভুল বিচার করবার অধিকার আমি কাউকে দেব না। সে স্বাধীন, পুরুষটার মধ্যেই গলদ ধরা পড়েছে—"

"সে আপনাকে ভালোবাসে না বলে গলদ আপনার! আপনার জানা উচিত ভালোবাসবার ক্ষমতাই তার নেই।"

"বরং বলা উচিত আমি তার মনে ভালোবাসা জাগাতে পারিনি। আমারই সে ক্ষমতা নেই—"

"মহারাজ, অপরাধ নেবেন না, কিন্তু আমার মনে তো আপনি ভালোবাসা জাগিয়েছেন। আমি আপনাকে ভালবাসি।"

"রঞ্জাবতী, তুমি করুণাময়ী"—হেসে উত্তর দিলেন গন্ধরাজ—"তুমি আমার উপর করুণা করেছ। কিন্তু এসব তর্ক বৃথা। কি করব আমি তা ঠিক করে ফেলেছি। স্পষ্ট কথা বলছি—

স্পষ্টবাদিতায় অবশ্য তুমিও কম যাও না—স্পষ্ট কথাটা হচ্ছে ব্যাপারটা আমি বুঝতে পেরেছি, এ সুযোগ আমি ছাড়ব না। দুঃসাহসে আমি পিছপা হইনি কখনও। এখানে আমি একটু বেকায়দায় পড়ে গেছি—সবাই বলছে রাজা হিসেবে আমি বেমানান। এখানে কেমন যেন রংছুট হয়ে আছি। তার চেয়ে সরে পড়াই কি ভালো নয়? আমার এই বেপরোয়া ভাব তুমি অনুমোদন করবে না?"

"মহারাজ, আপনি যদি মনস্থির করে থাকেন আমি আপনাকে ফেরাবার চেষ্টা করব না। কেন করব? বেহায়ার মতো একটা কথা বলছি আপনি গেলে আমারই তো সুবিধে। যান তাহলে, আমার বুকটা অবশ্য ভেঙে যাবে, আমার মনটা হয়তো আপনার পিছু পিছু ছুটবে, আপনার কষ্টের কথা ভেবে হয়তো রাত্রে আমার ঘুম হবে না, কিন্তু তবু আমি আপনাকে বারণ করব না। আপনার সাংসারিক বুদ্ধি কিচ্ছু নেই, তবু স্বীকার করছি আপনি রাজা, আপনি বীর।"

"রঞ্জাবতী, তুমি যে টাকাটা আমাকে দিয়েছিলে তা নেওয়া আমার ঠিক হয়নি। কিন্তু তোমার অনুরোধ কিছুতেই এড়াতে পারিনি কাল। যাক্, তোমাকে এর বদলে যে কিছু দিয়ে যেতে পারব এইটেই আমার সান্ত্বনা এখন।"

গন্ধরাজ একটা তাক থেকে কয়েকটা দলিল নিয়ে এলেন।

"এই নাও। তোমার টাকা দিয়ে যে খামারটা কিনেছি তার দলিল। তুমিই রাখ এটা। আমাকে যেখানে যেতে হবে সেখানে তো এসব আমার কাজে লাগবে না। অন্য কোনও উপায়ে তোমার ঋণ পরিশোধ করতে পারব এ সম্ভাবনাও আর নেই এখন। তুমি মহৎ বলেই কোন রসিদ না নিয়ে আমাকে টাকাটা দিয়েছিলে। আমি ভেবেছিলাম—কিন্তু এখন চাকা ঘুরে গেছে। গর্জনগাঁওয়ের মহারাজার সৌভাগ্যসূর্য অস্ত যাচ্ছে। এই দলিলটা রাখ, আমি তোমাকে যতদূর জানি তাতে আশা করি এটা নিতে তুমি দ্বিধা করবে না, কারণ তোমাকে দেবার আর আমার কিছুই নেই। সরল গৃহস্থ কীর্তিভূষণ নিরাপদে তার গৃহস্থালী চালাতে পারবে আর আমাকে টাকা দিয়ে আমার বান্ধবীও যে ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি এ কথা ভেবে আমি আনন্দ পাব।"

"মহারাজ, আমি যে কি জঘন্য অবস্থায় পড়েছি তা কি আপনি বুঝতে পারছেন না? আপনার পতনের উপরই আমার উন্নতি নির্ভর করছে।"

"আমাকে প্রতিরোধে উদ্বুদ্ধ করবার চেষ্টা করে তুমি তোমার মহান চরিত্রেরই পরিচয় দিয়েছ রঞ্জাবতী। জেনে রাখ, এসব সত্ত্বেও আমাদের সম্বন্ধ যেমন ছিল তেমনি থাকবে। এইবার মহারাজা হিসেবে শেষ আদেশ তোমাকে করব—এটা নাও।"

এই বলে জোর করে তিনি দলিলের কাগজগুলো তাঁর হাতে গুঁজে দিলেন।

"এগুলো ছুঁতেও ঘেন্না করছে আমার!"

এর পর নীরবতা ঘনিয়ে এল কয়েক মুহূর্তের জন্য।

গন্ধরাজ হঠাৎ বললেন—"তুমি কি জান কখন আমাকে ওরা বন্দী করবে?"

"মহারাজ, যখনই ইচ্ছে করবেন তখনই। কিংবা আপনি যদি ইচ্ছা করেন ওই আদেশপত্রটা ছিঁড়ে ফেলুন—তাহলে কখনই ওরা আপনাকে বন্দী করতে পারবে না।"

"না, তা করব না। দেখ আমার ইচ্ছা, যত শীঘ্র ব্যাপারটা চুকে যায় ততই ভালো। আমি শুধু সুরূপিণীকে একটা চিঠি লিখে রেখে যেতে চাই।"

"মহারাজ, আমি আপনাকে প্রতিবাদ করতে বলেছি, আমার ইচ্ছে আপনি রুখে দাঁড়ান। কিন্তু তাতে যখন আপনি সম্মত নন, আপনি যখন তস্করদের সামনে বোবার মতো দাঁড়িয়ে থাকাটাই ভালো মনে করছেন—তাহলে আপনাকে বন্দী করার ব্যাপারটার ভার আমাকেই নিতে হয়। আমি ওদের বলেছিলাম"—একটু ইতস্তত করে বললেন—"আমি ওদের বলেওছিলাম যে আপনাকে ধরিয়ে দেব, তাই এই আদেশপত্রটা ওরা আমাকে দিয়েছিল, কিন্তু বিশ্বাস করুন, আমার উদ্দেশ্য ছিল আপনাকে সাহায্য করা। কিন্তু আপনি আমার সাহায্য যখন নিতে চাইছেন না, তখন আমাকে একটু সাহায্য করুন। আপনার যখন সুবিধা হবে তখন আপনি তাহলে ওই উড়ন্ত পরীর কাছে গিয়ে দাঁড়াবেন—কাল যেখানে গিয়েছিলেন। এতে আপনার অসুবিধা হবে না, আমাদের কিন্তু সুবিধে হবে।"

"নিশ্চয়ই যাব। সাগরে ঝাঁপ দেবই যখন ঠিক করেছি, তখন কোন্ ঘাট থেকে দেব তা নিয়ে মাথা ঘামাতে চাই না। তুমি এখন যাও তাহলে, আমার সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ গ্রহণ কর। আমি চিঠিটা লিখেই যাব ওখানে। উড়ন্ত পরীর সামনেই দেখা হবে আবার। আজ আশা করি কালকের মতো ছদ্মবেশ থাকবে না কোনও।"

গন্ধরাজ একটু হাসলেন।

রঞ্জাবতী চলে যাবার পর খানিকক্ষণ নিজের সমস্ত শক্তি সংহত করে আত্মসংবরণ করলেন গন্ধরাজ। তিনি ভাবতে লাগলেন যে নিদারুণ হীন অবস্থার মধ্যে তিনি পড়েছেন, কি করে আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ রেখে তার থেকে এখন উত্তীর্ণ হতে পারা যায়। নির্বাসনের কথা শুনে তিনি একটুও বিচলিত হননি। কিন্তু ইন্দীবরের সঙ্গে আলাপ করে তিনি বড়ই আহত, বড়ই অপমানিত বোধ করছিলেন। এর পর নির্বাসনের খবরটা যেন মুক্তির বার্তা নিয়েই এল, তিনি যেন আরাম পেলেন একটু। তাঁর মনে হল এটা তো নির্দোষ পথ, এ পথে গেলেই তাঁর সব জ্বালা-যন্ত্রণার অবসান হবে। তিনি সুরূপিণীকে চিঠি লিখতে বসলেন। হঠাৎ মনের মধ্যে ক্রোধের আগুন জ্বলে উঠল। তাঁর অতীত জীবনের ক্ষমা, ধৈর্য, সহিষ্ণুতার কাহিনীগুলো বিকট ভাবে মনে পড়তে লাগল একে একে, আরও বিকট মনে হল যখন ভাবলেন এসবের প্রতিদানে কি উদাসীনতা কি অহঙ্কার, কি নিষ্ঠুরতার প্রকাশ রূপায়িত হয়েছে সুরূপিণী-চরিত্রে। যে কলম দিয়ে লিখছিলেন সেটা কাঁপতে লাগল। সহসা বিস্মিত হয়ে তিনি আবিষ্কার করলেন তাঁর আত্মসমর্পণের ভাব অন্তর্হিত হয়েছে, সে ভাব একদম তাঁর নাগালের বাইরেই চলে গেছে। আর ফিরবে না। তিনি মাত্র কয়েকটি উত্তপ্ত শব্দ লিখে, ক্ষিপ্ততাকে প্রেমের মর্যাদা দিয়ে আর ক্রোধকে ক্ষমার কৌলীন্যে ভূষিত করে তাঁর বিদায়পত্র শেষ করলেন। তারপর ঘরটার চারিদিকে একবার চেয়ে দেখলেন, যে ঘর এতদিন তাঁর নিজের ঘর ছিল, কিন্তু যা আর তা থাকবে না। তারপর বেরিয়ে পড়লেন। প্রেমে অভিভূত হয়ে? না, অহঙ্কারে?

যে গোপন পথ দিয়ে তিনি প্রায়ই যাতায়াত করতেন সেই পথেই বেরিয়ে পড়লেন তিনি। প্রহরী তাঁকে বাইরে নিয়ে গেল। বেরিয়েই তিনি রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলেন। রাত্রির অন্ধকারকে উন্মনা করে হু হু করে বইছে ঠাণ্ডা হাওয়া, আকাশ-ভরা তারা হাসি-ভরা চোখে চেয়ে আছে। মনে হল এরা যেন অভ্যর্থনা করল তাঁকে। চারদিকে চেয়ে চেয়ে দেখলেন। মাটির গন্ধ উঠছে, ফুলের গন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছে, বুক ভরে নিঃশ্বাস টেনে নিলেন। আবার আকাশের দিকে চাইলেন। মন শান্ত হল। তাঁর স্ফীত ক্ষুদ্র জীবনটা এই বিরাটের মধ্যে বিলীন হয়ে গেল যেন। যিনি একটু আগে নিজেকে বহ্নিগর্ভ শহীদ মনে করছিলেন, তিনি বিশাল আকাশের দিকে চেয়ে

ভাবলেন আমি কত ক্ষুদ্র। তাঁর মনের ক্ষতে প্রলেপ পড়ল। বাইরের দুরন্ত হাওয়া মহাকাশের অনাবিল শান্তি নীরব সঙ্গীতের মতো যেন তাঁর অহঙ্কারকে বিলীন করে প্রসন্নতায় ভরে দিল চিত্তকে।

"বেশ, আমি তাকে ক্ষমা করলুম"—বলে উঠলেন তিনি—"আমার ক্ষমা যদি তার কাজে লাগে আমি ক্ষমা করলুম তাকে।"

তারপর দ্রুতপদে তিনি বাগানটা পেরিয়ে সেই ফাঁকা জায়গাটায় এসে পড়লেন যেখানে উড়ন্ত পরীটা ছিল। বেদির পাশে অন্ধকারে অপেক্ষা করছিলেন একজন। তিনি বেরিয়ে এলেন সঙ্গে সঙ্গে।

"আমায় ক্ষমা করবেন। আমি বিদেশী। নূতন বাহাল হয়েছি, আপনাকে ঠিক চিনি না। যদি আপনি মহারাজা গন্ধরাজ হন তাহলে আপনি নিশ্চয় জানেন আমি কেন এখানে আপনার অপেক্ষা করছি।"

"ধূর্জটিপ্রসাদ কি আপনার নাম?"

"শ্রীমান ধূর্জটিপ্রসাদ সিংহ। যে কাজ করতে আমাকে আদেশ করা হয়েছে, সেটা একটু কঠিন কাজ। তা যে এমন নির্বিঘ্নে এমন সহজ ভাবে হয়ে যাবে তা ভাবিনি। কাছেই গাড়ি অপেক্ষা করছে। আমি কি মহারাজের অনুসরণ করব?"

"সেনাপতি, আমি এখন জীবনের সেই মধুর মুহূর্তে উপনীত হয়েছি যখন আমি আদেশ শুনব, আদেশ করব না।"

"বাঃ, এ তো কবির মতো উক্তি। মনে হল যেন বিদ্যাপতির কবিতা শুনলাম। চমৎকার! মহারাজ আপনার সঙ্গে আমার রক্তের সম্পর্ক নেই, এ রাজ্যের কারও সঙ্গে নেই। থাকলে আমি এ কাজের ভার নিতাম না হয়তো। কিন্তু চাকরি যখন গছেছি তখন কপিঞ্জলদেবের আদেশ আমাকে শিরোধার্য করতে হয়েছে, অবশ্য আমার দিক দিয়ে এতে কোন অশোভনতা নেই, সৈনিকের পক্ষে এরকম কাজ অস্বাভাবিকও নয়। আর মহারাজ যখন এটা সহজ ভাবে নিয়েছেন তখন মনে হচ্ছে আমাদের সময় ভালোই কাটবে। কারারক্ষীও তো বন্দী এক হিসেবে।"

"একটা কথা জানতে পারি কি? এ কাজে তো প্রশংসা নেই, এ কাজ বিপদও ডেকে আনতে পারে। তবে কেন আপনি এ কাজ নিতে রাজী হলেন।"

"আপনার কৌতূহল স্বাভাবিক। আমার বেতন দ্বিগুণ করে দেওয়া হয়েছে।"

"ও! যাক্, আমি সমালোচনা করব না। ওই যে গাড়িটা দেখতে পেয়েছি—"

একটু দূরেই চার ঘোড়ার গাড়িটা দাঁড়িয়ে ছিল গলির মোড়ে। গাড়ির আলোগুলো দেখেই বোঝা যাচ্ছিল এ সাধারণ গাড়ি নয়। আরও একটু দূরে গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়েছিল কুড়ি জন সশস্ত্র প্রহরী।

।। সতেরো ।।

রঞ্জাবতী গন্ধরাজের কাছ থেকে বেরিয়ে সোজা চলে গিয়েছিলেন ধূর্জটি সিংহের কাছে। কি করে মহারাজকে বন্দী করতে হবে তা তাঁকে বুঝিয়ে বলেই ক্ষান্ত হননি তিনি। উড়ন্ত

পরীর জায়গাটা ঠিক কোথায় তা দেখাবার জন্যে গিয়েছিলেন তিনি ধূর্জটি সিংকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর বাহু-লগ্ন হয়ে। ধূর্জটি সিংহের বুকের রক্তে দোলা দিয়ে তিনি যে সব কথাবার্তা বলছিলেন তা মনে হচ্ছিল যেন সেতারে গতের আলাপ। সত্যিই রঞ্জাবতী একটু উত্তেজিত হয়েছিলেন। আনন্দ এবং উদ্দীপনার ঝঞ্ঝায় যেন নিজেকে ঠিক রাখতে পারছিলেন না তিনি। হাসতে গিয়ে কথা আটকে যাচ্ছিল, চোখের দৃষ্টি থেকে ঠিকরে পড়ছিল অসামান্য দ্যুতি, যে রং তাঁর মুখ-শোভা থেকে অনেক দিন অন্তর্হিত হয়েছিল তাও যেন ফিরে এসেছিল তখন। অদ্ভুত সুন্দর দেখাচ্ছিল তাঁকে। যদিও কথাটা ভাবতে তাঁর ঘৃণা হচ্ছিল তবু তিনি আশঙ্কা করছিলেন আর একটু পরেই ধূর্জটি সিং হয়তো নতজানু হয়ে বসে পড়বেন তাঁর সামনে।

উড়ন্ত পরীর কাছেই একটা প্রকাণ্ড হাস্নুহানার ঝাড় ছিল। তারই আড়ালে লুকিয়ে রঞ্জাবতী নিরীক্ষণ করতে লাগলেন কি রকম ভদ্রতা সহকারে ধূর্জটি সিং গন্ধরাজকে বন্দী করছেন। তাঁরা দুজনে কথা কইতে কইতে এগিয়ে গেলেন, তারপর তাঁদের কথাবার্তা আর শোনা গেল না। একটু পরেই গাড়ির চাকার শব্দ আর অশ্বের ক্ষুরধ্বনি বিঘ্নিত করল নৈশ নীরবতাকে। সে শব্দও ক্রমশ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে এল। গন্ধরাজ চলে গেলেন।

রঞ্জাবতী তখন আকাশের দিকে চেয়ে দেখলেন। না, রাত খুব বেশী হয়নি। এখনও দেখা হতে পারে। দ্রুতবেগে তিনি প্রাসাদের দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন। ভয় হতে লাগল কপিঞ্জল এসে পড়েনি তো। বেগ আরও বেড়ে গেল এ কথা ভেবে। তিনি প্রাসাদে পৌঁছেই প্রতিহারিণীকে বললেন খুব জরুরী ব্যাপারে মহারাণীর সঙ্গে এখনি দেখা করা দরকার। কপিঞ্জলদেও তাকে পাঠিয়েছেন। এমনি গেলে মহারাণী হয়তো দেখা করতেন না, কিন্তু কপিঞ্জলের দূতীকে তিনি প্রত্যাখ্যান করতে পারলেন না।

সুরূপিণী একটা টেবিলের সামনে বসে খাওয়ার ভান করছিলেন। তাঁর গালে চোখের জলের দাগ, চোখ ফোলা ফোলা। তিনি ঘুমোননি, খাননি। এমন কি তাঁর বেশবাসও বিস্রস্ত। মনে হচ্ছিল তিনি যেন শুকিয়ে গেছেন। তাঁর চেহারা, তাঁর মন সবই যেন বিকল, বিবেকের তাড়নায় তিনি যেন বিধ্বস্ত। রঞ্জাবতী তাঁর এই চেহারার সঙ্গে নিজের চেহারার তুলনা করে একটু যেন খুশী হলেন।

"প্রধান মন্ত্রীর কাছ থেকে এসেছেন আপনি। বসুন। কি বলবার আছে বলুন।"

"কি বলবার আছে?"—রঞ্জাবতী পুনরাবৃত্তি করলেন কথাগুলো—"অনেক কিছু বলবার আছে। অনেক কিছু যা বলতে ইচ্ছে করছে না, অনেক কিছু যা গোপন রাখা উচিত কিন্তু যা আমাকে বলতে হবে। আমি রামায়ণের দুর্মুখের মতো, অনেক অপ্রিয় কাজ আমাকে করতে হয়। যা বলব, নিরপেক্ষভাবে বলবার চেষ্টা করব। আমি মহারাজের কাছে আপনার আদেশপত্র নিয়ে গিয়েছিলাম। তিনি নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারেননি। তিনি বলে উঠলেন—রঞ্জাবতী এ অসম্ভব—এ হতে পারে না—আমি ভুল দেখছি, ভুল পড়ছি। তুমি নিজের মুখে বল। আমার স্ত্রীকে ওরা ভুলিয়ে ভালিয়ে হাত করেছে, তার বুদ্ধি নেই, কিন্তু এত নিষ্ঠুর সে নয়। আমি বললাম, মহারাজ, আপনার স্ত্রী তরুণী সেইজন্যেই তিনি নিষ্ঠুর। হাতের কাছে আর কিছু না পেলে যুবতীরা পাখা দিয়ে মাছিও মারে—"

"রঞ্জাবতী দেবী"—তীক্ষ্ণ অকম্পিত কণ্ঠে বললেন সুরূপিণী, তাঁর মুখে ক্রোধের রক্তিমা ফুটে উঠল—"কে আপনাকে পাঠিয়েছে এখানে? কেন এসেছেন? কি প্রয়োজন আপনার?"

"আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন আমি কেন এসেছি। আপনার মতো বৃহৎ আদর্শ আমার সামনে নেই। আমার হৃদয় আমার বুকে থাকে না, আমার আস্তিনে থাকে। জামাটাও মাঝে মাঝে বদলাতে হয়। আমার হৃদয় খুব ছোট, সেই জন্যই হয়। মহারাণী আমার এই অশোভন উক্তি মাপ করবেন আশা করি, কিন্তু যা মনে হল তা বলে ফেললাম।"

দাঁড়িয়ে উঠলেন সুরূপিণী।

"মহারাজকে বন্দী করা হয়েছে, এই খবর দিতেই এসেছেন?"

"হ্যাঁ, আপনি যখন খাচ্ছিলেন তখনই বন্দী করা হয়েছে তাঁকে।"

রঞ্জাবতী উঠলেন না, বসেই রইলেন।

"যা বলতে এসেছিলেন তা তো বললেন। আর আপনাকে আমি আটকাব না—"

"না, মহারাণী, সব কথা এখনও বলা হয়নি। যদি অনুমতি করেন, বলি। আপনার কাজের জন্য আজ সমস্ত সন্ধ্যাটা অনেক কিছু সহ্য করেছি। বড় কষ্ট পেয়েছি। এ জঘন্য কাজ করবার জন্যে বাধ্য করা হয়েছে আমাকে—"

রঞ্জাবতী তাঁর হাতের পাট-করা পাখাটা খুলে ফেললেন, তারপর ধীরে ধীরে হাওয়া করতে লাগলেন নিজেকে, তাঁর নাড়ীর স্পন্দন দ্রুত থেকে দ্রুততর হচ্ছিল ক্রমশ। তাঁর মনের ভাব বিচ্ছুরিত হচ্ছিল তাঁর উজ্জ্বল চোখের ভাষায়, গ্রীবার উদ্দীপ্ত ভঙ্গিমায়, সুরূপিণীর দিকে বিজয়িনীর মতো যে উদ্ধত দৃষ্টিতে ঘৃণাভরে চেয়েছিলেন সেই চাহনির নীরব কশাঘাতে। একাধিক ক্ষেত্রে সুরূপিণীর সঙ্গে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল—অন্ততঃ রঞ্জাবতী তাই মনে করতেন—আজ সে সবের শোধ তুলতে হবে। আজ তিনি বিজয়িনী।

"রঞ্জাবতী দেবী, আপনি তো আমার ভৃত্য নন"—সুরূপিণী বললেন।

"না, তা নই"—তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন রঞ্জাবতী—"কিন্তু আমাদের দুজনকেই একটি লোকের তাঁবে থাকতে হয় এ কথা আশা করি আপনি জানেন, আর যদি না জানেন তাহলে আমি সেটা সানন্দে জানাচ্ছি আপনাকে। আপনার বুদ্ধিসুদ্ধি এত কম—এত কম—" কথাটা পুনরাবৃত্তি করলেন তিনি, হাতের পাখাটা প্রজাপতির মতো আর একটু ঊর্ধ্বে আন্দোলিত হতে লাগল—"হয়তো ব্যাপারটা আপনি ঠিক বোঝেননি।" এবার পাখাটা মুড়ে কোলের উপর রাখলেন এবং উত্তেজিত ভাবে আর একটু সোজা হয়ে বসলেন।

"সত্যি বলছি, আপনার মতো অবস্থায় কোনও মেয়েকে পড়তে দেখলে, সত্যিই খুব কষ্ট হবে আমার। আপনি তো জীবনে যা কিছু কাম্য তাই নিয়েই জীবন আরম্ভ করেছিলেন মহারাণী, পুষ্পাকীর্ণ পথে আপনার রথ যাত্রা শুরু করেছিল—ভালো বংশ, যোগ্য বর, অনিন্দ্য রূপ—সবই ছিল—কিন্তু দেখুন এ সব সত্ত্বেও কোথায় এসে দাঁড়িয়েছেন আপনি। সত্যি, অনুকম্পা হচ্ছে। সবচেয়ে কি সে সর্বনাশ হয়েছে জানেন? ক্ষমতার মদিরা পান করে আপনার মাথাটা ঘুরে গেছে, আপনার মতিভ্রম হয়েছে।"

আবার পাখাটা খুলে সপ্রতিভভাবে হাওয়া করতে লাগলেন নিজেকে।

"দেখুন, রঞ্জাবতী দেবী, আপনি আত্মবিস্মৃত হয়েছেন। পাগলের মতো কি যা তা বলছেন।"

"পাগল? না পাগল হইনি এখনও। মাথা আমার এত ঠাণ্ডা আছে যে আমি জানি আপনি এখন আমাকে দূর করে দিতে পারবেন না—এবং তা জানি বলেই যা বলবার তা বলে তবে

আমি যাব। আমি যখন প্রিয়দর্শী মহারাজাকে—হ্যাঁ আমি তাঁকে প্রিয়দর্শীই বলব—আমি যখন একটু আগে তাঁকে ছেড়ে এলাম তখন তিনি একটা তুচ্ছ কাঠের পুতুলের জন্যে অঝোর ঝরে কাঁদছিলেন। সত্যিই বড় কষ্ট হল, প্রিয়দর্শী গন্ধরাজকে আমি ভালোবাসি, আপনি বুঝতে পারবেন না, কিন্তু আমি তাঁকে তাঁর পুতুলটা ফিরিয়ে দিয়ে তাঁর চোখের জল মুছিয়ে তাঁর মুখে হাসি ফোটাতে চাই—আমি তাঁকে সুখী দেখতে চাই।"

হঠাৎ সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে উঠলেন রঞ্জাবতী। তাঁর নাসারন্ধ্র স্ফুরিত হয়ে উঠল। পাখাটা মহারাণীর দিকে খোঁচার মতো বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, "আপনি কি জানেন? আপনি বোকা, আপনি একটি কচি খুকী! প্রাণহীন কাঠের পুতুল একটা! আপনার শরীরে কি দয়ামায়া আছে? ভালোবাসা আছে? রক্ত আছে? কিচ্ছু নেই। থাকলে বুঝতে পারতেন উনি কত বড় মানুষ আর আপনাকে কত ভালোবাসেন। এ ভালবাসা জীবনে দু'বার আসে না, এ তুচ্ছ সাধারণ জিনিস নয়, এ ভালোবাসার জন্যে অনেক বুদ্ধিমতী অনেক রূপসী কেঁদে কেঁদে বেড়ায় তবু পায় না। আর আপনি, এক ফোঁটা মেয়ে, অমন রত্নকে পায়ে দলেছেন, আপনি বোকা, দেশাকে অন্ধ। রাজ্যশাসন করবার আগে নিজের ঘর গোছাতে শিখুন ভদ্রভাবে, ঘরই মেয়েদের রাজত্ব, রাজধানী সব—"

রঞ্জাবতীর হাতের পাখাটা কাঁপছিল। তিনি থামলেন একটু, তারপর হেসে উঠলেন, অদ্ভুত সে হাসি।

"বলা উচিত নয়, তবু একটা কথা বলছি, ভেবেছিলাম বলব না কিন্তু বলছি। নারী হিসেবে রঞ্জাবতী আপনার চেয়ে অনেক ভালো, জানি না কথাটা কষ্ট করে আপনি বুঝবেন কি না। আমি যখন আপনার আদেশপত্রটা মহারাজকে দিলাম তখন তাঁর মুখ দেখে আমার বুকটা ভেঙে গেল, সমস্ত আত্মাটাই বিগলিত হয়ে গেল যেন এবং—হ্যাঁ, রেখে-ঢেকে বলছি না—আমি দুহাত বাড়িয়ে এগিয়ে গেলাম তাঁকে আমার বুকে আশ্রয় দিতে।"

সত্যিই রঞ্জাবতী দুহাত প্রসারিত করে নাটকীয় ভঙ্গীতে এগিয়ে গেলেন একটু। সঙ্কোচে সরে গেলেন সুরূপিণী।

"ভয় পাবেন না। আমি আপনাকে সে আশ্রয় দিতে চাই না। পৃথিবীতে একটি মাত্র লোক আছেন যিনি আপনাকে সে আশ্রয় দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু আপনি তাঁকে দূরে ঠেলে দিয়েছেন। মহারাজ কি বলেছিলেন শুনবেন? বলেছিলেন ওর যদি এতেই আনন্দ হয় আমি কাঁটার মুকুটই পরব, আমি কাঁটাকেই আলিঙ্গন করব। আমি আপনাকে বলছি—খোলাখুলিভাবেই বলছি—আদেশপত্রটা তাঁর হাতে দিয়ে আমি তাঁকে বলেছিলাম আপনি রুখে দাঁড়ান, প্রতিবাদ করুন, প্রতিরোধ করুন। আপনি আপনার স্বামীর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন, আমার সঙ্গেও করতে পারেন—এ কথা কপিঞ্জলের কানে তুলে দিয়ে। কিন্তু গন্ধরাজ বিশ্বাসঘাতকতা করবেন না। এ কথাটা ভালো করে বুঝে নিন যে তাঁর উদারতার জন্যেই আপনি এখন এখানে বসে আছেন, চাকা অনায়াসেই ঘুরে যেতে পারত, তাকে আমি সে ক্ষমতা দিয়েছিলাম, আদেশপত্র অনায়াসেই বদলে দিতে পারতেন তিনি। কিন্তু তিনি তা করেননি; আপনাকে কারাগারে না পাঠিয়ে নিজেই তিনি চলে গেলেন সেখানে।"

সুরূপিণী স্তম্ভিত অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। যখন কথা কইলেন বোঝা গেল কাতরও হয়ে পড়েছেন খুব। বললেন—"আপনার রূঢ়তায় আমি স্তম্ভিত হয়ে গেছি। খুবই কষ্ট হচ্ছে

আমার। আপনি যা করেছেন তার জন্যে রাগ করছি না, কারণ অন্যায় হলেও এটা স্বীকার করতে হবে যা করেছেন তাতে আপনার সহৃদয়তাই প্রকাশ পেয়েছে। এটা আমার জানা দরকার ছিল। আমি সব কথা খুলে বলছি আপনাকে, যদিও হয়তো তা উচিত হচ্ছে না। অত্যন্ত দুঃখে আমি ওই আদেশপত্র লিখতে বাধ্য হয়েছিলাম। মহারাজকে আমিও পছন্দ করি খুব, তাঁর অমায়িকতায় আমি মুগ্ধ। কিন্তু এটা আমাদের মহা দুর্ভাগ্য, হয়তো আমিই এর জন্যে খানিকটা দায়ী, যে আমাদের ঠিক জোড় মেলেনি। কিন্তু তবুও ওঁর নানা গুণকে আন্তরিক শ্রদ্ধা করি আমি। উনি যদি সাধারণ লোক হতেন তাহলে আপনার মতের সঙ্গে আমি সায় দিতাম। কিন্তু যেখানে রাজ্যের ভালোমন্দ নির্ভর করছে সেখানে পক্ষপাতহীন হতে হবে, ব্যক্তিগত কোন প্রশ্নের সেখানে স্থান নেই। অত্যন্ত অনিচ্ছাসহকারে রাজ্যের শুভাশুভের কথা চিন্তা করে কর্তব্যের খাতিরেই ওটা করতে হয়েছে আমাকে এবং এটাও আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে রাজ্যের বিপদের ভয় যখন থাকবে না তখনই মহারাজা মুক্তি পাবেন। আপনি এখন যে সব কথা যে ভাবে বললেন তাতে রাণী হিসাবে আমার রাগ করা উচিত, কিন্তু আমি রাগ করিনি''—মনে হল মুহূর্তের জন্য তিনি কাতর দৃষ্টিতে চাইলেন রঞ্জাবতীর দিকে—''আপনি আমাকে যতটা অমানুষ মনে করছেন, আমি ঠিক ততটা নই—''

''আপনি রাজ্যের শুভাশুভ আর একজনের ভালোবাসা কি এক বাটখারায় ওজন করবেন?''

''রঞ্জাবতী, রাজ্যের অনেক লোকের জীবন-মরণ যে জড়িত রয়েছে এর সঙ্গে। গন্ধরাজের জীবনও নিরাপদ নয়, এবং হয়তো আপনারও নয়''—সুরূপিণী গম্ভীর ভাবে বিজ্ঞের মতো বলে চললেন—''আমার বয়স যদিও কম তবু জীবনে এই বেদনাদায়ক কঠোর শিক্ষা আমি পেয়েছি যে আমার ব্যক্তিগত ব্যথা-বেদনা-সুখ-দুঃখের স্থান কখনই সর্বাগ্রে স্থান পাবে না, সর্বদাই সবার শেষে থাকবে তা—''

''এ কি ন্যাকামি! মুখ দিয়ে লাগ-সই কথাটা বেরিয়ে পড়ল আমার, মাপ করবেন। ভদ্রভাবে বললেও বলতে হয়—আপনার এই সরলতা দেখে অবাক হচ্ছি। আপনি যে কি ষড়যন্ত্রের মধ্যে আছেন তা কি আপনি জানেন না? আপনার কি সন্দেহও হয়নি? সত্যি আপানর উপর অনুকম্পা হচ্ছে, হাজার হলেও আমরা দুজনেই এক জাতের, দুজনেই মেয়েমানুষ, ছি, ছি, লোকটা কি বোকা বানিয়েছে আপনাকে। আমি সব মেয়েমানুষকেই ঘৃণা করি তাদের ওই একটি দোষের জন্য। কিন্তু আপনাকে দেখে এখন সত্যি কষ্ট হচ্ছে আমার। আপনার উপর আর আমার রাগ নেই। মহারাণী—''

হঠাৎ তিনি ভঙ্গীভরে অভিবাদন করলেন—''মহারাণী, আমি এবার হয়তো আপনার সম্মানে আঘাত করব, যে লোকটাকে সবাই আমার প্রণয়ী বলে তার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করে দেখাব, কিছু গোপন করব না, এর জন্যে আপনি হয়তো আমার সর্বনাশ করে দিতে পারেন,—তা করুন, আমি গ্রাহ্য করি না। কি সুন্দর নাটক বলুন তো। আপনি বিশ্বাসঘাতক, আমি বিশ্বাসঘাতক, সবাই বিশ্বাসঘাতক। এবার আমার পালা এসেছে। চিঠি, হ্যাঁ একটা চিঠি। এই চিঠিটা দেখুন মহারাণী, এটার সীল এখনো আমি ভাঙিনি, এটা আজ সকালে আমার বিছানার উপর পেয়েছি। আজ আমার মেজাজ ভাল ছিল না তাই ওটা খুলিনি, এর এরকম চিঠি আমি অজস্র পাই, এ রকম অনুগ্রহ প্রত্যহই বর্ষিত হয় আমার উপর। আপনার নিজের

জন্য, আমার প্রিয়দর্শী গন্ধরাজের জন্য, আর যে রাজতন্ত্রের চিন্তা আপনার ঘাড়ে চেপে বসেছে তার জন্য আমি অনুরোধ করছি চিঠিটা খুলে পড়ুন।"

"এ চিঠির সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক আছে কোনও?"

"ওতে কি আছে তা তো জানি না। আমি তো পড়িনি। কিন্তু চিঠিটা আমার, আপনি পড়ে দেখুন কি আছে ওতে।"

"আপনি আগে না পড়লে আমি পড়ব না। ওতে হয়তো এমন কথা থাকতে পারে যা গোপনীয়, যা আমার জানা উচিত নয়।"

রঞ্জাবতী চিঠিটা খুলে চোখ বুলিয়ে নিলেন একবার, তারপর সেটা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন টেবিলের উপর। মহারাণী তুলে নিয়ে এক নজরেই কপিঞ্জলের হস্তাক্ষর চিনতে পারলেন। পড়তে পড়তে ভ্রূকুঞ্চিত হয়ে এল তাঁর। একটা অপ্রত্যাশিত ধাক্কায় তাঁর মাথা ঘুরে গেল, গা গুলিয়ে উঠল। চিঠিতে লেখা ছিল—

প্রাণের রনজু, অবিলম্বে চলে এস। আদরিণী কাজটি করে ফেলেছেন, আদেশ দিয়েছেন তাঁর স্বামীকে কারাগারে চালান করে দেওয়া হোক। বাচাল দজ্জাল মেয়েটা এবার সম্পূর্ণ আমার কবলে। এবার আর বেচাল হতে পারবে না. জোয়ালে জুতে দিলে ঠিক চালে চলবে। আর যদি না চলে তখন আমি বুঝব। এখনি চলে এস। কপিঞ্জল—

"ঘাবড়াবার কিছু নেই মহারাণী, বেসামাল হবেন না—" সুরূপিণীর মুখের বিবর্ণ ভাব দেখে তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন রঞ্জাবতী। "কপিঞ্জলের সঙ্গে আপনি এঁটে উঠতে পারবেন না, আপনার অনুগ্রহ ছাড়াও আরও নানাদিকে ওর জাল ছড়ানো আছে। অঙ্গুলি সামান্য হেলনে ও আপনাকে সিংহাসন থেকে নামিয়ে দিতে পারে। এটা জানি বলেই ওর স্বরূপটা দেখিয়ে দিলাম আপনাকে। কপিঞ্জল শক্তসমর্থ পুরুষ, ও এতদিন আপনাদের পুতুল নাচ নাচিয়েছে। এখন অন্তত আপনি বুঝতে পারছেন কিসের জন্যে আপনি আপনার অমন স্বামীকে বিসর্জন দিয়েছেন। আপনি একটু মাধ্বী পান করবেন? আমি বড়ই নিষ্ঠুরের মতো ব্যবহার করেছি আপনার সঙ্গে—"

"নিষ্ঠুরের মতো নয়, হিতকারী বন্ধুর মতো"—একটা হাসি হেসে বললেন মহারাণী, — "না, ধন্যবাদ, আমার কিছু দরকার হবে না। প্রথম ধাক্কাটা আমাকে একটু বিচলিত করেছিল। আপনি আমাকে একটু সময় দেবেন? আমি ভাবতে চাই একটু— "

তিনি দু'হাতে মাথাটা চেপে ধরে চোখ বুজে এমন ভাবে বসে রইলেন খানিকক্ষণ যেন একটা দুরন্ত ঝড়ের দাপটের মধ্যেও পথ খোঁজবার চেষ্টা করছেন।

"ঠিক সময়েই খবরটা পৌঁছেচে। আপনি যা করলেন আমি তা করতে পারতাম না, আমার ধন্যবাদ গ্রহণ করুন। কপিঞ্জল আমাকে প্রতারণা করেছে বুঝতে পেরেছি সেটা।"

"মহারাণী, কপিঞ্জল চুলোয় যাক, আপনি আগে গন্ধরাজের কথা ভাবুন।"

"আপনি আবার এমন ভাবে কথা কইছেন যেন আমি সাধারণ পর্যায়ের সামান্য মানুষ। আপনাকে অবশ্য আমি দোষ দিচ্ছি না এ জন্য। কিন্তু আমার নিজের চিন্তাই কেমন যেন এলোমেলো হয়ে গেছে। যাক, আপনি যখন আমার, মানে আপনি গন্ধরাজের প্রকৃত বন্ধু, তখন এই মুহূর্তেই তার মুক্তির আদেশটা আপনার হাতেই দিচ্ছি আমি। দোয়াত-কলমটা এগিয়ে দিন এ দিকে— "

তিনি টেবিলের উপর ঝুঁকে খস্ খস্ করে লিখে দিলেন আদেশটা যদিও লিখতে লিখতে তাঁর হাতটা কেঁপে কেঁপে উঠছিল।

"এই নিন। মনে রাখবেন এটা এখন ব্যবহার করবেন না, এ কথা বলবেনও না কাউকে যতক্ষণ না কপিঞ্জলের সঙ্গে আমার দেখা হচ্ছে। তাড়াতাড়িতে হয়তো সব পণ্ড হয়ে যেতে পারে, এই আকস্মিক ধাক্কায় আমার বুদ্ধিটা গুলিয়ে গেছে।"

"মহারাণী, আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যতক্ষণ না আপনি আমাকে অনুমতি দিচ্ছেন ততক্ষণ আমি এটা ব্যবহার করব না, তবে মনে হচ্ছে খবরটা গন্ধরাজের কানে যদি পৌঁছয় বেচারা একটু আরাম পাবে। হ্যাঁ, আর একটা কথা বলতে ভুলে গিয়েছি। তিনি আপনাকে একটা চিঠি লিখে রেখে গেছেন। আপনার অনুমতি পেলে সেটা আমি নিয়ে আসতে পারি। এই দরজা দিয়েই যাওয়া যায় বোধহয়?"

রঞ্জাবতী কপাটটা খোলাবার জন্য এগিয়ে গেলেন সেদিকে।

"এ কি, ওদিক থেকে খিল লাগানো রয়েছে যে!"

"হ্যাঁ—ওটা"—

সুরূপিণীর কানটা লাল হয়ে উঠল।

"ওঃ—"—রঞ্জাবতী আর কিছু বললেন না।

একটা নীরবতা ঘনিয়ে এল কয়েক মুহূর্তের জন্য।

"আমি নিজে গিয়েই চিঠিটা নিয়ে নেব। আপনি এখন যান। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আমি এখন একা থাকতে চাই।"

রঞ্জাবতী অভিবাদন করে বেরিয়ে গেলেন।

।। আঠারো।।

সুরূপিণী সাহসী, অন্তত বুদ্ধির সাহস তাঁর কম নয়, তবু যখন তিনি একা হয়ে গেলেন তখন টেবিলটা আঁকড়ে ধরে তিনি নিজেকে সামলালেন। সহসা সমস্ত আকাশ যেন ভেঙে পড়ল মাথায়। তিনি কোনও দিনই কপিঞ্জলকে পছন্দ তো করেনই নি, এমন কি সম্পূর্ণ বিশ্বাসও করেননি। তাঁর বন্ধুত্বটা যে মেকী হতে পারে এ সম্ভাবনার কথা তাঁর মনে বার বার জাগত। কিন্তু সরকারী কাজকর্মে যে সাধুতার জন্য তিনি তাঁকে সম্মানিত করেছিলেন তাও যে তাঁর একেবারেই নেই, তিনি যে একটা সামান্য শঠ স্বার্থান্বেষী মাত্র, নিজের হীন উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য জঘন্য ষড়যন্ত্রে তিনি যে সুরূপিণীকে দাবার বোড়ের মতো ব্যবহার করতে ইতস্ত করেননি—এ সব কল্পনাতীত ছিল সুরূপিণীর। এই সত্যের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে তাঁর একটু সময় লাগল, উচ্চ পর্বতশিখর থেকে দ্রুত অধঃপতন হলে মাথাটা যেমন ঘুরে যায় তাঁরও অনেকটা সেইরকম হল। তাঁর মস্তিষ্কে আলো আর অন্ধকার যেন পর পর আসতে লাগল, একবার বিশ্বাস করছেন, পরমুহূর্তেই অবিশ্বাস এসে বিশ্বাসকে সরিয়ে দিচ্ছে। তিনি কপিঞ্জলের চিঠিটা অন্ধের মতো হাত বাড়িয়ে বাড়িয়ে খুঁজতে লাগলেন। কিন্তু চিঠি ছিল না। রঞ্জাবতী যেমন গন্ধরাজের কাছ থেকে আদেশপত্রটি ঠিক নিয়ে এসেছিলেন এখান থেকেও

তেমনি কপিঞ্জলের চিঠিটা নিয়ে যেতে ভোলেননি। রঞ্জাবতী পুরোনো খেলোয়াড়, সহসা লক্ষ্যভ্রষ্ট হন না। রেগে গেলে তাঁর বুদ্ধি ভোঁতা হয় না আরও শাণিত হয়।

কপিঞ্জলের চিঠি খুঁজতে গিয়ে তাঁর আর একটা চিঠির কথা মনে পড়ল। গন্ধরাজের চিঠি। তৎক্ষণাৎ উঠে দ্রুতবেগে বেরিয়ে গেলেন তিনি, তাঁর মাথা তখনও ঘুরছিল, গন্ধরাজের শস্ত্রাগারে ঝড়ের মতো প্রবেশ করলেন গিয়ে। বৃদ্ধ কঞ্চুকী সেখানে অপেক্ষা করছিল। তাঁকে দেখে চটে গেলেন সুরূপিণী। মনে হল কি করছে লোকটা এখানে। তাঁর এই সর্বনাশ উঁকি মেরে দেখছে না কি!

"তুমি যাও এখান থেকে"—আদেশের ভঙ্গীতে বলে উঠলেন। কঞ্চুকী বেচারা যখন কিছুদূর চলে গেছে তখন আবার ডাকলেন তাকে—"থাম, শোন। প্রধানমন্ত্রী কপিঞ্জলদেও এলেই তাঁকে এখানে পাঠিয়ে দিও।"

"আপনার হুকুম তাঁকে বলব।"

"এখানে একটা চিঠি ছিল"—বলেই থেমে গেলেন তিনি।

"মহারাণী ওই টেবিলের উপর চিঠিটি আছে। আমার উপর কোনও আদেশ ছিল না, থাকলে মহারাণীকে এজন্য কষ্ট করে আসতে হত না। এনে দেব ওটা?"

"না, না, না। ধন্যবাদ। আমি এখন একা থাকতে চাই।"

কঞ্চুকী চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সুরূপিণী ছুটে গিয়ে যেন লাফিয়ে পড়লেন চিঠিটার উপর। তাঁর মন তখনও অন্ধকারাচ্ছন্ন, ঝোড়ো মেঘলা রাতে চাঁদের মতন তাঁর বিচারবোধ কখনও উজ্জ্বল হচ্ছে, কখনও আবার ঢাকা পড়ে যাচ্ছে। চিঠিটা তিনি একটানা পড়তে পারলেন না। থেমে থেমে পড়লেন।

"সুরূপিণী"—গন্ধরাজ লিখেছিলেন—"আমি একটিও তিরস্কার বাক্য লিখব না। আমি তোমার আদেশপত্র দেখেছি, আমি চললাম। আমার আর কি বাকি রইল? আমার সব ভালোবাসা আমি অপব্যয় করে নষ্ট করে ফেলেছি, আর কিছু অবশিষ্ট নেই। তোমাকে আমি ক্ষমা করলাম এ কথা লেখারও প্রয়োজন নেই। আমরা এখন চিরদিনের মতো আলাদা হয়ে গেলাম। তুমিই নিজে হাতে আমার ঈপ্সিত বন্ধনটা কেটে দিলে, বন্ধনহীন হয়ে আমি কারাগারে চললাম। রাগ করে বা অনুরাগ ভরে তোমাকে আর কখনও কিছু বলতে আসব না। তোমার জীবন থেকে আমি বেরিয়ে এলাম, হয়তো তুমি এবার স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে পারবে। যে স্বামী তোমাকে স্বামী-ত্যাগ করতে বাধা দেয়নি, যে রাজা তার নিজের সমস্ত ক্ষমতা, সমস্ত অধিকার তোমার হাতে ছেড়ে দিয়েছিল, যে বিবাহিত প্রণয়ী আড়ালে তোমার দোষ ঢেকে সর্বদাই গর্ব অনুভব করত—তার হাত থেকে এবার তুমি পরিত্রাণ পেলে। কিভাবে তুমি প্রতিদান দিয়েছ সে কথা তোমার বিবেকই তোমাকে স্পষ্ট করে বলবে, আমি কিছু বলতে চাই না। কিন্তু একদিন আসবে যখন তোমার অলীক স্বপ্নগুলো মেঘের মতই মিলিয়ে যাবে, তখন দেখবে তুমি নিতান্তই একা। তখন তোমার সব মনে পড়বে।"

গন্ধরাজ

চিঠিটা পড়তে পড়তে তিনি ভয়ে শিউরে উঠলেন। যে দিনের কথা গন্ধরাজ লিখেছেন সে দিন তো এসে গেছে। তিনি তো সত্যিই এখন একা, একেবারে একা। তিনি বিশ্বাসহন্ত্রী, তিনি নিষ্ঠুর। অনুতাপের ঢেউ যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল তাঁর মনের উপর। তার পরই তাঁর

চেতনার রঙ্গমঞ্চে তীব্র চীৎকার করে আরও নানা অনুভূতি মূর্ত হল। তিনি প্রবঞ্চিত, তিনি প্রতারিত। তিনি অসহায়। তিনি স্বামীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করবার জন্যে নিজেকে ঠকিয়েছেন। বছরের পর বছর তিনি কাটিয়েছেন খোশামোদের মিথ্যা স্বর্গে। টপ টপ করে গিলেছেন তোষামোদের টোপগুলো, জুয়াচোর পরিবৃত হাস্যকর বিদূষকের মতো লোক হাসিয়েছেন প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে দাঁড়িয়ে! তিনি—সুরূপিণী! এর পরিণাম কি তা তিনি নিমেষে বুঝতে পারলেন, নিমেষে আকণ্ঠ পান করলেন এ গরল। আসন্ন পতনের ছবিটা ভেসে উঠল চোখের উপর, জনতার ধিক্কার তিনি যেন শুনতে পেলেন, দেখলেন এই ঘৃণ্য কলঙ্কের কাহিনী কি ভাবে লোকের মুখে মুখে সাড়ম্বরে সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ছে। বাহাদুরি দেখাবার জন্য রাজকীয় প্রতাপের জোরে তিনি যে দৃষ্টিকটু কেলেঙ্কারিটাকে গ্রাহ্যই করেননি—এখন সেটার মুখোমুখি হবার মতো সাহস তাঁর কই। ওই লোকটার উপপত্নী বলে সবাই তাঁকে ভাববে এবার—হয়ত ওই জন্যই.....তাঁর মুদিত চোখের সামনে বহু অকথ্য জঘন্য চিত্র ভেসে উঠল সারি সারি। দেওয়ালে নানা অস্ত্র ঝুলছিল, হঠাৎ তিনি একটা ছোরা পেড়ে ফেললেন। হ্যাঁ, সরে পড়তে হবে। পৃথিবীর এই রঙ্গমঞ্চ থেকে, যেখানে দর্শকরা কেউ মাথা নাড়ছে, কেউ মুচকি হাসছে, কেউ ফুসফুস-গুজগুজ করছে—এখান থেকে সরে পড়বার একটি মাত্র দরজাই খোলা আছে এখন। যেমন করে হোক, যত কষ্ট সহ্য করেই হোক জনতার ওই স্থূল অট্টহাস্য থেকে পরিত্রাণ পেতে হবে। চোখ বুজে নীরবে তিনি প্রার্থনা করলেন, তারপর ছোরার ডগাটা বিঁধিয়ে দিলেন বুকে। খুব লাগল। চীৎকার করে উঠলেন তিনি, দংশন করল যেন ছোরাটা। বুঝলেন তিনি পারবেন না, এভাবে সরে পড়বার ক্ষমতা তাঁর নেই, অধিকারও নেই বোধ হয়। চুনীর মতো একফোঁটা রক্তবিন্দু কেবল তাঁর বুকের উপর সাক্ষী হয়ে রইল এই দুঃসাহসের। তীক্ষ্ণ আঘাতটা কিন্তু তাঁকে আত্মস্থ করল, তিনি যেন নিজের শক্তি ফিরে পেলেন আবার। আত্মহত্যা করবার ইচ্ছেটা চলে গেল মন থেকে।

ঠিক এই সময়ে বাইরের বারান্দায় পদধ্বনি শোনা গেল; ক্রমশ এগিয়ে আসতে লাগল সেটা। কপিঞ্জলের পদধ্বনি, এ পদধ্বনির আওয়াজ তাঁর চেনা, এ আওয়াজ শুনে কতবার তিনি খুশী হয়েছেন। কিন্তু এখন এ পদধ্বনি শুনে তাঁর সমস্ত সত্তা রুখে দাঁড়াল যুদ্ধের জন্যে। ছোরাটা তিনি লুকিয়ে ফেললেন কাপড়ের মধ্যে। তারপর সোজা হয়ে ঘাড় তুলে ক্রোধ-দীপ্ত মূর্তিতে অকম্পিত চরণে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি শত্রুর প্রতীক্ষায়।

প্রধানমন্ত্রীর আগমনবার্তা যথারীতি ঘোষিত হল। তিনি প্রবেশ করলেন এসে। টোলের ছাত্রদের কাছে পাণিনি ব্যাকরণ যেমন সমস্যা কপিঞ্জলের কাছে সুরূপিণীও বরাবর তাই। তিনি রূপসী কি না এ নিয়ে তিনি কখনও মাথা ঘামান নি, ঘামাবার ইচ্ছা বা অবসর তাঁর ছিল না। কিন্তু আজ তাঁর রোষরঞ্জিত মূর্তি দেখে হঠাৎ নূতন ভাব মনে জাগল তাঁর, তিনি মুগ্ধ হয়ে গেলেন, ক্ষণিকের জন্যে কামনার একটা স্ফুলিঙ্গও যেন বিচলিত করল তাঁকে। তাঁর এ দুটো অনুভূতিরই সম্ভাবনা কি হতে পারে তা ভাবলেন একটু। ভাবলেন, হ্যাঁ ও দুটোও নূতন উপায় বটে তাঁর স্বার্থসিদ্ধির। মনে হল—প্রেমিকের ভূমিকায় যদি অভিনয় করতে হয় এখন, তাহলে সেটা প্রাণহীন হবে না। আবেগময় করে তুলতে পারব সেটাকে—"

তাঁর গুরুভার দেহকে নত করে অভিবাদন করলেন তিনি।

"আমি চাই"—অদ্ভুত সুরে বেজে উঠল সুরূপিণীর কণ্ঠস্বরে, তাঁর কণ্ঠের এ সুর নিজেও

তিনি কোনদিন শোনেন নি—"আমি চাই যে মহারাজাকে এখনই মুক্তি দেওয়া হোক। যুদ্ধ বন্ধ করে দিন অবিলম্বে।"

"মহারাণী, আমি জানতাম শেষ পর্যন্ত এই ঘটবে। যখন আমরা এই অবাঞ্ছিত কিন্তু অতি প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্তে এসেছিলাম তখনই আমার আশঙ্কা হয়েছিল আপনার কোমল হৃদয় এ আঘাত সহ্য করতে পারবে না শেষ পর্যন্ত। কিন্তু বিশ্বাস করুন আমি আপনার অযোগ্য সহকারী নই। আমি জানি আপনার যে সব গুণ আছে আমার তা নেই। কিন্তু আপনার ওই গুণগুলোকেই আমি আমাদের মৈত্রীর অস্ত্রাগারে শ্রেষ্ঠ অস্ত্র বলে গণ্য করি। মহারাণীর অন্তরে কিশোরী। এ যে অপূর্ব —করুণা, প্রেম, স্নেহ, হাসি—এসবের চেয়ে বড় অস্ত্র আর আছে কি? মৃদুঅ হাসিও যে পুরস্কৃত করে সকলকে। আমি শুধু হুকুম করতে পারি, ধমকাতে জানি, আমার মুখে ভ্রূকুটি ছাড়া আর কিছু ফোটে না। কিন্তু আপনি: এই কমনীয় দুর্বলতাগুলোকে কাজে লাগাবার শক্তি আপনার আছে, আবার প্রয়োজন হলে, যুক্তির অনুরোধে এদের দমন করবার ক্ষমতাও আপনি রাখেন। এজন্যে আমি কতবার আপনার কাছেও উচ্ছ্বসিত হয়েছি। হ্যাঁ আপনার কাছেও"—একটু কোমল কণ্ঠে তিনি শেষ কথাগুলি বললেন, সম্ভবত বিগত দিনের উচ্ছ্বাসভরা কোন গোপন সাক্ষাৎকারের কথা তাঁর মনে পড়ল।

"কিন্তু মহারাণী, এখন—"

"এখন ওসব বক্তৃতা থামান"—তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলে উঠলেন সুরূপিণী—"আপনি সত্যি কি? বিশ্বাসী, না বিশ্বাসঘাতক? নিজের মনের দিকে চেয়ে উত্তর দিন। আমি আপনার মনের কথা শুনতে চাই।"

"এইবার হয়েছে"—ভাবলেন কপিঞ্জল। "আপনি, মহারাণী!"—আবেগভরে বলে উঠলেন তারপর, যেন চমকে গেছেন—আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে ভয়ে, আসলে কিন্তু আনন্দে—"আপনি! আপনি আমাকে আদেশ করছেন মনের কথা বলতে!"

"আপনি কি মনে করেন আমি ভয় করি?"

সুরূপিণীর মুখে এমন আশ্চর্য একটা অরুণিমা ফুটে উঠল, চোখের দৃষ্টিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল এমন একটা আলো, অধরপ্রান্তে খেলা করতে লাগল এমন একটা রহস্যময় হাসি যে কপিঞ্জলের মনে আর কোনও সন্দেহ কোনও দ্বিধা রইল না। তিনি ঝপ্ করে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লেন।

"মহারাণী"—আবেগ ভরে তাঁর কণ্ঠস্বর কাঁপতে লাগল—"সুরূপিণী, এ নামে ডাকবার অনুমতি দেবেন কি? আপনি কি আমার মনের গোপন কথা টের পেয়েছেন? সত্যি—আমি সানন্দে আমার জীবন আপনার পায়ে উৎসর্গ করছি। আমি আপনাকে ভালবাসি, সারা হৃদয় দিয়ে বাসি বন্ধুরূপে, প্রেয়সীরূপে, সমরসঙ্গীনীরূপে; মধুর হৃদয়ের জন্য কামনা করি আপনাকে, পূজা করি। আপনি আমার বধূ—" হঠাৎ তাঁর কবিত্ব সপ্তমে চড়ে গেল—"আমার মানসবধূ, আমার ইন্দ্রিয়লোকের ইন্দ্রাণী আপনি। করুণা করুন, গ্রহণ করুন আমার ভালোবাসা।"

সুরূপিণী বিস্মিত হয়ে শুনছিলেন। তারপর তাঁর রাগ হল, পরিশেষে ঘৃণা, নিদারুণ ঘৃণা। তাঁর কথাগুলো তাকে যেন মারতে লাগল, অপমানে আত্মহারা হয়ে গেলেন তিনি। হুমড়ি খেয়ে যে প্রকাণ্ড জানোয়ারটা তাঁর পায়ের কাছে পড়ে আছে তাঁকে দেখে হেসে উঠলেন তিনি, দুঃস্বপ্ন দেখে লোকে যেমন হাসে।

"কি লজ্জা, কি লজ্জা। এ কি অসম্ভব ঘৃণ্য আচরণ আপনার। এ দেখলে আপনার রঞ্জাবতী কি বলবেন?"

সেই মহামহিম প্রধানমন্ত্রী, সেই তুখোড় রাজনৈতিক নেতা—ওই অবস্থায় হাঁটু গেড়েই আরও কিছুক্ষণ রইলেন। তাঁর মনের যে অবস্থা হল তাকে সকরুণ বা শোচনীয় বললেও অত্যুক্তি হবে না কিছু। বিরাট বক্ষের লৌহপিঞ্জরে তাঁর অহঙ্কার যেন মাথা কুটে রক্তাক্ত হয়ে ছটফট করতে লাগল। তিনি যদি সমস্ত মুছে দিতে পারতেন, অংশত ও যদি পারতেন, ওই 'বধূ' শব্দটা যদি উচ্চারণ না করতেন—তাঁর কানের কাছে কে যেন আর্তনাদ করছিল—নিজের মূঢ় আচরণে ক্ষুব্ধ লজ্জিত হয়ে টলতে টলতে উঠে দাঁড়ালেন তিনি অবশেষে। নির্বাক যন্ত্রণা যখন ভাষা পায় তখন রসনা যা প্রকাশ করে তাতে মানুষের প্রচ্ছন্ন নিকৃষ্ট রূপ উদঘাটিত হয় সহসা। কপিঞ্জলের মুখ দিয়ে যা বেরুল তার জন্যে এরপর ছয় সপ্তাহ ধরে তাঁকে অনুতাপ করতে হয়েছিল।

"ও, রঞ্জাবতী?"—তিনি বললেন—"এইবার বুঝতে পারছি কেন মহারাণীর এ অস্বস্তি—"

অসভ্য চাষার মতো অশ্লীল ভঙ্গীতে কথাগুলো বললেন তিনি। আগুন ধরে গেল সুরূপিণীর মনে। যে বজ্রগর্ভ কালো মেঘটা তাঁর যুক্তিকে এতক্ষণ আচ্ছন্ন করে রেখেছিল সেটা থেকে এবার বজ্রপাত হল। তিনি চীৎকার করে উঠলেন, তারপর মেঘটা যখন সরে গেল, রক্তাক্ত ছোরাটা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন মেজের উপর। ক্ষতটাকে চেপে ধরে কপিঞ্জল ব্যায়ত আননে এগিয়ে এলেন টলতে টলতে। পরমুহূর্তে যে ভাষা উচ্চারণ করতে করতে তিনি বন্য মহিষের মতো সুরূপিণীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন সে ভাষা সুরূপিণী কখনও শোনেননি। খামচে ধরলেন তিনি সুরূপিণীর পোশাকের খানিকটা, সুরূপিণী আতঙ্কে পেছিয়ে গেলেন তাঁকে ধাক্কা দিয়ে। হোঁচট খেলেন কপিঞ্জল, তারপর তাঁর মাথাটা ঝুলে পড়ল। সুরূপিণী তাঁর সাংঘাতিক উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করবার আগেই কিন্তু তিনি পড়ে গেলেন তাঁর পায়ের কাছে।

তারপর তিনি একটা কনুইয়ের ভর দিয়ে উঠলেন, সুরূপিণী নিষ্পলকদৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন ভয়ে বিবর্ণ হয়ে।

"রনজু"—কপিঞ্জল চীৎকার করে বললেন—"রনজু, বাঁচাও—" এরপর আর কিছু বলতে পারলেন না, ধপাস করে পড়ে গেলেন আবার। মনে হল শেষ হয়ে গেল বুঝি সব।

সুরূপিণী ঘরের মধ্যে ছুটোছুটি করে বেড়াতে লাগলেন, অস্থিরভাবে মোচড়াতে লাগলেন নিজের হাত দুটো, চীৎকার করতে লাগলেন। তাঁর অন্তর্লোকে তখন যেন তুমুল ঝটিকা আর ভয়ঙ্কর কোলাহল, সচেতন মনে কেবল একটি মাত্র বাসনা এ দুঃস্বপ্ন শেষ হোক্, আমি জেগে উঠি।

দ্বারে কে যেন করাঘাত করতে লাগল। তিনি ছুটে চলে গেলেন দ্বারের কাছে, প্রাণপণে চেপে ধরলেন দরজাটা, যেন কেউ ঢুকে না পড়ে। হাঁপাতে লাগলেন, তারপর প্রাণপণ শক্তিতে প্রকাণ্ড খিলটা এঁটে দিলেন ভিতর থেকে। এটা করে নিশ্চিন্ত হলেন একটু, উত্তেজনা একটু কমল। তারপর তিনি ফিরে এলেন নিস্পন্দ কপিঞ্জলের কাছে। দরজার উপর

করাঘাত আরও জোরে জোরে পড়তে লাগল। হ্যাঁ, লোকটা মরেই গেছে। তিনিই হত্যা করেছেন। মৃত্যুকালে তিনি রঞ্জাবতীর নাম শেষ নিশ্বাসের সঙ্গে উচ্চারণ করলেন! এমন করে সুরূপিণীর নাম কেউ কি উচ্চারণ করবে? তিনিই হত্যা করেছেন ওকে। তিনি—যিনি একটু আগে ছোরার ডগার সামান্য খোঁচায় বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন—তিনিই এই বিরাট দৈত্যকে ছোরার এক আঘাতে ভূপাতিত করবার শক্তি সংগ্রহ করতে পেরেছেন।

বাইরের দরজায় করাঘাত আর কোলাহল ক্রমশ উদ্দাম হয়ে উঠতে লাগল। প্রাসাদের শান্ত নির্বিঘ্ন জীবনে এ রকম হয় না। কুৎসা নিন্দা অখ্যাতি কলঙ্ক এবার দ্বারে এসে হানা দিচ্ছে, সঙ্গে কত লোক আছে কে জানে। ভেবে শিউরে উঠলেন সুরূপিণী। অনেকে তাঁর নাম ধরে ডাকছে। মহাধ্যক্ষ কুজ্‌ঝটিকুমারের গলাটা তিনি চিনতে পারলেন।

"মহাধ্যক্ষ কুজ্‌ঝটিকুমার এসেছেন না কি?"—ভিতর থেকে প্রশ্ন করলেন তিনি।

"হ্যাঁ, মহারাণী আমি। আমরা আপনার ঘরে চীৎকার শুনলাম, তারপর কি একটা ভারী জিনিস যে পড়ে গেল। কি হয়েছে?"

"বিশেষ কিছু হয়নি। আমি কেবল আপনার সঙ্গে কথা বলব। আর যাঁরা আছেন তাঁদের চলে যেতে বলুন।"

থেমে থেমে হাঁপাতে হাঁপাতে কথাগুলি বললেন তিনি। তাঁর বুদ্ধি কিন্তু সজাগ ছিল। খিল খোলবার আগে দরজার দুধারে যে গোটানো পরদা ছিল সেগুলো তিনি ফেলে দিলেন, যাতে বাইরের কোন লোক হঠাৎ কিছু দেখতে না পায়। বশংবদ কুজ্‌ঝটিকুমার ভিতরে ঢুকতেই আবার খিল বন্ধ করে দিলেন তিনি। কুজ্‌ঝটিকুমার বিরাট পরদার ভাঁজে একটু জড়িয়ে পড়েছিলেন। সুরূপিণী তাড়াতাড়ি দরজার কাছ থেকে সরে এলেন।

"এ কি!"—সভয়ে বলে উঠলেন তিনি—"মহামান্য কপিঞ্জলদেও!"

"আমি ওঁকে খুন করেছি। হ্যাঁ, হত্যা করেছি—"

"বলেন কি! এ রকম তো আগে কখনও হয়নি।"—তারপর বললেন—"প্রণয় কলহের এ রকম সম্পূর্ণীকরণ"—বলেই থেমে গেলেন একটু অপ্রস্তুত হয়ে।

তারপর আবার বললেন, "কিন্তু এখন কি করা যায়। আমরা কি করব? এ যে ভয়ানক ব্যাপার, ধর্মের দিক দিয়ে নীতির দিক দিয়ে, যে দিক দিয়েই দেখুন — এ যে ভয়াবহ। মহারাণী, মাপ করবেন, যদিও আপনি প্রভু তবু আপনি আমার মেয়ের মতো, সেইভাবেই আমি কথা বলছি—এ যা কাণ্ড করেছেন আইনের চোখে তা—ওঃ তারপর এই মড়া আপনার ঘরে—"

সুরূপিণী ভ্রূকুঞ্চিত করে শুনছিলেন তাঁর কথা, ঘৃণা হল লোকটার উপর। এই অপদার্থ লোকটার কাছে সাহায্যের কোন আশা নেই। নিজেই রাশ ধরতে হবে, ঠিক করে ফেললেন।

"ভাল করে দেখুন না সত্যিই উনি মারা গেছেন কি না!"

নিজের আচরণের কোনও কৈফিয়ত দেওয়া তিনি প্রয়োজন মনে করলেন না। অতিশয় ভয়ে ভয়ে কুজ্‌ঝটিকুমার এগিয়ে গেলেন। এগিয়ে যাওয়া মাত্রই আহত কপিঞ্জলের চোখের পাতা নড়ে উঠল।

"বেঁচে আছেন"—চেঁচিয়ে উঠলেন বৃদ্ধ কুজ্‌ঝটিকুমার—"মহারাণী, উনি বেঁচে আছেন।"

"ওঁকে সাহায্য করুন তাহলে"—সুরূপিণী না নড়েই আদেশ দিলেন—"ওঁর ক্ষতটা কাপড় দিয়ে বেঁধে দিন।"

"বাঁধব? কি করে বাঁধব বলুন—"

"আপনার রুমালটা বার করুন না, যা হোক কিছু একটা দিয়ে বাঁধুন ওটাকে"—এই বলে তিনি তাঁর মসলিনের শাড়ির ঝালর দেওয়া আঁচলটা ছিঁড়ে ফেললেন। সেটা তাঁর দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বললেন—"নিন, এইটে দিয়ে বাঁধুন"—তারপর সেই প্রথম তাঁর কাছে এসে মুখোমুখি দাঁড়ালেন। এতক্ষণ দূরে ছিলেন।

কিন্তু কুজ্ঝটিকুমার দুহাত উপরে তুলে যন্ত্রণায় যেন আর্তনাদ করে উঠলেন। কপিঞ্জল যখন সুরূপিণীকে খামচে ধরেছিলেন তখন তাঁর মূল্যবান কাঁচুলির খানিকটা ছিঁড়ে গিয়েছিল।

"মহারাণী, আপনার কাঁচুলির এ কি ভয়ানক অবস্থা। আপনার বেশবাস যে বিস্রস্ত—"

"আপনি কাপড়টা তুলে নিয়ে ওঁর ক্ষতটা বাঁধুন আগে। তা না হলে উনি এখনি মারা যেতে পারেন।"

কুজ্ঝটিকুমার থতমত খেয়ে কপিঞ্জলের দিকে ফিরে অসহায়ভাবে তাই করবার চেষ্টা করতে লাগলেন, যা না করলেও চলত।

"এখনও আশা আছে মহারাণী। উনি নিঃশ্বাস নিচ্ছেন, নিঃশ্বাস নিচ্ছেন।"

"আপনি এর বেশী যদি কিছু করতে না পারেন তাহলে যান, কয়েকজন লোক ডেকে আনুন। ওঁকে ওঁর নিজের বাড়িতে নিয়ে যান।"

"মহারাণী এই হৃদয়বিদারক দৃশ্য যদি শহরের লোকের চোখে পড়ে, তাহলে তো সর্বনাশ, রাজ্য এখনি রসাতলে যাবে।"

"প্রাসাদে একটা পালকি আছে"—সুরূপিণী বললেন—"সেইটেতে করে ওঁকে বাড়ি পৌঁছে দিন। আপনার উপর এ দায়িত্ব দিচ্ছি। যদি পালন না করেন আপনার প্রাণদণ্ড হবে। যান, এখনি যান—"

"বুঝতে পেরেছি, মহারাণী, স্পষ্ট বুঝতে পেরেছি এবার। কিন্তু নিয়ে যাব কি করে? কারা নিয়ে যাবে? মহারাজের চাকররা? তারা মহারাজকে ভালোবাসে। হ্যাঁ, তাদের ডাকলে হয়, তারা বিশ্বাসী।"

"না, তাদের ডাকতে হবে না। আপনি সাপ্রাকে, আমার নিজের বিশ্বাসী চাকরকে ডাকুন—সে খুব কাজের লোক—"

"সাপ্রাকে! সে তো বিদ্রোহীদের দলের লোক। সে খবর পেলে তো আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়বে খবরটা। সবাই এখুনি এসে আমাদের কচু-কাটা করবে!"

তাঁর আদেশ যে পালিত হচ্ছে না, তিনি যে ধীরে ধীরে নেবে যাচ্ছেন তা সুরূপিণী অনুভব করলেন।

"বেশ, যাকে খুশি ডেকে আনুন। পালকিটা এখানে নিয়ে আসুক।"

কুজ্ঝটিকুমার চলে যেতেই সুরূপিণী কপিঞ্জলের কাছে ছুটে গেলেন এবং চেষ্টা করতে লাগলেন রক্তপাত বন্ধ করতে পারেন কি না—কিন্তু তাঁর গা ঘিন ঘিন করত লাগল। ওই পশুটার অঙ্গ স্পর্শ করবামাত্র তাঁর পা থেকে মাথা পর্যন্ত শিউরে উঠল। তাঁর মনে হল ক্ষতটা সাংঘাতিক, ক্রমাগত রক্ত পড়ছে। মনটাকে শক্ত করে তিনি কাপড়ের টুকরোটা দিয়ে রক্তটা মুছে নিতে লাগলেন, কুজ্ঝটিকুমার এটুকুও পারেনি। মূর্ছিত কপিঞ্জলকে দেখে কোনও নিরপেক্ষ দর্শক মুগ্ধ হয়ে যেতেন। তাঁর সুগঠিত বিশাল দেহ দেখে মনে হচ্ছিল একটা বিরাট যন্ত্র যেন হঠাৎ বিকল হয়ে গেছে। ক্রোধ বা ভণ্ডামির লেশমাত্র আভাস তাঁর মুখমণ্ডলে ছিল

না। মনে হচ্ছিল যেন ওটা কোন শিল্পীর সৃষ্টি, যেন পাথরে কোঁদা। সুন্দর শক্তিব্যঞ্জক অপূর্ব। কিন্তু সুরূপিণীর এ সব মনে হচ্ছিল না। কপিঞ্জলের প্রসারিত বিশাল বপু (মাঝে মাঝে থরথর করে কাঁপছিল সেটা), তাঁর উন্মুক্ত বিরাট বক্ষ, একটা ঘৃণ্য কদর্যতায় পূর্ণ করে তুলছিল তাঁর মনকে। ক্ষণে ক্ষণে গন্ধরাজের কথা মনে পড়ছিল তাঁর।

প্রাসাদের বাইরে কিন্তু গুজব ছড়াচ্ছিল। একাধিক লোকের ছুটোছুটির শব্দ আর গলার আওয়াজ থেকে বোঝা যাচ্ছিল তা। প্রকাণ্ড সিঁড়িটার উপর সহসা অনেক লোকের অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর শোনা গেল, দালান দিয়ে কারা যেন আসছে দ্রুতপদে। কুজ্‌ঝটিকুমার গন্ধরাজের চারজন চাকরের সাহায্যে পালকিটা নিয়ে আসছিলেন। চাকররা ঘরে ঢুকে বিস্রস্তবাসা সুরূপিণী আর আহত কপিঞ্জলের দিকে সবিস্ময়ে চেয়ে রইল। কথা বলবার অধিকার তাদের ছিল না, কিন্তু এ দৃশ্য দেখে তাদের মনে যে কথা জাগল তা অপবিত্র, তা অশুচি। কপিঞ্জলকে পালকির ভিতর ঢুকিয়ে পালকির পরদা ফেলে দেওয়া হল। বেয়ারারা পালকি তুলে নীরবে বাইরে নিয়ে গেল, কুজ্‌ঝটিকুমার তাদের অনুসরণ করলেন বিবর্ণ মুখে।

সুরূপিণী জানলার কাছে ছুটে গেলেন। জানলার কাচ দিয়ে বাইরের উঁচু ছাদটা দেখা যায়। সেখানে আলোর সারি। তারপর দেখা যায় যে বীথি-ঢাকা রাস্তাটা প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে শহরের দিকে চলে গেছে, তারও দুধারে আলোর সারি। আর দেখা যায় মাথার উপর অন্ধকার আকাশ আর নক্ষত্র। বড় বড় নক্ষত্রগুলো দপ্‌দপ্ করে জ্বলছে। জানলার কাচে চোখ লাগিয়ে নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন সুরূপিণী। একটু পরেই দেখা গেল পালকিটা প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে, বাগান পার হয়ে আলোকসজ্জিত রাস্তায় পড়ল। পালকিটা দুলছে, চিন্তিতমুখে বিব্রত কুজ্‌ঝটিকুমার চলেছেন পিছু পিছু। আস্তে আস্তে তারা দূরে মিলিয়ে গেল। বাইরে তিনি চোখের সামনে এই দৃশ্য দেখলেন, আর মনের ভিতর দেখলেন তাঁর জীবনের, তাঁর আশা-আকাঙ্ক্ষার চূর্ণ-বিচূর্ণ বিধ্বস্ত রূপ, সম্পূর্ণ ধ্বংসের, সম্পূর্ণ পরাজয়ের প্রতিচ্ছবি। তাঁর জীবনে এখন এমন আর কেউ নেই যাকে তিনি বিশ্বাস করতে পারেন, এমন কোন বন্ধু নেই যে হাত বাড়িয়ে দেবে, এমন একজনও নেই যার আনুগত্যের উপর তিনি আস্থা স্থাপন করতে পারেন। কপিঞ্জলের পতনের সঙ্গে সঙ্গে, তাঁর দলের, তাঁর ক্ষণিক জনপ্রিয়তারও পতন হল। তিনি জানলার কাছে বসে শীতল কাচের উপর তাঁর কপলটা রেখে চুপ করে বসে রইলেন। বেশবাস ছিন্ন, সম্পূর্ণ লজ্জানিবারণও হচ্ছিল না তাতে, মনে দুর্ভাবনার তুফান, চোখে শঙ্কার ছায়া। এই কি মহারাণী, সুরূপিণী?

ব্যাপার কিন্তু ক্রমশ ঘনীভূত হচ্ছিল; অন্ধকারের অন্তরালে ধ্বংস এবং বিদ্রোহের রক্তশিখা লেলিহান হয়ে উঠছিল নেপথ্যে। পালকি সিংহদরজা পার হয়ে শহরের রাস্তায় প্রবেশ করল। কোন্ মন্ত্রবলে কোন্ ঝড়ের মুখে আতঙ্কের খবরটা ছড়িয়ে পড়ল শহরে? কিন্তু পড়েছিল। প্রাসাদে যে চাঞ্চল্য, সাড়া জেগেছিল তার ঝাপটা শহরে গিয়েও পৌঁছেছিল। তা ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল সকলের ঘরে ঘরে। গুজব সাপের মতো ফণা তুলে বেড়াচ্ছিল রাস্তায় রাস্তায়। সবাই যন্ত্রচালিতবৎ বেরিয়ে এল ঘর ছেড়ে, রাস্তার মোড়ে মোড়ে জটলা হতে লাগল, জম্বীর বীথিতে লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল, শহরের প্রান্তে আলোর তলায়, হাটে, বাজারে সর্বত্র লোক। সবার মুখে কুটিল কালো ছায়া।

এই অপেক্ষমান জনতার ভিতর পরদা-ঢাকা পালকিটা আবির্ভূত হল অপ্রত্যাশিত বিস্ময়ের মতো। পালকির পিছনে পিছনে ধাবমান স্বয়ং কুজ্‌ঝটিকুমার। নীরবে দেখতে লাগল সবাই,

তারপর পালকিটা যখন পার হয়ে গেল, তখন একটা চাপা তর্জন ফুটন্ত জলের মতো যেন টগবগিয়ে ফুটে উঠল। উথলে পড়ল। জটলার লোকেরা জটলা থেকে বেরিয়ে এল একে একে, সমস্ত জনতা একের পিছনে আর একজন সারিবদ্ধ হয়ে চলতে লাগল পরদা-ঢাকা পালকিটাকে অনুসরণ করে। তারপর তাদের মধ্যে যারা একটু সাহসী তারা এগিয়ে এসে প্রশ্ন করতে লাগল কুজ্‌ঝটিকুমারকে। যে মিথ্যাভাষণের কৌশল আয়ত্ত করে তিনি সারাজীবন সুখে কাটিয়েছেন সে কৌশল কিন্তু এখন কাজে লাগল না। আমতা আমতা করতে লাগলেন তিনি। যে জৈবিক প্রেরণা এতকাল তাঁর জীবন নিয়ন্ত্রিত করে এসেছে— সেই ভয় তাঁকে অভিভূত করে ফেলল। তাঁকে চেপে ধরল সবাই ঃ তিনি অসংলগ্নভাবে যা তা বলতে লাগলেন, ঠিক এই সময়ে পালকির ভিতর থেকে একটা আর্তনাদ শোনা গেল। ঠিক সেই মুহূর্তে, সমবেত জনতার ক্ষুব্ধ কোলাহলে কুজ্‌ঝটিকুমার স্পষ্ট সেই সংকেত শুনলেন যা ঘড়ি বাজবার ঠিক আগে ছোট্ট 'খচ্‌' শব্দটিতে শোনা যায়। কম্পমান কুজ্‌ঝটিকুমার বুঝলেন আর উপায় নেই, আর গোপন করা যাবে না। কয়েক মুহূর্তের জন্যে আত্মবিস্মৃত হয়ে এরপর তিনি যা করলেন তাতে তাঁর অনেক পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে। তিনি একজন বেয়ারাকে চুপি চুপি বললেন—"মহারাণীকে পালাতে বল। সর্বনাশ হয়ে গেছে। দৌড়ে চলে যাও।" পরমুহূর্তেই তিনি আত্মসমর্পণ করলেন জনতার হাতে, অসংলগ্নভাবে বলতে লাগলেন তিনি দায়ী নন, তাঁর কোন দোষ নেই।

পাঁচ মিনিট পরে বেয়ারাটা ছুটতে ছুটতে এসে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল মহারাণীর ঘরে।

"সর্বনাশ হয়ে গেছে। মহাধ্যক্ষ মশাই আপনাকে পালাতে বললেন।"

সেই মুহূর্তেই সুরূপিণী জানলা দিয়ে দেখতে পেলেন আলোকিত বীথি-পথ দিয়ে জনতার কৃষ্ণস্রোত প্রাসাদের দিকে ছুটে আসছে।

"ও তাই নাকি। ভগবান তোমাদের রক্ষা করুন। তুমি যাও।"

লোকটা তবু দাঁড়িয়ে রইল।

"দাঁড়িয়ে আছ কেন। তুমিও পালাও। বাঁচাও নিজেকে— "

যে গোপন পথ দিয়ে ঠিক দু'ঘণ্টা আগে গর্জনগাঁওয়ের শেষ মহারাজা গন্ধরাজ নির্বাসনে গিয়েছিলেন সেই গোপন পথ দিয়েই গর্জনগাঁওয়ের শেষ মহারাণী মহামান্যা সুরূপিণীও অন্তর্ধান করলেন।

।। উনিশ ।।

গোলমালের শব্দ পেয়ে প্রহরীটা পালিয়েছিল পিছনের ফাটক থেকে। উন্মুক্ত তোরণদ্বারের সামনে অপেক্ষা করছিল রাত্রির অন্ধকার। সুরূপিণী বাগানের চাতালের উপর দিয়ে পালাতে পালাতে শুনতে পেলেন ক্ষিপ্ত জনতার কোলাহল আর পদধ্বনি প্রাসাদের দিকে এগুচ্ছে; শব্দ থেকে মনে হচ্ছে একদল অশ্বারোহী যেন ছুটে আসছে, এর উপর শোনা যাচ্ছে বাতি ভাঙার ঝন্‌ঝন্‌ শব্দ আর সবার উপরে শোনা যাচ্ছে তাঁর নিজের নামটা। ওরা যেন সেটা নিয়ে লোফালুফি করছে। রক্ষীদের ঘর থেকে তুরীধ্বনি হল, একটা বন্দুকের আওয়াজও শোনা গেল, তারপর শত শত লোকের বিকট চীৎকারের কাছে আত্মসমর্পণ করল পার্বতীর রাজপ্রাসাদ। বিরাট বন্যাস্রোতে ডুবে গেল যেন সব।

এই সব ভয়াবহ শব্দে ভীতচকিত হয়ে সুরূপিণী লম্বা বাগানটা ছুটতে ছুটতে পার হলেন, তারপর সিঁড়ি, এখানে নক্ষত্রের আলো ছাড়া অন্য আলো নেই। নিশাচরী পক্ষিণীব মতো উড়তে উড়তে সিঁড়িও তিনি অতিক্রম করলেন, এরপর ঢুকলেন এসে প্রমোদউদ্যানের অঙ্গনে। যেখানে এলেন সে জায়গাটা খুব বিস্তৃত নয়, নানারকম গাছের সারি আর ফুলের ঝোপ সেখানে। জঙ্গুলে জায়গা। তবু সেই জঙ্গলের মধ্যে ঢুকেই তিনি নির্ভয় হলেন একটু। তারপরই দেওয়াল দেওয়ালের পর আবার জঙ্গল, বেশ বেশী জঙ্গল। দূরে দূরে প্রাসাদের আলো জ্বলছে পিছন দিকে। সুরূপিণী সে সব আলো আর মহারাণীর মানমর্যাদা সব পিছনে ফেলে দেওয়ালের উপর উঠে লাফিয়ে নেমে পড়লেন জঙ্গলে। সভ্যতা থেকে ঝাঁপিয়ে পড়লেন অরণ্যে।

বনের মধ্যেও সরু পথ পেলেন। সেইটে ধরেই সোজা চলতে লাগলেন। আশপাশে গুল্ম ঝোপ আর আকাশে তারার আলো। তারার আলোই পথ দেখাতে লাগল তাঁকে। একটু দূরেই থামের মতো কালো কালো দেওদার গাছের সারি, কোথাও কোথাও কুঞ্জবনের মতো, শাখা-প্রশাখা আকাশকে আড়াল করেছে। চারিদিকে নিস্তব্ধ, একটু হাওয়া নেই, মনে হচ্ছে অন্ধকারের কারাগার যেন, একটা কি যেন ভয়ঙ্কর আবির্ভাব স্তব্ধ হয়ে আছে চারিদিকে; হাতড়ে হাতড়ে এগুতে লাগলেন সুরূপিণী, গাছের গুঁড়িতে ধাক্কা লাগতে লাগল। উৎকর্ণ হয়ে রইলেন যদি কোনও শব্দ শুনতে পাওয়া যায়, কিন্তু পাওয়া গেল না।

সহসা অনুভব করলেন একটা ঢালু জমি বেয়ে তিনি উপর দিকে উঠছেন। এতে একটু আশা জাগল, একটু পরেই দেখতে পেলেন পাহাড়টাকে, অরণ্যের সমুদ্রে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। আশেপাশে আরও ছোট বড় পাহাড়। কালো কালো উপত্যকাগুলো দেখা যাচ্ছে, যেন মখমলে মোড়া। মাথার উপর আবার দেখা দিল আকাশ, কোটি কোটি নক্ষত্রখচিত আকাশ। পশ্চিম আকাশের দূর দিগন্তে আরও অনেক পাহাড়ের অস্পষ্ট ছবি। মহারাত্রির মহামহিমায় অভিভূত হলেন সুরূপিণী, তারার মতোই দীপ্ত হয়ে উঠল তাঁর চোখ ঃ চোখের দৃষ্টি আকাশের শীতলতায় অবগাহন করল, মন আকাশের ভাস্বরতায় কৃতার্থ হল, মনে হল যেন অদ্ভুত একটা প্রশান্তির সাগরে ধীরে ধীরে তিনি বিলিয়ে দিচ্ছেন নিজেকে। একটু পরে সত্যিই মনে শান্ত হল। দিনের বেলা সূর্য মাথার উপরে আকাশে সোনার ফসল ছড়াতে ছড়াতে লক্ষ লক্ষ মানুষকে একই আহ্বান জানান। সে আহ্বান উদাত্ত, কিন্তু তা সকলের জন্য, ব্যক্তিবিশেষের জন্য নয়। চাঁদও জ্যোৎস্নার বীণায় যে সুর বাজান তাতেও ধ্বনিত হয় বহুলোকের আনন্দ, বহুলোকের বিরহ। তারারাই কেবল আলাদা আলাদা প্রতি মানুষের কানে কানে চুপি চুপি কথা বলেন বন্ধুর মতো। তাদের ওই উজ্জ্বল চিকিমিকি হাসিতে সর্বজনীনতা নেই, তা যেন প্রতি মানুষের প্রতি আলাদা সম্ভাষণ। তারা মিটিমিটি ওই হাসি হেসে আমাদের দুঃখের কথা শোনে, অসীম ধৈর্যভরে বুড়ী দিদিমার মতো। ওরা দেখতে ছোট ছোট কিন্তু কল্পনায় কি বিরাট ওদের রূপ। এ দুই ভূমিকাতেই ওরা আমাদের মনে ছবি আঁকে—আমাদের প্রকৃতির, আমাদের নিয়তির।

পাহাড়ের উপর বসে ছিলেন সুরূপিণী, বসে উপভোগ করছিলেন এই সৌন্দর্য, আকাশ-ভরা তারার সঙ্গিনী হয়ে। সন্ধ্যাবেলার ঘটনাগুলো উজ্জ্বল ছবির মতো ফুটে উঠছিল তাঁর

মানসপটে, মুখর হয়ে বাজছিল তাঁর কানের কাছে। রঞ্জাবতী আর তার পাখার দোলন, নতজানু কপিঞ্জল, চকচকে মার্বেলের মেঝেতে রক্তের ধারা, দ্বারে ঘনঘন করাঘাত, আলোকিত বীথি-ঢাকা পথে দোদুল্যমান পালকি, উর্ধ্বশ্বাসে দূতের আগমন, উন্মত্ত জনতার চীৎকার। এখন কিন্তু সবই কত দূরে, যেন সত্য নয়, স্বপ্ন। এখন তাঁর চারিদিকে বর্ষিত হচ্ছে রাত্রির প্রসন্নতা আর মহিমা, শান্ত হয়ে আসছে মন, ক্ষতগুলো আর জ্বালা করছে না। পার্বতীর দিকে চেয়ে দেখলেন ঃ পাহাড়ে ঢাকা পড়ে গেছে, দেখা যচ্ছে না ঃ কিন্তু পাহাড়ের উপরে আকাশটা লাল, পার্বতী পুড়ছে বোধহয়। সেই ভালো, সেই ভালো, তাঁর পতনটাও নাটকীয় মহিমায় হৃদয়-বিদারক হয়ে উঠুক। শহর জ্বলছে, প্রাসাদ জ্বলছে—চমৎকার! গর্জনগাঁওয়ের জন্য একটুও দুঃখ হল না তাঁর, কপিঞ্জলের জন্যও না! তাঁর জীবনের এ অধ্যায় চিরদিনের জন্য শেষ হয়ে গেল—যাক। আহত অভিমান, বিচূর্ণিত অহঙ্কার একটু দুঃখ দিচ্ছিল অবশ্য, কিন্তু তা-ও আর থাকবে না। একটি কথাই এখন সুস্পষ্টভাবে তাঁর মনে জাগছিল—পালাতে হবে এবং সম্ভব হলে—যদিও সেটা স্পষ্টভাবে তখনও তিনি স্বীকার করছিলেন না নিজের কাছে —পালাতে হবে শূলপাণির দিকে। তাঁর একটা কর্তব্য বাকী আছে—গন্ধরাজকে মুক্তি দিতে হবে। তাঁর যুক্তি অনাসক্তভাবে কথাটা ভাবছিল, কিন্তু তাঁর মনে তাঁর হৃদয়ে যা জাগছিল তা অনাসক্ত নয়, তা উন্মুখ আগ্রহে কম্পমান। তিনি কামনা করছিলেন সেই স্পর্শ যা করুণায় ভরা, যা বন্ধুর স্পর্শ।

এ কথা মনে হওয়াতে উঠে পড়লেন তিনি, ঢালু জমি বেয়ে ঢুকে পড়লেন জঙ্গলের ঝোপ-ঝাড়ে। ঝোপের মধ্যে হারিয়ে গেলেন তিনি, অরণ্যের নিবিড়তা তাঁকে আশ্রয় দিল আবার। আবছা মূর্তির মতো আবার তিনি যাত্রা শুরু করলেন অজানা পথে, যে পথে রাজকীয় জয়ধ্বনি নেই, পথপ্রদর্শক অশ্বারোহী সৈন্য নেই। এখানে ওখানে বনের ফাঁকে ফাঁকে সামান্য আলোর ইশারা, সেই দিকেই চললেন তিনি, কোথাও কোন বিরাট বনস্পতির রূপ শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে সবাইকে ছাড়িয়ে উঠেছে যেন, কোথাও খসখস শব্দ, কোথাও খুব ঘন অন্ধকার, কোথাও একটু আলোর আভাস, আর সমস্ত পরিব্যাপ্ত করে থমথম করছে নিশীথিনীর ঘনগাম্ভীর্য। সুরূপিণীর মনে হচ্ছিল গাম্ভীর্যসত্ত্বেও নিশীথিনী যেন তাঁর প্রতি পদক্ষেপ লক্ষ্য করছে। কখনও তিনি দাঁড়িয়ে পড়ছিলেন, রাত্রির গভীরতা ঘন থেকে ঘনতর হচ্ছিল, এই নিথর নীরবতায় তাঁর যেন দম বন্ধ হয়ে যাবে মনে হচ্ছিল। আবার চলতে শুরু করলেন, ছুটতে লাগলেন, হোঁচট খেলেন, পড়ে গেলেন, তবু থামলেন না। উঠে আরও বেশী ছুটতে লাগলেন। মনে হল, সমস্ত বন, সমস্ত গাছপালাও যেন তাঁর সঙ্গে ছুটছে। পাগলিনীর মতো তাঁর এই ঝড়ের বেগে যাত্রা সমস্ত বনকে সচকিত করে তুলল, ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়ে মুখরিত করে তুলল অন্ধকারকে, একটা আতঙ্ক যেন ঘনিয়ে এল চারিদিকে। আতঙ্ক, হ্যাঁ আতঙ্কই—আতঙ্ক যেন ছুটতে লাগল তাঁর পিছু পিছু; গাছেরা যেন শাখা বাড়িয়ে তাঁকে ধরতে আসছে; চারদিকে আবছা আবছা প্রেতমূর্তির মতো ওরা কারা! মনে হল তাঁর দম বন্ধ হয়ে আসছে আবার, তিনি উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে লাগলেন। তিনি ভয় পেয়েছিলেন খুব, কিন্তু বুদ্ধিহারা হননি। ভয়ের এইসব ঝড়ঝাপটে তাঁর মনের দুর্গে যুক্তির আলো একটু কাঁপছিল অবশ্যই, কিন্তু নিবে যায়নি। তিনি বুঝতে পারছিলেন, বুঝতে পারছিলেন এবার তাঁকে থামতে হবে, থামা উচিত, কিন্তু থামতে পারছিলেন না।

তিনি যখন প্রায় পাগল হয়ে যাওয়ার মতো হয়েছেন তখন হঠাৎ সরু একটা ফাঁকা জায়গায় এসে দাঁড়ালেন। এই সময় একটা তুমুল শব্দও স্পষ্ট হয়ে উঠল, সামনে অস্পষ্ট নানা মূর্তি, আর কি একটা যেন শাদা মতন চোখে পড়ল, পরমুহূর্তেই তিনি পড়ে গেলেন, আবার অতিকষ্টে উঠে দাঁড়ালেন, তাঁর সমস্ত চেতনা, সমস্ত অনুভূতি যেন তলিয়ে গেল!

যখন আত্মস্থ হলেন তখন দেখলেন তিনি জলে দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁর পায়ের গোছ পর্যন্ত বরফের মতো ঠাণ্ডা জল, এটা পাহাড়ী ঝরনা ঝরঝর করে ঝরে পড়ছে আর যে পাথরটা থেকে পড়ছে সেই পাথরটাকেই আঁকড়ে ধরে আছেন তিনি। উৎক্ষিপ্ত জলধারায় তাঁর চুল ভিজে গেছে। শাদা ঝরনাটা তখন দেখতে পেলেন, তার জলে আকাশের তারারা আন্দোলিত হচ্ছে, ফেনা ছড়িয়ে পড়ছে চারিদিকে, আর মাথার উপরে দুধারে নক্ষত্রের স্নিগ্ধ আলোকে তন্ময় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে লম্বা লম্বা দেওদার গাছের সারি। মনটা হঠাৎ আবার শান্ত হল, তখন সানন্দে লক্ষ্য করলেন কি প্রচণ্ড বেগে ঝরনাটা লাফিয়ে পড়েছে ওই জলাশয়ের বুকে। জল থেকে হামাগুড়ি দিয়ে উঠে এলেন, সর্বাঙ্গ থেকে জল ঝরছে। ক্লান্তির চরম সীমায় এসে পৌঁছেছিলেন তিনি, এখন এই অন্ধকারে আবার জঙ্গলের ভিতর ঢুকে পড়া আত্মহত্যারই নামান্তর হবে তাঁর মনে হল। মনে হল এই সংকীর্ণ স্থানে এই ছোট্ট নদীটির পাশে আকাশ-ভরা নক্ষত্রের সঙ্গে রাতটা তিনি কাটিয়ে দিতে পারবেন, একটু পরেই চাঁদও দেখা দিল পূর্বদিগন্তে।

দেওদার গাছের সারি পাহাড় বেয়ে নেমে গিয়েছিল দুধার দিয়ে। মাঝখানে বেশ খানিকটা চওড়া জায়গা, ছোট্ট পাহাড়ী নদীটির অতটা জায়গার প্রয়োজন ছিল না। গাছের নীচে নীচে ফাঁকা জায়গা, মাঝে মাঝে ঝোপঝাড়, নক্ষত্রের মৃদু আলোয় সবাই যেন স্বপ্ন দেখছে। এই দিকেই সাহস ও ধৈর্যভরে ধীরে ধীরে অগ্রসর হলেন তিনি। উপরে পাহাড়ের দিকে চেয়ে দেখতে পেলেন পাহাড় বেয়ে অনেক ছোট ছোট ঝরনা এসে নদীটিতে পড়ছে, অজস্র ধারা এসে প্রথমে পড়েছে বড় বড় ঘাসের বনে, সেখান থেকে ধীরে ধীরে মিশেছে নদীতে এসে মন্থর গতিতে। তারপর আকাশের দিকে মুখ তুলে আবার নক্ষত্রদের দিকে চাইলেন তিনি, চিরউজ্জ্বল, চিরনবীন, চিরসঙ্গীরা ওই যে রয়েছে চেয়ে। সন্ধ্যার প্রথম দিকটায় একটু শীত শীত করছিল, কিন্তু এখন তত শীত নেই মনে হল। অরণ্যের শাখা-প্রশাখার ভিতর থেকে বইছিল মৃদুমন্দ বাতাস, মনে হচ্ছিল কে যেন নিশ্বাস প্রশ্বাস নিচ্ছে। প্রচুর শিশির পড়েছে ঘাসে ঘাসে আর ঘাসের ফুলে ফুলে। সুরূপিণী জীবনে এই প্রথম উন্মুক্ত আকাশের তলায় একা এসে দাঁড়ালেন। আর তাঁর ভয় করছিল না। আকাশের স্নিগ্ধ নীরবতা-ভরা শান্তি তাঁর মর্মে গিয়ে পৌঁছল। মনে হল বিরাট মহাকাশ এই পথহারা মহারাণীকে যেন স্নেহভরে নিরীক্ষণ করছেন, আর নদীটির কল্লোলে যে ভাষা ফুটছে তা-ও যেন উৎসাহের ভাষা। বলছে, ভয় কি।

অবশেষে তিনি অনুভব করলেন তাঁর চারদিকে যেন বিরাট একটা পরিবর্তন হচ্ছে, নীরবে যেন একটা বিপ্লব ঘটছে চারদিকে—যার কাছে পার্বতীর অগ্নিকাণ্ড অতি তুচ্ছ একটা পটকাবাজির মতো অকিঞ্চিৎকর ব্যাপার। যে চেহারা নিয়ে দেওদার গাছের সারি তাঁকে প্রথমে দেখা দিয়েছিল, তাদের সে চেহারা ধীরে ধীরে বদলে গেল; ছোট ছোট তৃণগুল্মদল, ওই পাহাড়ী নদীর ঘোরানো সিঁড়ির মতো ঊর্ধ্বগতি মনে হল যেন লীলায়িত, গম্ভীর অথচ মধুর।

নির্বাক বিস্ময়ে সুরূপিণী দেখতে লাগলেন। তাঁর মনের তন্ত্রীতে যে সুর বেজে উঠল তা অনবদ্য, তা অপরূপ। মুগ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি। অনুভব করলেন সমস্ত প্রকৃতিও যেন তাঁর দিকে চেয়ে আছে, সে চাহনি অর্থভরা, যেন ঠোঁটের উপর একটি আঙ্গুল রেখে সে অপূর্ব ভঙ্গীতে সকৌতুকে প্রকাশ করছে অনির্বচনীয়কে। আকাশের দিকে আবার চেয়ে দেখলেন। তারারা কোথা গেল? যে দু'একটা আছে, তাদের আলোও যে ক্ষীণ হয়ে আসছে ক্রমশ। মিলিয়ে যাচ্ছে যেন। আকাশের রংও অদ্ভুত অপরূপ হয়ে গেল। রাত্রির ঘন-নীল যেন কিসের স্পর্শে কোমল হয়ে যাচ্ছে, গলে যাচ্ছে, উজ্জ্বল হয়ে উঠছে; যে রং ফুটে উঠেছে তার কোন নাম নেই, প্রভাতের বার্তাবহ হয়েই সে রং আকাশে ফোটে। "ও—" সানন্দে বলে উঠলেন সুরূপিণী—"ওই যে উষা!"

তাড়াতাড়ি তিনি নদী পার হয়ে গেলেন, গাছ-কোমর করে পরে নিলেন শাড়িটা, স্বল্পালোকিত সঙ্কীর্ণ পথ ধরে আবার ছুটতে লাগলেন। ছুটতে ছুটতে শুনতে পেলেন পাখিদের কাকলী, যা গানের চেয়েও সুন্দর; বড় বড় গাছের ডালে ডালে ছোট ছোট বাসায় বসে—সে বাসায় প্রণয়িনীর পাশে প্রণয়ী, ঘেঁষাঘেঁষি বসে সারারাত কাটিয়েছে—সেই বাসায় বসে ওই পাখির দল, ওই স্বচ্ছচক্ষু প্রাণোদ্বেল বিহঙ্গমেরা শুরু করেছে জাগরণী গান, ভৈরোঁতে নয়, ভৈরবীতে নয়, হৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ত উল্লাসে, প্রাণের অকুণ্ঠিত উচ্ছ্বাসে। সুরূপিণী ছুটছিলেন তবু তাঁর হৃদয় সাড়া দিল তাদের গানের ডাকে। তারাও যেন সু-উচ্চ মন্দিরের বাতায়ন থেকে সবিস্ময়ে দেখতে লাগল এই পলাতকা ছিন্নবসনা মহারাণীকে। একটুও না থেমে ছুটছিলেন তিনি ঘাস আর শ্যাওলায় ঢাকা গিরিপথে দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে।

একটু পরেই অতিকষ্টে একটা পাহাড়ের চূড়ায় উঠে পড়লেন। দেখতে পেলেন অনেক নীচে পূর্বদিগন্তে দূরাগত আলোকবন্যার মতো প্রভাতের আবির্ভাব হচ্ছে। তরঙ্গের পর তরঙ্গে স্বচ্ছ উজ্জ্বল হয়ে উঠছে দশদিক। অন্ধকার যেন কাঁপতে কাঁপতে আলো হয়ে যাচ্ছে। তারারা নিবে গেছে, মানুষের তৈরী শহরের রাস্তায় প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে যেমন রাস্তার আলো নিবিয়ে দেওয়া হয়, তেমনি এদেরও কে যেন নিবিয়ে দিয়েছে। স্বচ্ছ আলো প্রথমে মনে হল রজত-সন্নিভ, তারপর উত্তপ্ত হয়ে তা উজ্জ্বল হয়ে উঠল স্বর্ণকান্তিতে, স্বর্ণ রূপান্তরিত হল অগ্নিতে, তারপর পাবক জীবন্ত শিখা মূর্ত হল আকাশে ঃ বড় বড় রক্তরেখায় রঞ্জিত হয়ে গেল পূর্বদিগন্ত। শীতল বাতাসের প্রথম নিশ্বাস নিয়ে নবজাতক যেন স্তব্ধ হয়ে রইল কয়েক মুহূর্তে, তারপর আন্দোলিত হয়ে উঠল জীবনাবেগ বন-বনান্যে প্রভাত সমীরণের চাঞ্চল্যে। হঠাৎ সূর্য দেখা দিলেন, অকস্মাৎ যেন আবির্ভূত হলেন দিনেন্দ্র, আলোকের তূর্যধ্বনি নীরবে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হল মেঘমালায়, বৃক্ষপল্লবে, পর্বতচূড়ায়, উপত্যকার লতা-গুল্ম-তৃণদলে! এই প্রোজ্জ্বল মহিমাময় দৃশ্যে সচকিত হয়ে উঠলেন সুরূপিণী, আশপাশের ঝোপঝাড় থেকে অন্ধকারগুলো যেন লাফিয়ে বেরিয়ে এল এবং সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করল এই বিজয়ী বীরকে। প্রদীপ্ত গৌরবে দিবসের আবির্ভাব হল চতুর্দিকে, পূর্বদিগন্তে ধীরে ধীরে আরোহণ করতে লাগলেন সূর্যদেব তাঁর হিরণ্ময় রথে রাজকীয় প্রতাপে।

সুরূপিণী একটা দেওদার গাছে ঠেস দিয়ে বসেছিলেন, একটু ঢুলুনি এল। তাঁর ঢুলুনি দেখে সদ্য জাগরিত প্রফুল্ল বনভূমি উচ্চকণ্ঠে যেন ব্যঙ্গের হাসি হাসতে লাগল নানা সুরে। রাত্রির

অন্ধকারের ভয়, প্রভাতের অপূর্ব আবির্ভাবের শিহরন আর মনে সাড়া জাগাচ্ছিল না। তপ্ত দিবসের নিরাবরণ রৌদ্রে এখন সুরূপিণী চারিদিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলেন। দূরে নীচের বনভূমির একপ্রান্তে দেখতে পেলেন ধোঁয়া উঠছে, একটা কালো থাম যেন উপরে উঠে বিলিয়ে দিচ্ছে নিজেকে আকাশের নীলে আর সূর্যের সোনায়। নিশ্চয়ই লোক আছে ওখানে, আগুনের ধারে বসে আছে ওরা। মানুষেরই হাত শুকনো ডালাপালা কুড়িয়ে আগুন জ্বেলেছে, ফুঁ দিয়ে দিয়ে সঞ্জীবিত করেছে সে আগুনকে। এখন সে আগুনের আলো আর উত্তাপ চোখে মুখে সর্বাঙ্গে পড়েছে ওদের। ছবিটা জীবন্ত হয়ে উঠল মনে, মনে হল একটু যেন শীত শীত করছে, মনে পড়ল তিনি গৃহহারা। রোদের তাপ বাড়তে লাগল, বনের সৌন্দর্য আর ভালো লাগল না, মানুষের সঙ্গ পাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠল মন। গৃহের আশ্রয়, ছোট ছোট ঘরের গোপনতা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন অগ্নি-বেদির পবিত্রতা—এরাই যেন আকর্ষণ করতে লাগল তাঁকে। ধোঁয়ার থামটা হাওয়ায় বেঁকে নদীর মতো হয়ে গেল, তারপর একটা ছোট ধ্বজার মতো উড়তে লাগল তাঁর দিকে ফিরে। তাঁর মনে হল ও তো আমায় ডাকছে। উঠে পড়লেন সুরূপিণী, আবার প্রবেশ করলেন পাহাড়ের জঙ্গলে।

নীচে নেমেই মনে হল, দিন তো এখনও পাহাড়ের উপরেই আছে, এখানে তো নামেনি, এখানে এখনও প্রদোষের কুহেলী আর শিশিরের খেলা চলছে। কিন্তু এখানে ওখানে, ছায়াচ্ছন্ন পরিবেশকে ছাড়িয়ে যে বড় বড় দেওদার গাছেরা আকাশে তাদের জটিল শাখা-প্রশাখা বিস্তারিত করেছে সেখানে এসে পৌঁছে গেছে সূর্যালোক, ঝলমল করছে তরু-চূড়ারা প্রভাতকিরণে। দূরে দূরে পাহাড়গুলোর ফাঁকে ফাঁকেও দেখা যাচ্ছে দিবসের দীপ্তি। সুরূপিণী বন্যপথ ধরে দ্রুতবেগে চলতে লাগলেন। ধোঁয়ার ধ্বজাটা আর দেখতে পেলেন না, ঢাকা পড়ে গিয়েছিল সেটা। কিংবা হাওয়ায় উড়ে গিয়েছিল। কিন্তু কাছাকাছি যে মানুষ আছে এর চিহ্ন আরও নানাভাবে পাওয়া গেল। কোথাও কাটা গাছের গুঁড়ি পড়ে আছে, কোথাও এক বোঝা ঘাস, কোথাও শুকনো কাঠের গাদা। এই সবই পথ দেখাতে লাগল তাঁকে, কিছুদূর গিয়ে তিনি একটা ফাঁকা জায়গায় এসে দাঁড়ালেন, কাছেই একটি ছোট্ট কুটির, এইখান থেকেই ধোঁয়া বেরুচ্ছিল। কাছেই একটি পাহাড়ী নদী পাহাড়ের ধাপে ধাপে যেন নেচে নেচে চলেছে। কুটিরের ঠিক সামনে তামাটে রঙের রুক্ষ-মূর্তি এক কাঠুরে দাঁড়িয়ে ছিল। পিছনে দুহাত দিয়ে আকাশে মুখ তুলে কি দেখছিল যেন।

সুরূপিণী সোজা তার কাছে গেলেন। সুরূপিণী হয়তো বুঝতে পারছিলেন না, কি রকম অদ্ভুত দেখাচ্ছে তাঁকে। উজ্জ্বল-নয়না রূপসী, কিন্তু শীর্ণা ভিখারিণীর মতো; পোশাক-পরিচ্ছদ মূল্যবান কিন্তু ছেঁড়া, কানে তখনও হীরের দুল চকমক করে দুলছে, কিন্তু যখন হাঁটছেন তখন বুকের ছেঁড়া কাপড়ের ফাঁক দিয়ে ছোট্ট একটি স্তন দেখা যাচ্ছে মাঝে মাঝে। রাত্রি প্রভাতের স্বপ্নময় সন্ধিক্ষণে, ঘন বনের রহস্য থেকে বেরিয়ে এল এ কে—মানবী না পরী—এই কথা মনে হল লোকটির, ভয়ে একটু পিছিয়ে গেল সে।

'‘আমার বড় শীত করছে। বড় ক্লান্ত হয়েছি, তোমার উনুনের পাশে আমাকে একটু বিশ্রাম করতে দাও’'—এই বলে আর একটু এগিয়ে গেলেন সুরূপিণী।

বোঝা গেল কাঠুরেটি বিচলিত হয়েছে একটু। কিন্তু কোনও উত্তর দিল না সে।

"আমি এর দাম দেব"—সুরূপিণীর মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল, কিন্তু বলেই তিনি অনুতপ্ত হলেন যখন দেখলেন এ কথা শুনে লোকটির চোখে ভয়ের আভাস ফুটে উঠল। কিন্তু এতে তিনি দমলেন না, বরং যেমন তাঁর স্বভাব, বাধা পেয়ে তাঁর সাহস আরও যেন বেড়ে গেল। তিনি লোকটিকে দ্বার থেকে সরিয়ে দিয়ে সোজা ভিতরে ঢুকে গেলেন। লোকটি সভয়ে সবিস্ময়ে অনুসরণ করল তাঁর।

ভিতরে গিয়ে সুরূপিণী দেখলেন ঘরটি অন্ধকার, মেজে এবড়ো-খেবড়ো। ঘরের এককোণে শান-বাঁধানো জায়গায় উনুনটি রয়েছে, শুকনো ডালপালা জ্বলছে গনগনে আঁচটি চমৎকার। দেখেই যেন আরাম পেলেন সুরূপিণী। উনুনের ধারে ঘেঁষে বসলেন গিয়ে। তখনও শীতে কাঁপছেন, তবু আগুনের রূপ দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। কাঠুরেটি তখনও নির্নিমেষে তাঁর দিকে চেয়ে ছিল; তাঁর ছিন্নভিন্ন দামী পোশাকের দিকে, তাঁর উন্মুক্ত বাহুর দিকে, তাঁর বিপর্যস্ত জরি আর জহরতের দিকে চেয়ে নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়েছিল সে। কি বলবে ভেবে পাচ্ছিল না।

"আমাকে কিছু খেতে দাও"—সুরূপিণী বললেন—"এইখানে, এই উনুনের পাশেই দাও।"

লোকটি একটা ভাঁড়ে খানিকটা দেশী মদ, শালপাতায় কয়েকখানা শুকনো রুটি, একটা খুরিতে খানিকটা বাসী দই, আর কয়েকটা পেঁয়াজ এগিয়ে দিল। রুটিগুলো চামড়ার মতো শক্ত, দইটা খুব টক। পেঁয়াজ যদিও ভুঁই-ফোড় ফলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে গণ্য, তবু কাঁচা পেঁয়াজ মহারাণীর পক্ষে সুখাদ্য নয়। কিন্তু তবু তিনি খেলেন, ভালো লাগছিল না, তবু সাহস করে চেটেপুটে খেয়ে ফেললেন সব। মদের ভাঁড়টাকেও অবহেলা করলেন না। তিনি জীবনে এ রকম খাবার খাননি, এ রকম মদও খাননি। মেয়েরা সব অবস্থার সঙ্গেই সাহসের সঙ্গে যতটা খাপ খাইয়ে নিতে পারে, পুরুষরা ততটা পারে না। কাঠুরেটা একটি কথা বলেনি, আড়চোখে চেয়ে চেয়ে দেখছিল কেবল। তার মনে যে ভাব জাগছিল তা মোটেই উচ্চভাব নয়। লোভ, ভয় এবং আরও যেন কিছু সেখানে যে দ্বন্দ্ব শুরু করেছিল তার আভাস ফুটে উঠেছিল তার চোখের দৃষ্টিতে। সুরূপিণী অনুভব করলেন এখান থেকে এখনই চলে যেতে হবে।

তিনি উঠে পড়লেন এবং দুটো টাকা দিলেন তাকে।

"এতেই হবে তো?"

এইবার লোকটার মুখে কথা ফুটল।

"ওতে হবে না, আরও চাই।"

"আর তো আমার কাছে নেই"—বলেই গম্ভীরভাবে গটগট করে তার পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেলেন তিনি। তাঁর বুকটা কেঁপে উঠল যখন তিনি দেখলেন লোকটা হাত বাড়িয়ে তাঁকে ধরবার চেষ্টা করছে। কুড়ুলটা ঘরের কোণে ছিল, সেদিকেও চাইছে সে। ছুটে বেরিয়ে গেলেন সুরূপিণী। পশ্চিম দিকে যে পায়ে-চলা পথটা চলে গিয়েছিল সেইটে ধরেই ছুটতে লাগলেন তিনি পিছু দিকে না চেয়ে। রাস্তার বাঁক থেকেই আবার বন শুরু হয়েছিল, তার ভিতর ঢুকে পড়লেন তিনি, আর বড় বড় গাছের নীচে দিয়ে ছুটতে লাগলেন। অনেকক্ষণ ছুটলেন। যখন মনে হল আর ভয় নেই তখন থেমে হাঁপাতে লাগলেন।

মাথার উপর দেওদার গাছের শাখা-প্রশাখার আচ্ছাদন। সুরূপিণী দেখলেন প্রখর দিবালোক হাজার হাজার জায়গায় সে আচ্ছাদনকে ভেদ করে বনের ভিতর প্রবেশ করেছে, গাছের গুঁড়িগুলো সে আলোয় লালে লাল হয়ে গেছে, মনে হচ্ছে যেন আগুন লেগেছে। সে আলো প্রবেশ করেছে ঝোপঝাড়ের অন্ধি সন্ধিতে, বিচিত্র সাজে সাজিয়েছে তাদের। সে আলো মরকতের মতো জ্বলছে ঘাসে ঘাসে। দেওদার গাছের গঁদের সৌরভে চতুর্দিক আমোদিত। তপ্ত রৌদ্রে দেওদাররা কি ধূপ জ্বেলেছে? মৃদুমন্দ হাওয়া বইছে, গাছের ডালপালা নড়ছে, তার সঙ্গে নড়ছে আলো ছায়া, নড়ছে ঘাসের উপর বিছানো মরকত-দ্যুতি, যেন একপাল রঙীন দুরন্ত পাখি কিংবা একঝাঁক মত্ত মধুকর পাগলের মতো উড়ে বেড়াচ্ছে, একটা অদ্ভুত মর্মরে কি যেন জাগছে আবার মিলিয়ে যাচ্ছে।

সুরূপিণী চলছিলেন, ক্রমাগত চলছিলেন, চড়াই উতরাই ভেঙে, রৌদ্রে ছায়ায় অবিরাম চলছিলেন তিনি। কখনও রুক্ষ পাহাড়ের উপর দিয়ে, কখনও বন্য গিরগিটি আর সাপের কবল থেকে আত্মরক্ষা করে, মেঘের সঙ্গে, সূর্যের সঙ্গে, গহন বনের অন্ধকারের নিবিড়তায় চলেই ছিলেন তিনি দ্রুতপদে। কোথায় যাচ্ছেন? উপত্যকার গোলকধাঁধায় বন্য রাস্তা দিয়ে উদ্দেশ্যহীনভাবেই চলছিলেন তিনি। কখনও পাহাড়ের চূড়া থেকে দেখতে পাচ্ছিলেন আরও দূরের পর্বতমালা, দেখছিলেন বিরাট বিরাট পাখিরা আকাশে চক্রাকারে ঘুরছে, কখনও দূরে পাহাড়ের গায়ে ছোট পল্লী, পল্লী কিন্তু এড়িয়ে চলছিলেন তিনি। নীচে দেখতে পাচ্ছিলেন খরস্রোতা ফেনায়িতা পাহাড়ী নদীদের লীলা-নর্তন। কাছে ছোট ছোট উৎস, নিঃশব্দে মাটির ভিতর থেকে বেরুচ্ছে, শ্যাওলা আর কচি কচি ঘাসের সঙ্গে লুকোচুরি খেলছে যেন। কোথাও আবার একদল শিশু-নদী একত্রিত হয়ে বেরিয়েছে কোন গহ্বর থেকে আর পাথরের নুড়িতে ঠুনঠুন বাজনা বাজিয়ে ছোট ছোট জলাশয় সৃষ্টি করছে চড়ুই পাখিদের স্নানের জন্য, কোথাও বা আবার উঁচু পাহাড় থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ছে তার নীচের উপত্যকায় স্ফটিকস্বচ্ছ ধারায়। চলতে চলতেই এসব দেখছিলেন তিনি উজ্জ্বল দিবালোকে আনন্দে বিস্ময়ে আত্মহারা হয়ে। এমন অনন্য, এমন মর্মস্পর্শী, রঙে রসে গন্ধে ভরা এমন অপূর্ব অনুভূতি তাঁর ইতিপূর্বে আর হয়নি কখনও। নীল-আকাশঘেরা রূপকথালোকের ভিতর দিয়ে তিনি চলেছিলেন।

অবশেষে যখন খুব ক্লান্ত হয়ে পড়লেন তখন এসে পৌঁছলেন এক অগভীর জলাশয়ের ধারে। অগভীর কিন্তু বেশ প্রশস্ত। তার মধ্যে ছোট ছোট দ্বীপের মতো কালো কালো পাথর মাথা উঁচু করে আছে, জলের ধারে ধারে বড় বড় ঘাস, নলখাগড়ার মতো। তীরে অসংখ্য দেওদার গাছ, জলের তলাতেও অসংখ্য দেওদারের ফল। দেওদার গাছের শিকড়ও এসে প্রবেশ করেছে সেই জলাশয়ের ভিতর, মনে হচ্ছে ছোট ছোট অন্তরীপ যেন, গাছগুলো ঈষৎ ঝুঁকে দেখছে তাদের। সুরূপিণী হামাগুড়ি দিয়ে জলের ধারে এসে বসলেন, স্বচ্ছ জলে নিজের প্রতিবিম্ব দেখে অবাক হয়ে গেলেন। এ কে! এই কি মহারাণী সুরূপিণী? চোখের কোলে কালি, কাপড় জামা ছিন্নভিন্ন, খোঁপা খুলে পড়ছে। একটু হাওয়া বইল, নড়ে উঠল প্রতিবিম্ব, তারপর এক ঝাঁক পোকা উড়তে লাগল সেটার উপর। সুরূপিণী হাসলেন একটু, প্রতিবিম্বও হাসল, সে হাসিতে অনুকম্পার ছটাও দেখতে পেলেন তিনি। অনেকক্ষণ তিনি রোদে বসে রইলেন। দেখলেন তাঁর হাত পা সব ছড়ে গেছে, কতবার যে আছাড় খেয়েছেন তিনি। কি

নোংরা হয়ে গেছে কাপড়চোপড়, হাত পা মুখ চোখ সবই নোংরা, আশ্চর্য হলেন এই বেশে তিনি এতক্ষণ আছেন কি করে।

তারপর তিনি উঠলেন। ঠিক করলেন ওই আরণ্য আয়নার সাহায্যেই একটু ঠিকঠাক করে নিতে হবে নিজেকে, একটু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হবেন, গা-হাত-পা-মুখে জল দিয়ে ময়লাগুলো ধুয়ে ফেলবেন। প্রথমেই তাঁর দামী গয়নাগুলো খুলে একটা পুঁটুলিতে বাঁধলেন, তারপর ছিন্নভিন্ন শাড়ি কাঁচুলি ওড়নাটাকে গুছিয়ে পরলেন আবার, কুন্তল আলুলায়িত করে চূড়ার মতো করে বেঁধে নিলেন সেটা। বাঁধতে বাঁধতে একটা কথা মনে পড়ল। গন্ধরাজ বলতেন তোমার চুলে সুবাস আছে। আছে না কি? শুঁকে দেখলেন, কই না! হাসলেন একটু। তাঁর সেই ছোট্ট হাসিরও প্রতিধ্বনি ফিরে এল। তারপর উপরের দিকে চেয়ে দেখলেন একটি ছোট মেয়ে আর তার চেয়েও ছোট একটি ছেলে, জলাশয়ের ওপারে একটা দেওদার গাছের নীচে দাঁড়িয়ে সবিস্ময়ে তাঁকে দেখছে। যেন দুটি পুতুল। সুরূপিণী ছোট ছেলেদের তত পছন্দ করেন না, ওদের দেখে তাঁর ভয় হল একটু।

"কে তোমরা"—একটু রুক্ষকণ্ঠেই প্রশ্ন করলেন।

ওরা দু'জনেই ভয় পেয়ে পেছিয়ে গেল। তখন তাঁর মনে হল ছি ছি, ওদের সঙ্গে এমনভাবে কথা কওয়া ঠিক হয়নি। ভয় পেয়ে গেছে বেচারারা। কি সুন্দর দেখতে, চোখের দৃষ্টিতে কি স্বচ্ছতা। বনের ছোট ছোট পাখিদেরই সগোত্র ওরা। পাখির চেয়ে একটু বড়, কিন্তু পাখির চেয়ে ঢের বেশী সরল। ইচ্ছে হল ওদের সঙ্গে ভাব করি।

"এস না, এখানে এস, ভয় কি।"

তাদের দিকে এগিয়ে গেলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে ছুটে পালাল তারা, অদৃশ্য হয়ে গেল বনের ভিতর। নিদারুণ ব্যথা পেলেন এতে। একটা শাণিত সত্য যেন বুকে এসে বিঁধল। তাঁর বাইশ বছর বয়স হল—শীঘ্রই তেইশ হবে—কিন্তু কেউ তাঁকে ভালবাসে না। কেউ না। গন্ধরাজ হয়তো বাসতো। কিন্তু সে কি তাঁকে ক্ষমা করবে? তাঁর দুচোখ জলে ভরে এল। তখনি মনে হল এখন যদি এখানে কাঁদতে বসি তাহলে সে কান্না তো শেষ হবে না। আমরণ বসে কাঁদতে হবে। পাগলও হয়ে যেতে পারি। না, এখানে বসে থাকলে চলবে না। তাড়াতাড়ি উঠে পড়লেন। জ্বলন্ত কাগজকে লোকে যেমন পায়ে চেপে নিবিয়ে দেয় তাঁর এই চিন্তাগুলোকে তেমনি দুপায়ে মাড়িয়ে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। চুলটা ঠিক করে নিলেন—এদিক-ওদিকে চেয়ে দেখলেন একবার—নিশ্চয়ই কাছে বস্তি আছে— ভয় হল, তাড়াতাড়ি আবার চলতে শুরু করলেন।

দুপুরের কাছাকাছি সময়ে তিনি রাজপথে এসে পৌঁছলেন। রৌদ্রালোকিত পথটা দুটো বড় বড় ঝোপের মাঝ দিয়ে পাহাড়ের উপর উঠে গেছে। মনে হচ্ছে পথ নয়, যেন আলোর নদী। প্রকাণ্ড চড়াই। কিন্তু তিনি আর পারছিলেন না। ক্লান্তিতে সমস্ত শরীর ভেঙে পড়ছিল। যা হবার হোক এই ভেবে রাস্তার ধারে একটা গাছের ছায়ায় শুয়ে পড়লেন তিনি, সভ্যতার প্রতীক এই রাজপথের সান্নিধ্যে এসে অজ্ঞাতসারে একটু নির্ভয়ও হলেন হয়তো। সঙ্গে সঙ্গে চোখ বুজে এল, মনে হতে লাগল ক্লান্তিতে বোধহয় মূর্ছাই গেলেন, কিন্তু মূর্ছা নয়, ঘুমই। যখনই তিনি আত্মসমর্পণ করলেন তখনই নিদ্রা যেন তাঁকে কোলে তুলে নিল। সমস্ত দুঃখ,

সমস্ত কষ্ট অতিক্রম করে নিমেষে তিনি বাড়িতে ফিরে গেলেন মায়ের বুকে। রাজপথের ধারে বে-পরদা হয়ে শুয়ে রইলেন মহারাণী, তাঁর ছিন্নভিন্ন বিপর্যস্ত বিলাসব্যসন ধুলোয় লুটোতে লাগল। পাখিরা উড়তে লাগল আশেপাশে আর পাখিদের ভাষায় পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করতে লাগল— এ কে, এ কে।

সূর্য আরও উপরে উঠলেন। মহারাণীর পায়ের কাছ থেকে ছায়া সরে গেল, ক্রমশঃ আরও সরতে লাগল। একেবারে যখন সরে যাচ্ছে তখন দূরে একটা গাড়ির চাকার শব্দে চাঞ্চল্য জাগল পাখিদের মধ্যে। ওই অঞ্চলে রাস্তাটা খুব খাড়া, চাকার আর্তনাদ থেকেই বোঝা যাচ্ছিল সেটা। একটু পরেই একটি প্রৌঢ় ভদ্রলোক হাঁটতে হাঁটতে এসে হাজির হলেন সেখানে। মাঝে মাঝে তিনি পেন্সিল দিয়ে একটি নোটবুকে কি যেন লিখে নিচ্ছিলেন, আর মাঝে মাঝে আপনমনে কথাও বলছিলেন নিজের সঙ্গে, মনে হচ্ছিল কোনও কবি বুঝি কবিতা লিখে মৃদুকণ্ঠে সেটা পড়ে দেখে নিচ্ছেন ছন্দটা ঠিক হয়েছে কি না। গাড়ির চাকার শব্দ তখনও অনেক দূরে। বোঝা গেল গাড়িকে ছাড়িয়ে তিনি অনেকটা পথ এগিয়ে এসেছেন।

সুরূপিণী যেখানে শুয়েছিলেন তার খুব কাছাকাছি এসেও তাঁকে প্রথমে দেখতে পাননি তিনি। তারপর হঠাৎ পেলেন। দেখেই চমকে উঠলেন তিনি, খাতা-পেন্সিল পকেটে পুরে, আরও কাছে এলেন। কাছেই পাথর ছিল একটা। তার উপর বাগিয়ে বসে ভ্রূকুঞ্চিত করে দেখতে লাগলেন তিনি সুরূপিণীকে। অনেকক্ষণ দেখলেন। পা গুটিয়ে হাত গুটিয়ে পাশ ফিরে শুয়েছিলেন তিনি নিটোল বাহুর উপর মাথা রেখে। মনে হচ্ছিল প্রাণহীন নিস্পন্দ। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসেও তাঁর বুক উঠছিল পড়ছিল না। জীবনের কোনও লক্ষণই নেই, একটা মড়াকে কারা যেন রাস্তায় ফেলে দিয়েছে। প্রগাঢ় ক্লান্তির ভাষা সর্বাঙ্গে পরিস্ফুট। ভদ্রলোক মুখ টিপে হাসলেন একটু। একটা মর্মরমূর্তি দেখলে তিনি যা করতেন তাই করলেন। অনিচ্ছাসহকারে হলেও মহারাণীর মুখের চোখের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের, তাঁর রূপের, প্রসাধনের একটা তালিকা প্রস্তুত করতে লাগলেন মনে মনে । ওই তন্বী দেহের অনাবৃত ঘুমন্ত মহিমায় বিস্মিত হলেন তিনি। মনে হল এই নিরাবরণ নিরাভরণ নিদ্রা অপরূপ মানিয়েছে তাঁকে, নূতন রূপে অলংকৃত করেছে তাঁর সর্বাঙ্গ।

"কি আপদ"—ভাবলেন তিনি—"মেয়েটা যে এত সুন্দরী তা তো ভাবিনি। আর এক আপদ, একথা আমি ঘুণাক্ষরে প্রকাশ করতে পারব-না কোথাও—"

তাঁর হাতে একটা ছড়ি ছিল। সেইটে দিয়ে সুরূপিণীর পায়ে ঈষৎ খোঁচা দিলেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে সুরূপিণী চীৎকার করে উঠে বসলেন ধড়মড়িয়ে এবং তাঁকে দেখে চেয়ে রইলেন বিস্ফারিত চক্ষে।

"মহারাণীর আশা করি সুনিদ্রা হয়েছে"—মাথা নেড়ে প্রশ্ন করলেন তিনি। কিন্তু মহারাণীর মুখ দিয়ে অসংলগ্ন শব্দ বেরুতে লাগল শুধু।

"আপনি ভয় পাবেন না, স্থির হোন। আমার গাড়ি পিছনে আসছে, আশা করি মহারাণীর সহযাত্রী হবার পরম সৌভাগ্য আমার হবে।"

"পণ্ডিত ভগীরথ শর্মা!"—সুরূপিণী তাঁকে চিনতে পারলেন অবশেষে।

"মহারাণীর আদেশ পালন করতে সর্বদাই প্রস্তুত।"

সুরূপিণী দাঁড়িয়ে উঠলেন।

"ও, আপনি পার্বতী থেকে আসছেন কি?"

"আজ সকালেই আমি পার্বতী ত্যাগ করেছি। আর ফিরব না সেখানে। আপনি ছাড়া সেখানে না ফিরে যাওয়ার সম্ভাবনা যদি আর কারো থাকে তাহলে সে ব্যক্তি আমি।"

"প্রধানমন্ত্রী কপিঞ্জল—"

বলেই থেমে গেলেন সুরূপিণী।

"আপনি সৎকার্যই করেছিলেন, আপনি দ্রৌপদীর চেয়ে বড় বীরাঙ্গনা, ভীমের সাহায্য না নিয়েই কীচক বধ করতে উদ্যত হয়েছিলেন, কীচক কিন্তু মরেনি। কয়েকঘণ্টা কেটে গেছে। শুনেছি তিনি ভালো আছেন। সকালে বেরুবার আগে আমি খবর নিয়েছিলাম, ওঁরা বললেন, ভালো আছেন, কিন্তু যন্ত্রণা আছে খুব। অ্যাঁ? হ্যাঁ খুব। পাশের ঘর থেকে তাঁর কাতরানি শোনা যাচ্ছে না কি—"

"আর মহারাজা? তাঁর কোনও খবর পেয়েছেন?"

ভগীরথ শর্মা প্রশ্নটা শুনে একটু আমোদ অনুভব করলেন এবং একটু থেমে বললেন—"লোকে বলছে এর সঠিক খবর একমাত্র আপনিই দিতে পারেন না কি।"

সুরূপিণী এ কথার জবাব না দিয়ে একবার চোখ তুলে চাইলেন তাঁর মুখের দিকে। তারপর অন্য প্রসঙ্গ পাড়ালেন—"আপনার গাড়ি আছে? আপনি কি দয়া করে আমাকে শূলপাণি দুর্গে পৌঁছে দিতে পারবেন? সেখানে আমার খুব জরুরী দরকার আছে একটা—"

"নিশ্চয় পারব। আপনার অনুরোধ অগ্রাহ্য করতে পারি কি?"—ভগীরথ শর্মা গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন—"আমার ক্ষমতায় যতটুকু কুলুবে তা আমি সানন্দে করব। আমার গাড়ি এখনি এসে পড়বে। আপনি সেটা যেখানে খুশি নিয়ে যান। কিন্তু"—আবার তাঁর কণ্ঠে ব্যঙ্গের সুর ফুটল—"আপনি তো রাজপ্রাসাদের কথা কিছু জানতে চাইলেন না?"

"ওর জন্যে আমার একটুও মাথা-ব্যথা নেই। মনে হচ্ছে কাল আমি ওটা পুড়তে দেখেছি—"

"অদ্ভুত তো! মনে হচ্ছে আপনার? এতগুলো প্রসাধনসামগ্রী পুড়ে গেল, অথচ আপনি নির্বিকার। প্রশংসা করছি আপনার মনের জোরের! রাজ্য সম্বন্ধেও আপনার মাথা-ব্যথা নেই না কি? আমি যখন এলাম তখন নূতন শাসন-তন্ত্রের বৈঠক বসেছে—নূতন শাসনতন্ত্রের দুজনের নাম নিশ্চয়ই আপনার পরিচিত। একজন সাপ্রা, যে আপনার ভৃত্য হবার সৌভাগ্যলাভ করেছিল—ফাইফরমাশ খাটবার চাকর ছিল কি?—আর দ্বিতীয় লোকটি হচ্ছেন কুজ্‌ঝটিকুমার, তিনি এখন অবশ্য আর মহাধ্যক্ষ নন, নিম্নপদস্থ কর্মচারী। এই রকমই হয়, রাষ্ট্রবিপ্লবের সময় নীচুরা উপরে উঠে যায়, আর উপরের লোকেরা নীচে নেমে আসে।"

"মহামান্য শর্মাজি, আপনি নিশ্চয়ই এসব কথা আমার ভালোর জন্যেই বলছেন, কিন্তু আমি বলছি ওসব জানবার আমার বিন্দুমাত্র কৌতূহল নেই।"

ভগীরথ শর্মা একথা শুনে বেশ একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন। গাড়িটা দূরে দেখা যেতেই বেঁচে গেলেন যেন, কিছু একটা বলবার জন্যেই যেন বললেন, "চলুন আমরা হেঁটে গিয়েই চড়ি ওটাতে।"

তাই হল। তিনি সসম্ভ্রমে সুরূপিণীকে আগে গাড়িতে চড়িয়ে দিয়ে তারপর নিজে চড়লেন। গাড়ির ভিতর নানারকম টুকিটাকি জিনিসে ভরতি ছিল। তিনি কিছু ফল বার করলেন, কয়েক টুকরো মেটে-ভাজা, চমৎকার রুটি আর এক বোতল গৌড়ী সুরা। বোতলটা পাথরের। এসব বার করে তিনি সুরূপিণীকে খাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন, মনে হল বাবা যেন অবাধ্য মেয়েকে সাধছেন। এ সময় আতিথ্যের রীতিবিরুদ্ধ কোনও অভদ্র আচরণ তাঁর ব্যবহারে প্রকাশ পেল না, কণ্ঠে ধ্বনিত হল না কোনও ব্যঙ্গের সুর। তাঁর আন্তরিকতায় মুগ্ধ হলেন সুরূপিণী। কৃতজ্ঞও হলেন।

বললেন, "শর্মাজি, আমি জানি আপনি আমাকে ঘৃণা করেন, আজ এত সদয় কেন?"

এ কথার কোন প্রতিবাদ না করে তিনি বলনেল—"ও, কেন? আপনার স্বামীর বন্ধুত্বলাভের সৌভাগ্য হয়েছে যে আমার। তাঁকে খানিকটা ভালও লেগেছে।"

"পছন্দ হয়েছে! কিন্তু শুনেছি আমাদের দুজনের সম্বন্ধেই অনেক নিষ্ঠুর কটুবাক্য লিখেছেন আপনি।"

"হ্যাঁ, ওই অদ্ভুত পথ দিয়েই আমরা পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলাম। বিশেষ করে আপনার সম্বন্ধে আমার সমালোচনা বিশেষ রকম নিষ্ঠুর এবং কটু হয়েছিল—ওই দুটো শব্দই তো আপনি ব্যবহার করলেন। আপনার স্বামী আমার বন্দীত্ববন্ধন মোচন করে আমাকে স্বাধীন করে দিলেন, রাজ্য ত্যাগ করবার ছাড়পত্র লিখে দিলেন, আমার জন্যে একটা গাড়ি ঠিক করে দিলেন। তারপর ছেলেমানুষের মতো বললেন, আমি আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করব। তাঁর দাম্পত্যজীবনের খবর আমি জানতাম, তাই তাঁর এই সাহস আর আপনার সম্মান রক্ষা করবার জন্যে তাঁর আগ্রহ দেখে ভারী মজা লাগল আমার। তিনি কি বলেছিলেন শুনবেন? বলেছিলেন—'আপনি আমাকে যদি মেরে ফেলেন কেউ আমার অভাব অনুভব করবে না, কেউ আমার জন্যে কাঁদবে না।' বোধহয় আপনিও পরে এই ধরনের কিছু একটা ভেবেছিলেন। অন্য কথায় এসে পড়ছি। আমি তাঁকে বললাম—'আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করা অসম্ভব আমার পক্ষে! তিনি উত্তর দিলেন—"আমি যদি আপনাকে আঘাত করি, তাহলেও অসম্ভব?' কি অদ্ভুত কাণ্ড দেখুন! আমার ইচ্ছে ছিল এ ঘটনাটাও আমার রোজনামচায় লিখে রাখব। কিন্তু আমি হেরে গেলাম, ভদ্রতা আর আন্তরিকতার কাছে পরাজয় ঘটল আমার, গন্ধরাজকে ভালোবেসে ফেললাম। আপনাদের সম্বন্ধে যা যা লিখেছিলাম অনেক কলঙ্কের কথা ছিল তাতে—তা ছিঁড়ে ফেলতে হল তাঁর সামনে। আমি আপনার সঙ্গে এখন যে ব্যবহার করছি তার জন্যে আপনি আপনার স্বামীর কাছে ঋণী মহারাণী।"

সুরূপিণী চুপ করে বসে রইলেন খানিকক্ষণ। তিনি যাদের ঘৃণা করেন তাদের কাছ থেকে নিজের সম্বন্ধে সুবিচার তিনি প্রত্যাশা করেন না। গন্ধরাজের মতো সকলকে খুশী করার ক্ষমতা তাঁর নেই, প্রবৃত্তি নেই। নিজের মতে নিজের পথে মাথা উঁচু করে সোজা গিয়ে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছনই তাঁর স্বভাব। কিন্তু ভগীরথ শর্মার কথা শুনে, বিশেষ করে তিনি তাঁর স্বামীর বন্ধু এ খবর পেয়ে, তিনি নিজেকে অবনত করলেন একটু।

"আমার সম্বন্ধে কি ধারণা আপনার?"—হঠাৎ জিগ্যেস করলেন তিনি।

"সে তো আগেই বলেছি। আমার ধারণা আপনার আর এক পাত্র গৌড়ী পান করা উচিত।"

"কথাটা আপনি এড়িয়ে যাচ্ছেন। এটা তো আপনার স্বভাব নয়। আপনি তো সত্য কথা বলতে ভয় পান না। আপনি বললেন আপনি আমার স্বামীকে পছন্দ করেন। আমার সম্বন্ধেও সত্য কথাটা বলুন—"

"আপনার সাহসকে আমি প্রশংসা করছি। কিন্তু তার বেশী আর কি বলব। আপনি ঠিকই অনুমান করেছেন, মুখ ফুটে বলেওছেন, আমাদের রুচির পার্থক্য আছে।"

"আপনি যে কেলেঙ্কারি আর কলঙ্কের কথা লিখেছিলেন সত্যিই কি তা খুব বেশী শুনেছিলেন আপনি?"

"বেশ বেশী—প্রচুর।"

"আপনি সে সবে বিশ্বাস করেছেন?"

"মহারাণী—এ কি প্রশ্ন!"

"আপনার উত্তরের জন্য ধন্যবাদ", —উষ্মাভরে বললেন সুরূপিণী—"কিন্তু আপনার মুখের উপরই আমি বলছি, আমার ধর্ম, আমার ভগবান, আমার আত্মা, আমার সম্মান সাক্ষী—শত কেলেঙ্কারি শত কুৎসা সত্ত্বেও সত্য কথা হচ্ছে আমি অকলঙ্কিতা, আমি সতী।"

"এরকম ব্যাখ্যায় বোধহয় আমি সায় দিতে পারব না।"

"আমি জানি, আমি আমার স্বামীর সঙ্গে অত্যন্ত দুর্ব্যবহার করেছি। কিন্তু সে কথা বলছি না। আপনি যদি আমার স্বামীকে ভালোবাসেন, তাহলে আমি দাবি করছি আপনি আমার কথাটাও বুঝুন। আমি নির্ভয়ে আমার স্বামীর মুখের দিকে চাইতে পারি, আমার চোখের দৃষ্টি একবারও কাঁপবে না—"

"হতে পারে। কাঁপবে একথা তো আমি বলছি না।"

"তাহলে আপনি আমার কথা বিশ্বাস করবেন না? আপনার ধারণা আমি তাহলে অসতী? ওই লোকটা আমার প্রণয়ী?"

"মহারাণী, আমি যখন ওই কাগজগুলো ছিঁড়ে ফেলেছিলাম তখনই আমি আপনার স্বামীকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি আপনার ব্যাপার নিয়ে আমি আর মাথা ঘামাব না। আমি আবার বলছি আপনার ভালো-মন্দর বিচার করবার আমার একটুও ইচ্ছে নেই।"

"কিন্তু আমি যে নির্দোষ একথা আপনি মানবেন না? কিন্তু সে মানবে, সে আমাকে ভালো করে চেনে।"

ভগীরথ শর্মা হাসলেন।

"আপনি আমার দুঃখ দেখে হাসছেন?"

"দুঃখ দেখে নয়, আপনার সাহস দেখে। কোনও পুরুষ এ রকমভাবে নিজের সাফাই গাইবার সাহস পেত কি না সন্দেহ। আপনি যা করছেন তা হয়তো খুবই স্বাভাবিক, যা বললেন তাও হয়তো সত্যি। তাহলে শুনুন, আপনি যখন আমার মতামত শুনতে এত উৎসুক—আপনি যা আপনার দুঃখকষ্ট বলে বর্ণনা করছেন তা শুনে আমার বিন্দুমাত্র করুণা হচ্ছে না। আপনি অত্যন্ত স্বার্থপর, আপনি যে বীজ বপন করেছিলেন তারই ফসল ফলেছে। আপনি যদি কেবল নিজের কথা না ভেবে আপনার স্বামীর কথা একবারও ভাবতেন, তাহলে আপনি এমন একা পড়ে যেতেন না, এমনভাবে আপনাকে পালাতে হত না, ঘাতকের মতো

আপনার হাতে রক্তের ছাপ লাগত না, আর একজন বৃদ্ধ বিমর্ষ গৌড়বাসীর মুখে আপনার সম্বন্ধে এইসব সত্য কথাও শুনতে হত না, যা কুৎসার চেয়েও বেশী তিক্ত।''

''আপনাকে ধন্যবাদ''—সুরূপিণীর কণ্ঠস্বর কেঁপে গেল—''যা বললেন তা সত্যি, খুব সত্যি। এখন আপনার গাড়িটা থামাবেন?''

''না, যতক্ষণ না আপনি দেহে-মনে সুস্থ হচ্ছেন ততক্ষণ থামাব না।''

গাড়ি চলতে লাগল। একটা পাহাড় একটা প্রকাণ্ড বনভূমি পার হয়ে গেল।

''এইবার আমি সুস্থ হয়েছি। আবার আপনাকে অনুরোধ করছি, আমাকে নামিয়ে দিন।''

''এটা তো অবুঝের মতো কথা। থাকুন না গাড়িতে—চারদিকে পাহাড়—''

''মহামান্য শর্মাজি, ওই পাহাড়ে যদি স্বয়ং মৃত্যুও আমার অপেক্ষায় বসে থাকে তবু আমি নামব। আমি আপনাকে দোষ দিচ্ছি না, ধন্যবাদ দিচ্ছি। অপরের চোখে আমি যে কি তা আমি এখন বুঝতে পেরেছি। কিন্তু আমার সম্বন্ধে যাঁর ওই রকম ধারণা তাঁর সঙ্গে আমি এক গাড়িতে বসে যাব? না, না, কিছুতেই না, আপনি গাড়ি থামান—''

ঘণ্টা বাজিয়ে গাড়ি থামালেন ভগীরথ শর্মা। তারপর নিজে নেমে হাতটা বাড়িয়ে দিলেন যাতে মহারাণী নির্বিঘ্নে নামতে পারেন। কিন্তু মহারাণী সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করলেন না, নিজেই লাফিয়ে নেমে পড়লেন।

রাস্তাটা এতক্ষণ ঘুরে ঘুরে পাহাড়ের উপরে উঠছিল, এইবার সেটা উপত্যকা থেকে বেরিয়ে গর্জনগাঁওয়ের উত্তরে আর একটা উঁচু পাহাড়ের উপর দিয়ে ঠিক যেন কার্নিসের মতো হয়ে চলে গিয়েছিল আরও উপরে। তাঁরা যেখানে নেমেছিলেন সেখানে প্রকাণ্ড একটা বাঁক। মাথার উপরে প্রকাণ্ড একটা পাথরের চাঙড় আর ঝঞ্ঝাহত কয়েকটা দেওদার গাছ ঝুলছিল, নীচে অনেক নীচে, দেখা যাচ্ছিল উপত্যকার নীল সমতলভূমি সবুজ দিগন্তের সঙ্গে কোলাকুলি করছে—আর সামনে রাস্তাটা এঁকেবেঁকে বিরাট একটা সাপের মতো উঠে গিয়েছিল আরও উপরে। সেখানে একটা উচ্চ গিরিচূড়ার উপর একটা দুর্গ দাঁড়িয়েছিল দৃষ্টিরোধ করে।

ভগীরথ শর্মা অঙ্গুলিনির্দেশে জানালেন—''ওই হচ্ছে শূলপাণি, আপনার গন্তব্যস্থান। কামনা করি আপনার যাত্রা শুভ হোক। আপনাকে আর একটু সাহায্য করতে পারলে আমি সত্যিই খুশী হতাম, কিন্তু তাতো আর হল না।''

তিনি গাড়িতে চড়ে ইঙ্গিত করতেই গাড়ি চলতে শুরু করল। সুরূপিণী রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে রইলেন সামনের দিকে চেয়ে, মনে হতে লাগল কিছু দেখতে পাচ্ছেন না, চোখ দুটো যেন অন্ধ হয়ে গেছে। ভগীরথ শর্মার কথা আর ভাবছিলেন না তিনি, যাদের তিনি ঘৃণা করেন মুহূর্তের জন্যও মনে স্থান দেন না তাদের, তারা ক্রমশ ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হয়ে অবশেষে বিলীন হয়ে যায় তাঁর মন থেকে। এখন তিনি ভাবছিলেন অন্য কথা। গন্ধরাজের সঙ্গে তাঁর শেষ সাক্ষাৎকারের কথা তিনি ভোলেননি, এজন্য গন্ধরাজকে ক্ষমাও করেননি। কিন্তু এখন ব্যাপারটা নূতন আলোকে নূতন রূপে প্রতিভাত হয়েছে তাঁর মনে। তিনি অপমানিত হয়ে তাঁর কাছে গিয়েছিলেন, তবু এই দ্বন্দ্বযুদ্ধের কথা ঘুণাক্ষরে বলেননি। তাঁর সম্মান রক্ষা করবার জন্যই তিনি দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করেছিলেন ভগীরথ শর্মার মতো বীরকে। হ্যাঁ তাঁর জন্যই।

অথচ—। দেখতে দেখতে সমস্ত ছবিটারই মানে বদলে গেল। তিনি যে তাঁকে ভালবাসেন, তাতে সন্দেহ রইল না। এ সামান্য দুর্বলতামাত্র নয়, এ পৌরুষের বীরত্ব। কিন্তু তিনি? তাঁর কি ভালোবাসার ক্ষমতাই নেই? আপাতদৃষ্টিতে তাই তো মনে হয়। সহসা তাঁর দুই চোখ জলে ভরে এল, গন্ধরাজকে দেখবার জন্যে, তাঁকে সব কথা খুলে বলবার জন্যে আকুল হয়ে উঠলেন। তাঁর অপরাধের জন্য হাঁটু গেড়ে ক্ষমা চাইবেন তিনি। আর সমস্ত আশা ভরসা যদি চিরতরে নির্বাপিত হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে তাঁর যে স্বাধীনতা তিনি অপহরণ করেছেন সেটা অন্তত ফিরিয়ে দেবেন তাঁকে।

আবার দ্রুতপদে যাত্রা শুরু করলেন। ঘোরানো সিঁড়ির মতো রাস্তা দিয়ে তিনি পর্বত-সমীরণ-স্নাত রৌদ্রোজ্জ্বল শূলপাণিকে লক্ষ্য করেই চলতে লাগলেন। মাঝে মাঝে অনেক উঁচুতে, কখনও তাকে দেখতে পেলেন, আবার কখনও পাহাড়ের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে সে যেন লুকিয়ে পড়ল। আবার দেখা দিল একটু পরে।

।। কুড়ি।।

গন্ধরাজ যখন তাঁর চলন্ত কারাগারে উঠলেন তখন দেখলেন আর একজন কে যেন সামনের আসনে কোণের দিকে বসে আছে। মাথা নীচু করে বসে ছিল লোকটি, গাড়ির আলো বাইরের দিকে পড়ছিল, তাই গন্ধরাজ শুধু একটি লোককেই দেখলেন। সেনাপতি ধূর্জটিপ্রসাদ সঙ্গে সঙ্গে ঢুকে গাড়ির কপাট বন্ধ করে দিতেই গাড়ির চারটি ঘোড়াই অবিলম্বে কদমচালে চলতে শুরু করল।

"দেখুন"—একটু পরে গলা খাঁকারি দিয়ে ধূর্জটি সিং বললেন—"মানে এমন চুপচাপ করে না গিয়ে একটু ঘরোয়াভাবে গেলে কেমন হয়। আপনাদের চোখে আমি অবশ্য ঘৃণ্য লোক, কিন্তু বিশ্বাস করুন আমি অসভ্য নই। আমি বই পড়তে ভালোবাসি, বিদ্যাপতি কালিদাস ভবভূতি আমার কণ্ঠস্থ, বিদগ্ধ লোকের সঙ্গে আড্ডা দেবার সুযোগ পেলে হাতে স্বর্গ পাই। কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাসে আমাকে বিদেশে এসে প্রহরীর চাকরি নিতে হয়েছে। আজ কিন্তু মহা সুযোগ পেয়ে গেছি, অনুরোধ করছি, আমাকে হতাশ করবেন না। ছত্রসভার বাছাই করা দুটি অমূল্য রত্নকে আজ পেয়েছি—অবশ্য রূপসী সদস্যাদের কথা বাদ দিয়ে—একজন সুপ্রসিদ্ধ স্বনামধন্য গ্রন্থকার পণ্ডিত এবং—"

"এ কি, ইন্দীবর না কি"—সবিস্ময়ে বলে উঠলেন গন্ধরাজ।

"মনে হচ্ছে আমাদের দুজনকে এক গাড়িতে একসঙ্গেই যেতে হবে। মহারাজ বোধহয় এটা প্রত্যাশা করেননি।"

"মানে? তুমি কি ভেবেছ আমি তোমাকে বন্দী করেছি?"

"এ সিদ্ধান্তে আসা খুব দুরূহ তো নয়।"

"সেনাপতি ধূর্জটি সিং"—গন্ধরাজ বললেন—"আপনার তো কিছুই অবিদিত নেই। ব্যাপারটা পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিন ইন্দীবরকে।"

"দিচ্ছি। আপনারা দুজনেই মহারাণী সুরূপিণীর আদেশে নির্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত হয়ে

শূলপাণি দুর্গে চলেছেন। আদেশপত্রে মহারাণীর স্বাক্ষরের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী কপিঞ্জলের স্বাক্ষর আছে। পরশু দিন আদেশপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছে। যা বলছি সেটা গোপনীয় কথা।''

''গন্ধরাজ''—ইন্দীবর বললেন—''অকারণে তোমাকে সন্দেহ করেছিলাম বলে ক্ষমা চাইছি।''

''ইন্দীবর, যা চাইছ তা কিন্তু তোমাকে দিতে পারব কি না জানি না।''

''মহারাজ''—একটু ইতস্তত করে ধূর্জটিপ্রসাদ বললেন—''আমি জানি আপনি উদার দিলদরিয়া লোক। আমি যা করতে যাচ্ছি আশা করি তাতে আপনি আপত্তি করবেন না। আমাদের দেশে ঠাকুরঘরে আলো জ্বেলে দেওয়া নিয়ম। এখানেও আমি একটা আলো জ্বেলে দিতে চাই। সঙ্গে এনেছি—''

সত্যিই তিনি একটা উজ্জ্বল বাতিদান লাগিয়ে দিলেন গাড়ির ভিতরে। ভিতরটা বেশ আলোকিত হয়ে উঠল। তারপর তিনি বললেন, ''আমাদের দেশে আর একটা নিয়ম আছে। কোনও গাছে ফুল না ফুটলে আমরা পৈঠী সুরা দিয়ে তার অর্চনা করি। সে সুরাও এনেছি কিছু।'' তিনি গাড়ির আসনের নীচে থেকে একটা ঝুড়ি টেনে বার করলেন, দেখা গেল অনেকগুলি বোতলের গলা বেরিয়ে আছে তার ভিতর থেকে।

''অধ্যাপক মশাই, আপনি রাগ করবেন না তো। আপনারা আমার অতিথি এখন, আমাকে আপনাদের সেবা করবার সুযোগ দিন, বিশেষত আমার এই চাকরিটার জন্যে একটু বিব্রতবোধ করছি, আপনারা যদি আমার অনুরোধ না রাখেন তাহলে আরও বিব্রত হব। শ্রীমান মহারাজা গন্ধকুমারের মঙ্গল হোক।''

এই বলে ধূর্জটিপ্রসাদ একপাত্র পৈঠী সুরা পান করে ফেললেন।

গন্ধরাজ হেসে বললেন—''আমাদের সেনাপতি মশায় রসিক লোক দেখছি। দিন তাহলে আমাকেও একপাত্র। আপনার মঙ্গল কামনা করে আমিও পান করে ফেলি সেটা—''

এরপর আর আড়ষ্টতা রইল না। তিনজনেই মহানন্দে মদ্যপান করতে লাগলেন। একটা ঝাঁকানি দিয়ে গাড়িটা মোড় পার হল, তারপর আরও দ্রুতবেগে চলতে লাগল রাজপথ ধরে।

গাড়ির ভিতরটা আলোকিত ছিল বলে দেখা গেল ইন্দীবর ভারতীর গাল দুটো লাল হয়ে উঠেছে। জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছিল অস্পষ্ট গাছের সারি আসছে আর মিলিয়ে যাচ্ছে, আকাশে নক্ষত্রের সারিও চলছে সঙ্গে সঙ্গে, কখনও কখনও ঢাকা পড়ে যাচ্ছে পাহাড়ের আড়ালে, আবার দেখা দিচ্ছে। বিরাট আকাশ মাঝে মাঝে একফালি মণিমুক্তাখচিত কালো ওড়নার মতোও মনে হচ্ছে, মাঝে মাঝে হু হু করে হাওয়া ঢুকছে নিশীথ রাত্রির রহস্যময় স্বাদ বহন করে। চাকার শব্দ, ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ মুখরিত করে তুলেছে পার্বত্য বন্যপথকে। তিনজনে ক্রমাগত মদ খেয়ে চলেছেন, পাত্রের পর পাত্র হাতে করে পরস্পর পরস্পরকে অভিবাদন করে গলায় ঢেলে দিচ্ছেন তীব্র পৈঠী আসব। দেখতে দেখতে একটা আনন্দময় পরিবেশ ঘনিয়ে উঠল তিনজনকে ঘিরে, মৃদু হাসির গুঞ্জন কেবল ব্যাহত করতে লাগল তাকে মাঝে মাঝে।

নীরবতা ভঙ্গ করে ইন্দীবর বললেন—''গন্ধরাজ, আমি তোমাকে আর ক্ষমা করতে অনুরোধ করব না। ভেবে দেখলাম আমি যদি গন্ধরাজ হতাম আর তুমি যদি ইন্দীবর হতে আমি তোমাকে ক্ষমা করতে পারতাম না।''

"কথাটা বেশ কায়দা করে বললে তো!"—গন্ধরাজ উত্তর দিলেন—"আমি কিন্তু তোমাকে ক্ষমা করে ফেলেছি, যদিও তোমার কথাগুলো আর আমার প্রতি তোমার সন্দেহ মনে খচখচ করছে এখনও। শুধু তোমার কথাগুলোই নয়। সেনাপতি ধূর্জটিপ্রসাদ, আপনার কাছে তো আদেশপত্রটা আছেই, সুতরাং আপনার কাছে আর গোপন করবার কিছু নেই। আমার পারিবারিক অশান্তি আর মনান্তরের কাহিনী তো এখন সকলের সাধারণ সম্পত্তি হয়ে গেছে। সুতরাং আমি তা নিয়ে অসংকোচে এখন আলোচনা করতে পারি। আচ্ছা, আমি কি আমার স্ত্রীকে ক্ষমা করতে পারি? অবশ্যই পারি এবং করেওছি। কিন্তু কি ভাবে? আমি নিশ্চয়ই প্রতিশোধ নেবার জন্য নিজেকে অবনত করব না, আর এও ঠিক যে এখন যদি তার কথা ভাবি তাহলে এমনভাবে ভাবতে হবে যেন সে অপরিচিতা, কোনও দিন যেন তাকে চিনতাম না—"

"একটা কথা বলছি, মাপ করবেন"—ধূর্জটিপ্রসাদ বললেন—"একটা কথা গোড়াতেই ঠিক করে নিন। আমরা কি সবাই হিন্দু নই? আমরা কি সকলেই নিয়তির অমোঘ তাড়নায় বিপর্যস্ত নই? সকলেই কি আমরা ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির? সকলেই কি নিষ্পাপ কলঙ্কহীন?"

"আমি ওসব বিশ্বাস করি না"—হঠাৎ বলে উঠলেন ইন্দীবর ভারতী—"আপনার এই উৎকৃষ্ট সুরা পান করে আমি হৃদয়ঙ্গম করছি কর্মফলটল বাজে কথা, পাপপুণ্য সব ধাপ্পাবাজি। আপনার ও যুক্তি অচল।"

"অচল? আপনি কি কখনও মন্দ কাজ করেননি? একটু আগেই তো আপনি ক্ষমা চাইছিলেন, ভগবানের কাছেও নয়, আপনারই মতো আর একজন সাধারণ লোকের কাছে।"

"ঘায়েল হয়ে গেলুম স্বীকার করছি। দেখছি আপনি শুধু অস্ত্রবিশারদই নন, যুক্তিবিশারদও।"

"ভগবান সাক্ষী, এ কথা শুনে গর্বে আমার বুক ফুলে উঠছে"—ধূর্জটিপ্রসাদ সিংহের মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল—"আমি মিথিলায় সংস্কৃত টোলে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছি। দেখুন, আমার মতে এইসব ক্ষমা চাওয়াটাওয়ার ব্যাপার তাঁদের সাজে যাঁদের জীবনের নীতি শিথিল এবং তা সত্ত্বেও যাঁরা সমাজের বাইরে পা বাড়াতে ভরসা পান না। তাঁরাই এইসব ক্ষমা চাওয়াচাওয়ি করেন মাঝে মাঝে। যাঁরা আসল জ্ঞানী তাঁদের নিজের জীবনের নীতি নির্দিষ্ট সমাজের নীতির বাইরে তাঁরা পা বাড়াতে ইতস্তত করেন না। আপনারা দুজনেই জ্ঞানী, আপনারা কেউ কারোর ক্ষমা চাইবেন কেন? কেউ কারুকে ক্ষমা করবেনেই বা কেন!"

"এই আপাত-বিরুদ্ধ কথাটা কিন্তু খুব লাগসই মনে হচ্ছে না।"—হেসে উত্তর দিলেন ইন্দীবর।

"ক্ষমা করবেন সেনাপতি মশাই, আমি আপনার মনে আঘাত দিতে চাই না, কিন্তু আপনার কথাগুলো যেন ব্যঙ্গের মতো দংশন করল আমাকে। আপনি আমাকে জ্ঞানী বলছেন? যে অবস্থায় পড়েছি সে অবস্থায় আমাকে জ্ঞানী বলা কি সংগত? আমি কি আমার অজ্ঞানের প্রায়শ্চিত্ত করছি না? সুদীর্ঘ অজ্ঞতার ফলে এই অপমানের পঙ্কে ডুবছি না?"

"ক্ষমা করবেন মহারাজ"—বললেন ধূর্জটিপ্রসাদ—"আপনি কি কখনও মন্দির থেকে বিতাড়িত হয়েছেন, আপনি কি কখনও সর্বস্বান্ত হয়েছেন? আমি হয়েছি। সামরিক কর্তব্যচ্যুতির

জন্য হয়েছি। খুলেই বলছি তাহলে—এত বেশী মদ খেতাম, এমন মাতলামি করতাম যে সর্বনাশ হয়ে গেল আমার। এখন অবশ্য আর অতটা করি না''—এই বলে, তিনি তার এক পাত্র সুরা ঢাললেন—''দেখুন মহারাজা, যে লোক তার নিজের চরিত্রের সমস্ত দোষের কথা সম্পূর্ণরূপে জেনেছে, যেমন আমি জেনেছি, যে লোকটাকে অন্ধ লাটিমের মতো জীবনের অঙ্গনে নেচে নেচে বেড়াতে হয়েছে, তার কাছে ক্ষমার অর্থ একটু আলাদা। আমি যতক্ষণ না নিজেকে সম্পূর্ণ ক্ষমা করতে পারছি ততক্ষণ ক্ষমার মহত্ত্ব নিয়ে আস্ফালন করা আমার অন্তত সাজে না। হয়তো আমি জীবনে কোনও দিন কাউকে ক্ষমা করবার মতো শক্তি সংগ্রহ করতে পারবই না। আমার পিতা সচ্চরিত্র নিষ্ঠাবান মন্দিররক্ষক ছিলেন, খুব কড়ালোক ছিলেন তিনি। তিনি কারো দোষত্রুটি ক্ষমা করতেন না । আমি সচ্চরিত্র নই নিষ্ঠাবানও নই এবং ওইখানেই তফাত। যে লোক দুর্বল মানুষকে ক্ষমা করতে পারে না আমার মতে সে শিশু, জীবনের কোনও সত্য অভিজ্ঞতাই তার নেই।''

ইন্দীবর বললেন, ''শুনেছি, আপনি একজন বড় মল্লযোদ্ধা--''

''ওটা অন্য জিনিস। পেশা মাত্র, তবে একেবারে পাশবিক নয়।''

একটু পরেই সেনাপতি মশাই ঘুমিয়ে পড়লেন। অগাধ ঘুম! নাক ডাকতে লাগল। তাঁর দিকে চেয়ে হাসলেন ওঁরা।

''আজব চিড়িয়া''—ইন্দীবর বললেন।

''আর অদ্ভুত অভিভাবকও''—গন্ধরাজ উত্তর দিলেন—''তবে উনি যা বললেন তা নেহাত বাজে কথা নয়।''

''হ্যাঁ ঠিকভাবে বিচার করলে''—ইন্দীবর বললেন—''আমরা যখন বন্ধুকে ক্ষমা করতে অস্বীকার করি, আসলে তখন আমরা নিজেদেরই ক্ষমা করতে পারি না। প্রত্যেক কলহের সঙ্গে আমাদের নিজেদেরই দুষ্কৃতি জড়িয়ে থাকে খানিকটা, তাতেই আরও জট পাকিয়ে যায়।''

''যারা ক্ষমা করে তাদের চরিত্রও কি দোষমুক্ত? আত্মসম্মানের কি কোনও সীমা নেই?''—গন্ধরাজ প্রশ্ন করলেন।

''দেখ, গন্ধরাজ, আত্মসম্মানের কথা তুললে যখন তখন জিগ্যেস করছি কোনও লোক কি সত্যি সত্যি নিজেকে সম্মান করে? এই পাহারাওলার চোখে আমরা মস্ত লোক। কিন্তু সত্যি আমরা কি! বাইরের নানারকম ভড়ং দিয়ে অন্তরের আবর্জনাকে ঢেকে রেখেছি। মুখোশ ছাড়া লোককে দেখাবার মতো আমাদের কিই বা আছে!''

''যা বললে, তা আমার সম্বন্ধে ঠিক খাটে। কিন্তু তুমি? তোমার অক্লান্ত পরিশ্রম, তোমার বিরাট প্রতিভা, তোমার অমর গ্রন্থাবলী, তোমার সাধনা, তোমার ব্রহ্মচর্য—তুমি জান না ইন্দীবর তোমাকে আমি কত হিংসা করি—''

ইন্দীবর মৃদু হাসলেন একথা শুনে।

''গন্ধরাজ, সত্যি কথাটা শুনবে তাহলে? এক কথায় বলছি, যদিও কথাটা ভালো শোনাবে না। আমি মাতাল, লুকিয়ে লুকিয়ে মদ খাই। খুব বেশী খাই। সুরা প্রেতিনীর মতো আমার উপর ভর করেছে। আমার যে অমর গ্রন্থাবলীর প্রশংসায় তুমি এখনি গদগদ হলে সে গ্রন্থাবলী যত ভালো হতে পারত তত ভালো হয়নি, ওই প্রেতিনী তা করতে দেয়নি। পলে

পলে ও আমার মনুষ্যত্ব চুষে চুষে খেয়ে ফেলছে, আমার প্রতিভাকে নিষ্প্রভ করে দিচ্ছে, আমার মেজাজকে সঙ্কীর্ণ করে আনছে। সেদিন যে তোমাকে ওই ওজস্বিনী তিরস্কারটা করলুম, তার ওজস্ কোথা থেকে এল? মদ থেকে, রাত্রে খুব মদ খেয়েছিলাম। ওই যে মাতালটা নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে, তার কথার যদিও প্রতিবাদ করলাম সাড়ম্বরে, কিন্তু ও ঠিক কথাই বলেছে। আমরা সবাই পাপী, কিছুক্ষণের জন্য এই রঙ্গমঞ্চে দাঁড়িয়ে ঠিক করছি এটা ভালো ওটা মন্দ, কিন্তু ভগবানের চক্ষে আমরা সবাই উলঙ্গ পাপী, ভাবলে লজ্জায় মাথা কাটা যায়। কথাটা কিন্তু সত্যি—"

"সত্যি? কি আমরা তাহলে? যা উৎকৃষ্ট—"

"মানুষের মধ্যে উৎকৃষ্ট বলে কিছু নেই। আমি তোমার চেয়ে কিংবা ওই ধূর্জটিপ্রসাদের চেয়ে কোন অংশে ভালো নই, হয়তো মন্দও নই। আমি রঙ্গমঞ্চের একজন অভিনেতা, আমার সাজপোশাক, আমার কথাবার্তা আমার নয়, সব মেকী। এবার আশা করি আমাকে চিনেছ, যদি চিনে থাক তাহলেই আমি খুশী—"

"কিন্তু এসব শুনেও তোমার প্রতি আমার ভালোবাসা তো কমছে না"—মৃদুকণ্ঠে বললেন গন্ধরাজ—"আমাদের দুষ্কৃতি আমাদের বদলায় না। ইন্দীবর, আবার সুরা ঢাল। এই চরম দুর্গতির মধ্যেও যে ধ্রুবতারাটা এখনও ডোবেনি, এস তারই স্মরণে, আমাদের সেই পুরাতন প্রেমকে স্মরণ করে আর এক পাত্র করে পান করি। তারপর যে অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত কারণে তুমি আমাকে তিরস্কার করেছিলে তার অপমান বিস্মৃতির তমসায় ছুঁড়ে ফেলেদি। এস সুরূপিণীকে স্মরণ করেও পান কর আর এক পাত্র, যে সুরূপিণীর সঙ্গে আমি দুর্ব্যবহার করেছি, যে সুরূপিণী আমার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছে, যাকে আমি ছেড়ে চলে এসেছি, হয়তো খুব বিপদের মুখেই ফেলে এসেছি, এস, তাকে স্মরণ করেই আর এক পাত্র পান করি আবার। আমরা কত মন্দ তা বিচার করে লাভ কি, কি তাতে যায় আসে যদি তা সত্ত্বেও লোকে আমাদের ভালবাসে আর আমরাও তাদের ভালোবাসতে পারি—"

"ঠিক বলেছ"—ইন্দীবর বললেন—"খুব ভালো বলেছ। যারা দুঃখবাদী বিশ্বনিন্দুক এই তাদের মুখের মতন জবাব। এইটেই মনুষ্যজাতির ইতিহাসে চিরন্তন অত্যাশ্চর্য ঘটনা। তাহলে তুমি এখনও আমাকে ভালোবাস? তুমি এখনও তাহলে তোমার স্ত্রীকে ক্ষমা করতে পার? ব্যাস, তাহলে তো হয়ে গেল। আমরা এখন অনায়াসে আমাদের বিবেকরূপী কুকুরটাকে ধমক দিয়ে বলতে পারি—থাম বেটা, ছায়া দেখে ঘেউ ঘেউ করে মরছিস কেন।"

দুজনেই নীরব হয়ে গেলেন। ইন্দীবর খালি পানপাত্রটায় অন্যমনস্কভাবে আঙুল দিয়ে টোকা দিতে লাগলেন।

গাড়ি উপত্যকা অতিক্রম করে সেই রাস্তাটায় এসে হাজির হল যেটা গর্জনগাঁওয়ের সামনে দিয়ে চলে গেছে ভৈরঙ্গীর কান ঘেঁষে অনেক নীচে নক্ষত্রালোকে আলোকিত একটা জলপ্রপাত দেখা যাচ্ছিল, মনে হচ্ছিল বনলক্ষ্মীর অঞ্চলপ্রান্ত লুটিয়ে পড়েছে। উপরের পর্বতশ্রেণী নিকষকৃষ্ণ, নগ্ন এবং ভয়ঙ্কর। গাড়ির বাতি পাহাড়ের গায়ে আলোর ছাপ ফেলে ফেলে চলেছিল, দেখা যাচ্ছিল ছোট ছোট দেওদারগাছদের সেই চকিত আলোকে। পাথরের রাস্তাটা ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল গাড়ির চাকা আর ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দে। মাঝে মাঝে

গন্ধরাজ অশ্বারোহী প্রহরীদেরও দেখতে পাচ্ছিলেন, একটা নদীর ধার দিয়ে দলবদ্ধ হয়ে চলেছিল তারা। একটু পরেই শূলপাণির বলিষ্ঠ রূপ ফুটে উঠল, পর্বতের উচ্চ শিখরে দাঁড়িয়ে আছে নক্ষত্রখচিত আকাশের পটভূমিকায় বিরাট দৈত্যের মতো।

"ইন্দীবর, আমরা এসে পড়েছি—"

ইন্দীবর স্বপ্নাচ্ছন্ন হয়ে বসে ছিলেন, জেগে উঠলেন।

"আমি ভাবছিলাম। তুমি বললে সুরূপিণীকে বিপদের মুখে ফেলে এসেছ। এলে কেন? তোমার রুখে দাঁড়ান উচিত ছিল। শুনলাম তুমি স্বেচ্ছায় এসেছ, সুরূপিণীর কথাটা একবার ভাবলে না? তাকে বাঁচাবার জন্যে তোমার কি সেখানে থাকা উচিত ছিল না?"

গন্ধরাজের মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল।

।। একুশ ।।

সুরূপিণীর সঙ্গে দেখা সেরে রাজপ্রাসাদ থেকে শ্রীমতী রঞ্জাবতী যখন বেরিয়ে এলেন তখন ভয়ে তাঁর বুক কাঁপছে। তিনি লম্বা বারান্দায় দাঁড়িয়ে মনে মনে হিসাবনিকাশ করতে লাগলেন, তিনি যা করে ফেললেন কপিঞ্জলের উপর তার কি রকম প্রতিক্রিয়া হবে। পাখাটা খুলে নিজেকে হাওয়া করলেন একটু, কিন্তু পাখার হাওয়া তাঁকে নিশ্চিন্ত করতে পারল না।

"মেয়েটার মাথা একদম খারাপ হয়ে গেছে"—ভাবলেন তিনি; তারপর মনে হল, "আমিও একটু বেশী বাড়াবাড়ি করে ফেলেছি।" অবিলম্বে ঠিক করে ফেললেন গা ঢাকা দিতে হবে। রঞ্জাবতীর গা-ঢাকা দেওয়ার একটা জায়গাও ছিল। শহর থেকে দূরে বনের মধ্যে একটি ছোট বাগান-বাড়িগোছের। তিনি যদিও কবিত্ব করে এটার নামকরণ করেছিলেন—"অরণ্যনীড়"—সাধারণ লোকে কিন্তু এটাকে বলত "বনদরগা"।

এ কথা মনে হওয়ামাত্র তিনি গাড়ি হাঁকিয়ে দ্রুতবেগে বেরিয়ে গেলেন। যাবার সময় দেখলেন বীথিপথ ধরে কপিঞ্জল প্রাসাদের দিকে যাচ্ছেন। ভান করলেন যেন তাঁকে দেখতে পাননি। বনদরগা পার্বতী থেকে সাত মাইল দূরে, একটি সঙ্কীর্ণ উপত্যকার মধ্যে। সেইখানেই রাতটা কাটালেন তিনি। শহরের গোলমালের খবর তাঁর কানে এল না। জায়গাটা উপত্যকার মধ্যে, চারদিকে পাহাড়, তাই অগ্নিকাণ্ডের আলোও দেখতে পেলেন না তিনি। রাত্রে ঘুম হল না ভালো! কি হবে কি হবে এই চিন্তায় অস্থির হয়ে রইলেন, কাল সন্ধ্যাটা বেশ মনোরমভাবেই কেটেছে কিন্তু তার ফল শেষপর্যন্ত কি দাঁড়াবে কে জানে! তাঁরও শেষপর্যন্ত নির্বাসন লেখা আছে না কি কপালে! চিঠিপত্রের মাধ্যমে নিজের অনেক সাফাই গাইবার পর তবে কি তিনি কপিঞ্জলের নাগাল পাবেন? কে জানে অদৃষ্টে কি আছে! তারপর তাঁর কৌতূহল হল গন্ধরাজ কাল তাঁকে যে দলিলগুলো দিয়েছিল তাতে কি আছে? দেখা যাক। দেখে কিন্তু তিনি হতাশ হলেন। এই ডামাডোলের বাজারে জমি আর খামার নিয়ে কি করবেন তিনি। এও তাঁর মনে হল গন্ধরাজ খুব বেশী টাকা দিয়েছে। একটা খামারের অত দাম? পরিশেষে গন্ধরাজের মুক্তির জন্যে সুরূপিণী যে আদেশটা দিয়েছিলেন সেটা খুলে পড়লেন। আঙুলগুলোয় ছ্যাঁকা লাগল যেন! মুড়ে রেখে দিলেন সেটা। ভাবলেন একটু। তারপর ঠিক করে ফেললেন কি করবেন।

পরদিন সকালে দেখা গেল একটি রূপসী রমণী অশ্বারোহণে এসে শূলপাণির সিংহদরজার সামনে ঘোড়ার লাগাম টেনে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর পরনের কাপড় আঁটসাঁট করে পরা। চোখের দৃষ্টিতে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। পরিণাম কি হতে পারে তা না ভেবেই দুঃসাহসিনী রঞ্জাবতী বেরিয়ে পড়েছিলেন। তাঁর মনের ভাবটা—দেখা যাক না কি দাঁড়ায়! চিরকালই এই তাঁর মনের ভাব। খেয়ালের হাওয়াতেই চিরকাল তিনি তরী ভাসিয়েছেন। প্রহরীকে আদেশ করলেন—সেনাপতিকে খবর দাও। ধূর্জটিপ্রসাদ বেরিয়ে এসে স্বাগত-সম্ভাষণ জানালেন তাঁকে, নবীন যুবক কোনও তরুণীকে দেখে যেভাবে উচ্ছ্বসিত হতেন তেমনই উচ্ছ্বসিত হলেন, যদিও আশ্চর্যের বিষয়, দিবালোকে তাঁকে বেশ প্রবীণ বলেই মনে হচ্ছিল। রঞ্জাবতীর চোখমুখ রহস্যময় হয়ে উঠল।

"সেনাপতি মশাই, আপনাকে তাক লাগিয়ে দিতে এসেছি"—বলে একটি অর্থপূর্ণ কটাক্ষ হানলেন তিনি।

"আমার আসামী দুটিকে যেন ভুলিয়ে নিয়ে যাবেন না। বরং আপনি এসে যদি তাদের দলে যোগ দেন আমার আনন্দ সীমা ছাড়িয়ে যাবে।"

" তার মানে আমাকে নষ্ট করতে চান!"

"পারব কি? চেষ্টা নিশ্চয়ই করব।"

এই বলে তিনি হেসে হাত বাড়িয়ে দিলেন। রঞ্জাবতী তাঁর বাহুলগ্না হয়ে ঘেঁষে দাঁড়ালেন ঘনিষ্ঠ হয়ে।

"আমি মহারাজার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। অবিশ্বাস করছেন তো? হ্যাঁ, এখুনি দেখা করতে হবে। ওই হতভাগা কপিঞ্জল, আমাকে দূতের মতো দৌড় করাচ্ছে খালি। আচ্ছা, আমাকে দূতের মতো দেখাচ্ছে কি?"

এই বলে তিনি তাঁর চোখের উপর চোখ রাখলেন।

"আপনাকে পরীর মতো দেখাচ্ছে"—ধূর্জটিপ্রসাদ কবিত্ব করবার প্রয়াস পেলেন। রঞ্জাবতী হেসে উঠলেন এ কথায়।

"পরীর মতো? পরীরা কখনও ঘোড়ায় চড়ে আসে? আপনার কল্পনাটা একটু বেসামাল হয়ে পড়ল বোধহয় তাড়াতাড়িতে।"

"হতে পারে। আপনি এলেন, দেখলেন এবং জয় করলেন, সময় দিলেন কই। আসবার সময় আপনাকে স্মরণ করে আমরা পৈঠী পান করেছি, বার বার করেছি—সুন্দরী সুনয়নীকে ভুলিনি আমরা। সত্যি বলছি, আপনার চোখের মতো চোখ আমি একটিবার মাত্র দেখেছি কেবল আমাদের গ্রামে, তখন আমি টোলে পড়তাম। মেয়েটির নাম ছিল বৈদেহী। আপনার সঙ্গে তার অদ্ভুত মিল—"

"গাড়িতে আপনারা তাহলে বেশ ফুর্তি করতে করতে এসেছেন?"—রঞ্জাবতী মুখে হাতটা রেখে ছোট্ট হাই তুললেন।

"এসেছি। আড্ডা চমৎকার জমেছিল। কিন্তু মনে হয় কাল আমাদের মাত্রাটা একটু ছাড়িয়ে গিয়েছিল, মহারাজ মনে হয় একটু বেশী খেয়ে ফেলেছিলেন। আজ সকালে সেইজন্যেই বোধহয় মেজাজটা ঠিক নেই। তবে সন্ধ্যে নাগাদ ঠিক হয়ে যাবে। এই যে এইটে দরজা—"

"দাঁড়ান—রঞ্জাবতী চুপি চুপি বললেন—"একটু দম নিয়েনি। না, না থামুন, এখন কপাটটা

খুলবেন না, আমার কিছু করার আছে।"

এই বলে তিনি যা করলেন তা অপ্রত্যাশিত। গান গেয়ে উঠলেন মিষ্টি গলায়। রোমাঞ্চিত হয়ে গেলেন ধূর্জটিপ্রসাদ, তাঁর মনে হল যেন একটা বীণা বাজছে। গানের প্রথম কলি— আকাশ আবার ডাক দিয়েছে পাখিকে। গান শেষ করে তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন একবার। তারপর বললেন—"এইবার খুলুন।" কপাট খুলে গেল। হরিণীর মতো চটুল দ্রুতগতিতে এগিয়ে গেলেন তিনি গন্ধরাজের কাছে, তাঁর চোখের দৃষ্টিতে ফুটে উঠল অপরূপ জ্যোতি, মুখের ভাবে মূর্ত হল সদ্য-গাওয়া সংগীতের মধুর মূর্ছনা। নাটকীয় ভঙ্গীতে প্রবেশ করলেন তিনি। কারারুদ্ধ বিমর্ষ গন্ধরাজের মনে হল মূর্তিমতী আলো এল যেন।

"এ কি! রঞ্জাবতী! তুমি এখানে!"

রঞ্জাবতী সেনাপতির দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চাইলেন। ভাবটা—আপনি একটু আড়ালে যান। সেনাপতি চলে যেতেই রঞ্জাবতী ছুটে গিয়ে কণ্ঠলগ্ন হলেন গন্ধরাজের।

"তোমাকে দেখতে এসেছি।"

কান্না ফুটে উঠল রঞ্জাবতীর কণ্ঠস্বরে। আরও জড়িয়ে ধরলেন তিনি গন্ধরাজকে।

কিন্তু গন্ধরাজ বিচলিত হলেন না। দৃঢ়পদেই দাঁড়িয়ে রইলেন। সঙ্গে সঙ্গে রঞ্জাবতীও সামলে নিলেন নিজেকে।

"আহা বেচারী, বেচারী। বস, এইখানে আমার পাশে এসে বস। সব বল আমাকে। আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। কেমন লাগছে এখানে?"

রঞ্জাবতী কাল পর্যন্ত গন্ধরাজকে 'আপনি' বলে সম্বোধন করেছেন। আজ হঠাৎ 'তুমি' বলতে তাঁর বাধছিল একটু। আড়চোখে গন্ধরাজের দিকে চেয়ে দেখলেন একবার। না, গন্ধরাজ এ নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন না। গন্ধরাজ তাঁর পাশে বসলেন। তাঁর বিমর্ষ ভাবটাও কেটে গেল।

"রঞ্জাবতী, তুমি যতক্ষণ আছ ততক্ষণ ভালোই লাগবে। কিন্তু তুমি তো এখনি চলে যাবে। ওখানকার খবর কি বল আগে। মনে হচ্ছে কাল তোমার পরামর্শ শোনাই উচিত ছিল আমার। শুনিনি বলে অনুতাপ হচ্ছে। আমার প্রতিরোধ করাই কর্তব্য ছিল। তুমি বার বার বলেছিলে। সত্যি তুমি বুদ্ধিমতী, সত্যি তুমি মহৎ, তোমার মতো হিতৈষী—"

"গন্ধরাজ আমার কথা বাদ দাও। আমার পক্ষে ওভাবে তোমাকে উৎসাহিত করা উচিত হয়েছিল কি? আমারও তো কর্তব্য আছে একটা। কিন্তু তোমাকে দেখলেই আমি সব কথা ভুলে যাই, সব কর্তব্য যেন উপে যায়।"

"আর আমার কর্তব্যবুদ্ধি পরে জাগে, তখন আর কিছু করবার থাকে না। এখন বুঝছি সত্যি, আমার প্রতিরোধ করা উচিত ছিল। এখন মনে হচ্ছে স্বাধীনতা ফিরে পাবার জন্যে আমি কি না দিতে পারি?"

"বল, কি দেবে তুমি?"—রঞ্জাবতী হেসে প্রশ্ন করলেন, তাঁর লাল পাখাটা আবার খুলে গেল মুখের সামনে, মনে হল তিনি যেন একটা দেওয়ালের ওপাশ থেকে উজ্জ্বল হাসি-ভরা দৃষ্টি মেলে চেয়ে আছেন গন্ধরাজের দিকে।

"কি দেব? মানে? মনে হচ্ছে কোন খবর এনেছ তুমি—"

"খবর? হ্যাঁ তা খবর বলতে পার—"

গন্ধরাজ দাঁড়িয়ে উঠলেন।

"ছলনা করো না রঞ্জাবতী। বল, কি খবর এনেছ। তুমি তো নিষ্ঠুর নও, আমি তোমাকে চিনি। কি দেব বলছিলে? কিছুই দেব না, এখন তো আমার কিছুই নেই, আমি এখন তোমার করুণা ভিক্ষা করতে পারি। আর কোনও ক্ষমতা নেই আমার।"

"ছি, ছি, ও কি কথা বলছ। না না এটা ঠিক হচ্ছে না। তুমি তো আমার দুর্বলতা জান। ও কথা বলো না, তুমি মহারাজা, তোমার মহত্ত্ব বিসর্জন দিও না।"

"আমি আর মহারাজা নই রঞ্জাবতী, আমার মহত্ত্বও আর নেই। তুমি চিরকালই মহৎ, চিরকালই করুণাময়ী। তোমার সিংহাসন থেকে তোমাকে কেউ নামাতে পারেনি। তুমিই কৃপা কর আমাকে—"

তিনি রঞ্জাবতীর হাত দুটি ধরে সাগ্রহে চেয়ে রইলেন তাঁর চোখের দিকে। তারপর পিঠে হাত বুলিয়ে দিলেন, দু'একটা বিস্রস্ত অলক ঠিক করে দিলেন। রঞ্জাবতী খুব উপভোগ করতে লাগলেন এটা মনে মনে যদিও বাইরে ভান করতে লাগলেন যেন গন্ধরাজের এই মনোযোগে তিনি বিব্রত বোধ করছেন, শত্রু যেন দুর্গ আক্রমণ করেছে। অবশেষে হৃদয় বিগলিত হল তাঁর। তড়াক করে লাফিয়ে উঠে পটপট জামার বোতাম খুলে ফেলে বুকের ভিতর থেকে আদেশপত্রটা বার করে ছুঁড়ে দিলেন সেটা মেজের উপর।

"এই নাও। আমি জোর করে ওটা লিখিয়ে এনেছি। তোমার মুক্তির আদেশ। তুমি ওটা ব্যবহার করলে কিন্তু আমার ধ্বংস অনিবার্য। কপিঞ্জল আমাকে ক্ষমা করবে না। তাকে তো চেনো—"

মুখ ঘুরিয়ে নিলেন তিনি, যেন উদগত অশ্রু গোপন করবার জন্যে।

গন্ধরাজ লাফিয়ে কাগজটা তুলে নিলেন। পড়লেন। তারপর বলে উঠলেন—"ও লিখে দিয়েছে? সত্যি? বিশ্বাস হচ্ছে না—"

আবেগভরে চুম্বন করতে লাগলেন কাগজটাকে।

রঞ্জাবতীর মনটা সত্যিই উদার, সত্যিই কোমল। কিন্তু এ দৃশ্য দেখে তিনি থাকতে পারলেন না। তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল—"অকৃতজ্ঞ! আমি জোর করে তাকে দিয়ে লিখিয়ে এনেছি ওটা, এর জন্যে কপিঞ্জলের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করতে হয়েছে আমাকে। আর তুমি তার জন্যে পাগল হয়ে উঠলে!"

"আমাকে দোষ দিও না রঞ্জাবতী। আমি তাকে ভালোবাসি।"

"সে তো দেখতেই পাচ্ছি। আর আমি?"

"তুমি? তুমি আমার প্রিয়তমা, উদার-হৃদয়া, করুণাময়ী বান্ধবী।"

গন্ধরাজ এগিয়ে এলেন তাঁর দিকে। তারপর বললেন—"তুমি যদি এমন রূপসী, এমন মনোরমা না হতে তাহলে তুমি আদর্শ বান্ধবী হতে পারতে। তোমার রসবোধ আছে, তোমার মোহিনীশক্তির ক্ষমতা যে কত তা তুমি জানো, যখন তোমার মরজি হয় তখন তুমি আমার দুর্বলতা নিয়ে খেলা করতেও ভালোবাস, আমিও কখনও কখনও সে খেলায় যোগ দিয়েছি। কিন্তু আজ সে নাটক হবে না। আজ আমাকে বিশ্বাসী শক্তসমর্থ পুরুষ বন্ধুর ভূমিকা নিতে

হবে, আজ যদি আমি ভুলে যাই যে তুমি রূপসী আর আমি দুর্বল তাহলে তুমি রাগ করতে পাবে না। আজ তোমাকে সম্পূর্ণরূপে প্রকৃত বন্ধুর মতো পেতে চাই রঞ্জাবতী, আমার এ অনুরোধ রাখ আজ—"

হাত বাড়িয়ে হেসে এগিয়ে গেলেন গন্ধরাজ। রঞ্জাবতীও সে হাতে নিজের হাত মেলালেন বেশ সপ্রতিভ হাসি হেসে।

বললেন, "তুমি আমাকে জাদু করেছ গন্ধরাজ"—তারপর একটু হেসে—"আমি আমার অস্ত্র সংবরণ করছি এবং আমাকে এতে রাজী করতে পেরেছ বলে তোমাকে বাহবাও দিচ্ছি। কি চমৎকার করে গুছিয়ে তুমি কথাগুলো বললে! আমি যেমন রূপসী, তুমিও তেমনি নিপুণ—"

বলে অপরূপ ভঙ্গীভরে অভিবাদন করলেন তিনি।

গন্ধরাজও অভিবাদন করে বললেন—"আবার যদি তুমি অমন লোভনীয় হয়ে ওঠ তাহলে আমাদের চুক্তি টিকবে কি?"

"এই আমার শেষ তীর। এবার আমি সম্পূর্ণ নিরস্ত্র। খালি টোটা। গন্ধরাজ তুমি যদি এই কারাগার ছেড়ে চলে যাও—যেতে পার,—কিন্তু আমার সর্বনাশ হয়ে যাবে। কি করবে বল—"

ঠিক করে ফেলেছি, যাব। যদিও আমি গোবরগণেশ, তবু আমাকেই কর্তব্যের অনুরোধে যেতে হবে। একটা কর্তব্য করা হয়নি এখনও। কিন্তু ভয় নেই, তোমার সর্বনাশ হবে না। তুমিই আমাকে নিয়ে চল। ভালুকওলারা যেমন ভালুকের নাকে দড়ি পরিয়ে গলায় শিকল দিয়ে নিয়ে যায়—তেমনি করে তুমিও আমাকে নিয়ে চল কপিঞ্জলের কাছে। আমি সব হীনতা সহ্য করব আমার স্ত্রীকে বাঁচাবার জন্য। আমাকে সে যা করতে বলবে তাই করব। তার সব দাবি মানব আমি, মহারাক্ষসের সব ক্ষুধা মেটাব। আর এর বাহাদুরি এবং গৌরব তুমি পাবে।"

"বেশ, রাজী! আর তুমি প্রিয়দর্শী গন্ধরাজ নও, তুমি এখন কর্তব্যপরায়ণ শ্রীরামচন্দ্রের মহিমায় পরমপূজ্য মহাপুরুষ। চল এক্ষুনি তাহলে আমরা বেরিয়ে পড়ি। হ্যাঁ একটা কথা। ওই দলিলগুলো আমি তোমাকে ফেরত দিয়ে দিতে চাই। ওই খামার বাড়ি তুমিই পছন্দ করেছিলে, আমি তো দেখিও নি। তুমিই কীর্তিভূষণের উপকার করতে চেয়েছিলে, আমি তাকে চিনিও না। আর তাছাড়া"—একটু নিম্নকণ্ঠে হেসে বললেন—"আমি ভূমি-লক্ষ্মীর পুজোর মন্ত্র জানি না, আমি চিরকাল নগদ লক্ষ্মীরই উপাসিকা—"

দুজনেই জোরে হেসে উঠলেন।

"বেশ, আবার তাহলে আমি কৃষক হয়ে গেলাম"—দলিলগুলো হাত বাড়িয়ে নিলেন গন্ধরাজ—"কিন্তু ঋণে যে আমার মাথার চুল পর্যন্ত বিকিয়ে রইল।"

রঞ্জাবতী ঘণ্টা বাজাতেই ধূর্জটিপ্রসাদ এসে হাজির হলেন।

"সেনাপতি মশাই, আমি আপনার একজন কয়েদীকে নিয়ে উধাও হচ্ছি। আমাদের দুজনের মধ্যে কথাবার্তা হয়ে গেছে। এই দেখুন, মহারাণীর আদেশপত্র—"

যদিও প্রয়োজন ছিল না তবু ধূর্জটিপ্রসাদ একটি শৌখিন বিদেশী চশমা ব্যবহার করতেন। সেটি কায়দা করে নাকের উপর লাগিয়ে তিনি আদেশপত্রটি পড়লেন।

"মহারাণীর আদেশপত্র। ঠিক আছে। কিন্তু আগেকার আদেশপত্রে প্রধানমন্ত্রী কপিঞ্জল দেওয়েরও স্বাক্ষর ছিল—"

"তাঁরই জীবন্ত স্বাক্ষর হয়ে তো আমি এসেছি। তিনিই তো আমাকে পাঠিয়েছেন।"

"ও বেশ, বেশ। আপনি সৌভাগ্যবতী, আমি হতভাগ্য এমন একজন লোকের সঙ্গ থেকে বঞ্চিত হলাম। এখন আপসোস করা ছাড়া আর উপায় কি? ইন্দীবর ভারতী অবশ্য রইলেন, তিনি বিরাট পণ্ডিত, নিজে ইচ্ছে করে যদি আমার নাগালের মধ্যে ধরা না দেন তাহলে আমি তাঁর পাত্তা পাব না।"

"হ্যাঁ, ইন্দীবরের সম্বন্ধে তো কোনো আদেশ নেই—"

"ভালোই তো। সেনাপতি মশাইকে একা থাকতে হবে না।"

"মহারাজ"—ধূর্জটিপ্রসাদ সাড়ম্বরে বললেন—"আশা করি আপনার এই স্বল্প কারাবাসের সময় আমি যথোচিত শ্রদ্ধাসহকারে আপনার মর্যাদা রক্ষা করতে পেরেছি। ইচ্ছে করেই আমি একটা আনন্দময় পরিবেশ সৃষ্টি করবার প্রয়াস পেয়েছিলাম। আমার মতে আনন্দময় পরিবেশ আর সুরা সব সময়েই সব দুঃখকষ্ট লাঘব করে দেয়।"

"সেনাপতি মশাই"—গন্ধরাজ হাত বাড়িয়ে দিলেন—"আপনার মধুর সঙ্গই যথেষ্ট ছিল, আর কিছুর প্রয়োজন ছিল না। আপনার চমৎকার স্বভাব, আর আপনার জীবনদর্শন মুগ্ধ করেছে আমাকে। শিক্ষাও দিয়েছে। আশা করি আবার আমাদের দেখা হবে। আপনাকে একটা উপহার দিতে চাই, সামান্য স্মৃতি-চিহ্ন। এখানে বসে এই কারাগারের জানলার গরাদের দিকে চেয়ে চেয়ে আমি এইগুলো লিখেছি। আমি কবি নই, কারাগার কবিত্বের প্রেরণাও যোগায় না তবু বসে বসে কবিতাই লিখেছি। আপনি রাখুন এগুলো, আপনার কৌতূহলের খোরাক যোগাবে অন্তত—"

কাগজগুলো হাতে করে ধূর্জটিপ্রসাদের মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। তাড়াতাড়ি আবার শৌখিন চশমাটি নাকে লাগিয়ে পড়তে লাগলেন।

"বাঃ, চমৎকার ছন্দ তো! মালিনী কি? না, তা তো নয়। এ যে অনন্য একেবারে। আকাশ তোমার আলোর দূতের রামধনুরাঙা পোশাক হেরি হয়েছি মুগ্ধ আত্মহারা, কি বারতা তুমি পাঠায়েছ তাহা পশে কি কানে, তারপর এলো আলো-ঝলমল-লক্ষ তারা'—বাঃ, বা চমৎকার! শিরোধার্য করে নিলাম এই অমূল্য উপহার।"

"সেনাপতি মশাই কবিতাগুলো পরে পড়বেন"—বাধা দিলেন রঞ্জাবতী—"আগে কারাগারের দ্বার উন্মুক্ত করে দিন।"

"নিশ্চয় নিশ্চয়। ক্ষমা করবেন, কিন্তু এ কথা আমি বলতে বাধ্য আমি যে ধরনের লোক তাতে এই কবিতাগুলো, এদের অপূর্ব জন্মকথা, আমাকে সত্যিই বিচলিত করেছে। আপনাদের সঙ্গে কি কোনও লোক দেব?"

"না, দরকার নেই"—রঞ্জাবতীই উত্তর দিলেন—"আমরা হইচই করতে চাই না, ছদ্মবেশে যাব, যেমন এসেছিলাম। অমারা একসঙ্গে ঘোড়ায় যাব। গন্ধরাজ আমার চাকরের ঘোড়া নেবেন। আমরা তাড়াতাড়ি গোপনে সরে পড়তে চাই, এর বেশী আর কিছু দরকার নেই।"

তিনি দ্বারের দিকে অগ্রসর হয়ে গেলেন।

কিন্তু গন্ধরাজ ইন্দীবর ভারতীর কাছে বিদায় না নিয়ে যেতে পারলেন না। ধূর্জটিপ্রসাদ নাকে চশমা দিয়ে কবিতাগুলো পড়তে পড়তে তাঁর অনুসরণ করলেন, আর যাকে সামনে পেলেন তাকেই পড়ে শোনাতে লাগলেন সেগুলো। তাঁর উত্তেজনা ক্রমশ যেন বাড়তে লাগল। শেষে তিনি বললেন—"এগুলো পড়তে পড়তে আমার কালিদাসকে মনে পড়ছে। মেঘদূতের আকুলতা ফুটেছে কবিতাগুলোর ছত্রে ছত্রে।"

সব শেষ হল অবশেষে। গন্ধরাজ আর রঞ্জাবতী পাশাপাশি হাঁটতে লাগলেন পাহাড়ী রাস্তা দিয়ে। রঞ্জাবতীর চাকর দুটো ঘোড়া নিয়ে পিছু পিছু আসছিল। রৌদ্র আর সমীরণ, উড়ন্ত পাখির দল, সুদূরবিস্তৃত দিগন্ত তাঁদের ঘিরে যে পটভূমিকা সৃজন করছিল তা অবর্ণনীয়। চারিদিকের বনভূমি, পর্বতশিখরের গম্ভীর মহিমা, ঝরনা আর নদীর কলরোল তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে চলছিল যেন। অনেক নীচে দেখা যাচ্ছিল বিরাট সবুজ যেন দিগ্বলয়ের বিরাট নীলে গিয়ে মিশছে।

তাঁরা কিছুক্ষণ নীরবেই হাঁটলেন। গন্ধরাজ তাঁর অপ্রত্যাশিত মুক্তির কথা ভেবে আর প্রকৃতির অনবদ্য রূপ দেখে আনন্দে মগ্ন হয়ে গিয়েছিলেন, মাঝে মাঝে ভাবছিলেন কপিঞ্জলের সঙ্গে দেখা হলে তাকে কি বলবেন। কিন্তু যখন উঁচু নীচু অমসৃণ রাস্তাটা শেষ হল, পাহাড়ের আড়ালে শূলপাণি যখন ঢাকা পড়ে গেল তখন রঞ্জাবতী দাঁড়ালেন।

"এখানে আমার চাকরটা ঘোড়া থেকে নেমে পড়ুক। তুমি ওর ঘোড়াটা নাও। এস দুজনে মিলে উদ্দামগতিতে ঝড়ের বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে বেরিয়ে যাই। মনোমত সঙ্গী পেলে ঘোড়া চড়তে এত ভালো লাগে!"

তাঁর কথা শেষ হতে না হতে দেখা গেল নীচে ঢালু রাস্তাটার মোড়ে একটা গাড়ি ক্যাঁচ কোঁচ করতে করতে অতিকষ্টে চড়াই ভাঙছে। আর তার সামনে খাতা-হাতে একটি গম্ভীর প্রৌঢ় ভদ্রলোক হাঁটতে হাঁটতে আসছেন।

"এ কি, ভগীরথ শর্মা দেখছি—"

গন্ধরাজ ডাকলেন তাঁকে। ভদ্রলোক খাতাটি পকেটে পুরে ফেলে খানিকক্ষণ ভ্রূকুঞ্চিত করে চেয়ে রইলেন উপরের দিকে। তারপর ছড়ি নাড়লেন। গন্ধরাজ আর রঞ্জাবতী এগুতে লাগলেন তাঁর দিকে, তিনিও এঁদের কাছে আসবেন বলে চড়াই ভাঙতে লাগলেন লাঠিতে ভর দিয়ে দিয়ে। তাঁরা যেখানে মিলিত হলেন সে জায়গাটা একটা কোণের মতো। সেখানে একটা ঝরনার ধারা মস্ত একটা পাথরকে ঘিরে ঘিরে নৃত্য করে ঝাঁপিয়ে পড়েছে পাশের ঝোপে ভগীরথ শর্মা গন্ধরাজকে সসম্ভ্রমে অভিবাদন করলেন। রঞ্জাবতীর দিকে চেয়ে তিনি মাথাটা একবার নোয়ালেন বটে, কিন্তু তাঁর নাকটা একটু কুঁচকে গেল, আর চোখের দৃষ্টিতে ফুটল একটু বিস্ময়।

রঞ্জাবতীকে সম্বোধন করেই প্রথমে কথা বললেন তিনি।

"আপনি কি খবরটা শোনেননি তাহলে?"

"কি খবর?"

"মস্ত খবর। গর্জনাগাঁওয়ে রাষ্ট্রবিপ্লব হয়ে গণতন্ত্র স্থাপিত হয়েছে। রাজপ্রাসাদ ভস্মীভূত, মহারাণী পালিয়েছেন আর কপিঞ্জল আহত—"

"কপিঞ্জল আহত?"

"খুব। অত্যন্ত যন্ত্রণা পাচ্ছেন। তাঁর আর্তনাদ—"

রঞ্জাবতীর মুখ দিয়ে এমন একটা শপথবাক্য নির্গত হল যে অন্যসময়ে হলে এঁরা চমকে যেতেন তা শুনে। পরমুহূর্তেই তিনি ছুটে গেলেন তাঁর ঘোড়াটার কাছে, একলম্ফে তার পিঠে চড়ে আর কোন দিকে না চেয়ে ছুটে বেরিয়ে গেলেন। চাকরটা সবিস্ময়ে দাঁড়িয়ে রইল কয়েকমুহূর্ত, তারপর সেও অনুসরণ করল তাঁর। রঞ্জাবতীর এই ঝঞ্ঝাবৎ অর্ন্তধানের দাপটে ভগীরথ শর্মার গাড়ির ঘোড়াগুলো একটু ভড়কে গেল। রঞ্জাবতী কিন্তু থামলেন না—খটাখট্ খটাখট্ খটাখট্—তাঁর দ্রুতধাবমান অশ্বের ক্ষুরধ্বনি সচকিত করে তুলল গিরিপর্বত অরণ্যভূমিকে। তাঁর চাকর বৃথাই তার অশ্বকে বারংবার কশাঘাত করতে লাগল তাঁর নাগাল পাওয়ার জন্য। আর একটু নীচে আর একটি মেয়ে অতিকষ্টে চড়াই ভেঙে উপরে উঠছিল, সহসা রঞ্জাবতীর ঘোড়ার সামনে পড়ে চীৎকার করে সরে গেল সে। আর একটু হলে হয়তো মারা যেত। রঞ্জাবতী কিন্তু সেদিকে ফিরেও চাইলেন না। চড়াই উতরাই ভেঙে পাহাড় বনজঙ্গল অতিক্রম করে তিনি ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলেছিলেন ঘোড়ার রাশ ছেড়ে দিয়ে।

"অদ্ভুত মেয়ে! কে বলবে ও একদিন লোকটাকে ভালোবাসত—"

গন্ধরাজ তাঁকে দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরেছিলেন আবেগভরে।

"আমার স্ত্রী! মহারাণী? তার খবর কি।"

"তিনি আসছেন। ওই বাঁকটার নীচেই আছেন। চড়াই ভাঙছেন। এই একটু আগে আমি তাঁকে ছেড়ে এসেছি।"

পরমুহূর্তেই বিস্মিত ভগীরথ একা দাঁড়িয়ে রইলেন সেখানে কারণ রঞ্জাবতীর মতো গন্ধরাজও ছুটতে ছুটতে চলে গেলেন নীচের দিকে।

।। বাইশ ।।

গন্ধরাজ দ্রুতবেগে ছুটছিলেন, তাঁর পা দুটো এগোচ্ছিল সবেগে,—কিন্তু তাঁর হৃদয়, যদিও তা প্রথমটা আরও দ্রুতবেগে এগিয়ে গিয়েছিল, ক্রমশ যেন পিছিয়ে পড়তে লাগল। সুরূপিণীর দুর্ভাগ্যে তাঁর বুক ভেঙে যাচ্ছিল, সুরূপিণীকে দেখবার জন্যেও তিনি আকুল হয়ে উঠছিলেন, কিন্তু তবু অতীতের কথা স্মরণ করে, সুরূপিণীর কঠোর অবজ্ঞার কথা ভেবে তিনি যেন মনে জোর পাচ্ছিলেন না। তাঁর আত্মপ্রত্যয় কখনই সুদৃঢ় ছিল না. এখন তা যেন আরও শিথিল হতে লাগল। ভগীরথ শর্মার সব কথা যদি তিনি শেষ পর্যন্ত শুনতেন, অন্তত এটুকু যদি শুনতেন যে সুরূপিণী তাঁকে দেখবার জন্যেই শূলপাণির দিকে আসছেন পায়ে হেঁটে, তাহলে হয়তো তাঁর বুক ভরে উঠত। কিন্তু এখন তাঁর আবার মনে হল হয়তো তিনি তাঁর অবাঞ্ছিত মনোযোগ দিয়ে বিব্রত করে ফেলবেন তাকে, হয়তো এও তার মনে হবে যে তার দুর্ভাগ্যের সুযোগ নিয়ে তাকে অনুকম্পা করতে এসেছেন তিনি, তার দুর্দশার সময় সেই সোহাগের পসরা নিয়ে এসেছেন যা সে তার মহিমার দিনে পদাঘাত করে সরিয়ে দিতে ইতস্তত করেনি। তাঁর আহত অহমিকার ক্ষতগুলো জ্বালা করে উঠল, রাগে তাঁর উদারতার

রংও যেন লাল হয়ে গেল। তিনি ক্ষমা করবেন নিশ্চয়ই, সাহায্যও করবেন, বাঁচাবার চেষ্টা করবেন, সান্ত্বনাও দেবেন সেই স্ত্রীকে যে তাঁকে ভালোবাসে না। সবই তিনি করবেন একটু দূর থেকে, স্ত্রীর ঔদাসীন্যকেও ক্ষমা করবেন তিনি, লোকে অবুঝ শিশুর সরলতাকে যেমন করে। তিনি যখন বাঁকটা ঘুরে সুরূপিণীকে দেখতে পেলেন তখন প্রথমেই তাঁর মনে হল তিনি প্রথমেই তাকে বুঝিয়ে বলবেন যে জোর করে নিজেকে তার উপর চাপিয়ে দিতে আসেননি। হঠাৎ তিনি দাঁড়িয়ে পড়লেন। সুরূপিণী ছুটতে লাগল তাঁকে অপ্রত্যাশিতভাবে এখানে দেখে। কিন্তু গন্ধরাজ দাঁড়িয়ে পড়তেই তিনিও দাঁড়িয়ে পড়লেন। তারপর ভয়ে ভয়ে আস্তে আস্তে উঠে এলেন উপরে। গন্ধরাজের কাছে এসে দাঁড়ালেন।

"গন্ধ, আমি সব নষ্ট করে ফেলেছি। সর্বনাশ হয়ে গেছে।"

"সুরূপিণী"—গন্ধরাজের গলার কাছটা ব্যথা করতে লাগল, তিনি আর নড়তে পারলেন না, সুরূপিণীর বিস্রস্ত মলিন বেশবাশ দেখে, তার ক্লান্ত মুখের দিকে চেয়ে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি। সুরূপিণী যদি চুপ করে থাকতেন তাহলে হয়তো পরমুহূর্তেই আলিঙ্গনাবদ্ধ হতেন তাঁরা। কিন্তু সুরূপিণী চুপ করে রইলেন না। দেখা হলে কি বলবেন তা তিনিও ভেবে এসেছিলেন। তিনি কথা কয়ে উঠলেন। মিলনের মুহূর্তটি হারিয়ে গেল।

"আর কিছু নেই"—সুরূপিণী বলতে লাগলেন—"সব নষ্ট করে ফেলেছি। গন্ধ দয়া করে তুমি আমার কথা শোন— আমি নিজের দোষ ঢাকব না, সব স্বীকার করব। শোন তুমি। আমাকে ওরা কি নিষ্ঠুর পথে ভুলিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। এখন আমি ভেবে দেখছি, ভাববার অনেক সময় পেয়েছি এখন। বুঝতে পারছি আমাকে অন্ধ করে দিয়েছিল ওরা, চোখে ঠুলি পরিয়ে দিয়েছিল। এখন বুঝতে পারছি সব। ভালোকে ত্যাগ করে আলোকে ফেলে আমি অন্ধকারে বাস করেছি এতদিন। কিন্তু স্বপ্ন যখন ভেঙে গেল, যখন বুঝতে পারলাম আমি তোমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছি, যখন ভাবলাম আমি কপিঞ্জলকে"—একটু সামলে আবার বললেন—"যখন আমি ভাবলাম কপিঞ্জলকে মেরে ফেলেছি, তখন—তুমি যা লিখেছিলে তাই হল। আমার আর কেউ রইল না, আমি একা হয়ে পড়লাম।"

কপিঞ্জলের নাম শুনেই গন্ধরাজের মহানুভবতা উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল।

"এসব যদি ঘটেই থাকে, তাহলে কার দোষ সেটা? আমার। তুমি আমাকে ভালোবাস আর না বাস আমার কি উচিত ছিল না তোমার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা? কিন্তু আমি মন গুমরে বরাবর দূরে দূরে কাটিয়েছি, তোমাকে বোঝাবার চেষ্টা না করে পালিয়ে যাওয়াটাই শ্রেয়ঃ মনে করেছি। ভালোবাসার যেটা আসল জিনিস—যুদ্ধ করে ঝগড়া করে নিজের দাবি সাব্যস্ত করা—সেটা আমি শিখিনি। আমি কেবল পালিয়ে বেড়িয়েছি। কিন্তু এইবার তো রাজত্বের প্রহসন শেষ হয়ে গেল, ভেঙে গেল রঙীন পুতুলটা, হয়তো আমার অক্ষমতার জন্যে, কিংবা তোমার ছেলেমানুষির জন্যে—যে জন্যেই হোক, শেষ হয়ে গেছে সব—এখন আমরা দুজনে পথে দাঁড়িয়েছি—স্ত্রী আর পুরুষ এই এখন আমাদের সত্য পরিচয়। আমি তোমাকে মিনতি করছি সুরূপিণী তুমি আমার দুর্বলতাকে ক্ষমা কর, নির্ভর কর আমার ভালবাসার উপর। আমাকে ভুল বুঝো না"—সুরূপিণী কথা কইতে যাচ্ছিলেন হাত তুলে থামিয়ে দিলেন তিনি তাঁকে— "শোন আগে সবটা। আমার ভালোবাসার চেহারা বদলে গেছে। দাম্পত্যের কোনও

প্রসাধন আর তার অঙ্গে নেই। এ ভালোবাসা এখন আর কিছু প্রত্যাশা করে না, কোনও দাবি করে না, প্রতিদানে কিছু চায় না। এতদিন আমার মধ্যে যা তোমার এতো খারাপ লেগেছে তা আর থাকবে না, সে কথা ভুলে যাও তুমি—আজ তোমাকে যা দিচ্ছি তাতে কোনও খাদ নেই, তা ভাইয়ের ভালবাসা, স্বামীর নয়।"

"গন্ধ, আমি জানি তুমি মহৎ। এও জানি তোমার ভালোবাসার আমি উপযুক্ত নই। কিন্তু তুমি যা দিচ্ছ তা আমি নিতে পারব না। তার চেয়ে আমাকে ত্যাগ কর তুমি, আমার কপালে যা হবার তাই হোক। তুমি যাও, আমাকে ছেড়ে চলে যাও তুমি—"

"না। আগে আমাদের ওই ভীমরুলের চাকের কাছ থেকে পালাতে হবে। ওখানে আমিই তোমাকে নিয়ে গিয়েছিলাম। তোমাকে আমি ছেড়ে যেতে পারি না, তোমাকে চিরকাল রক্ষা করব এ অঙ্গীকারের কথা আমি ভুলব কি করে! আমরা গরীব হয়ে গেছি ঠিক, কিন্তু মাথা গোঁজবার একটা জায়গা এখনও আমাদের আছে। এখান থেকে কিছুদূরে গর্জগাঁওয়ের সীমার বাইরে আমার নিজের একটা বাড়ি আছে। চল সেইখানে নিয়ে যাই তোমাকে। মহারাজা গন্ধরাজের পতন হয়েছে, দেখা যাক শিকারী গন্ধরাজ এবার কি করতে পারে। এস। অতীতকে ভুলে যাও, আমার দোষের কথা আর মনে রেখো না। আমাদের নূতন ঘরে নূতন হাসি ফুটিয়ে তোল এবার। তুমি তো কতবার বলেছ মহারাজা আর স্বামী হিসেবে আমি তোমার মনোমত না হলেও মানুষ হিসেবে আমি খুব খারাপ লোক নই। মহারাজা আর স্বামীর রাজত্ব তো শেষ হয়ে গেল। এখন আমি মহারাজাও নই, স্বামীও নই, এবার হয়তো আমাকে তোমার ভালো লাগবে। চল যাই। গর্জনগাঁওয়ের এলাকায় থাকলে ওরা হয়তো আবার আমাদের বন্দী করে ফেলবে। তার চেয়ে চল নিজের ঘরে চলে যাই। তুমি হাঁটতে পারবে কি? পারবে? তাহলে চল—"

গন্ধরাজ পথ দেখিয়ে আগে আগে চললেন।

তাঁরা যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন তার একটু নীচেই একটি পাহাড়ী নদী বইছিল রাস্তার নীচে দিয়ে। রাস্তাটা সেতুর মতো তার উপর দিয়ে চলে গিয়েছিল। এই কলস্বরা নদীর তীর থেকে একটি ছোট পায়ে-চলা পথ নেমে গিয়েছিল নীচের সবুজ উপত্যকায়। পথটা এবড়ো-খেবড়ো, পাথরে ঢাকা, আর বড্ড বেশী ঢালু, তার উপর কাঁটাগাছে ভরতি। খানিকটা পথ অবশ্য সমতল। চারিদিকে পাহাড়ের গা বেয়ে জল ঝরছিল আর সে জল নদীটিতে এসে পড়ছিল বলে নদীটি ক্রমশ স্ফীতকায়া আর বেগবতী হয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে নীচে নেমে একটা বড় জলাশয়ে পড়ছিল অবশেষে। সেখানে থেকে বেরিয়েও নানা বিচিত্র গতিতে নানা আশ্চর্য ছবি সৃষ্টি করতে করতে এগিয়ে চলেছিল সে। পাহাড়ের খানায় খন্দে, পাথরে, কাঁকরে, গহ্বরে গুহায় প্রবেশ করে লুকোচুরি খেলতে খেলতে চলেছিল যেন। দুই তীরে নানা ভঙ্গীতে নানারকম গাছের শোভা, অসংখ্য ফুলের, অসংখ্য লতার, অসংখ্য পতঙ্গ পক্ষীর বিচিত্র দৃশ্য। এরই মধ্যে দিয়ে তীর্থযাত্রীর মতো তাঁরা নীচে নামছিলেন—আগে গন্ধরাজ, আর তাঁর পিছু পিছু সুরূপিণী। যেখানে রাস্তাটা বেশী ঢালু, সেখানে গন্ধরাজ দাঁড়াচ্ছিলেন সুরূপিণীকে হাত ধরে আস্তে আস্তে নামিয়ে দেবার জন্য। লক্ষ্য করছিলেন সুরূপিণীর চোখে নূতন আলো জ্বলছে, যে দৃষ্টি দিয়ে তাঁকে দেখছেন তা যেন আরতির প্রদীপ। তিনি লক্ষ্য করছিলেন কিন্তু

সাহস করে তার মর্মটা উপলব্ধি করতে পারছিলেন না। মনে মনে বলছিলেন—"ও তো আমাকে ভালোবাসে না। এটা হয়তো দুঃখের পরে কৃতজ্ঞতা। আমি যদি ভদ্রলোক হই, সাধারণ মনুষ্যত্ব যদি আমার থাকে তাহলে এ অবস্থায় অন্য কোন চিন্তাই আমার করা উচিত নয়।"

আরও কিছুদূর নেমে দেখা গেল নদীটি আরও বড় হয়েছে, কিন্তু তার গতিকে রোধ করেছে একটি বাঁধ। নদীর স্রোতকে ভুলিয়ে নিয়ে গিয়ে ফেলা হয়েছে একটা কাঠের তৈরী খালে। সেই খালের ভিতর দিয়েই মহানন্দে বয়ে চলেছে নদী, সেই খালের দুপাশও সবুজ হয়ে উঠেছে তার স্নিগ্ধ স্পর্শে। এই খালের ধার দিয়ে দিয়ে পথটিও চলছিল ঝোপঝাড়ের পাশে পাশে। একটু পরেই বাদামী রঙের জল-চালিত কলটি দেখা গেল। তারপরই কলের বড় বড় চাকা আর চাকাকে কেন্দ্র করে মথিত জলরাশির অপূর্ব দৃশ্য। চারিদিকে হীরে ছিটকে পড়ছে যেন। এখানে উপত্যকাটি সংকীর্ণ হয়ে এসেছে। এরপরেই কাঠ চেরার শব্দ পাওয়া গেল। মনে হল করাতরা বুঝি গান গাইছে।

পায়ের ˋব্দ শুনে কলের মালিক কপাট খুলে বেরিয়ে এলেন। তিনি এবং গন্ধরাজ দুজনেই চমকে উঠলেন। টকটকে লাল মুখ, পুরু ঠোঁট লোকটার।

"নমস্কার"—গন্ধরাজ বললেন—"আপনার কথাই ঠিক, আমারই ভুল হয়েছিল। আপনাকে আমিই খবরটা দিচ্ছি, আপনি পার্বতীতে চলে যান। আমি সিংহাসনচ্যুত হয়েছি—, মহা হইচই হয়েছে এ নিয়ে—আপনার বন্ধুরাই এখন রাজত্ব করছেন সেখানে।"

আশ্চর্য হয়ে গেল কলের মালিক।

"আর মহারাজ আপনি—"

"মহারাজ এখন পালাচ্ছেন ভৈরঙ্গীর দিকে—"

"গর্জনগাঁও ছেড়ে? আপনি কি আপনার পিতার পুত্র নন? না, এ হতে পারে না।"

"আপনি কি তাহলে বন্দী করতে চান আমদের?"

"আপনাকে বন্দী করব? আমি? আপনি আমাকে কি মনে করেন! গর্জনগাঁওয়ের একটি লোকও আপনার কেশাগ্র স্পর্শ করবে না। আপনাকে ভালোবাসে না এমন লোক কেউ নেই।"

"অনেক আছে, অনেক আছে"—গন্ধরাজ হাসলেন—"আমি যখন মহারাজা ছিলাম তখন আপনি আমার মুখের উপর অনেক কড়া কড়া কথা শুনিয়েছিলেন। এখন চাকা ঘুরে গেছে, এখন আমার দুঃখের দিনে হয়তো আপনার কাছ থেকেই সাহায্য প্রার্থনা করতে হবে আমাকে—"

কলের মালিকের মুখ আরও লাল হয়ে উঠল।

"আপনি যা খুশি বলতে পারেন। আপনারা দুজন আমার বাড়িতে পায়ের ধুলো দিলে আমি কৃতার্থ হবে। আসুন—"

"না, সময় নেই আমাদের। তবে আপনি আমাদের যদি এখানে একপাত্র করে যাহোকে কিছু খাওয়াতে পারেন তাহলে উপকৃত হব, খুশীও হব—"

আরও লাল হয়ে গেলেন ভদ্রলোক। তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে একটা কলসীতে কিছু সুরা আর তিনটি স্ফটিকের পাত্র নিয়ে এলেন। পাত্রে মদ ঢালতে ঢালতে বললেন—"মহারাজ

যেন মনে করবেন না, আমি রোজ মদ খাই। আপনার সঙ্গে সেবার যেদিন হঠাৎ দেখা হয়ে গিয়েছিল সেদিন অবশ্য মাত্রা একটু বেশী হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সাধারণত আমি বেশী খাই না, বিশ্বাস করুন এটা। আপনাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবার জন্যেই এখন খাচ্ছি একটু—"

পাহাড়ী ভব্যতার রীতি অনুযায়ী সসম্ভ্রমে মদের পাত্রে চুমুক দিলেন তাঁরা। গন্ধরাজ আর থাকতে চাইলেন না। উপত্যকার ঢালু রাস্তা বেয়ে আবার নামতে শুরু করলেন তাঁরা। সংকীণ উপত্যকা বিস্তৃত হল ক্রমশ, দীর্ঘ তরুশ্রেণী আবার দেখা দিল।

"ভদ্রলোকের সঙ্গে অন্যায় ব্যবহার করেছিলাম আমি"— গন্ধরাজ বললেন—"ওঁর সঙ্গে কিছুদিন আগে যখন দেখা হয়েছিল তখন একটু অপমানই করেছিলাম ওঁকে। দোষটা আমারই ছিল হয়তো। কিন্তু মনে হচ্ছে নিজেকে নত করে শেষ পর্যন্ত কোনও লাভ হয় কি?"

সুরূপিণী উত্তর দিলেন—"কিন্তু সে শিক্ষাটা প্রয়োজন।"

"তা বটে তা বটে"—গন্ধরাজ একটু বিব্রত বোধ করলেন—"তা বটে। কিন্তু এখন আমাদের নিরাপদ হওয়া প্রয়োজন। ওই কলের মালিকটি ভদ্রলোক, কিন্তু ওঁর উপর ঠিক বিশ্বাস স্থাপন করতে পারছি না, উনি গণতন্ত্রের পাণ্ডা একজন। এই নদীর ধার দিয়ে দিয়ে যদি আমরা আরও এগিয়ে যাই—নদীটা অবশ্য অনেক এঁকেবেঁকে গেছে—কিন্তু এর ধার দিয়ে দিয়ে গেলেই আমরা স্বস্থানে পৌঁছে যাব। এই উপত্যকার উপরের দিকে একটা লম্বালম্বি খালের মতো আছে। সেটা পার হলেই, ব্যাস্—নিথর নির্জনতা। হরিণরা পর্যন্ত সেখানে যেতে ভয় পায়। তোমার ক্লান্ত লাগছে না তো, অতদূর যেতে পারবে এখন?"

"পথটা দেখাও, আমি ঠিক পারব।"

কথাটা শুনে অপ্রতিভ হয়ে পড়লেন গন্ধরাজ।

"না। আমি বলছিলাম পথটা বড্ড উঁচুনীচু, ওই ছোট ছোট উপত্যকার ভিতর দিয়ে দিয়ে। মাঝে মাঝে গর্তও আছে, গর্তের ভিতর কাঁটার জঙ্গল—"

"চল না তুমি। তুমি শিকারী না?"

ঝোপঝাড় পেরিয়ে আবার হাঁটতে লাগলেন তাঁরা। একটু পরেই সবুজ নির্জন মাঠের মতো জায়গায় এসে পড়লেন। চমৎকার জায়গাটি। লম্বা লম্বা গাছ দিয়ে ঘেরা। গন্ধরাজ দাঁড়িয়ে পড়লেন, দেখতে লাগলেন চারিদিক চেয়ে চেয়ে, আনন্দে পূর্ণ হয়ে উঠল মনটা। তারপর ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন সুরূপিণীও দাঁড়িয়ে পড়েছেন। তিনিও চেয়ে দেখছেন গন্ধরাজের দিকে। আরণ্য পটভূমিকায় কি যে চমৎকার দেখাচ্ছে, কি যে রহস্যময় ভাষা ফুটেছে চোখ দুটিতে। মানসিক এবং দৈহিক দুর্বলতায় সর্বাঙ্গ যেন অবশ হয়ে এল গন্ধরাজের, মনে হল এইখানেই হাত পা ছড়িয়ে বসলে কেমন হয়। নির্নিমেষে চেয়ে রইলেন তিনি সুরূপিণীর দিকে।

"এস, এখানে একটু জিরিয়ে নেওয়া যাক"—একটা ছোট্ট ঢিপির পাশে সুরূপিণীর হাত ধরে জোর করে বসিয়ে দিলেন। নিজেও বসলেন।

সুরূপিণীর চোখের দৃষ্টি আনত হল, তিনি ঘাড় ফিরিয়ে ঘাস ছিঁড়তে লাগলেন, উৎকর্ণ হয়ে রইলেন প্রেমের ডাক এইবার আসবে কি? বনে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছিল বাতাস মাতালের মতো, কখনও কাছে আসছিল, কখনও দূরে সরে যাচ্ছিল। কাছের একটা ঝোপ থেকে ভেসে এল একটা সচকিত পাখির ত্রস্ত ডাক। কি যেন একটা হবে, তারই প্রস্তুতি যেন

চারিদিকে। গন্ধরাজের মনে হল তিনি এবার কি বলবেন তাই শোনবার জন্যে সমস্ত প্রকৃতি যেন অপেক্ষা করছে। কিন্তু তবু আত্মসম্মান যেন তাঁর মুখ চেপে রইল। যতই তিনি সুরূপিণীকে—ছিন্নলতার মতো বিস্রস্তা বিবর্ণা ওই মেয়েটিকে দেখতে লাগলেন—ততই যেন তাঁর পক্ষে কথা বলা ক্রমশ শক্ত হয়ে উঠতে লাগল। তাঁর আত্মসম্মান, তাঁর অহঙ্কারের সঙ্গে মনের নেপথ্যে নীরবে লড়তে লাগল ওই অসহায় মেয়েটাই।

"সুরূপিণী—" অবশেষে কথা ফুটল গন্ধরাজের মুখে। একটু ইতস্তত করে ঢোঁক গিলে বললেন—"সুরূপিণী, আমি তোমাকে"—বলতে যাচ্ছিলেন, 'কখনও সন্দেহ করিনি'। কিন্তু সেটা কি সত্যি কথা? আর সত্যি হলেও সেটা কি এখন বলা উচিত? আবার নীরব হয়ে গেলেন।

"বল, কি বলছিলে। থেমে গেলে কেন।"

"বলছিলাম, আমি সব বুঝতে পেরেছি, বুঝতে পেরেছি তোমার কোনও দোষ নেই। বুঝতে পেরেছি আমার মতো দুর্বল লোকের প্রতি তোমার মতো সবলার আচরণ এই রকম হওয়াই স্বাভাবিক। কোন কোন ব্যাপারে তোমার হয়তো ভুল হয়েছিল, কিন্তু কেন হয়েছিল, তা-ও আমি বুঝতে চেষ্টা করেছি। বুঝেওছি। আমার আর ক্ষমা করবার কিছু নেই, আমি সব বুঝতে পেরেছি।"

"আমি জানি আমি কি করেছি"—সুরূপিণী উত্তর দিলেন—"আমি এত নির্বোধ নই যে কথায় আমি ভুলে যাব। আমি কি করেছি, কি ছিলাম তা আমি স্পষ্ট জানি। তোমার রাগের উপযুক্ত আমি নই, ক্ষমার তো নইই। এই পতন আর দুর্দশার অন্ধকারে আমি কেবল আমাকে দেখতে পাচ্ছি আর তোমাকে। তুমি চিরকাল যেমন ছিলে সেই তোমাকে, আর আমি যেমন ছিলাম সেই আমাকে। আমি আমাকেই দেখছি কেবল, আর কিছু ভাবতে পারছি না।"

"তাহলে এস আমাদের ভূমিকা বদলে ফেলি"—গন্ধরাজ বললেন—"অপরকে যখন আমরা ক্ষমা করতে পারি না তখন আসলে আমরা নিজেদেরই ক্ষমা করতে পারি না—কাল রাত্রে একজন বন্ধু বলেছিলেন আমাকে। তাঁর কথা শুনে আমি নিজেকেও ক্ষমা করেছি আমার শতদোষ থাকা সত্ত্বেও। কিন্তু তুমি কি আমাকে ক্ষমা করবে না? তুমি নিজেকেও ক্ষমা কর, আমাকেও।"

সুরূপিণী কোন উত্তর দিলেন না, হাতটা বাড়িয়ে দিলেন কেবল।

গন্ধরাজের মুঠোর মধ্যে ভীরু আঙুলগুলো কাঁপতে লাগল। অদৃশ্য স্রোতে ভাষাহীন আকুতি মূর্ত হয়ে উঠল দুজনের মধ্যে।

"সুরূপিণী, অতীতকে ভুলে যাও একেবারে। আমি তোমাকে এখন সেবা করি, সাহায্য করি। মীরা বলেছিলেন তাঁর প্রিয়তমকে—ম্যঁয় নে চাকর রাখো জি। তুমিও আমাকে তোমার চাকর করে রাখ। তোমার কাছে থেকে তোমাকে সেবা করতে পেলেই আমি কৃতার্থ হয়ে যাব। আমাকে তাড়িয়ে দিও না। তোমার ভালোবাসা আমি নাই বা পেলাম, আমার একার ভালোবাসাই যথেষ্ট—"

"গন্ধ......."

সুরূপিণী আর কিছু বলতে পারলেন না। গন্ধরাজ তাঁর মুখের দিকে চেয়ে দেখলেন—

আনন্দে, ভালোবাসায়, বেদনায় তা যেন বিগলিত হয়ে যাচ্ছে। তাঁর সর্বাঙ্গ, বিশেষ করে চোখের দৃষ্টিতে যে মহিমা ফুটে উঠেছে তা প্রেমের মহিমা।

"সুরূপিণী"—হঠাৎ জোরে চেঁচিয়ে উঠলেন গন্ধরাজ। তার পর অন্য সুরে বললেন—"সুরূপিণী? সুরু—"

"চারিদিকে চেয়ে দেখ, প্রতিটি গাছে নতুন পাতা বেরিয়েছে, নতুন ফুল ফুটেছে। এইখানেই আমাদের দেখা হল, প্রথম দেখা হল, সব ভুলে গিয়ে নতুন জগতে জন্মালাম আমরা। পাপের আবর্জনা ছুঁড়ে ফেলে দিলাম বিস্মৃতির গহ্বরে ভগবানের পদপ্রান্তে—"

"তাই হোক সুরূপিণী। দুঃস্বপ্নের মতো মিলিয়ে যাক বিগত জীবনটা। আবার নতুন করে শুরু করি, অচেনার মতো। আমি এতকাল স্বপ্ন দেখেছি—দীর্ঘ একটা স্বপ্ন, যেন আমি এক রূপসী নিষ্ঠুরা মেয়েকে পুজো করছি, সে সব বিষয়ে আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ, কিন্তু বরফের মতো কঠিন আর ঠাণ্ডা সে। তারপরও আমি স্বপ্ন দেখেছি, তারপরও ভেবেছি—বরফ গলছে, সে বদলাচ্ছে, অরুণ কিরণ এসে পড়েছে তার উপর, সে তার উজ্জ্বল দৃষ্টি যেন আমার দিকে ফিরিয়েছে। কিন্তু আমি তো অযোগ্য—ভালোবাসা ছাড়া আর তো আমার কিছু নেই—সাষ্টাঙ্গ-প্রণত প্রেমই আমার একমাত্র সম্বল—তাই আমি ভয়ে নড়িনি, পাছে স্বপ্নটা ভেঙে যায়—"

"আমার আরও কাছে ঘেঁষে এস—"

সুরূপিণীর কণ্ঠস্বরে কাঁপন লাগল, বীণার মূর্ছনার মতো শোনাল তা। বনভূমিতে বসন্তের সমারোহ শুরু হয়েছে।

পার্বতীতেও ঠিক সেই সময় নতুন গণতন্ত্রের প্রথম বৈঠক বসল।*

*আর এল স্টিভেন্‌সন প্রণীত 'প্রিন্স অটো' নামক উপন্যাসের ভাবানুবাদ।



নবীন দত্ত

।। এক ।।

আকাশ-পাতাল ভাবছিলেন নবীন দত্ত। নামে নবীন হলেও বয়সে প্রবীণ। বয়স সত্তর পেরিয়ে গেছে। সমস্ত মুখে খোঁচা খোঁচা পাকা দাড়ি। অর্থাভাবে ব্লেড কেনা হয় নি। গায়ের গেঞ্জিটা শতছিদ্র। পরনে কালো রঙের মাদ্রাজি লুঙ্গি। কালো রঙের লুঙ্গিই আজকাল কেনেন, কারণ ময়লা হলেও দিন আষ্টেক দশ বেশ পরা যায়, সাবান দেবার দরকার হয় না। হাতের ও পায়ের নখগুলিও বড় বড়। নিজেই ছুরি দিয়ে কেটে নেন। কয়েকদিন থেকে ছুরিটি খুঁজে পাচ্ছেনা না। সন্দেহ হচ্ছে তাঁর বড় দৌহিত্র প্রতাপ সেটি গাপ করেছে। ছুরিটি সেকালের রজার্সের ছুরি। আজকাল যে সব ছুরি পাওয়া যায় তাতে কিছু কাটা যায় না। প্রতাপ কলেজে পড়ে, সেদিন এসেছিল, ছুরিটার ওপর তার অনেক দিন থেকেই লোভ। চেয়েও ছিল একবার, তিনি দেন নি। এবার চুরি করেছে। এম.এ পড়ছে, কিন্তু চোর। পরীক্ষাও হয়তো চুরি করে পাশ করে। কিন্তু এ নিয়ে নবীন দত্ত আধঘন্টার বেশী মাথা ঘামান নি। কোনও বিষয় নিয়েই তিনি বেশীক্ষণ মাথা ঘামান না। কারণ মাথা ঘামাবার বিষয় অসংখ্য। কত মাথা ঘামাবেন? নির্বিকার হতে চেষ্টা করেন। সব সময়ে কিন্তু পারেন না। একটা লাট্টু মনের মধ্যে হরদম ঘুরছে বন বন করে--অর্থাভাব। পেনসনটি আছে অবশ্য ---মাসে মাত্র দেড়শ টাকা। সেটিও আদায় করতে প্রতি মাসেই নাস্তানাবুদ হতে হয়। আর একটি সম্বল আছে একতলার বাড়ি ভাড়া। রিটায়ার করার পর যথাসর্বস্ব খরচ করে— মানে, দেশের সব বিষয়সম্পত্তি বেচে, এক কাঠা জমির উপর চোঙ্ মার্কা এক চারতলা বাড়ি করেছিলেন। একতলায় একজন ভাড়াটে আছে। দোতলায় বড় ছেলের বিধবা বউ দুই মেয়েকে নিয়ে থাকে। তেতলায় থাকেন তাঁর গৃহিণী তাঁর বিধবা শুদ্ধাচারিণী মাকে নিয়ে। চারতলায় থাকে তাঁর ছোট ছেলে। ভাল নাম অহঙ্কার, ডাক নাম দুম্। দুমকায় জন্মেছিল বলে সবাই তাকে দুমকা বলে ডাকত ছেলেবেলায়। সেইটেরই সংক্ষিপ্ত সংস্করণ দুম্। দুম্ বিয়ে করে নি। কিন্তু সে একাই একশ। তার এই চারতলায় দুখানা ঘরে তার শোবার বিছানা, বিছানার চারদিকে বই, একদিকে রেডিও, আর একদিকে জামাকাপড়, আর একদিকে ছবি আঁকবার ইজেল, রঙের বাক্স, তুলি আর এক দিকে ফোটো তোলবার ক্যামেরা। আর একটা ঘরে কেবল ছবি, স্বদেশের বিদেশের নানারকম ছবি। কিছু দেওয়ালে টাঙানো, কিছু মেঝেতে স্তূপীকৃত। বাথরুমে একটা টেবিল আর একটা টুল। টেবিলের উপর আপিসের ফাইল। সেইখানে বসেই আপিসের কাজ করে রাত্রে। দুম্ কখন বাড়িতে থাকে, কখন থাকে না, কেউ বলতে পারে না। দিনে প্রায়ই থাকে না। বাড়িতে খায় না, হোটেলে খায়। রাত্রে ফিরেই ঘরে খিল দিয়ে কাজ করে। কখনও ছবি আঁকে কখনও পড়ে, কখনও আপিসের ফাইল ক্লিয়ার করে। সে যখন, এম, এস. সিতে রসায়ন শাস্ত্রে ফার্স্ট ক্লাস পেল তখন নবীন দত্তই তাকে চিঠি দিয়ে পাঠিয়েছিলেন তাঁর পূর্বতন এক বন্ধু মার্লো সাহেবের কাছে। মার্লো

সাহেবই তাকে জার্মানীর এক ব্যবসায়ী ফার্মে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। মাইনে বোধহয় ভালই পায়— ঠিক কত তা নবীন দত্ত জানেন না, জিজ্ঞেসও করেন নি। কিন্তু সে প্রথম মাইনে পেয়েই শ' দুই টাকা নবীন দত্তকে এনে দিয়েছিল। নবীন দত্ত বলেছিলেন—এখন আমার দরকার নেই। তুমি টাকা ব্যাংকে রেখে দাও, যখন দরকার হবে নেব। কিন্তু আজ পর্যন্ত নেন নি। এক তলা ভাড়া দিয়ে মাসে শ' দুই টাকা পান। তাছাড়া নিজে টিউশনিও করেন দু' জায়গায়। এককালে ভালো প্রফেসার ছিলেন। এককালে অনেক কিছুই ছিলেন তিনি। গায়ক, লেখক, বিপ্লবী, রাজনৈতিক, কাগজের সম্পাদক— অনেক কাজই করেছেন তিনি জীবনে। এখন চারতলা বাড়িটার চিলেকোঠায় একা থাকেন। দিনে স্বপাকে খান। চাল, কিছু তবকারি আর দুধ এক সঙ্গে সিদ্ধ করে সেইটে খান বেলা দেড়টা দুটোর সময়। রাতে আর কিছু খান না। টিউশনি করে ফেরেন রাত দশটায়, এসেই শুয়ে পড়েন ছাতে। শীত গ্রীষ্ম আকাশের তলাতেই শুয়ে থাকেন। বৃষ্টি পড়লে অবশ্য ঘরে ঢুকতে হয়। দশটাব সময এসে শুয়ে পড়েন বটে, কিন্তু ঘুম হয় না। বিছানায় শুয়ে এপাশ ওপাশ করেন রাত বারোটা পর্যন্ত। তাঁর বড় ছেলে অলঙ্কার কৃতবিদ্য হয়েছিল, ভালো চাকরিও পেয়েছিল। দুটি মেয়ে হয়েছিল তাব। বড়টি দশ বছরের এখন, ছোটটি আট বছরের। হঠাৎ মারা গেল অলঙ্কাব করোনাবি অসুখে। মেয়ে দুটির পড়াশোনার খরচ আছে, তারপর বিয়ে। না, ঘম আসে না নবীন দত্তের চোখে। তিনি এপাশ ওপাশ করেন। ঘুমের জন্য একটা ট্যাবলেট তাঁর এক ডাক্তাব ছাত্র ব্যবস্থা করেছিল। খেয়েছিলেন কদিন। তবু ঘুম হয় না। এখন আর খান না।

তাঁর বড় বৌমা সাবিত্রী বি. এ. পাশ। একটা আপিসে চাকরি নিয়েছিল। বাড়ি থেকে বেশ কিছুদূর হেঁটে 'বাস' ধরতে হত । রূপসী সে—এই তার অপরাধ। একদল অসভ্য ছোঁড়া তার পিছনে লাগল। হাত ধরে টানলও একদিন। চীৎকার করা সত্ত্বেও কেউ এসে বর্বরগুলোকে শাস্তি দিলে না। ভীড় জমে গেল, কিন্তু ভীড়ের ভিতর থেকে কেউ এগিযে এসে প্রতিবাদ করল না এর। মজা দেখতে লাগল কেবল। সাবিত্রী তার পর থেকে ঘবে বসে আছে। বর্বর দেশে ভদ্রলোকের বাস করা মুশকিল। কিন্তু তবু বাস করতে হবে। সাবিত্রী দুশো টাকা মাইনে পেত তার মেয়েদের পড়াশোনার সব খবচ চালাতে পারত— কিন্তু তা আর হল না। অপমানিত হওয়া সত্ত্বেও সাবিত্রী আবার সেই আপিসে যেতে চেযেছিল কিন্তু নবীন দত্ত আর যেতে দেন নি। বলেছিলেন, এই অসভ্য দেশে সভ্য কিছু করা যায় না। তুমি বাড়িতেই থাকো, মেয়ে দুটিকে মানুষ কর। আমি যতদিন বেঁচে আছি খরচ চালিয়ে যাব। টিউশনি করে যে দুশো টাকা পান তা সাবিত্রীকেই দিয়ে দেন। বাকি থাকে সাড়ে তিনশো টাকা। তার থেকে পঁচিশ টাকা পাঠাতে হয় তাঁর কাশীবাসিনী মাকে, জোর করে কাশী চলে গেছেন মা। বার্ধক্যে তীর্থবাস করাই কর্তব্য মনে করেন। নবীন দত্ত তাঁকে বাধা দেন নি। দশ টাকা পাঠাতে হয় তাঁর এক গরীব আত্মীয়াকে, পঞ্চাশ টাকা দিতে হয় তাঁর এক ভাগ্নেকে, সে লক্ষ্ণৌ শহরে বি. এ. পড়ে। তাঁর একমাত্র বোন কালীর বিয়ে হয়েছিল লক্ষ্ণৌ শহরের প্রবাসী বাঙালী শিবসেবকের সঙ্গে। কালীর পুত্রটি খুব শৈশবে কিছুদিন ছিল নবীন দত্তের কাছে। বহুকাল আগে। শিবসেবকের একটা কাপড়ের দোকান ছিল আর ছিল একটি দজ্জাল বিধবা

ভগ্নী। নাম বিশাখা। কালীর ছেলে দেবনাথকে সেই মানুষ করেছিল। দেবনাথ যে বছর আই. এ. পাশ করল সেই বছরই শিবসেবক মারা গেলেন। অনেক দিন থেকে ভুগছিলেন তিনি। চিকিৎসা করাতেন না। বিশাখার প্রতাপে কোন ডাক্তারই না কি তাঁর বাড়িতে আসত না। দু'দিন জ্বর না ছাড়লেই বিশাখা ডাক্তারকে তেড়ে যেত। জ্বর কমাতে পার না অথচ ফি নিয়ে যাচ্ছ! টাকা কি খোলামকুচি না কি! শিবসেবকের যক্ষ্মা হয়েছিল। শিবসেবক মারা যাওয়ার পর বিশাখা একদিন দেবনাথকে নিয়ে হাজির হল নবীন দত্তের কাছে। বলল—তোমাদের ছেলে তোমাদের কাছে দিয়ে গেলাম। এর ভার বইবার সামর্থ্য আমার নেই। আমি আমাদের পৈতৃক বাড়ির অর্ধেকটা ভাড়া দিয়ে নিজের খরচ চালিয়ে নেব। কিন্তু ওর পড়ার খরচ, খাওয়ার খরচ তাতে চলবে না। বাড়ির অর্ধেকটা ভাড়া দিলে বড় জোর পনেরো কুড়ি টাকা পাব। নবীন দত্ত বললেন—কত টাকা হলে ওখানে তোমাদের চলে? বিশাখা বললে—ওকে যদি কলেজে পড়াতে চান তাহলে টাকা পঞ্চাশেক লাগবে। দেবনাথও তাই বললে—হ্যাঁ, ওর কমে চলবে না। দেবনাথ ভালো ছেলে। ফার্স্ট ডিভিসনে আই. এ. পাশ করেছে। নবীন দত্ত বললেন—বেশ তোমরা লক্ষ্ণৌতেই ফিরে যাও। আমি প্রতি মাসে পঞ্চাশ টাকা করে দেব। সেই থেকে দিয়ে যাচ্ছেন। অলঙ্কার যতদিন বেঁচে ছিল ততদিন কষ্ট হয়নি। এখন কষ্ট হচ্ছে, কারণ সাবিত্রীকে দুশো টাকা দিতে হচ্ছে মাসে মাসে। সে ওইতেই নিজেদের খরচ চালিয়ে নেয়। নিজের আর মেয়ে দুটির জন্যে আলাদা রান্না করে তাদের স্কুলে ভরতি করেছে, ওই থেকে তাদের কাপড়-জামাও কিনে নেয়। শৌখিন কাপড় আর কেনা হয় না। মোটা সাধারণ জামা কাপড় পরে। আর একটা মুশকিল হয়েছে তাঁর শাশুড়ীকে নিয়ে। শ্যালক দুটিকে যে কোন লোক যদি শালা বলে খুব একটা অন্যায় হয় না। দুটিই মূর্খ শযতান। বউগুলিও জুটেছে তেমনি। মায়ের সেবাযত্ন করে না এবং কেন করে না তার দীর্ঘ জবাবদিহি আওড়ায়। নবীন দত্ত শাশুড়ীকে নিজের কাছে এনে রেখেছেন। নবীন দত্তের স্ত্রী পারুলবালা মাকে নিয়েই থাকেন। তাঁর জন্যে রান্না করেন, তাঁর সর্বাঙ্গে তেল মালিশ করেন, তাঁর কাপড় আর বিছানা কাচেন রোজ। কারণ, বৃদ্ধা মা রোজই প্রায় বিছানায় মলমূত্রে মাখামাখি হয়ে পড়ে থাকেন। ওঠবার সামর্থ্য নেই চোখের দৃষ্টি কমে গেছে। চিঁচিঁ করে কি যে বলেন বোঝা যায় না। কানেও বোধহয় কম শোনেন। কিছু বললে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকেন, কোনও উত্তর দেন না। মাঝে মাঝে কপালে হাত ঠেকান খালি। চোখ দিয়ে জল পড়ে অনবরত। মাকে নিয়েই পারুলবালা সব সময় ব্যস্ত। নবীন দত্ত তাই স্বপাক খান। শাশুড়ীর জন্য নবীন দত্তের মাসে প্রায় শ' দেড়েক টাকা খরচ হয়। রোজ আপাদমস্তক সরষের তেল মালিশ করতে হয়। সরষের তেল আজকাল দুর্মূল্য। কাপড় বিছানা কাচতে সাবানও অনেক লাগে। তাছাড়া সরু আলোচাল কিনতে হয়। দুধও লাগে প্রায় সেরখানেক করে। পারুলবালা মায়ের জন্যে রাঁধেন, নিজেও ওইখানে খেয়ে নেন। তিনি এককালে মাছ ছাড়া ভাত খেতে পারতেন না। এখন কটা বাঙালীই বা মাছ খেতে পায়? বহুদিন বাড়িতে মাছ ঢোকে না। আলু ভাতে, ডাল ভাতে দিয়েই ভাতটা খেয়ে নেন পারুলবালা। ওর সঙ্গে একটু ঘি থাকলে ভালো লাগত। কিন্তু ঘি কেনবার পয়সা কোথায়। পারুলবালার মা-ও বড়লোকের মেয়ে ছিলেন,

পারুলবালার বাবাও বড় চাকরি করতেন, সুতরাং দুধ ঘি মাছমাংসের অভাব ছিল না কোন দিন। এখন মাকে গলা গলা সিদ্ধ ভাতে ভাত খাওয়ান পারুলবালা। দুধটা একটু ঘন করে না দিলে মা খেতে পারেন না, তাই দুধটা ঘন করেই দেন, কিন্তু মুশকিল হয়েছে ঘন দুধ পেটে সহ্য হচ্ছে না। অথচ মা পাতলা দুধ কিছুতেই খেতে চান না। সংসারের সব খরচ মিটিয়ে নবীন দত্তের হাতে একশ' পঁযষট্টি টাকা থাকে। কিন্তু তা ও থাকে না শেষ পর্যন্ত। মেয়ের বিয়ের সময় বাড়ি বাঁধা দিয়ে যে টাকা ধার করেছিলেন তা এখনও শোধ হয় নি। প্রতি মাসে পঞ্চাশ টাকা করে দিয়ে যাচ্ছেন। এ ঋণ তাঁর জীবনকালে শোধ হবে না বোধহয়। বাড়িটা শেষে বিক্রি হয়ে যাবে। তা ছাড়া বাড়ির ট্যাক্স আছে। সে-ও প্রায় মাসে পঁচিশ টাকা করে। অলঙ্কার যখন বেঁচে ছিল তখন বাড়িতে ইলেকট্রিক আলো জ্বলত। অলঙ্কার মারা যাবার পর তিনি ইলেকট্রিক আলো বন্ধ করে ঘরে ঘরে আবার প্রদীপ আর লণ্ঠন চালু করেছিলেন। কিন্তু দুম চাকরি পাবার পর আবার ইলেকট্রিক কানেকশন নিয়েছে। ইলেকট্রিক বিল সে ই দেয়। কারণ তার ইলেকট্রিক চাই। হাই পাওয়ারের বালব জ্বালিয়ে ছবি আঁকে। সব খরচ মিটিয়ে নবীন দত্তের কাছে একশ টাকাও থাকে না। তার থেকেও মাঝে মাঝে তিনি পুরোনো বইয়ের দোকান থেকে বই কেনেন। দুই নাতনীর জন্য টুকিটাকি জিনিস কেনেন। কখনও লজেন্স, কখনও ডালমুট, কখনও সন্দেশ। সব দিন পারেন না, মাঝে মাঝে কেনেন। তাঁর নিজের জন্য খরচ হয় দৈনিক প্রায় আড়াই টাকা। দুধ, চাল, তরিতরকারি কিনতেই দু টাকার মতো খরচ হয়। মাসের শেষে হাতে বিশেষ কিছু থাকে না। সবাই নিজের কাজ নিজেই করে নেয়, ঝি চাকর রাখবার সামর্থ্য নেই। তবু কিন্তু মুখপুড়ি রোজ আসে একবার। নবীন দত্তের যখন সচ্ছল অবস্থা ছিল তখন মুখপুড়ি ঝি ছিল তাঁদের বাড়িতে। তখন যৌবন ছিল আদর্শবাদী নবীন দত্তকে ভক্তি করত সে। হয়তো ভালোও বাসত মনে মনে। দেখতে কুৎসিত মেয়েটা। নাম জিগ্যেস করাতে বলেছিল আমার নাম মুখপুড়ি। বলে হেসেছিল মুখে কাপড় দিয়ে। এসব অনেক দিন আগেকার কথা। মুখপুড়ি এখন প্রৌঢ়া হয়েছে। এখন সে ঝি গিরি করে না। তার ছেলে কোন কারখানায় ভালো কাজ করে। মাকে আর এখন ঝি-গিরি করতে দেয় না। মুখপুড়ি কিন্তু নবীন দত্তের বাড়িতে আসে রোজ একবার করে। কখনও কাপড় কেচে দেয়, কখনও আবার বাসন মেজে দেয়। নবীন দত্তের চিলেকোঠায় উঠতে সাহস পায় না। কখনও পারুলের ঘরে, কখনও সাবিত্রীর ঘরে বসে গল্প করে । নবীন দত্ত বাড়িতেও থাকেন না প্রায়। যেদিন থাকেন সেদিন মুখপুড়ি যাবার আগে তাঁকে ভক্তিভরে প্রণাম করে যায় গলায় আঁচল দিয়ে খোলা দ্বারের সামনে। ভিতরে ঢুকতে সাহস পায় না। নবীন দত্ত তন্ময় হয়ে থাকেন নিজের লেখা নিয়ে। নবীন দত্ত নিজের নিদারুণ হতাশাটাকে ঠেকিয়ে রাখেন লেখা দিয়ে। কিছু নিয়ে তন্ময় হয়ে থাকতে চান তিনি। মুখপুড়ি যখন এসে প্রণাম করে তখন লেখা থেকে মুখ তুলে তার দিকে চান। বলেন—মুখপুড়ি ভালো আছিস? মুখপুড়ি কোনও উত্তর দেয় না, ঘাড় হেঁট করে চলে যায়। আবার লেখায় মন দেন নবীন দত্ত। একদিন মুখপুড়ি চলে যাবার খানিকক্ষণ পরে নবীন দত্ত লক্ষ্য করলেন একখানা নোট উড়ে বেড়াচ্ছে তাঁর ঘরের সামনে। উঠে গিয়ে দেখলেন দশ টাকার নোট একখানা। কোথা থেকে এল এটা? তাঁর

নিজের টাকাকড়ি তো বাক্সে থাকে। এ নোটটা কোথা থেকে এল বুঝতে পারলেন না। তারপর তাঁর হঠাৎ মনে হল মুখপুড়ি এসেছিল সেই ফেলে যায় নি তো? আলাদা করে রেখে দিলেন সেটা। তার পর দিনই তাঁর বড় নাতনী রেবতী একটি রেকাবিতে করে চারটি সন্দেশ, আর তাঁর ছোট নাতনী পার্বতী একটি নতুন কাপড় নিয়ে হাজির হল।

''তোমাব আজ জন্মদিন না কি দাদু? পিসিমা তোমার জন্যে তাই এসব নিয়ে এসেছে—''

'পিসিমা মানে? মুখপুড়ি?'

'হ্যাঁ। পিসিমা তো রোজ আসে। কাল দিদার কাছে শুনল যে আগে তোমার প্রতি বছর জন্মদিনে না কি ভারি ধুম হত। অনেকদিন আগে সেটা বন্ধ হয়ে গেছে। পিসিমা বলল, এখন বন্ধ হয়ে গেছে না কি? আমি যখন ছিলাম তখনও তো হয়েছে। উনি ভীম নাগের সন্দেশ খেতে ভালবাসতেন বলে ভীম নাগের সন্দেশ আনানো হত। আমিও তো খেয়েছি। দিদা বললে, আজকাল আর হয় না, পয়সায় কুলোয় না। অলু চলে যাওয়ার পর আর কিছু হয় না। তাই পিসিমা আজ তোমার জন্যে কাপড় আর ভীম নাগের সন্দেশ এনেছে। আমাদেব জন্যেও এনেছে একটা করে।''

নবীন দত্তের মনের ভাব যা হল তা অবর্ণনীয়। কিন্তু সে ভাব তিনি প্রকাশ করলেন না। একটা সন্দেশ তুলে খেলেন। আর কাপড়টা রেখে দিলেন কোণের দিকে আলনায়। কোণের দিকে দড়ির একটা আলনাতে তাঁর জামাকাপড় থাকে। তারপর তিনি বললেন—-মুখপুড়িকে পাঠিয়ে দে। রেবতী পার্বতী চলে গেল ছুটে? একটু পরে মুখপুড়ি এসে দাঁড়াল।

'তুমি সেদিন আমার ঘরের সামনে একটা দশ টাকার নোট ফেলে গেছ। টাকাকড়ি অমন অসাবধানে রাখো কেন? ভাগ্যে আমি দেখতে পেয়েছিলাম, উড়ে বেড়াচ্ছিল নোটটা। এই নাও। আর এই পাঁচটা টাকাও নাও, আমার জন্মদিনে আশীর্বাদ করলাম তোমাকে।'

মুখপুড়ির একবার ইচ্ছা হল বলে, আমি ও টাকাটা আপনাকে প্রণামী স্বরূপই দিয়েছিলাম। কিন্তু সাহস করে আপনার হাতে দিতে পারি নি। কিন্তু সে কিছুই বলতে পারল না, ঘাড় হেঁট করে দাঁড়িয়ে রইল। নবীন দত্তের হাত থেকে টাকাটা নিয়ে আর একবার ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করল, তারপর চলে গেল। নবীন দত্ত চুপ করে বসে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর তাঁর জাবদা খাতাটা বার করে লিখলেন।

'মুখপুড়ি ইজ গ্রেট! মহীয়সী নারী। ও লেখাপড়া জানে না। ওর বংশপরিচয়ও সাধারণ। যতদূর জানি ওর বাবার উপাধি ঘোয। কায়স্থ হতে পারে, গয়লাও হতে পারে। কিন্তু ওর মহত্ত্ব এত বেশী যে ও অনায়াসে জাতিকলের গণ্ডী পেরিয়ে গিয়ে স্বমহিমায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। আর সে সম্বন্ধে ও সচেতন নয়, তা নিয়ে আস্ফালন করে না কখনও। সেজন্য আরও গ্রেট। আমাদের সমাজে আস্ফালন প্রিয় অনেক নর-নারীর সঙ্গে দেখা হয় প্রত্যহ। তার কথায় কথায় বার বার আত্মমহিমা প্রচার করে। মুখপুড়ি তাদের মতো ধনী নয়, তাদের মতো ডিগ্রিধারী নয়, তাদের মতো উচ্চপদাধিকারী নয়। তবু ও তাদের চেয়ে অনেক বড়। সেদিন ও দশটা টাকা আমাকে দেবে বলেই এনেছিল, কিন্তু সাহস করে দিতে পারে নি। তাই দুয়ারের সামনে রেখে গিয়েছিল। আজ যখন আমি ফেরত দিলাম তখনও ও

আপত্তি করল না। আমি যে পাঁচ টাকা ওকে দিলাম তা যে এখন দেওয়া আমার পক্ষে কষ্টকর তা ও ভালো করেই জানে, কিন্তু তা সত্ত্বেও ও বিনা প্রতিবাদে সেটা নিল—এখানেই ওর মহত্ত্ব। ওর বিনয়, ওর ভদ্রতা মুগ্ধ করেছে আমাকে। এই মুখপুড়িরাই আমাদের সমাজকে বাঁচিয়ে রেখেছে। অবশ্য আর কত দিন বাঁচিয়ে রাখতে পারবে জানি না। আমরা দ্রুতগতিতে নতুন রকম পশু হয়ে যাচ্ছি, যে পশুর একমাত্র লক্ষ্য টাকা আর আত্মসুখ। ভক্তি শ্রদ্ধাকে অনেকেই শিকেয় তুলে রেখেছে। তাদের ভালো কথা বললে— তারা বলে— আর জ্ঞান দিতে হবে না। কবি টি. এস. ইলিয়ট দুঃখ করে বলেছেন—

Where is the life we have lost in living?
Where is the wisdom we have lost in knowledge?
Where is the knowledge we have lost in information?
The cycles of heaven in twenty Centuries.
Bring us further from God, and nearer to Dust.

যেখানে অধিকাংশ লোকই পশু কিংবা পশুবৎ তাদের মধ্যে থেকে আদর্শ বজায় রাখা খুব শক্ত। কিন্তু তবু এই শক্ত কাজটাই করতে হবে, তা না হলে বেঁচে থাকার কোনও অর্থ হয় না। তবে, একটা জিনিস বুঝেছি, অপরকে ভালো করা যায় না, প্রত্যেকেই নিজের মতে নিজের পথে চলতে চায়। যা করা সম্ভব সেটা নিজেকে ভালো করা। তা-ও শক্ত।

নবীন দত্তের এই খাতাটার নাম আধুনিক ভাষায় হয়তো 'জার্নাল' কিন্তু নবীন দত্ত নিজেকে যদিও অতি আধুনিক বলে প্রচার করেন, কিন্তু খাতাটার কোন নামকরণ করেন নি। খাতাব প্রথম পাতায় কেবল লেখা আছে শ্রীশ্রীদুর্গা শরণং। খেরোয় বাঁধানো মোটা খাতা একটা। এ খাতায় নবীন দত্ত সম্বন্ধে অনেক খবর পাওয়া যাবে। এমন অনেক গূঢ় খবর যা বাইরের লোকে জানে না। যেমন ধরুন, অর্থাভাব সত্ত্বেও তিনি কেন তাঁর ছেলে দুমের কাছ থেকে টাকা নিচ্ছেন না, এই খবরটা। খবরটা অতি তুচ্ছ। কিন্তু এই খবরটার আলোকে নবীন এবং দুম্ দুজনেরই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বোঝা যায়। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে একদিন একখানা পোস্টকার্ড কুড়িয়ে পেয়েছিলেন নবীন। সেই পোস্টকার্ডটি পড়ে তাঁর যা মনে হয়েছিল তা তাঁর জাবদা খাতায় লেখা আছে। উদ্ধৃত করছি।

"সিঁড়িতে একটি পোস্টকার্ড কুড়িয়ে পেয়েছি। পোস্টকার্ডটি খুব সম্ভবতঃ দুমের প্যান্টের পকেট থেকে পড়ে গেছে। কোনও বন্ধুকে চিঠি লিখে পোস্ট করবে বলে নিয়ে যাচ্ছিল বোধহয়, কিন্তু পোস্ট করা হয় নি, পকেট থেকে পড়ে গেছে। কিছুদিন আগেই দুম একটা ভালো চাকরি পেয়েছে। বন্ধুকে লিখেছে, "আমার ভাই কত রকম জিনিস কেনবার শখ, কিন্তু টাকায় কুলোয় না। একটা চাকরি পেয়েছি, মাইনে খুম কম নয়, কিন্তু তাতেও আমার কুলোবে না, কারণ বাবাকে তো প্রতি মাসে কিছু দিতে হবে। আমার ছবি কেনার শখ, ছবি আঁকার শখ, তা ছাড়া ফোটো তোলার বাতিকও আছে। আমি প্রকৃতির ছবি তুলি। মানুষের ছবি কদাচিৎ। অনেক ফড়িঙের, অনেক প্রজাপতির, অনেক ফুলের, অনেক সূর্যাস্তের এবং অনেক সুর্যোদয়ের রঙীন ছবি তুলেছি। সবগুলিই ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। ধার করে করেছি

এসব। এখন চাকরি পেয়েছি, ভেবেছিলাম সে ধারগুলো শোধ করব। কিন্তু বাবাকেও যে প্রতি মাসে কিছু দিতেই হবে। ভাই, চাকরি পাওয়া সত্ত্বেও আমি যে তিমিরে ছিলাম, সেই তিমিরে রয়ে গেলাম। দেখি, এখন কতদূর কি করতে পারি। বাবাকে যদি টাকাটা না দিতে হত তাহলে হয়তো তোমার ধারটা তাড়াতাড়ি শোধ করতে পারতাম। আমি জানি তুমি বড়লোকের ছেলে, সামান্য হাজার টাকা তোমার কাছে কিছু নয়, কিন্তু এ-ও জানি, ওটা আমাকে পরিশোধ করতেই হবে, না করলে স্বস্তি পাব না। তবে তোমাকে কিছুদিন সবুর করতে হবে।' এ চিঠিটা আমি পোস্ট করে দিয়েছিলাম, আর সেই দিনই ঠিক করেছিলাম দুমের কাছ থেকে কোনও টাকা নেব না। ও নিজেই বিপন্ন, ওকে আরও বিপন্ন করতে চাই না। বাজে খেয়ালে টাকা নষ্ট করছে বলে ওকে ভর্ৎসনাও করতে চাই না আমি। কোনটা বাজে কাজ, কোনটা আসল কাজ তা আমিই কি জানি? মনে হচ্ছে পিতা হিসাবে আমারই বরং এ বিপদে ওকে অর্থসাহায্য করা উচিত। কারণ ও যা করছে তা সৃষ্টিধর্মী কাজ। কোনও দুর্নীতিমূলক কাজ হলে বাধা দিতাম। দিতাম কি? ওকে বাধা দেবার শক্তি আমার আছে কি? তবু ঠিক করলাম ওর কাছ থেকে টাকা নেব না।"

এই জাবদা খাতায় লেখা ছাড়া তাঁর আর একটা অবলম্বন ছিল। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তার ওই চিলেকোঠার ঘরে একটিমাত্র ছবি টাঙানো আছে। বিদ্যাসাগরের ছবি। মাঝে মাঝে তার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকেন তিনি। কোন বিপদে পড়লে ছবিটার দিকে চেয়ে ভাবেন এ অবস্থায় পড়লে বিদ্যাসাগর কি করতেন। নবীন দত্তর জীবনে কোনও ঠাকুর দেবতা নেই। পুজোবাড়িতে পাঁচজনের সামনে ঠাকুর দেবতাকে প্রণাম করেন তিনি অবশ্য। নিজের মতামত প্রকাশ করে বাহাদুরি দেখাবার ইচ্ছে তাঁর হয় নি কখনও। কোনও রকম বাহাদুরি দেখানোটা 'ভালগার' মনে হয় তার কাছে। হ্যাঁ, তিনি ঠাকুর দেবতার কাছে প্রণত হন তাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ নন, তবু হন। হন সামাজিকতা বজায় রাখবার জন্য। হন আর একটা কারণেও। ঠাকুর দেবতা ভগবান কিছুই যে নেই, এরও অকাট্য কোন প্রমাণ কি তিনি পেয়েছেন? পান নি। সুতরাং নাস্তিক্য নিয়ে বাহাদুরি করবার মতো জোর নেই তাঁর মনে। ওসব নিয়ে মাতামাতি করেন না তিনি। বিদ্যাসাগরের ছবি যেমন তাঁকে নীরব ভাষায় বলেছিল, দুমের কাছ থেকে টাকা নিও না, তেমনি বলেছিল ঈশ্বরটিশ্বর নিয়ে বেশী মাথা ঘামিও না। ঈশ্বরচন্দ্র নিজেও এ বিষয়ে খোলাখুলি কিছু বলেন নি। বুদ্ধদেবও বলেন নি। ও প্রশ্নের সামনে চিরকাল একটা রহস্য যবনিকা দুলছে। দুলুক। নবীন দত্ত ও নিয়ে মাথা ঘামাবেন না ঠিক করেছেন। কিন্তু কি আশ্চর্য, তবু মাঝে মাঝে ঘামাতে হচ্ছে। এ নিয়ে কারো সঙ্গে তর্ক করেন না অবশ্য, কিন্তু নিজেরই মনে বারবার প্রশ্ন জাগে। ভগবান সত্যিই কি নেই? এত বড় নিখিল বিশ্ব সৃষ্টি করলে কে তাহলে? আপনি-আপনি ঘটনাচক্রে হয়ে গেছে? ধোঁয়া দেখলে যেমন মনে হয় কোথাও না কোথাও আগুন আছে, তেমনি সৃষ্টি দেখলেই মনে হয় নিশ্চয় এক বা একাধিক স্রষ্টাও আছেন। এই স্রষ্টার স্বরূপ নিয়ে অনেক বিদ্বান ব্যক্তি মাথা ঘামিয়েছেন। কিন্তু বিদ্বান ব্যক্তিরা নবীন দত্তকে বিশেষ আশ্বাস দিতে পারেন নি। তাঁরা নিজেদের বিদ্যাবুদ্ধির আস্ফালন করেছেন কেবল। সে আস্ফালন মাঝে

মাঝে বেশ চমকপ্রদ, মাঝে মাঝে বেশ কৌতূহলজনক, মাঝে মাঝে 'বাঃ' বলতে ইচ্ছে হয়েছে তাঁর। কিন্তু তার থেকে মনের স্থায়ী কোন অবলম্বন পান নি নবীন দত্ত। যখন চারদিকে অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে তখন আলো জ্বালতে পারে নি কেউ। সার্কাস বা ম্যাজিক দেখে যেমন সাময়িক বিস্ময় বোধ করেছেন, ওই সব বড় বড় দার্শনিকদের বই পড়েও তেমনি করেছেন। যে সত্যের উপর নির্ভর করা যায়, যে সত্য সমস্ত সন্দেহ নিরসন করে দেয়, সে সত্যের দেখা কখনও পান নি। অথচ এ রকম সত্যকে অপরোক্ষ করেছেন এ রকম লোকের অভাব আমাদের দেশে নেই একথাও তো ঐতিহাসিক সত্য। এই সেদিনই তো শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস, স্বামী বিবেকানন্দ, মহর্ষি রমণ এদেশে ছিলেন। তাহলে---অন্ধকারের মধ্যে ওই 'তাহলে'-টাই প্রলুব্ধ করে তাঁকে মাঝে মাঝে—আলেয়ার মতো। মাঝে মাঝে তাঁর মনে হয় ও রকম লোক এখনও আছেন কি? থাকলেও তিনি কোথায় আছেন, কে তার সন্ধান দেবে, তাঁর কাছে গেলেও তিনি কি তাঁকে প্রশ্রয় দেবেন, যদি দেনও তাঁর উপদেশ তিনি কি অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করতে পারবেন এই বৃদ্ধ বয়সে? এই সব কথা মনে হয় মাঝে মাঝে। যদিও তিনি আধ্যাত্মিক নন, তবু এই সব চিন্তা অনেক সময় অন্যমনস্ক করে দেয় তাঁকে। এই অন্যমনস্ক হয়ে থাকাটাও তাঁর একটা বিলাস, অমীমাংসিত সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামায় যেমন অনেকে, অনেকটা তেমনি। সেদিন-- যেদিন এই গল্পের আরম্ভ সেদিন কিন্তু এসব নিয়ে ভাবছিলেন না তিনি, ভাবছিলেন আর একটা বিষয় নিয়ে। আকাশ পাতাল ভাবছিলেন। তাঁর এক ছাত্র তাঁকে একটি প্রস্তাব দিয়েছে। তিনি এককালে নামজাদা অধ্যাপক ছিলেন। যদি নোট বই লিখতেন তাহলে বড়লোক হতে পারতেন, কিন্তু তিনি লেখেন নি। তাঁর ধারণা নোট বই লিখলে সেটা চালাবার জন্যে এমন সব লোকের দ্বারস্থ হতে হয় যাদের দ্বারস্থ হবার প্রবৃত্তি তাঁর কোনদিন হয়নি। এ-ও তাঁর কানে গেছে এসব ব্যাপারে ঘুষ ঘাসও না কি দিতে হয় নানা জায়গায়। তাই ও চেষ্টাই তিনি করেন নি কখনও। তাঁর ছাত্রটি এসে বলছে—আপনি স্যার অনুমতি দিন, আমিই সব করি। আমিই নোট বুক লিখব, আমিই তার প্রকাশের ব্যবস্থা করব, আমিই যেখানে যাবার যাব--আপনি শুধু আপনার নামটি ধার দিন আমাকে। গ্রন্থকার হিসাবে আপনার নামটি ছাপব আমি আর এর জন্যে আপনাকে লাভের অর্ধাংশ দেব। যদি বইটা চালাতে পারি বছরে আপনাকে হাজার পাঁচেক টাকা অনায়াসে দিতে পারব। আমি কোথাও চাকরি যোগাড় করতে পারছি না, সর্বত্রই নেপোটিজম। আমার এক বন্ধু ভালো ছাপাখানা করেছে, সে বলেছে, বইটা কম লাভ নিয়ে ছেপে দেবে আপনি যখন আমাদের পড়াতেন তখন যে নোট দিতেন তা সব আমার টোকা আছে.. বিজেনের কাছেও আছে। আপনি শুধু নামটি ধার দিন আমাদের। ছাত্রটিকে সোজা 'না' বলতে পারেন নি নবীন দত্ত। বলেছিলেন, ভেবে দেখব, পরের রবিবার এসো তুমি। ছাত্রটি চলে যাবার পর থেকেই এ নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন তিনি। টাকার তাঁর সত্যিই দরকার খুব। মেয়েদের বিয়ের জন্যে যে দেনাটা করে বাড়ি বাঁধা রেখেছেন সেটা শোধ করতে পারলে তিনি যেন স্বস্তি পান। নগদ পাঁচ হাজার টাকা যদি পাওয়া যায় তাহলে দেনাটা শোধ হয়ে যাবে। রিটায়ার করার পর প্রভিডেন্ট ফান্ডের যে টাকা তাঁর পাওনা হয়েছে তার

এখনও হিসেবই হয়নি নাকি। অনেকবাব হাঁটাহাটি কবেও পান নি টাকাটা। পেলে ওঁব স্ত্রীব নামে একটা fixed deposit কবে দেবেন ভেবেছেন। কিন্তু আমাদেব স্বাধীন গভর্নমেন্টেব অধীনে আবও স্বাধীন আমলাতন্ত্রেব যে কেবানীবা কাজ কবেন তাদেব কবল থেকে সে টাকা কবে উদ্ধাব কবতে পাববেন কে জানে।

পাকলেব সঙ্গে আজকাল তাঁব প্রায় সম্পর্কই নেই। সে তাব মাকে নিয়ে থাকে। সাবিত্রীব সঙ্গে মাঝে মাঝে হয়তো গল্প কবে, কিন্তু তাঁব কাছে আসে না। এসে হয়তো সুখ পায় না। জীবনসঙ্গিনী কিন্তু সঙ্গ দিতে পাবে না। পাকল আব মুখপুড়ি দুজনে প্রায় এক জাতেব লোক, মুখপুড়িব সঙ্গে বোজ গল্প কবে পাকল। যে সব প্রসঙ্গ নিয়ে কবে, সে সব প্রসঙ্গে দখল নেই নবীন দত্তেব। কৌতূহলও নেই, আগ্রহও নেই। নবীন দত্ত মানিকতলাব বিলেতফেবত বউটিব কাণ্ডকাবখানা নিয়ে মাথা ঘামাতে চান না, পাকলবালাবও বিজ্ঞান ইতিহাস বা দর্শন নিয়ে মাথা ঘামাবাব সামর্থ্য নেই সুতবাং জমে না। এক বিষয়ে দুজনেব মতেব কোন অমিলও আছে। পাকলবালা দুমেব উপব অসন্তুষ্ট। বিয়ে কবে নি, যা বোজগাব কবে নিজেই খবচ কবে ফেলে পাকলবালাব বিশ্বাস নবীন দত্তেব আসকাবা পেয়েই ছেলেটা উচ্ছন্ন গেছে নবীন দত্ত যদি গোড়া থেকেই বাশ টেনে ধবতেন তাহলে ছেলেটা এমন হত না। নবীন দত্ত কিন্তু দমেব উপব প্রসন্ন। তিনি ওকে শাসন কবতে চেষ্টা কবতেন না বস্তুত কাউকেই তিনি জীবনে শাসন কবেন নি। দুমকে প্রশ্রয় দেন নি কাবণ ওই খেয়ালী ছেলেটাব মতিগতি বুঝে উঠতে পাবেন। যদিও তিনি একথা বলেন নি কাউকে, কিন্তু তাঁব মনে হত ওব খাপছাড়া খেয়ালি ধবনধাবণ প্রতিভাবান লোকেব লক্ষণ প্রতিভাবান পুরুষেবা বাঁধা ধবা পথে কেতা দুবস্ত হয়ে চলে না সব সময় সাধাবণ ছেলেব দুটো বঙীন প্রজাপতিব বঙীন ফোটো তোলবাব জন্যে দুপুব বোদে টো টো কবে ঘুবে বেড়ায় না। পড়াশোনাতেও দুম অসাধাবণ। ওব থীসিস পড়ে এক জন জার্মান বিজ্ঞানী খুব প্রশংসা কবেছেন। যে জার্মান ফার্মে ও চাকবি পেয়েছে সেখানে ওকে কেবানীগিবি কবতে হয় না। গবেষণা সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখে পাঠাতে হয় জার্মানিতে। ওব চাকবি দশটা পাঁচটা আপিসেব চাকবি নয়। অধিকাংশ সময় কাটাতে হয় লাইব্রেবিতে না হয় ল্যাববেটবিতে। চবক সুশ্রুত পড়তে যেতে হয় কবিবাজদেব কাছে। দুমেব সম্বন্ধে ভাবনা নেই নবীন দত্তেব। ও নিজেব পথ কেটে নিজেই বেবিয়ে যাবে। নবীন দত্তেব ভয় উনি নিজে ওব স্বচ্ছন্দে চলাব পথে বিঘ্ন হয়ে না দাঁড়ান। অনেক দিন আগে তাব এক সতীর্থ পবমেশ বায় তাঁকে প্রশ্ন কবেছিলেন—তোমাব ছেলেবা কি তোমাকে দেয় কিছু? নবীন উত্তব দিয়েছিলেন— আমি ওদেব কাছ থেকে নিই না কিছু। বিজ্ঞেব মতো হেসে উত্তব দিয়েছিলেন—শাক দিয়ে মাছ আব কত ঢাকবে ভাই। নিতে চাইলেও আজকালকাব ছেলেবা দেবে না কিছু। আজকাল যে জেনাবেশন গ্যাপ হয়েছে সে গ্যাপ লাফিয়ে পাব হওয়া শক্ত। কথাটা শুনে চটে উঠেছিলেন নবীন। বলেছিলেন—লক্ষ্মীছাড়া পবিবাবে জেনাবেশন গ্যাপ সেকালেও ছিল, আব একালেও আছে। যে সব পবিবাবে বাপ মা-বা ছেলেদেব দাযিত্ব নেয় না, যাদেব ছেলে মেয়েবা পথে-ঘাটে কুকুব বিড়ালেব মতো মানুষ হয়, অনেক সময় যাদেব পিতৃপবিচয়ও অস্পষ্ট—এদেব মধ্যে

জেনারেশন গ্যাপ তখনও ছিল, এখনও আছে। কিন্তু ভদ্র ভালো পরিবারে নেই। কর্তব্যপরায়ণ ছেলেমেয়ে, কর্তব্যপরায়ণ বাপ মা এখনও এদেশে অনেক আছে। সেখানে গ্যাপ ট্যাপ নেই। জেনারেশন গ্যাপ কথাটি বিলিতি প্রপাগাণ্ডা। প্রত্যেক পরিবারে পিতামাতা আর পুত্রকন্যাদের মধ্যে ঝগড়া সৃষ্টি করবার একটা কৌশল। বিদেশীরা আমাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে চায়। ওতেই ওরা ওস্তাদ। ওরা হিন্দু মুসলমানে ঝগড়া লাগিয়েছে, ভাষায় ভাষায় ঝগড়া লাগিয়েছে, ধনিক আর শ্রমিক নামক দুটো দল তৈরি করে তাদের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি করেছে। 'ক্ষয়' শব্দটার সঙ্গে 'অব' উপসর্গ জুড়ে অবক্ষয় নামে এমন একটা আওয়াজ সৃষ্টি করেছে যেন মনে হচ্ছে ওই অবক্ষয় আগে ছিল না, এখন হয়েছে, এবং আমরা যতদিন স্বাধীন থাকব, চলতে থাকবে। ওই বিদেশী ধূর্তেরা আমাদের দেশের লোককে টাকা দিয়েই এই সব বিষ ছড়াচ্ছে এই দেশে। বোকারা চিরকাল গরীব ছিল, পিছনে পড়ে ছিল, আগেও ছিল, এখনও আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে। বুদ্ধিমানরা যে কোন পরিস্থিতিতেই ওপরে উঠে যাবে। এসব নতুন কিছু নয়। বিদেশী শত্রুদের ভাঁওতায় ভুলো না। নিজের বিচারবুদ্ধি দিয়ে ভাববার চেষ্টা কর। ভালো মন্দ সব সময়েই ছিল, সব সময়েই থাকবে। আমি তো আমার চেনাশোনা যে কটি ভালো পরিবার জানি, সেখানে জেনারেশন গ্যাপ নিযে কোনও হা-হুতাশ শুনি নি। যেখানে শুনেছি সেখানে পরিবারটাই খারাপ—সেখানে মদ মেয়েমানুষেব মৈচোট্। সেখানে শুধু জেনারেশন গ্যাপ কেন সবই ফরদাফাঁই। এ ধরনেব পরিবার আজকাল ডিগ্রির জোরে, চাকরির জোরে কিংবা রাজনীতির জোরে অনেক সময় ওরা ভদ্র পরিবার বলে পরিচিত হয়। কিন্তু ওরা ভদ্র নয়, ওরা ছদ্মবেশী ছোটলোক। নবীন দত্তের এই আকস্মিক উষ্মায় পরমেশবাবু হকচকিয়ে গিয়েছিলেন একটু। বলেছিলেন—অত চটছ কেন? আজকাল ছেলেমেয়েদের কাণ্ড কারখানা যা দেখি তাতে পিলে চমকে যায়। যা খুশি করে বেড়াচ্ছে। কাজের মতো কাজ একটাও করছে না। সবই পায় অকাজ। এরও উত্তর দিয়েছিলেন নবীন দত্ত। বলেছিলেন—ওদের আমরাই কাজে লাগাতে পারছি না। আমাদের শিক্ষাটাও বর্তমানে ভুল পথে চলছে। যে ভালো মিস্ত্রি হতে পারত সে হচ্ছে কেরানী, যে বড় শিল্পী হতে পারত সে হচ্ছে কেরানী, যে বড় ব্যবসায়ী হতে পারত সে হচ্ছে কেরানী। দেশে ভালো দরজি নেই, ছুতোর নেই, সৎ ব্যবসায়ী নেই, আছে কেবল ঝাঁক ঝাঁক ডিগ্রিধারী কেরানী, যাদের পেটে বিদ্যেও নেই, অন্য কোন কাজ করবার যোগ্যতাও নেই, যাদের একমাত্র লক্ষ্য চাকরি—যে চাকরিও তারা ভালোভাবে করে না। ছেলেবেলা থেকে ওরা পাকা ইমারতে বসে ফ্যানের তলায় মানুষ, তাই পরবর্তী জীবনেও কোনও ইমারতে চেয়ার টেবিলের সামনে ফ্যানের তলায় বসে চাকরি করতে চায়। হয়তো চাওয়াটা স্বাভাবিক। নিজেরা মেহনত করে কিছু করতে পারে না, কিন্তু অবসর সময়ে মেহনতী মানুষদের নিয়ে বক্তৃতা করে। এদের আমরা যদি কাজে লাগাতে পারতাম তাহলে দেশের চেহারা ফিরে যেত। কিন্তু আমরা ওদের কাজের লোক না করে ক্রমাগত সেই বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠিয়ে যাচ্ছি যেখানে বিশ্বের বিদ্যা দূরে থাক সামান্য বিদ্যালাভও হয় না, যেখানে মানুষকে অমানুষ করবার নানা আয়োজন ও উদাহরণ সর্বদা মজুত। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়েই কিন্তু চাকবি চাই।

বেকার সমস্যা—। রাজনৈতিক আন্দোলন, কাগজে কাগজে ফাটাফাটি। চাকরি-দেনেওয়ালাদের সর্বাঙ্গ তৈলাক্ত, সুপারিশ, ঘুষ। এই হচ্ছে, বুঝলে। আমাদের ছেলেদের আমরাই বিপথে ঠেলে দিচ্ছি। ওদের দোষ দিও না, দোষ আমাদের। তোমার ছোট ছেলেটা কি করছে? পরমেশ কুণ্ঠিত কণ্ঠে বললেন—এবারও আই.এ. ফেল করেছে ভাই। কি যে করি—। নবীন দত্ত বললেন, ওকে কলেজ থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে পত্রপাঠ কোনও কাজে লাগিয়ে দাও। যে কোন কাজ। ফেরি করুক, রিকশা টানুক, মোটর ড্রাইভারি শিখুক, এনি ওয়ার্ক। পরমেশ আপত্তি করলেন। বললেন—ওকথা আজকাল অনেকেই বলছে। কিন্তু একটা ভদ্রলোকেব ছেলের পক্ষে ফেরিওলা বা রিকশাওলা হওয়াটাই কি আদর্শ হওয়া উচিত? একথা শুনে অধীর হয়ে উঠেছিলেন নবীন দত্ত। বলেছিলেন, দেখ ভাই, আদর্শের সঙ্গে পেশার কোনও সম্পর্ক নেই। মানুষ হওয়াই সকলের আদর্শ হওয়া উচিত। তা যে কোন কাজ করেই হওয়া সম্ভব। যার বড় হবার আগ্রহ আছে, সে যে কোনও অবস্থা থেকেই তা হতে পারে। ওদেশের অনেক বড় লোক অনেক নিম্নস্তর থেকে জীবন শুরু করেছিলেন, কেউ চায়েব দোকানে কাপ ডিস ধুতেন, কেউ কাগজ ফেরি করতেন, কিন্তু তাতে তাঁদের বড় হওয়া আটকায় নি। এদেশেও বিস্তর উদাহরণ আছে। স্বাধীন পেশা করলেই মনুষ্যত্ব বজায় থাকে, চাকরি করলে প্রায় থাকে না। আমি তো কাউকে বরাবর ফেরিওলা বা রিকশাওলা বা মুটে হয়ে থাকতে বলছি না। কিন্তু কুঁড়ে হয়ে ঘরে বসে থাকার চেয়ে, কিংবা রাজনৈতিক দলের খপপ্পরে পড়ে শ্লোগান দিয়ে বেড়ানোর চেয়ে—ওসব কাজ ঢের ভালো, ঢের সম্মানজনক।

পরমেশ খোঁচা দিতে ছাড়েন নি। বলেছিলেন—তবে তোমার দুটি ছেলেকেই চাকরিতে ঢুকিয়েছিলে কেন? সদর্পে উত্তর দিয়েছিলেন নবীন দত্ত—আমি ঢোকাই নি, ওরা নিজেদের জোরে ঢুকেছিল, কমপিটিটিভ পরীক্ষা দিয়ে নিজেদের বিদ্যার জোরে। সবাই যদি ওদের মতো চাকরি পায় পাক না। কিন্তু খোলামকুচির টুকরো যদি হীরের দরে বিকোতে চায় তাহলেই তো মুশকিল। কথাটা বলেই অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিলেন নবীন দত্ত। নিজের ছেলেদের সম্বন্ধে এ রকম আস্ফালন করাটা ভালো হল কি? কিন্তু ঝোঁকের মাথায় এ রকম অনেক অশোভন কাজ করে ফেলেন তিনি। পরে আপসোস হয়। অলঙ্কার মারা যাওয়ার পর তাঁর মাঝে মাঝে অযৌক্তিকভাবে মনে হয়েছিল পরমেশের কাছে নিজের ছেলে নিয়ে অমন গর্ব করেছিলাম বলেই কি ভগবান অলঙ্কারকে কেড়ে নিলেন? ভগবান কি ইচ্ছে করলেই কি[illegible] দিতে পারেন বা কেড়ে নিতে পারেন? এসব অমীমাংসিত প্রশ্নের কোন জবাব নেই, ত[illegible] কথাটাকে একেবারে উড়িয়ে দিতে পারেন নি তিনি। বার বার মনে হয়েছিল, এখ্যারে ন

সেদিন বিদ্যাসাগরের ছবির দিকে চেয়ে বসেছিলেন নবীন দত্ত। ভাবছিলেতিনি, আর তো আসবে। তার লেখা নোট বুকে নিজের নামটা ধার দেবেন কি না ভেসে আসছিল নি। এ অবস্থায় পড়লে বিদ্যাসাগর কি করতেন? ছবিটার দিকে। নবীন দত্তের মনে হয় নিজের খোঁচা খোঁচা গোঁফদাড়িতে হাত বুলোচ্ছিলেন।

একটা। দূরে কোথায় যেন কারখানা আছে, সেখান

কোনও শক্তিশালী দানব বুঝি অত্যাচার করছে কারো উপর। ওই শব্দটা যেন অত্যাচারিতের আর্তনাদ। যখন প্রথমে বাড়ি করে এখানে এসেছিলেন তখন শব্দটা খুব খারাপ লাগত। এখন সয়ে গেছে। হঠাৎ খাপছাড়াভাবে মনে পড়ল অলঙ্কারের প্রথম মেয়ে রেবতী যখন হল তখন খুব কাঁদত মেয়েটা। দিনরাত কাঁদত। অসহ্য মনে হত প্রথম প্রথম। তা-ও পরে সয়ে গিয়েছিল। এখন রেবতী কাঁদে না, হাসে। হাসি থেকে মুক্তো ঝরে। আবার বিদ্যাসাগরের ছবির দিকে চাইলেন তিনি । হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ল তাঁর। বিদ্যাসাগর নিজেই তো অনেক স্কুলপাঠ্য বই লিখে নিজে ছাপিয়ে বাজারে বার করতেন। বইয়ের ব্যবসা করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছিলেন। কিন্তু তিনি নিজের নাম কোথাও ধার দেন নি তো কখনও। সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদকের পদ তিনি ছেড়ে দিলেন রসময় দত্তের সঙ্গে মতের মিল হল না বলে। বলেছিলেন, আলু পটল বেচে খাব। কিন্তু আলু পটল বেচতে হয় নি। ইংরেজি ভাষা শিখলেন নিজের চেষ্টায়। শোভাবাজার রাজবাড়ির জামাতা অমৃতলাল মিত্র এবং শ্রীনাথ দত্তের কাছে রোজ ইংরেজী শিখতে যেতেন। ক্রমশ নিজে বই লিখতে আরম্ভ করলেন। প্রথমে 'বাসুদেব চরিত', তারপর 'বেতাল পঞ্চবিংশতি', তারপর 'বাংলার ইতিহাস।' তারপর ছাপাখানা করলেন নীলমাধব মুকুজ্যের কাছে টাকা ধার করে। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের মার্শাল সাহেব তাঁর ছাপা বই কিনলেন অনেক। ধার শোধ হয়ে গেল। হু হু করে অনেক কথা মনে পড়ল নবীন দত্তের। কে যেন তাঁর মনের ভিতর বলে উঠল— বই বেচে টাকা রোজগার করতে চাও তো নিজে লেগে পড়। নাম ধার দেবে কেন? ফাঁকি দিয়ে কিছু হয় কি? ছাত্রটি যদি সত্যি ভালো ছেলে হয় সে ব্যবসায়ে তোমার সহকারী হোক। মদনমোহন তর্কালঙ্কার বিদ্যাসাগরের সহকারী ছিলেন এ বিষয়ে। তারপরই মনে হল আজকাল মার্শাল সাহেবের মতো লোক পাওয়া যাবে কি? পাওয়া যাবে কি নীলমাধব মুকুজ্যে আর মদনমোহন তর্কালঙ্কারের মতো বন্ধু? আরও খানিকক্ষণ চেয়ে রইলেন বিদ্যাসাগরের ছবির দিকে কেমন যেন ক্ষোভ ঘনিয়ে উঠল মনের ভিতর। এ যুগে কি সবই খারাপ? সঙ্গে সঙ্গে মনে হল, তা হতেই পারে না। বিদ্যাসাগরের সময়ে খারাপ লোক যে অনেক ছিল তার প্রমাণ আছে। তাঁর ঘরে ডাকাতি করেছিল, তাঁর ঘর পুড়িয়ে দিয়েছিল, তাঁকে ঠকিয়েছিল, তাঁর নামে কুৎসা ছড়িয়েছিল। কিন্তু সে যুগেও বিদ্যাসাগর ভালো লোকের দেখা পেয়েছিলেন। এ যুগেও ভালো লোক নিশ্চয়ই আছে। আমি নাগাল পাই নি। কেন পাই নি? সবার মধ্যেই একটা না একটা খুঁত দেখতে পেয়েছি। মার্শাল সাহেব, নীলমাধব মুকুজ্যে, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, দুর্গাদাস বাঁড়ুয্যে—এঁরা কি নিখুঁত ছিলেন? নিখুঁত মানুষ তো হতেই পারে না। নিশ্চয়ই কিছু খুঁত ছিল তাঁদের। তবু বিদ্যাসাগরের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছিল। ভালবাসার জোরেই খুঁতকে উপেক্ষা করা যায়। বিদ্যাসাগর ওদের ভালবাসতে পেরেছিলেন বলেই ওঁরা ওঁর অকৃত্রিম বন্ধু হয়েছিলেন। এর পরেই একটা নিদারুণ সত্যের মুখোমুখি হলেন তিনি। তাঁর জীবনে প্রকৃত বন্ধু একটাও নেই। তাঁর চাকরি জীবনে যে সব সহকর্মীর সঙ্গে চাকরি করতেন তাঁদের একজনকেও বন্ধু করতে পারেন নি তিনি। সবারই সঙ্গে কেমন যেন একটা মুখোশ পরা সম্পর্ক ছিল। ঈর্ষাও ছিল পরস্পরের মধ্যে। বিলেত-

ফেরত ডক্টার সেনকে তাঁর মনে হত চালিয়াত। বিলেত ফেরত বলে তাদের সবাইকে ডিঙিয়ে ওপরে উঠে গেছে। এজন্য ঈর্ষাও হত। ঘৃণা করতেন প্রফেসার মিত্রকে ছাত্রীদের সঙ্গে প্রেম করতেন বলে। অনুকম্পা হত প্রফেসার মুখার্জির উপর। ছাত্র-ছাত্রীদের মনোহরণ করতে পারেন নি ভদ্রলোক। তোত্‌লা ছিলেন একটু। তাঁর ক্লাসে পা ঘষত, শিস দিত সবাই কোনদিন বোর্ডে লেখা থাকত— আই, ক্লডিয়াস। রোমান সীজার ক্লডিয়াস তোত্‌লা ছিলেন আই ক্লডিয়াস রবার্টসের লেখা বিখ্যাত ঐতিহাসিক উপন্যাস। প্রফেসার মুখার্জি প্রায়ই রেগে ক্লাস থেকে বেরিয়ে আসতেন। তোতলামির জন্যেই কারো সঙ্গে মিশতেন না বোধহয়। নবীন দত্ত শুনেছিলেন লোকটা নাকি বিদ্যার জাহাজ। একজন হোমরা চোমরা সাহেবের পৃষ্ঠপোষকতার জোরে চাকরিটি পেয়েছিলেন। সব সময়ে তার তোতলামি থাকেও না। ভয় পেলে বা রেগে গেলেই কথাগুলো আটকে যায়। লোকটার উপর অনুকম্পা হত নবীন দত্তের। যার প্রতি অনুকম্পা হয় তার সঙ্গে বন্ধুত্ব হয় না। পরমেশ লোকটা দুঃখী। তিনবার বিয়ে করেছে। দেখা হলেই দুঃখের কাঁদুনি গায় আর ঘোঁট করবার চেষ্টা করে। ওর সঙ্গেও মেলে নি নবীন দত্তের। এক পাল ছেলেমেয়ে নিয়ে টিউশনি করে, নোট লিখে, ধার করে আর নানা রকম শেয়ার কিনে, নানা ফন্দিফিকির করে সংসার চালায় লোকটা বন্ধুত্ব হওয়া দূরে থাক লোকটাকে দেখলেই অঙ্গ জ্বলে যায় নবীন দত্তের। প্রফুল্ল আঢ্যির লোকটার সঙ্গে বন্ধুত্ব হতে পারতো। ও লোকটার অনেক গুণ। কিন্তু মুখে এমন গন্ধ আর হুদহুদ করে এমন অনর্গল বকে যে মুখ দিয়ে থুথু ছিটকে বেরোয়— ওর কাছে বসাই শক্ত। বন্ধুত্ব হবে কি করে? তবে ওর প্রবন্ধ পড়ে মুগ্ধ হন নবীন দত্ত। না, নবীন দত্ত কারো সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে পারেন নি। যখন বিপ্লবী ছিলেন, মানে যখন পলিটিকস করতেন তখনও মনের মতো মানুষ পান নি। সেখানেও যেন একটা প্রতিযোগিতা, সেখানেও দলের যিনি কর্তা তার মন রাখবার জন্যে ঠেলাঠেলি ভীড়। সেখানেও নির্বাচন, সেখানেও নিজের দলে লোক টানবার জন্যে অশোভন প্রয়াস এবং তার জন্যে অনেক সময় অসাধু আচরণ। সেখানে বন্ধুত্ব তো হয়ই নি কারো সঙ্গে, দলাদলির ঘূর্ণাবর্তে পড়ে হাবুডুবু খেয়েছিলেন কিছুদিন। সেখান থেকে পালিয়ে বেঁচেছিলেন শেষ পর্যন্ত। তারপর কাজ করেছিলেন কয়েকটা সাময়িক পত্রিকার অফিসে সেখানেই ওই কুৎসিত দলাদলি। প্রত্যেকেই প্রত্যেককে হিংসে করে মনে মনে —বিশেষত সে যদি প্রতিভাবান হয়, প্রত্যেকেরই চেষ্টা কি করে অপরকে চেপে আমি পাদপ্রদীপের সামনে দাঁড়াব। প্রফেসারি যতদিন পান নি ততদিন পেটের দায়ে এই নরকবাস করতে হয়েছিল তাকে কিছুদিন। যেদিন তাঁর লেখা না ছেপে এক কাগজের মালিক তাঁর এক মোসায়েবের লেখা ছাপলেন সেদিন বড় কষ্ট হয়েছিল তাঁর। মুখ ফুটে বলতে পারেন নি কিছু, চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে চলে আসবার মতো কোমরের জোরও ছিল না তখন। পারুলকে নিয়ে তখন সাঁতরাগাছিতে একটা একতলা বাড়িতে থাকতেন, একটি মেয়ে হয়েছে—যা পেতেন তাতে অত্যন্ত টানাটানি করে চলত। সুতরাং চাকরিটা ছাড়তে পারেন নি। সেখানে হোমরাচোমরা কারো সঙ্গে বন্ধুত্ব হওয়া সম্ভবই ছিল না, সবাই তাঁরা নিজেদের লাটবেলাট মনে করতেন, তাঁর সঙ্গে মুখে একটা ভদ্রতা বজায় রাখতেন বটে, কিন্তু মনে মনে করতেন অনুকম্পা।

এদের কারো সঙ্গে বন্ধুত্ব হবে কি করে? বন্ধুত্ব মানে প্রেম। এদের মধ্যে একজনও প্রেম জাগায় নি তাঁর মনে। জাগিয়েছিল বরং রামরতন। সে ছিল প্রুফরীডার। কমবয়সী ছেলেটা। অর্থাভাবে লেখ পাড়া শিখতে পারে নি। কিন্তু ভারী সুন্দর স্বভাব ছিল তার। ভালো প্রুফ দেখত। মাইনে পেত মাত্র পঞ্চাশ টাকা। তাকে ভালোবেসে ছিলেন নবীন দত্ত। বাড়ি ফেরার পথে তারই সঙ্গে গল্প করতে করতে যেতেন ট্রাম ধরবার জন্যে। মাঝে মাঝে তার বাড়িও গেছেন। বাড়িতে বিধবা মা ছিলেন কেবল। আপনার মাকে দেখেছিলেন তাঁর মধ্যে। সত্যি বাঙালী মায়ের রূপ দেখেছিলেন। তাঁর আগ্রহে মাঝে মাঝে চা আর মুড়ি খেতেন তিনি রামরতনের বাড়িতে। কখনও কখনও বেগুনিও ভেজে দিতেন তিনি তার সঙ্গে। চা করতেন। অতি ছোটখাটো ঘরোয়া সুখদুঃখের গল্প করতেন, পলিটিকস বা সাহিত্য, চীন বা রাশিয়া নিয়ে আসর জমাবার ক্ষমতাই ছিল না তাঁর। পাড়াপড়শীর কথাই বলতেন বেশী। রামরতন তাঁর বন্ধু হতে পারে নি কিন্তু। বুদ্ধির জগতে অনেক পার্থক্য ছিল দু'জনের। স্নেহ করতেন তিনি রামরতনকে। তারপর রামরতনও হারিয়ে গেল। যুদ্ধে যোগ দিয়েছিল আর ফেরে নি। নবীন দত্ত তার বাড়িতে তবু গিয়েছিলেন একদিন। দেখলেন সেখানে অন্য ভাড়াটে। বাড়িওলা বললেন— রামরতনের মা দেশে গেছেন। তাঁর দেশ কোথায় তা তিনি বলতে পারলেন না। ওরা হারিয়ে গেল নবীন দত্তর জীবন থেকে। অতীতের এই সব স্মৃতি মন্থন করতে করতে আর একবার তিনি বিদ্যাসাগরের ছবিটার দিকে চেয়ে দেখলেন। অদ্ভুত একটা কৌতুক যেন চকমক করছে তাঁর চোখের কোণ দুটিতে। মনে হল তাঁর অবস্থা দেখে মনে মনে হাসছেন যেন তিনি। যেন বলছেন—বাপু, ও রকম কি হয় কখনও? মানুষ কি না ভালোবেসে থাকতে পারে? তুমিও ভালোবেসেছ নিশ্চয়, কাকে ভালোবেসেছ সেটাও তোমার অজানা নেই। কিন্তু সত্যটাকে আমল দিতে লজ্জা হচ্ছে তোমার। লজ্জার কি আছে এতে। সহসা বিদ্যুৎ-চমকের মতো সত্যটা উদ্ভাসিত হল নবীন দত্তের মনে। মনে পড়ল অলঙ্কারকে আর দুমকে। দুটি ছেলেকেই ভালোবেসেছিলেন তিনি। কেবল পিতৃসুলভ ভালোবাসা নয়। ওরা যদি মেয়েমানুষ হত তাহলে এটাকে অনায়াসে রোমান্টিক ভালোবাসাও বলা চলত। অপত্যস্নেহের উপর এমন একটা রঙের ছোপ লেগেছিল যা সত্যিই মাতিয়ে তুলেছিল তাঁকে। তাঁর এভাব তিনি গোপন রাখতেন। ওদের কাছেও তা প্রকাশ করেন নি কখনও। বরং ওদের কাছে একটু বেশী গম্ভীর হয়ে থাকতেন। রোমান্টিক বলছি এই কারণে যে রোমান্সের রমণীয়তা, অনিশ্চয়তা, আশা আশঙ্কা সবই ছিল সে ভালোবাসার মধ্যে। অলঙ্কার অনেক দিন আগে চলে গেছে। ওর মেয়ে দুটোকে তত ভালো লাগে না কিন্তু। কেমন যেন লোভী লোভী ধরনের। বোধহয় দারিদ্র্যের মধ্যে মানুষ হচ্ছে বলেই ওরকম হয়েছে। ভালো লাগে না, কিন্তু মায়া হয়। অলঙ্কার তাঁর স্বপ্নলোক আলো করে এখনও আছে। মাঝে মাঝে চোখ বুঁজে তার কথা ভাবেন। তাঁর ছেলেরা রূপবান নয় কেউ। অলঙ্কার তো কালোই ছিল। বেঁটেও ছিল একটু। কিন্তু চোখের দৃষ্টি কী স্বপ্নময়। মনে হত সে যেন এ জগতের লোক নয়।. সর্বদাই অন্যমনস্ক হয়ে থাকতো। পড়াশোনায় খুব ভালো ছিল, ইতিহাসের ছাত্র ছিল সে। ইতিহাসের রূপকথালোকেই ঘুরে বেড়াত যেন। নবীন দত্ত সে

স্বপ্নলোকে প্রবেশ করতে পারতেন না। ইতিহাসের বই পড়লেই ঘুম পেত তাঁর। অলঙ্কার কিন্তু ওই ইতিহাসের অরণ্যে কিসের যেন সূত্র খুঁজে বেড়াত। মনে হত যেন পরশমণি খুঁজছে। নবীন দত্তর মনে হয়—হয়তো এখনও খুঁজছে। অনেক দূরে মনের সুদূর প্রত্যন্ত প্রদেশে এখনও তিনি মাঝে মাঝে দেখতে পান স্বপ্নাচ্ছন্ন অলঙ্কারকে। মাঝে মাঝে তাঁর মনে হয় সে চলে গেছে ভালই হয়েছে। বেঁচে থাকলে বাস্তবের রূঢ় আঘাতে তার স্বপ্ন ভেঙে যেত। ইর‍্যাসমাস (Erasmus) কিংবা শেলীর (Shelly) মতো কষ্ট পেতে হত। গেছে, বেশ গেছে। ভোগেও নি বেশী। হঠাৎ হার্টফেল। এক মিনিটেই সব শেষ। বেশ গেছে। অলঙ্কার আর নাগালের মধ্যে নেই, তাকে ইচ্ছে করলে আর দেখতে পাবেন না, শোকের জ্বালা নেই, ক্ষতির দুঃখ নেই, কিন্তু ওই রোমান্টিক ভাবটা এখনও আছে। মনে হয় ঘোর অন্ধকারের মধ্যে অনেকদূরে যেন একটা আলোকিত বন্দর দেখতে পান। সেদিকে মনে মনে আকুল হয়ে চেয়ে থাকেন তিনি। এ আকুলতা রোমান্টিক আকুলতা, যে আকুলতা নিয়ে রাধা মথুরার রাজা শ্রীকৃষ্ণের কথা ভেবে বিরহের কুয়াশায় পথ হারাত। অলঙ্কারের যবনিকা পড়ে গেছে, কিন্তু পড়েও যেন পড়ে নি। যবনিকার ওপারে এমন একটা জ্যোতির্ময় লোক দেখা যাচ্ছে যার জ্যোত অনির্বাণ।

দুম যদিও অন্যরকম, একেবারে অন্যরকম, তবু তাকেও ঠিক ওই রকম রোমান্টিক ভালোবাসাই বেসেছেন নবীন দত্ত। আরও বেশী করে বেসেছেন কারণ দুম আরও গোপনচারী অত্যন্ত স্বল্পভাষী সে। বাড়িতে কখন আসে কখন যায়, তাও জানা যায় না সবসময়ে। তার পদশব্দ বা কথা শোনবার জন্য নবীন দত্ত উৎকর্ণ হয়ে থাকেন, কিন্তু ক্বচিৎ শুনতে পান। খুব ছেলেবেলায় তাকে নিজে যখন পড়াতেন তখন লক্ষ্য করেছিলেন খুব কম সময়ের মধ্যে সে পড়া শিখে ফেলত আর বাকি সময়টা সে কাটাত বাড়ির চারদিকে ঘুরঘুর করে। ড্রয়ার খুলে কখনও এটা হাঁটকাচ্ছে, কখনও ওটা ঘাঁটকাচ্ছে, কিংবা বাড়ির সামনে যে ছোট মাঠটা ছিল সেই মাঠে গিয়ে হয় ঘুড়ি ওড়ান দেখছে, না হয় প্রজাপতির সন্ধান করছে। না-হয় হাঁ করে চেয়ে আছে আকাশের দিকে। প্রতিবেশীর বাড়িতে যাওয়া মানা ছিল, পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে বেশী মিশতে দিতেন না তিনি নিজের ছেলেদের। তবু বাইরে গিয়ে মাঠে দাঁড়িয়ে দুম যেন বাইরের বিশ্বের স্পর্শলাভ করবার চেষ্টা করত। কেমন যেন একটা উৎসুক কৌতূহলী ভাব। বয়ঃসন্ধিকালে কিশোরীদের মনের ভাব যেমন হয় অনেকটা তেমনি। আর একটা উপমাও তাঁর মনে হত। ঐতিহাসিক উপমা কিন্তু খুব লাগসই নয়। কোথায় যেন পড়েছিলেন যে প্রাচীনকালে ফিনিশিয়ানরাই সর্বপ্রথম সমুদ্রযাত্রা করেছিল। অকূল সমুদ্রে পাল তুলে নৌকো ভাসিয়েছিল অজানা দেশের উদ্দেশে, সমুদ্র আর আকাশ যে চক্রবাল রেখায় মিশেছে সেই সীমারেখা তারাই নাকি লঙ্ঘন করেছিল সর্বপ্রথম। তাদের এই চরিত্রের সঙ্গে দুমের খানিকটা মিল আছে, কিন্তু অমিলও অনেক। তারা ছিল অর্থগৃধ্নু বেনের দল, সংস্কৃতির ধার ধারত না, তাদের কোন পিরামিড নেই, টাওয়ার আর ব্যাবেল নেই, তাদের টাকার গুদাম টায়ার আর সিডন করে অবলুপ্ত হয়ে গেছে। দুম কিন্তু টাকাকড়ি বিষয়ে ঠিক উল্টো। খরচ করেই ফতুর চিরকাল। নবীন দত্ত ছেলেদের হস্টেলে রেখে পড়িয়েছিলেন। একদিন হঠাৎ

লক্ষ্য করলেন দুম বড্ড রোগা হয়ে গেছে। খোঁজ নিয়ে জানতে পারলেন টাকা ধার করে একটা টাইমপিস কিনেছে। সেই ধাব শোধ করছে জলখাবাব না খেয়ে। জিজ্ঞেস কবেছিলেন--টাইমপিসটা কোথা? টাইমপিসটা ছিল, কিন্তু গোটা ছিল না। দুম সেটাব যন্ত্রপাতি খুলে খুলে দেখেছিল। বললে---আমি ওটা আবার ঠিক কবে দিতে পারি কিন্তু দুটো স্ক্রু (screw) হারিয়ে গেছে। অনেক দোকানে খুঁজেছি পাই নি। নবীন দত্ত মুখে ক্রোধ প্রকাশ করেছিলেন, মনে মনে কিন্তু তিনি এমন একটা লোকে চলে গিয়েছিলেন যার আভাস আমরা মাঝে মাঝে পাই, কিন্তু যা প্রায়ই আমাদের নাগালের বাইরে থাকে।

হঠাৎ নবীন দত্তের মনে হল, আমি যদি বইয়েব ব্যবসা কবি দুম আমার সহকাবী হবে কি? হবে না। সে রসায়ন নিয়ে গবেষণা কবছে, তাব সঙ্গে দোকানদারী খাপ খাবে না। কবলে কি তিনি খুশী হতেন? না, হতেন না। দুম দোকানেব আপিসে বসে কেবানীগিবি কবছে বা বই বেচবাব জন্যে ইস্কুলে ইস্কুলে ঘুবে বেড়াচ্ছে এ কল্পনা করাও অসহ্য তাঁব পক্ষে। কিন্তু তবু তিনিই আবাব তাব সহকারিতাও কামনা কবতেন। তিনি জানেন সোনাব পাথব বাটি হওযা অসম্ভব, কিন্তু আশ্চর্য অসম্ভবের দিকেই মনটা ঝুঁকে পড়তে চায বাব বাব সেকালেব অ্যালকেমিস্টদেব মতো, যারা অ-সোনা থেকে সোনা বানাতে চাইত।

আবাব চাইলেন তিনি বিদ্যাসাগবেব ছবিব দিকে। দেখলেন চোখেব কোণে কৌতুকেব সে ছটা আর নেই। বিদ্যাসাগব যেন ভাবছেন, কি যেন ভাবছেন একটা। একটি ভাবনাই তিনি সারা জীবন ভেবেছিলেন— কি কবে এই হতভাগা দেশের উন্নতি কবা যায়। সেই ভাবনাটিই আবার পেয়ে বসেছে না কি তাঁকে। যে যুগে তিনি বিধবা বিবাহ দেবাব জন্য প্রাণপণ করেছিলেম। তাঁব একটা জোবালো যুক্তি ছিল ছোট ছোট মেযের সঙ্গে অনেক বুড়োব বিয়ে হয়, ফলে অকালবৈধবা হয় তাদের, তাদের আবার বিয়ে না দিলে তারা কু-পথে যাবে। মেয়েদেব লেখাপড়া শেখাতে চেয়েছিলেন, তারা যদি লেখাপড়া শিখে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পাবে তাহলে পেটের দাযে কু-পথে যাবে না। এখন বিদ্যাসাগব এ দেশের শত শত কুমাবী অবিবাহিতা মেয়েদের দেখতে পান নি? সচ্ছল অবস্থার ব্যভিচাবিণী মেয়েদের খবব রাখেন কি, যারা মোটরে চড়ে অভিসারে যায়— যাদের মধ্যে সধবা, বিধবা, কুমাবী সব আছে? হঠাৎ বিদ্যাসাগরের চোখের ভাষার রং বদলে গেল, মনে হল রেগে গেলেন তিনি। বাঙ্ময হয়ে উঠল তাঁর দৃষ্টি, তুমি আমার কথা ভাবছ কেন, নিজের চরকায় তেল দাও। পশু চিরকাল আছে, চিরকাল থাকবে, কামড়াবে, ল্যাথি ছুঁড়বে, পেখম মেলবে, নাচবে, কুঁদবে। ওদের নিয়ে আমি মাথা ঘামাই নি, চেষ্টা করেছিলাম অসহায় কতকগুলো ভদ্র মেয়েকে বাঁচাতে। তাদের মধ্যে কিছু বেঁচেছে, এইতেই আমি খুশী। তুমি আমার কথা ভেবো না, নিজের চরকায় তেল দাও। বইয়ের ব্যবসা যদি করতে চাও, নিজে ব্যবসাতে নাম। প্রায সঙ্গে সঙ্গেই সেই ছেলেটি এসে হাজির হল। নবীন দত্ত বললেন---বেশ, নোট তুমি বার কর। আমি নতুন নোটও তোমাকে লিখে দেব। নগদ টাকা দিতে হবে না। আমি তোমার দোকানে গিয়ে বসব রোজ। যা লাভ হবে আধাআধি আমরা নেব। তুমি রাজী আছ?

ছেলেটি একটু থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

তারপর বলল 'আমাদের দোকানে আপনি বসতে পারবেন না স্যার। সে একটা গলির গলি তস্য গলির মধ্যে। কোনক্রমে এককালি ঘর পেয়েছি। উপরে নীচে, আশেপাশে সব দোকান চারদিকে ময়লা, ভ্যাপসা গন্ধ, মানুষগুলো পোকার মতো কিলবিল করছে, আপনি সেখানে এক মিনিটও বসতে পারবেন না। আপনার দোকানে বসবার দরকার কি স্যার?' 'আমি নিজেই দেখতে চাই ব্যবসাটা। তাতে তো তোমাদের সুবিধেই হবে। হিসেবপত্র আমিই রাখব। তোমরা বাইরে ঘুরবে। কেন সেখানে বসতে পারব না বলছ? আমি এককালে বস্তিতে খোলার ঘরে থাকতুম।' রাখাল হেসে বললে, 'আপনাদের আমলে বস্তিও বাসযোগ্য ছিল। এখন ভদ্রপাড়াও বাসের অযোগ্য হয়ে গেছে। আমাদের যেখানে দোকান সেটা তো একটা নরক।' নবীন দত্ত চটে উঠলেন। বললেন, 'আমি বাপু নরকেই যদি বসতে পারি তোমার আপত্তি কেন। তোমার দোকান যাতে ভালোভাবে চলে সেই চেষ্টাই করব বলে ওখানে বসতে চাচ্ছি। শুধু আমার নামটা ধার দেব কেন, ব্যবসাটার যাতে উন্নতি হয় সেই চেষ্টা করব। তোমার আপত্তি কেন এতে।' রাখাল চুপ করে রইল। তারপর বলল—'একটা কথা জিজ্ঞেস করছি স্যার, কিছু মনে করবেন না। নবীন দত্ত বললেন, 'কিছু মনে করব কি না, সেটা নির্ভর করছে তুমি কি জিগ্যেস করবে তার উপর। অত ভণিতার দরকার কি কি বলতে চাও বল না।' রাখাল মাথা চুলকে একটু ইতস্তত করে বলল—'আপনি কি অবিশ্বাস করছেন আমাদের? তাই কি দোকানে বসতে চাইছেন?' নবীন দত্ত হেসে ফেললেন। বললেন 'বিশ্বাস অবিশ্বাসের প্রশ্নই আসে না এখন। কিছুদিন না মিশলে তো বোঝাই যায় না কে কেমন। তবে ভদ্রলোকমাত্রেই বিশ্বাস করতে চায়। ঠকতে পারি এ সম্ভাবনা আছে জেনেও করতে চায়। তোমাকে পড়িয়েছি, ছাত্র হিসাবে তুমি ভালো ছিলে তোমাকে অবিশ্বাস করবার কোনও কারণ তো নেই। আমি দোকানে বসতে চাইছি, কারণ আমিও একটা কাজ চাই। দোকানে বসেই লেখাপড়া করব। তোমাদের ব্যবসাটাও দেখব। তার মানে তোমাদের মতো আমিও এখন বেকার। আমিও একটা কাজ চাই।' রাখাল বললে - 'আপনি কিন্তু স্যার ওখানে বসে লেখাপড়া করতে পারবেন না। চারদিকে খালি হট্টগোল।' এর পর নবীন দত্ত কি বলতেন কি করতেন তা আর জানা গেল না। দুম দুম করে দুম এসে হাজির হল। বলল, "বাবা, আজই আমি জার্মানি যাচ্ছি। কিছু টাকা তোমার কাছে দিয়ে যাচ্ছি, হঠাৎ যদি কোনও দরকার হয় খরচ কোরো, আর তুমি বাড়িতে থেকো। মায়ের শরীরটা ভালো নয়। দিদিমার শরীর আরও খারাপ। দরকার হলে কোন বড় ডাক্তারকে ডেকো।' নবীন দত্ত হকচকিয়ে গেলেন। বললেন 'হঠাৎ জার্মানি যাচ্ছিস কেন? এত টাকাই বা পেলি কোথা?'

'আমি রেল নিয়ে কিছু রিসার্চ করেছি। পেপারগুলো ওদের পাঠিয়েছিলাম। ওরা আমার সঙ্গে এ বিষয়ে সামনাসামনি আলাপ করতে চায়। টাকা ওরাই দিয়েছে আমি বলেছিলাম বাড়িতে কিছু টাকা রেখে না গেলে আমি যেতে পারব না। ওরা সে টাকাও দিয়েছে। হয়তো পরে আমার মাইনে থেকে অ্যাডজাস্ট করে নেবে। জানি না—'

নবীন দত্ত নোটের গোছার দিকে চেয়ে বললেন—'কত টাকা আছে এতে?'

'পাঁচ হাজার টাকা।'

নবীন দত্ত গুম্ হয়ে রইলেন খানিকক্ষণ।

'কখন যাবি?'

'দুঘন্টা পবে আমার প্লেন ছাড়বে।'

'পাসপোর্ট, ভিসা?'

' সে হয়ে গেছে। আমি চললুম তাহলে।'

প্রণাম করে দুম্ চলে গেল। তখখুনি ফিরে এল আবার।

'আমি রাঘবকে বলে গেলাম সে এসে তোমাদেব রোজ খোঁজখবব নেবে। যদি কিছু দরকার হয় তাকেই বোলো।'

'ব্যঘব কে?'

'রাঘব আমাব বন্ধু। আমার আপিসে কাজ কবে।'

'এসব হাঙ্গামা করতে গেলে কেন?'

'হাঙ্গামাটা কি?'

'একজন ভদ্রলোক বোজ আসবেন আর জিগ্যেস কববেন কি আমাদেব দবকাব এই বাধ্যবাধকতার মধ্যে কেন ফেলছ তাঁকে? আর সব দবকাব কি সকলকে বলা যায সব সময়ে—তুমি মানা কবে দাও ওঁকে।'

'দবকার বোঝ, তুমিই মানা করে দিও। চললুম—' আবাব নেমে গেল দুম্।

নবীন দত্ত চুপ করে রইলেন। রাখাল একটু মুচকি হেসে বললে—'উনিই কি আপনাব ছেলে এ. দত্ত?'

'এ. দত্ত বলছ কেন? অমল দত্ত, অধীর দত্ত, অবিনাশ দত্ত, অসভ্য দত্ত, অলস দত্ত, অগা দত্ত —সবাই এ-দত্ত। ও তার একটাও নয। ও হচ্ছে অহঙ্কাব দত্ত। আমাব নোটবুকে তুমি যেন এন. দত্ত ছেপো না। নবীন দত্ত ছাপবে।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, নবীন দত্তই ছাপব। নামটা ছাপবার অনুমতি দিচ্ছেন তাহলে?'

'দিচ্ছি, কিন্তু একটি শর্তে। তোমাদের দোকানে গিয়ে যখন বসবার উপায় নেই, আমার ছেলে না ফেরা পর্যন্ত বাড়িতেই থাকতে হবে আমাকে, কিন্তু দোকানের সব কাগজপত্র আমার কাছে প্রতি রবিবারে নিয়ে এস। আমি বাড়িতে বসেই তোমাদের দোকানের খবর রাখব। খবর রাখব তোমাকে অবিশ্বাস করছি বলে নয়। কর্তব্য বলে।'

রাখাল বলল—'বেশ, তাই হবে। এখন তবে যাই।'

প্রণাম করে রাখাল চলে গেল।

নবীন দত্ত চুপ করে বসে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর নিজের জাবদা খাতাটা পেড়ে লিখলেন—

দুম্ দুম্ করে জার্মানি চলে গেল। আমাদের দেশের অতীশ দীপঙ্কর তিব্বত গিয়েছিলেন অনেক কষ্ট করে জ্ঞান আহরণের জন্য। পায়ে হেঁটে হিমালয়ের শীতকে উপেক্ষা করে গিয়েছিলেন তিনি। আমাদের সব ছেলেরা এখন যান এরোপ্লেনে করে। অতীশ দীপঙ্করের

সময় প্লেন থাকলে তিনিও হয়ত প্লেনেই যেতেন। অতীশ দীপঙ্কর আর দুমের উদ্দেশ্য একই—জ্ঞান আহরণ। তবু কিন্তু কেন জানি না, অতীশকে উচ্চতর আসনে বসাতে ইচ্ছে করছে আমার। মনে হচ্ছে—রেল, প্লেন, জাহাজ যদি না থাকত তাহলে কি দুম জার্মানি যেত? বলতে ইচ্ছে করছে—যেত নিশ্চয়ই যেত কিন্তু আমার মনের মধ্যে অতিঅভিজ্ঞ হতাশাবাদী যে লোকটি আছে, সে বলছে যেত না। এ সংশয় নিরসন করা যাবে না। সুতরাং এইখানেই থামলুম। এই পাঁচ হাজার টাকা নিয়ে কি করি এখন? ব্যাঙ্কে রাখব? তাহলেই তো ইনকম ট্যাক্সের লোকেরা ধরবে। ঠিক আছে, আমার ঘরে যে বড় পিতলের ফুলদানীটা আছে, যাতে এখন ফুল সাজাবার ক্ষমতা নেই আমার, যাতে এখন নানাবিধ আবর্জনা জমে আছে, সেইখানেই রাখব টাকাগুলোকে। রেখে তার উপর একটা ময়লা রুমাল গুঁজে দেব। ওর চেয়ে বেশী সাবধানতা অবলম্বনের দরকার নেই। আমার ঘরে কেউ আসে না। দুম্ বলে গেছে আমি যেন বাড়ি থেকে না বেরুই। তার মায়ের শরীর খারাপ, তার দিদিমা এখন-তখন। তা কি আমি জানি না? তাঁদের কিছু হলে ডাক্তার ডাকতেই তো ছুটোছুটি করতে হবে আমাকে। দূরে শুনতে পাচ্ছি একদল চোং-প্যান্ট-পরা ছেলে হই হই করছে ঃ মাঠে হাল্লা করছে ঃ ক্রিকেট খেলছে তারা। তাদের এ উৎসাহ আমার মনে উদ্দীপনা সঞ্চার করছে না, রাগ হচ্ছে। তার মানে, আমি ওদের কাছ থেকে অনেকদূর সরে এসেছি। বুড়ো হয়ে গেছি। বুড়ো হওয়াটা কোন অপরাধ নয়, স্বাভাবিক নিয়মে সবাই বুড়ো হয়। বুড়ো বয়সেরও একটা আলাদা রূপ আছে, যা তরুণদের নেই, কিন্তু সেই রূপকে অক্ষত অক্ষুণ্ণ রাখতে হলে সংসারের হই-হুল্লোড় থেকে দূরে থাকতে হয়। আমাদের দেশের জ্ঞানীরা বিধান দিয়েছিলেন পঞ্চাশোর্ধ্বে বনং ব্রজেৎ। কিন্তু এ যুগে সে বন নেই। আছে নানা রকম শৌখীন বন সেখানেও ভীড়, সবাই গিয়ে পিকনিক করে। তাই নিজেই নিজের চারদিকে একটা 'তফাৎ যাও' মনোভাব সৃষ্টি করেছি। কারো কাছে যাই না, কাউকে কাছে আসতেও উৎসাহ দিই না। তবু আসে, ক্রমাগত আসে। আমি তট, ওরা ঢেউ। ক্রমাগত ধাক্কা মারছে।'

জাবদা খাতাটা মুড়ে রেখে আবার চুপ করে বসে রইলেন। বিদ্যাসাগরের দিকে চাইলেন একবার। বিদ্যাসাগর যেন বললেন, দেখ বাপু, আর যা-ই কর, নাকে কেঁদো না। বিধবা-বিবাহ দিতে গিয়ে আমার যখন ৮৪,০০০্ টাকা দেনা হয়েছিল তখনও আমি নাকে কাঁদিনি। আমার হয়ে যাঁরা নাকে কেঁদে জনসাধারণের ভিক্ষাপাত্র প্রসারিত করছিলেন তাঁদের আমি মানা করেছিলাম। মনে হচ্ছে তুমিও কৃপা ভিক্ষা করছ। ভিক্ষা পেলেও সে কৃপা তুমি নেবে কেন? তোমার ছেলের টাকাটা রেখে দাও সে এলে ফেরত দিয়ে দিও। ও তোমাকে ঘরে বন্দী হয়ে থাকবার হুকুম দিয়ে গেল। তোমার স্বাধীনতার দাম কি মাত্র পাঁচ হাজার টাকা?'

খাতাটা তুলে রেখে ঘড়ি দেখলেন দেড়টা বেজেছে। এইবার খেতে হবে। ইকমিক কুকারে চাল-ডাল, দুধ, আলু, পটোল চড়িয়ে দিয়েছেন সকালে। এতক্ষণে হয়ে গেছে নিশ্চয়। উঠে কুকারটায় হাত দিয়ে দেখলেন। এখনও একটু গরম আছে। খেতে যাবেন এমন সময় দুমের মা এসে হাজির হল। তাঁর হাতে একটা বাটি।

'মা আজ আদা লাউ খেতে চেয়েছিলেন। তাই করেছিলাম, একটু। তোমার জন্যেও এনেছি, তুমি তো ভালোবাসতে আগে—'

প্রফুল্ল হলেন নবীন দত্ত।

'এখনও বাসি। দুম তোমার সঙ্গে দেখা করে গেছে?'

'গেছে। আমার ভালো লাগছে না। কি যে ও করবে শেষ পর্যন্ত ভগবানই জানেন। অত দূর দেশে এখন হঠাৎ গেলই বা কেন, তা-ও বুঝতে পারছি না। বায়েদের ছেলেটা বিলেত গিয়েছিল আব ফেরে নি। সেইখানেই বিয়ে করে বসবাস করছে। আর আসবেও না শুনছি—'

'এ দেশে ফিবে কি লাভ হত। এ দেশে আমরা কি সুখে আছি? এখানে তোমার ছেলের উন্নতি হলে কেউ খুশি হত না। সকলেরই বুক জ্বলত, চোখ টাটাত। বিষকুম্ভ পয়োমুখ আমাদের আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবেরা—। সামনে খুব গদগদ পিছনে ফিরলেই ভুরু নাচায়।'

'কিন্তু এদের মধ্যেই আমরা এতকাল বেঁচে আছি তো। এদের নিয়ে আমাদের সাধ-আহ্লাদও মিটেছে এতকাল।'

'আমাদের পূর্বপুরুষরা মধ্য এশিয়া থেকে এদেশে এসেছিলেন, জান?'

'তাই না কি?'

'দাও তোমার তবকারিটা শুধু মুখেই খেয়ে ফেলি। আমার ওই ঘ্যাঁটেব সঙ্গে ভালো লাগবে না।'

পারুলবালা বাটিটা দিলেন।

বললেন -'আমিই তো তোমাকে ফুটিয়ে দিতে পাবি দুটো। কিন্তু তোমাব শখ ওই রকম ঘ্যাঁট কবে খাওয়া।'

'চমৎকাব হয়েছে আদা লাউ। সেদিনেব পোস্তটাও বেশ হয়েছিল। মা কেমন আছেন এখন?'

'মা আর বাঁচবেন না। আমরা যত্নেব ত্রুটি কবছি না। তবুও মনে শান্তি নেই। ছেলেদের নাম করছেন দিনরাত। ওরা তো একবার এসে খোঁজও কবে না।'

নবীন দত্ত কোন উত্তর দিলেন না। আদা লাউয়েব বাটিটা চেটে চেটে খেতে লাগলেন। শালাদের সম্বন্ধে কোন মন্তব্য করে পারুলবালার মনে কষ্ট দিতে চান না তিনি।

পারুলবালাকে বললেন, 'ইকমিকটা খোল। খাওয়াটা শেষই করে ফেলি। বেরুতে হবে একবার।'

পারুলবালা ইকমিকটা খুলে দেখলেন একটা বাটিতে রয়েছে কি রকম যেন একটা থকথকে জিনিস। আর একটা বাটিতে একটা ঝিঙে, একটা আলু আর একটা বেগুন। নীচের বাটিতে ডাল খানিকটা। মুসুর ডাল।

'নামিয়ে ওই থালায় ঢেলে দাও। সব চটকে খেয়ে ফেলব।'

'নুন তেল দেবে না।'

'দরকার নেই।'

'ওপরেব বাটিতে এটা কি?'

'চরু। ঘি দুধ আর চাল। ভালো চরু ইকমিকে হয় না। যা হয় বেশ লাগে।' পারুলবালা সবগুলো একটা কানা উঁচু থালায় ঢেলে দিলেন। সেগুলো চটকে ফেললেন নবীন দত্ত।

তাবপব সপাসপ কবে খেযে ফেললেন সেটা। পাকলবালা নীববে দেখলেন, হঠাৎ তাঁব বুকেব ভেতবটা মুচড়ে উঠল। মনে হল এই লোকটাব খাওযাব তবিবৎ কববাব জন্য তাকে চব্বিশ ঘন্টা ব্যস্ত থাকতে হত। মাছ, মাংস নানাবকম নিবামিয তবকাবি, ক্ষীব, দই সব বকম ব্যবস্থা বাখতে হত। আব আজ ওই লোকটা যেন পিণ্ডি গিলছে।

বললেন —'এসব ভালো লাগে? আগে তোমাব খাওযাব কত শখ ছিল।'

'আগে তো কত কিছু ছিল। মাথায কোঁকড়া চুল ছিল, এখন আছে? আগে ফুলেল তেল মাখতাম এখন মাখি? আগে মাসে বাবোশো টাকা বোজগাব কবতুম, এখন কবি, পৃথিবীব নিযমই এই। সব বদলে যায। তুমি বদলাও নি? তোমাব মাথাব সামনে টাক পড়েছে, গাল তুবড়ে গেছে, কোমবে ব্যথা, বুক ধড়ফড়। আগে এসব ছিল? আগেব কিছুই থাকে না। ওই কৌটোটাতে দেখ তো হবতুকি আছে কিনা—'

পাকল কৌটোটা তাক থেকে পেড়ে খুলে দেখলেন।

'না নেই। কাল মুখপুড়িকে দিয়ে আনিযে নেব।'

'কী এখুনি বেবব। কিনে আনব। মুখপুড়িকে ফবমাস কোবো না, ও দাম নিতে চায না। তোমাব খাওযা হয়েছে?'

'হযেছে।'

'শুযে পড়গে তাহলে। আমি বেবব।'

নবীন দত্ত উঠে মযলা খদ্দবেব পাঞ্জাবিটা পবে ফেললেন।

পাবলবালা উঠে নেমে গেলেন। নবীন দত্ত স্যাণ্ডালটা পাযে দিতে গিযে দেখলেন একটা জুতোব স্ট্র্যাপ প্রায ছিঁড়ে গেছে। তখনই মোটা ছুঁচ আব মোটা সুতো বাব কবে দুটো ফোড় দিযে নিলেন স্ট্র্যাপটাতে। বাস্তায মুচি পেলে সাবিযে নেবেন। টাকা পযসাব ছোট্ট থলিটি হাতে নিযে ঘবে তালা দিযে বেবিযে পড়লেন নবীন দত্ত। কিন্তু চাবতলায দুমেব ঘবেব সামনে এসে দাঁড়িযে পড়লেন আবাব। দুযাবটা হা হা কবছে খোলা। কপাটটা বন্ধ পর্যন্ত কবে যায নি ছেলেটা। ঘবেব ভিতব ঢুকলেন নবীন দত্ত। ঢুকেই দেখলেন ঘবে অসংখ্য সিগাবেটেব টুকবো। কোণে ক্যামেবাটা বযেছে। মাটিতে একটা আধ মযলা চাদব ঢাকা বিছানা। বিছানাব এলোমেলো অনেক বই। ঘবেব দেওযালেও বইযেব শেলফ। সব বই ঠাসা। বিজ্ঞানেব বই। তিনি কিছু বোঝেন না। হঠাৎ যেন নজবে পড়ল একটা আলমাবিতে কিছু আধুনিক ইংবেজি নাটক বযেছে। পাশেব ঘবে ছবিব স্তূপ। চুপ কবে খানিকক্ষণ দাঁড়িযে বইলেন নবীন দত্ত। কেমন যেন অসহায বোধ কবতে লাগলেন। আবও মিনিটখানেক দাঁড়িযে বইলেন চুপ কবে। তাবপব নেবে গেলেন।

বাস্তায প্রচণ্ড ভিড় এই দুপুবেও। মযদানে কি একটা হচ্ছে না কি। পিলপিল কবে লোক ছুটছে সেদিকে। কেউ কাউকে চেনে না, অথচ পাশাপাশি ছুটছে। নবীন দত্তকে ধাক্কা দিযে বেবিযে গেল এক গগলস পবা ছোকবা। হনহন কবে চলেছে দিগ্বিদিক জ্ঞান-শূন্য হযে। চাকবিহীন বেকাব, পেটে বিদ্যে নেই, কিন্তু চালচলন দেখে মনে হয এক একটি নবাব। নবীন

দত্ত ভাবলেন এ আমাদেরই দোষ, আমরা ওদের গড়তে পারি নি, শিব গড়তে বাঁদর গড়েছি। হঠাৎ একটি মেয়েকে দেখলেন। বয়স কত তা বোঝার উপায় নেই। মুখ দেখে মনে হয় তিরিশ পেরিয়ে গেছে। বব্ করা চুল, চোখে কাজল, পিঠের অনেকখানি দেখা যাচ্ছে, কাপড়টা পরেছে নাভির অনেক নিচে. হাতে গয়না নেই, আছে শুধু একটা ঘড়ি। আর এক হাতে শিকলের মতো কি একটা জড়ানো। মুখে খুকী খুকী ভাব। স্যান্ডাল টেনে টেনে চলেছে এদিক-ওদিক চাইতে চাইতে। সে যুগে হলে এ জাতীয় চেহারাকে পতিতার পর্যায়ে অনায়াসে ফেলে দিতে পারতেন, কিন্তু এ যুগে তা যায় না। কারণ অধিকাংশেরই ওই বেশ। এ দেশের অধিকাংশই বেশ্যা হয়ে গেছে এ কথা ভাবতে পারলেন না নবীন দত্ত। মনে মনে রবীন্দ্রনাথের সেই লাইনটা আওড়ালেন—ও আমার, এ তোমার পাপ। তারপর তিনি আর কোনও দিকে না চেয়ে হনহন করে চলতে লাগলেন। যাচ্ছিলেন তিনি ধীরেশ বিশ্বাসের কাছে। লোকটি তাঁর পেনসন-উদ্ধারের ব্যাপারে খুব সাহায্য করেছে তাঁকে। তার একটি মেয়ে আছে, তাঁরই ছাত্রী, তার জন্যে খুব ভাল একটি পাত্রের খোঁজ পেয়েছেন তিনি। পাত্রের বাবার সঙ্গে আলাপ আছে নবীন দত্তের। কিন্তু তিনি থাকেন টালিগঞ্জে। তাঁর ফোন আছে, ধীরেশেরও আছে। ধীরেশের বাড়িতে গিয়ে তাকে ফোন করবেন বলেই যাচ্ছিলেন। নবীন দত্ত যেতে যেতে ভাবছিলেন—ফোন তো করব, কিন্তু ভদ্রলোক আমার কথা কি শুনবেন। এদেশে সম্বন্ধ করে বিয়ের ব্যাপার আগেকার চেয়েও জটিল হয়ে গেছে। আগে কুরূপা মেয়েকে টাকা দিয়ে পার করা যেত। আজকাল কুরূপা মেয়েদের বিয়েই হয় না। হয়, যদি তারা নিজেরাই ফাঁদ পেতে কাউকে ধরতে পারে। আমেরিকায় নাকি ছেলেমেয়েরা date করে সম্মিলিত হয়, সম্মিলন-অভিসারে যাওয়ার আগে মায়েরা তাদের পিল খাইয়ে দেন যাতে তারা গর্ভবতী না হয়ে পড়ে। ও দেশের কুৎসিত সমাজ চিত্র ওদেশের এক নাট্যকার টেনেসি উইলিয়ামস লিখেছেন তাঁর 'এ ক্যাট অন এ হট টিন রুফ' নাটকটাতে। সেই সমাজের নকল করছি আমরা। ভদ্র মেয়েরা সিনেমায় ঢোকবার জন্য উৎসুক, চাকরি করবার জন্যে 'কিউ' দিচ্ছে নানা অফিসের দরজায়, দেহও বিক্রি করছে অনেকে, আর তাদের দেহকে লক্ষ্য করে সাহিত্য সৃষ্টি করছে মনে মনে লম্পট সাহিত্যিকের দল। অন্যমনস্ক হয়ে হাঁটছিলেন নবীন দত্ত। হঠাৎ ফুটপাথের উপর হোঁচট খেলেন, তাঁর অমজবুত স্ট্র্যাপটা ছিঁড়ে গেল। টাল সামলাতে না পেরে পড়ে গেলেন এক ছোকরার ঘাড়ে। সে সহানুভূতি দেখাল না। বলল—রাস্তা দেখে চলতে পারেন না মশাই। নবীন দত্ত মাপ চাইলেন তার কাছে। স্যাণ্ডাল দুটো খুলে হাতে নিলেন। হাতে নিয়েই পথ চলতে লাগলেন। চিৎপুরের সেই চেনা মুচিটার কাছে যাবেন, বরাবর তার কাছেই জুতো সারান। খালি পায়েই হাঁটতে লাগলেন। মুচিটি যেখানে বসে তার পাশেই একটি ডাক্তারবাবুর চেম্বার। তাঁর সঙ্গে তেমন আলাপ নেই নবীন দত্তের। আলাপ আছে তাঁর কম্পাউন্ডারটির সঙ্গে। কম্পাউন্ডারের ভাই তাঁর ছাত্র। ছেলেটি পড়াশোনায় তেমন ভালো নয়, কিন্তু রাজনীতিতে পরিপক্ক। উগ্র কমিউনিস্ট। সম্ভবত গরীব বলে। কিন্তু ছেলেটির মধ্যে একটি আন্তরিকতা লক্ষ্য করেছেন নবীন দত্ত, তাই তাকে ভালোবাসেন। প্রায়ই পড়া বলে দেন তাকে, বিনা পয়সায়। কম্পাউন্ডারবাবু তাই খাতির করেন তাঁকে।

'আসুন, আসুন মাস্টার মশাই।'

মুচিকে জুতো জোড়া দিয়ে ডিসপেন্সারিতে উঠে বসলেন নবীন দত্ত। মুচি জুতোটা উলটে পালটে দেখলে অনেকক্ষণ ধরে। তারপর বললে—

'এ জুতো ফেলে দিন বাবু। এ আর চলবে না।'

'সে আমিও বুঝেছি। কিন্তু এখন জুতো কেনবার পয়সা নেই। আগে ন সিকে আড়াই টাকা খরচ করলে চীনেবাজারে ভালো জুতো পাওয়া যেত। এখন কুড়ি বাইশ টাকার কমে কোনও জুতো পাওয়া যায় না। এটাই একটু মেরামত করে দাও বাবা তুমি '

'একে রিসোল করতে হবে, স্ট্র্যাপগুলোও নতুন দিতে হবে। মেরামতি খরচ পড়বে তিন টাকা—'

কম্পাউন্ডারবাবু বললেন—'খরচ যা-ই পড়ুক। ওটা করে দাও তাড়াতাড়ি।'

নবীন দত্ত টাকার থলিটা বার করে দেখলেন তাঁর কাছে কত আছে। তিন টাকা আছে কি না। খুচরোই বেশী ছিল। গুনে গুনে দেখলেন তিন টাকা আশি নয়া আছে। নিশ্চিন্ত হলেন। আশি নয়ায় ধীরেশের বাড়ি গিয়ে পৌঁছতে পারবেন। তারপর ধীরেশের কাছ থেকে কিছু ধার করে বাড়ি ফিরবেন।

ধীরেশ বিশ্বাস রোগা ছিপছিপে লোক। বয়স প্রায় আশির কাছাকাছি। গোঁফ দাড়ি কামানো লম্বা গোছের মুখ। নাকটি খুব টিকালো। মাথায় চুল বেশী নেই, যা আছে তা শাদা। সোজা-ভাবে আঁচড়ানো। কখনও তেড়ি কাটেন নি। দাঁত পড়ে নি এখনও। চোখের দৃষ্টিও ভালো আছে। পড়বার সময় কেবল তিনি চশমা ব্যবহার করেন। ব্রিটিশ আমলে উঁচু সরকারি কাজ করতেন। এখনও তাঁকে পরিচিত পুরাতন গভর্নমেন্ট কর্মচারীরা খাতির করে। তাই তিনি নবীন দত্তের পেনসন আর প্রভিডেন্টফন্ডের ব্যাপারে সাহায্য করতে পেরেছেন। আর একটা ব্যাপার, ধীরেশ বিশ্বাস নাস্তিক প্রকৃতির লোক। ঈশ্বরের প্রতিই শুধু নয়, সব মানুষের প্রতিও তাঁর যেন একটা অবিশ্বাসের ভাব। একমাত্র ব্যতিক্রম বোধ হয় নবীন দত্ত। তিনি তার নামই দিয়েছেন একসেপশন (exception) দত্ত। তিনি কাউকে বিশ্বাস করেন না। বলেন, সবাই চোর, স্বার্থপর, মতলববাজ, তিনি কাউকে শ্রদ্ধা করেন না, বলেন শ্রদ্ধেয় কেউ নেই, সব ধড়িবাজ ভণ্ড। কিন্তু নবীন দত্তকে তিনি বিশ্বাস করেন, শ্রদ্ধাও করেন। এতদিন তাঁকে দেখছেন কোনদিন তার মধ্যে মেকি কিছু দেখতে পান নি। আন্তরিকতার অভাব দেখতে পান নি। এই লোকটির সত্যনিষ্ঠা মুগ্ধ করেছে তাঁকে। কখনও কথার খেলাপ করেন নি, সত্যকথা স্পষ্টভাষায় বলতে ভয় পাননি। মাঝে মাঝে বলেন—'একসেপ্‌শন দত্ত, তুমি বাঙালীর পোশাকে সায়েব একজন। সাহেবদের মধ্যেও খারাপ অনেক আছে, কিন্তু ভালো যারা আছে তারা পয়লা নম্বরের। তুমি সেই পয়লা নম্বরের লোক। কি করে এদেশে জন্মালে হে।'

নবীন দত্ত উত্তর দিয়েছিলেন, 'পয়লা নম্বরের সাহেবের উপমা দিলেন, আমার কিন্তু মনে হচ্ছে ওটা অপমান। আমাদের দেশেও অনেক পয়লা নম্বরের লোক ছিলেন, এখনও আছেন, যারা প্রণম্য। তাঁদের পায়ের নখেরও যুগ্যি নই আমি। আমার স্বপক্ষে এইটুকু শুধু

বলতে পারি আমি ভালো থাকবার চেষ্টা করেছি, কিন্তু সব সময়ে পারি নি। আর একটা অনুরোধ, আমার প্রশংসা কখনও আমার সামনে করবেন না। বড্ড অস্বস্তি লাগে।'

ধীরেশ বিশ্বাস বললেন, 'বেশ তোমার প্রশংসা করব না। কিন্তু তুমি যে বললে এখনও দেশে প্রণম্য লোক আছেন—একটা নাম কর দিকি—'

নবীন দত্ত একজনের নাম করলেন।

'ও এই তোমার প্রণম্য লোক? ও লোকটা 'রেড এরিয়া'য় রেগুলার যাতায়াত করে জান এ খবর? আমি পুলিসের লোক, অনেক প্রণম্য ব্যক্তির হাঁড়ির খবর রাখি।'

নবীন দত্ত একটা আশ্চর্য উত্তর দিয়েছিলেন তাকে।

বলেছিলেন—' তা সত্ত্বেও উনি প্রণম্য। যার বাড়িতে ভালো রান্না হয় না, অথচ যিনি খাদ্যরসিক, তিনি যদি হোটেলে নিজের পয়সা খরচ করে খান, তাতে আমি অন্যায় কিছু দেখি না। যে লোকটির নাম করলাম তিনি একজন দিকপাল বিদ্বান তো বটেই, মানুষ হিসেবেও খুব বড়। অনেক গরীব ছাত্রকে পড়ান, অনেক দুঃস্থ আত্মীয়কে অর্থ সাহায্য করেন, পারতপক্ষে বিদেশী জিনিস কেনেন না, কারো খোশামোদ করেন না, তার প্রকাণ্ড বাড়ির একতলাটা বিনা পয়সায় ছেড়ে দিয়েছেন নাইট স্কুল করবার জন্যে। তাঁর স্ত্রী বিয়ে হবার এক বছর পরেই মারা যান। ছেলেপিলে নেই। তবু বিয়ে করেন নি। আব একটা প্রধান গুণ যা আজকাল প্রায় বিরল হয়ে এসেছে আত্মপ্রচার উনি করেন না কখনও। সেজন্য অনেক লোক তাঁর নামও জানে না।'

ধীরেশবাবু হেসে জবাব দিয়েছিলেন—'সবই মানলুম। কিন্তু ওই 'রেড এরিয়া'ব কথাটা কিছুতে ভুলতে পারি না। এক কলসী দুধে চোনা পড়ে গেছে খানিকটা। আমাব কাছে মনুষ্যত্বের প্রধান লক্ষ্য চরিত্রবল। আমি পঞ্চান্ন বছব বয়সে বিয়ে করেছিলাম। তার কারণ আমার ভাইদের মানুষ করতে হয়েছিল, বোনদের বিয়ে দিতে হয়েছিল। তাই যৌবনে বিয়ে করবার অবসর পাই নি, কিন্তু তা বলে বিপথে যাই নি একদিনও। যাওয়ার সুযোগ ছিল, পুলিসে চাকরি করতাম। আমাদের ওপরওলা টেগার্ট সাহেবও যেতেন একটি মেয়ের কাছে। সেজন্য ঘৃণা করতাম তাকে। বিয়ের পরও বউ আমার বাঁচল না। ওই একটি মেয়ে প্রসব করে মারা গেল। ওই মেয়েটিকেই আগলাচ্ছি এখন। আর বিয়েও করি নি রেড এরিয়াতেও যাই নি—'

এসব আলোচনা অনেক দিন আগে হয়েছিল।

নবীন দত্ত প্রথমে ছিলেন শিশুর মাস্টার মশাই, পরে হয়েছিলেন কাকাবাবু। শিশু এখন শিশু নেই, এম এ পাস করেছে, ডক্টরেট পেয়েছে বয়স প্রায় তিরিশের কাছাকাছি। এখন ধীরেশ বিশ্বাসের মহাচিন্তা শিশুর বিয়ে নিয়ে। আসলে তিনি চান না যে শিশু বিয়ে করে অন্য কোথাও চলে যাক। এ-ও চান না কোন ছোকরা তাঁর বাড়িতে এসে ঘর-জামাই হয়ে থাকে। শিশু অন্য কোথাও চাকরি করুক, সকাল দশটা হতে না হতেই নাকে মুখে যাহোক চারটি গুঁজে সন্ধ্যা পর্যন্ত আপিস করুক—এটাও তাঁর মনঃপূত নয়। তিনি চান শিশু সারা দিনরাত তাঁর কাছেই ঘুরঘুর করুক, তাঁকে বকুক, তাঁর নানা অপটুতার বন্যায় পটুতার বাঁধ হয়ে

হাযে-হাল দাঁড়িয়ে থাকুক। কিন্তু ধীরেশ বিশ্বাস এসব কথা কাউকে বলতে সাহস করেন না। তাঁর সব চেয়ে ভয় নবীন দত্তকে। নবীন দত্ত অনেক দিন থেকেই বলছেন—শিশুর এবার বিয়ে দেওয়া দরকার। ধীরেশ বিশ্বাসও বলেছেন, হ্যাঁ, দেখ না একটা ভালো ছেলে। ভালো ছেলের অনেক সন্ধান এনেছেন নবীন। কিন্তু ধীরেশ একটা না একটা খুঁত বার করে নাকচ করে দিয়েছেন তাদের। কেউ বেঁটে, কেউ বেশী লম্বা, কেউ খুব গরীব, কেউ বেশী বড়লোক, কারও মায়ের হাঁপানি কারো ঠাকুর্দা যক্ষ্মায় মারা গিয়েছিলেন, কেউ বেশী নর, কারো ইচ্ছে জার্মানি, ইংলণ্ড বা আমেরিকায় গিয়ে বসবাস করবে—এই ধরনের নানা অজুহাতে ধীরেশ একের পর এক অনেক ভালো পাত্রকে অমনোনীত করেছেন। তাঁর পক্ষে খুঁত বার করা সহজ, কারণ গভর্নমেন্টের পুলিস বিভাগের (বিশেষ করে আই, বির) অনেকের সঙ্গে তাঁর আলাপ। পাত্রের খবর পেলেই তাদের লাগিয়ে দেন। তারা একটা না একটা খুঁতের খবর এনে হাজির করেন। নবীন দত্তও কিন্তু না-ছোড়। তিনি একের পর এক পাত্রের খবর এনে যাচ্ছেন। সৎপাত্রের খবর পেলেই তিনি তার সঙ্গে গিয়ে দেখা করেন। কথাবার্তা কয়ে তার যদি ভালো লাগে তাহলে তিনি প্রথমে শিশুকে জিগ্যেস করেন- এই পাত্র তোর পছন্দ হবে? শিশুর বরাবর এক উত্তর আপনারা যা ঠিক করবেন তাই হবে, কেবল আমার একটি শর্ত বিয়ের পরও আমি লেখাপড়া করব। নবীন দত্তরও তাই মত। তখন তিনি পাত্রের খবর ধীরেশকে বলেন। ধীরেশ মাথায় হাত বুলিয়ে বলেন—দাড়াও আগে খবর টবর নি। তারপর বলব। এর পর তিনি খবরটি তাঁর ঘনিষ্ঠ পুলিস বন্ধুদের কাছে চালান করে দিয়ে বলেন খুঁত বার কর।

এবার নবীন দত্ত যে পাত্রটির খবর এনেছিলেন সেটি প্রায় নিখুঁত। ধীরেশবাবুর চরেরা সবাই এসে বলেছিলেন না ভালো পাত্র। বংশ ভালো ওদের পরিবারের কারও বিরুদ্ধে খারাপ কোন খবর নেই। সবাই একবাক্যে প্রশংসা করল ওদের। পাত্রটি ভালো। তবে রং ফরসা নয়, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। মাথার সামনের দিকে একটু টাকও আছে। তাঁদের মতে পাত্রটি সুপাত্র, টাক বা রঙে কিছু আসে যায় না। খবরটি সংগ্রহ করে গুম হয়ে বসে আছেন ধীরেশ বিশ্বাস। নবীন দত্ত খবর পাঠিয়েছে আজই সে এসে ফোন করবে পাত্রপক্ষকে। সশঙ্কিত হয়ে বসেছিলেন ধীরেশ বিশ্বাস। একটু পরেই ধীরেশবাবু বিস্মিত হলেন। যা কোনও দিন হয় না, তাই আজ ঘটল। নবীন দত্ত এলেন রিকশা করে। মাথায় একটা ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। রিক্‌শা থেকে নেমেই বললেন—'রিকশ'র ভাড়াটা মিটিয়ে দিন। আমার কাছে পয়সা নেই।'

'মাথায় কি হয়েছে—'

'ক্রিকেটের বল লেগেছে। ছেলেরা রাস্তা ব্লক করে ক্রিকেট খেলছে দুপুর বেলা। আমার মাথায় লেগে গেল হঠাৎ। একটা ছেলে বলল— দেখছেন না খেলা হচ্ছে, এদিক দিয়ে আসছেন কেন মশাই। এমনভাবে বললে যেন রাস্তাটা তার বাবার। কিছু বললাম না, পার হয়ে গেলাম সেখানটা। তারপর একজন ভদ্রলোক বললেন, আপনার মাথা দিয়ে রক্ত পড়ছে যে। তখন দেখলাম, আমার জামাতেও রক্ত পড়েছে।' 'একটু গিয়েই মিত্তিরদের ডিসপেনসারি আছে সেখানে গিয়ে ওষুধ লাগিয়ে নিন'—এই উপদেশটি দিয়ে ভদ্রলোক চলে

গেলেন। মিত্তিরদের ডিপেনসারির যিনি কম্পাউণ্ডার ছিলেন তিনি তোতলা। তো তো করে বললেন যে ওষুধ ব্যাণ্ডেজ ইত্যাদির দাম দেড় টাকা পড়বে। দেড় টাকা ছিল না, তাই ট্রামে করে মেডিকেল কলেজে গেলাম। সেখান থেকে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়ে আসছি। ফেরবার সময় কিছুদূর ট্রামে এলাম। তারপর ট্রাম ফুরিয়ে গেল। নেমে ভাবলাম 'বাস' ধরি। কিন্তু কিছুদূর হেঁটেই মাথা ঘুরে উঠল। তাই রিক্‌শা করেই চলে এলাম। ফোনে আজ কথাটা শেষ করে ফেলতে চাই। তাঁদের চিঠিও লিখেছি যে আজ তাঁদের ফোন করব। তাঁরা হয়তো আমার ফোনের অপেক্ষা করবেন। তুমি পাত্রটির সম্বন্ধে খোঁজ নিয়েছ?'

'নিয়েছি। রিপোর্ট তো ভালই। কিন্তু শুনছি রং কালো আর মাথায় টাক।

'শিশুকে বলেছ?'

'না।'

'বল। সেই ঠিক করুক এ পাত্র সে পছন্দ করবে কি না। কন্যা বরয়তে রূপং—'

ধীরেশের ডাকে শিশু নেমে এল নীচে।

আসতেই নবীন দত্ত বললেন—'ওগো শিশুসমা, আমরা একটি ভালো পাত্র পেয়েছি। শোনা যাচ্ছে তার রং কালো আর টাক আছে। তোমার যদি আপত্তি থাকে—'

শিশুকে শিশুসমা নবীন দত্তই করেছেন। বলেছিলেন, ওর নামটার মধ্যে কায়দা করে সুষমা ঢুকিয়ে দিলাম।

শিশু এসে বললে—'কাকাবাবু, ওঘরে চলুন। সব বলব। শরবৎ খাবেন?'

'খেতে পারি—'

পাশের ঘরে গিয়ে শিশু বললে—'কাকাবাবু, আমার বিয়ের জন্য চেষ্টা করবেন না।'

'কেন—'

বাবার ইচ্ছে নেই। বাবা চান না আমি তাঁকে ছেড়ে কোথাও যাই। অথচ তিনি আপনার কথাও ঠেলতে পারছেন না। নানারকম খুঁত বার করেছেন তাই। আমি বিয়ে নাই করলাম। আমিই তো বাবার একমাত্র অবলম্বন। আমি চলে গেলে সত্যি ওঁর কষ্ট হবে খুব। আমি বিয়ে করব না। আপনি ফোনে ওদের বলে দিন—ছেলের মাথায় টাক আছে বলে ও পাত্র পছন্দ নয় আমাদের।'

'তুই ঠিক থাকতে পারবি?'

'পারব একথা জোর করে বলা যায় কি। চেষ্টা করব। এমন কিছু করব না যাতে আপনাদের মনে কষ্ট হয়।'

'আমাদের মনের কষ্টের কথা ভাবছ কেন তুমি। আমাদের মনে কষ্ট হবে বলে কোন ভালো কাজও তুমি করবে না? তাহলে তো মুশকিল। এই যে দুম হঠাৎ জার্মানি চলে গেল, আমার মনে কষ্ট হয়েছে, তার মায়ের মনেও হয়েছে। তাহলে কি দুমের মায়ের আঁচল ধরে বসে থাকা উচিত ছিল? ছিল না। সে ঠিক কাজই করেছে। আমাদের কথা তোমাকে ভাবতে হবে না, তুমি নিজে যা ভালো বোঝ তাই কর। তুমি লেখাপড়া শিখেছ। তোমার যদি মনে হয় বাবার জন্যে এখন তুমি বিয়ে করবে না, বেশ তো, করো না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যদি দেখি

তুমি গালে চুন-কালি মেখে ঘুরে বেড়াচ্ছ তাহলে তোমার সঙ্গে সংস্রব রাখা শক্ত হবে আমার পক্ষে । তুমি যদি চুনকালি মাখাটা ভালো মনে করো মেখো, আমাদের মনোকষ্ট হবে কি না এ নিয়ে মাথা ঘামিও না, তুমি লেখাপড়া শিখেছ, প্রাপ্তবয়স্ক হয়েছ, তোমার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করবার প্রবৃত্তি আমার নেই, তবে আমাদের স্বাধীনতাতেও হস্তক্ষেপ করতে পারে না তুমি।'

শিশু হাসিমুখে চেয়েছিল নবীন দত্তের দিকে।

'কি স্বাধীনতা।'

'তোমার সংস্রব ত্যাগ করবার স্বাধীনতা—'

'ইস তা কি পারবেন? পারলে করবেন।'

শিশু ঠোঁট ফুলিয়ে চলে যাচ্ছিল, নবীন দত্ত ডাকলেন আবার।

'শোন— শোন—'

'কি?'

'আমাকে এত দুর্বল বলে মনে করিস তুই, বেশ, এখনি আমি চললাম আর আসব না এ বাড়িতে।'

নবীন দত্ত বেরিয়ে যেতে উদ্যত হতেই শিশু বলে উঠল ' কি যে অবুঝের মতো আপনি করেন কাকাবাবু। আপনি শরবৎ খেতে চেয়েছিলেন আগে সেইটে খান। তার পর বলুন, আপনার মাথায় ব্যাণ্ডেজ কেন—'

'একটা বল লেগেছিল রাস্তায়। ছেলেরা খেলছিল।'

' কি পাজী সব ছেলেরা হয়েছে আজকাল । রাস্তায় বল খেলবে?'

'পাজী ছেলেরা নয়, পাজী আমরা। গণ্ড গণ্ডা ছেলের জন্ম দিয়েছি, অথচ তাদের ঘরে থাকবার জায়গা নেই, খেলবার মাঠ নেই, রাস্তায় রাস্তায় দলে দলে কুকুর বেড়ালের মতো ঘুরছে আর হুড়োহুড়ি করছে। কী করবে, কোথায় যাবে ওরা—'

'খুব লাগে নি তো—'

'অজ্ঞান হই নি যখন, তখন গুরুতর কিছু নয়।'

'আপনি ভিতরে চলুন। শরবৎ খেয়ে তবে যাবেন।'

'আর ও ভদ্দরলোকদের ফোনও করতে হবে। টাকার কথা বলব না, সরল সত্য কথাই বলব। বলব আমি আগে জানতাম না যে মেয়ের বাপের ইচ্ছেই নেই মেয়ের বিয়ে দেবার। সেইজন্যে চেষ্টা করছিলাম, আমাকে মাপ করবেন।'

শিশু বললেন—'ফোনটা আপনি করবেন কেন? আমিই করি—'

'তুমি? কেন?'

'আপনি তো ঘুর-পথে যেতে পারবেন না। আমি বলব ছেলের কুষ্ঠি পাঠান, মেয়ের কুষ্ঠির সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে হবে—'

শিশু মুচকি হেসে চেয়ে রইল নবীন দত্তের দিকে। হাসলে তার গালে টোল পড়ে।

'স্টুপিড় কোথাকার'

শিশু এক ছুটে ভিতরে চলে গেল।

তার পিছনে নবীন দত্তও গেলেন। কিন্তু শিশুর নাগাল পেলেন না। শিশু রোগা ছিপছিপে, তরতর করে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে গেল। নবীন দত্তকে ধীরে ধীরে সিঁড়ি ভাঙতে হল। তেতলায় উঠে দেখেন ধীরেশ বিশ্বাস একা গুম হয়ে বসে আছেন। শিশু নেই। বিশ্বাস মশাই নবীন দত্তকে দেখেই উঠে দাঁড়ালেন। কিন্তু কিছু বলবার আগেই নবীন দত্ত বললেন- 'আপনি মেয়ের বিয়ে দিতে চান না এ কথাটা আমাকে আগে খুলে বললেই পারতেন। আমার এত হয়রানি হত না।' সামনে যে মোড়াটা ছিল সেইটিতেই বসে পড়লেন নবীন দত্ত। ধীরেশ তবুও গুম।

নবীন দত্ত বললেন—'আপনি যে এতটা স্বার্থপর তা ধারণা ছিল না। নিজের সুখের জন্যে মেয়েকে নিজের কাছে রেখে দেবেন চিরকাল—এ তো ভাবাই যায় না- '

ধীরেশ বিশ্বাস বললেন—'আজকাল ছেলেদের যে রকম মতিগতি দেখছি, একজন পুলিশ অফিসার হিসাবে আমার যা অভিজ্ঞতা, তাতে আমি বুঝেছি মেয়েকে কারো সঙ্গে বিয়ে দেওয়া মানেই তার হাত পা বেঁধে একটা অনিশ্চিত গহ্বরের মধ্যে ছুঁড়ে দেওয়া সে গহ্বরে সাপ বিছে বাঘ ভালুক দৈত্য দানব পাঁক আগুন সব কিছু থাকাই সম্ভব। তাছাড়া দিলেই ছেলে হবে, এক একটা ছেলে হওয়ার কি ভয়ঙ্কর 'রিসক' তা জানেন?'

নবীন দত্ত ভ্রূকুঞ্চিত করে চেয়েছিলেন ধীরেশবাবুর দিকে। তিনি যেন ধীরেশ বিশ্বাসকে নূতন করে আবিষ্কার করছিলেন। তাঁর প্রশ্নের কোনও উত্তর দিলেন না তিনি, চুপ করেই রইলেন।

ধীরেশবাবু কাতর ভাবে তাঁর দিকে চেয়ে বললেন—'তাছাড়া এই বুড়ো বয়সে, আমি কার কাছে থাকি বলুন।'

'বেশ মেয়ের কাছেই থাকুন। আমার ধারণা ছিল অন্য রকম। আমি জানি মেয়ে হলে তাকে সৎপাত্রে অর্পণ করাই কর্তব্য। আমারও দুটি মেয়ে আছে, তাদেরও আমি কম ভালোবাসতুম না, কিন্তু তাদের নিজের সেবার জন্যে কাছে রাখি নি, বিয়ে দিয়েছি, তার জন্যে বাড়ি বাঁধা দিতে হয়েছে আমাকে, তবু দিয়েছি। কিন্তু আপনার মত দেখছি অন্য রকম। এখন সমাজ বলে কিছু নেই, টাকাই সমাজ, টাকাই ভগবান, যে যা খুশী করছে। আপনিও করুন। আপনার ফোনটা কোথা। সেই ভদ্রলোকদের ফোন করে দি তারপর চলে যাই।'

শিশু এক গ্লাস শরবৎ নিয়ে ঢুকল।

'আপনার এখন যাওয়া হবে না কাকাবাবু। আমি ডাক্তার সেনকে ফোন করেছি। তিনি এসে আগে আপনার মাথার চোটটা দেখুন। এইখানেই খাওয়ার ব্যবস্থা করেছি আপনার।'

'আমি খেয়ে এসেছি—'

'তাহলে শরবৎটা খেয়ে ওঘরে বিশ্রাম করবেন চলুন। ডাক্তার সেন আপনাকে দেখে যান, তারপর আমি আপনাকে ট্যাক্সি করে পৌঁছে দিয়ে আসব।'

'আমার কিচ্ছু হয় নি।'

'ডাক্তার সেন এসে দেখে যান না। যদি কোনও ওষুধ বা ইনজেকশন দেন—'

'কি বিপদ, আমার কিচ্ছু হয় নি, কেন জ্বালাচ্ছিস আমাকে—'

শিশু মুচকি হেসে তাঁর দিকে চেয়ে রইল।

গালে টোল পড়ল।

'শরবৎটা খেয়ে ফেলুন।'

শিশু আসার সঙ্গে সঙ্গে ধীরেশ বিশ্বাস পাশের ঘরে চলে গিয়েছিলেন। নবীন দত্ত খেয়ে জামার হাতায় মুখটা মুছে ফেললেন।

'চল এবার ফোনটা করে ফেলি। সে ভদ্রলোকরা আমার ফোনের জন্য অপেক্ষা করছেন।'

'চলুন। কিন্তু বাবার দোষ দেবেন না। বরং বলুন মেয়েটি বিয়ে করতে চাইছে না।'

ঘন্টা তিনেক পরে নবীন দত্তের সঙ্গে শিশু নেমে এল দোতলা থেকে।

'তুমি নামলে কেন—'

'আমি আপনাকে ট্যাক্সি করে পৌঁছে দিয়ে আসি।'

'কি দরকার! আমি ট্রামে বাসে চড়তেই অভ্যস্ত, বেশ চলে যাব।'

'না, আমি আপনাকে একলা যেতে দেব না। এই ট্যাক্সি—'

ট্যাক্সি এসে দাঁড়াল একটা।

'উঠুন— '

ট্যাক্সির কপাটটা খুলে দাঁড়িয়ে রইল। উঠতে হল নবীন দত্তকে। তারপর শিশুও উঠল।

ট্যাক্সিতে উঠে শিশুর দিকে চেয়ে ভ্রূকুঞ্চিত করে নবীন দত্ত বললেন—'আমার উপর এমন জবরদস্তি করিস কেন বল তো – '

শিশু অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে চেয়ে রইল, কোন উত্তর দিল না।

'কি রে কথার কোনও জবাব দিচ্ছিস না।'

শিশু তবু মুখ ফিরিয়ে রইল।

নবীন দত্ত জোর করে তার মুখটা নিজের দিকে ফিরিয়ে নিলেন। শিশু মুচকি হাসল। তার গালে টোল পড়ল, কিন্তু নবীন দত্ত দেখলেন তার দুই চোখে জল টলমল করছে।

' এ কি কাণ্ড।'

শিশু কোনও জবাব দিলে না। ট্যাক্সি ছুটতে লাগল। সমস্ত পথটা শিশু কোন কথাই বলল না। নবীন দত্তও চুপ করে রইলেন। নবীন দত্তকে বাড়িতে নামিয়ে কিন্তু শিশু কথা কইল।

'আমি এই ট্যাক্সিতেই ফিরে যাচ্ছি।'

নবীন দত্তকে প্রণাম করে সে ট্যাক্সিতে উঠে বসল। নবীন দত্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন, একটা কথাই বারবার তাঁর মনে জাগতে লাগল—ওর চোখে জল কেন।

।। দুই ।।

রাখাল এসেছিল।

সঙ্গে ছিল এক তাড়া প্রুফ আর বগলে একটা হিসাবের খাতা আর ফ্ল্যাট ফাইল একটা।

'ওগুলো কি ফাইনাল প্রুফ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। ফোর্থ প্রুফ।

নবীন দত্ত প্রথম পাতাতেই তিনটে বানান ভুল বার করলেন।

'এ তো ভুলে ভরতি দেখছি। কে প্রুফ দেখেছে?'

'প্রেসের লোকেরা—'

'প্রেসের প্রুফ রীডাররা সাধারণত মূর্খ হয়। ভাষা-জ্ঞান না থাকলে ভালো প্রুফ দেখা যায় না। তোমরা দেখে দাওনি কেন?'

'বিকাশ তো পেটের অসুখে ভুগছে। আর আমাকে নানা কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়। তাই—'

'ওই লোকটিকে চেন?'

বিদ্যাসাগরের ছবিটি দেখিয়ে প্রশ্ন করলেন তিনি।

'বিদ্যাসাগর। ও ছবি কে না চেনে।'

'উনি তোমার চেয়ে বেশী কাজে ব্যস্ত থাকতেন। তবু নিজের বইয়ের প্রুফ নিজে দেখতেন।'

রাখাল নীরব হয়ে রইল।

নবীন দত্ত বললেন—'স্কুল কলেজ পাঠ্য বই নির্ভুল ছাপা হবে। তা না হলে ছেলেরা ভুল শিখবে। তুমি নিজে আর একবার প্রুফটা দেখো। তারপর আমি আবার দেখব।'

প্রুফটা ফেলে দিলেন নবীন দত্ত।

'দেখি হিসেবের খাতাটা দেখি—'

হিসেবের খাতা দেখে বললেন। 'এই যে কাগজ কিনেছ, কি ধরনের কাগজ তা তো লেখ নি। খালি লিখেছ কাগজ এত টাকা। নগদ দাম দিয়ে কিনেছ তো?'

'হ্যাঁ।'

'দেখাও সেটা।'

রাখাল ফাইলটা খুলে দেখাল।

'এতেও তো লেখা আছে শুধু 'পেপার'। কি পেপার তা তো লেখে নি'— রাখাল চুপ করে রইল।

'কোন্ দোকান থেকে কিনেছিলে? এ ক্যাশমেমোতে তো দোকানের নাম ছাপা নেই দেখছি—'

'ওটা ব্ল্যাক থেকে কিনেছি—'

'কেন? খোলা থেকেই কিনতে হবে। আমরা চোরদের শরিক হব কেন?'

চুপ করে রইল রাখাল।

গলার সুর চড়িয়ে নবীন দত্ত আবার প্রশ্ন করলেন—' আমরা কি চোর?'

'না, চোর নই। কিন্তু খোলা বাজারে কাগজ নেই, দেরিতে বই বেরুলে বই কেউ কিনবে না।'

'না কিনুক। আমরা লাভ খুব বেশী রাখব না। পনেরো পারসেন্ট লাভ হলেই খুশী হব আমরা। চোর প্রকাশকদের দলে ভিড়তে চাই না আমি। বুঝলে?'

'বুঝেছি স্যার। চোরের দলে আমাদেরও ভিড়বার ইচ্ছে নেই। কিন্তু কি করি তাহলে যে ব্যবসা চালানো যায় না।'

'নিশ্চয় যায়। বিদ্যাসাগর চালিয়েছিলেন কি করে? বিদ্যাসাগরের জীবনীটা আর একবার পড়-- '

নবীন দত্ত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে হিসাব দেখতে লাগলেন। রাখাল বসে উসখুস করতে লাগল। তার সিগারেট খাওয়া অভ্যাস। কিন্তু এখানে খাওয়া সম্ভব নয়।

'আপনি দেখুন, আমি একটু ঘুরে আসছি স্যার।'

'কোথায় আবার ঘুরতে যাবে এখন!'

'একটু চা খেয়ে আসি গলির দোকানটা থেকে।'

'সকালে খাও নি?'

'খেয়েছি—'

'তবে আবার কেন?'

'সকালে চা ছাড়া তো আর কিছু খাই না। তাই খিদে পেয়ে যায়।'

'ছোলা-ভিজে খাও না কেন? গুড় আর ছোলা ভিজে?'

'দুটোই আজকাল অগ্নিমূল্য।'

আবার ধমকে উঠলেন নবীন দত্ত।

'অগ্নিমূল্য হলেও খেতে হবে। না খেলে বাঁচবে কী করে? এই যে টেরিলিনের শার্টটা পরে এসেছ এটার দাম কত?'

'এটাও বেশ দামী। কিন্তু একবার কিনলে অনেক দিন চলে। আর ধোপার খরচ লাগে না. একবার সাবান দিয়ে—'

'শুধু গায়ে থাকলেই বা ক্ষতি কি। না-খেয়ে দামী জামা গায়ে দেওয়ার কোন মানে হয় না।'

বিপদে পড়ে গেল রাখাল।

হঠাৎ উঠে পড়লেন নবীন দত্ত।

'আমার ভাঁড়ারে তো কিছু নেই। দেখি আমার গিন্নীর ভাঁড়ারে কিছু আছে কি না। থাকবার কথা নয়। আজকাল বড্ড গরীব হয়ে পড়েছি আমরা।'

উঠে নেমে গেলেন নিচে। রাখাল ছাতে দাঁড়িয়ে সিগারেটের বাক্স থেকে আধখানা সিগারেট বার করে চট করে ধরিয়ে ফেলল সেটা। সে আজকাল পুরো সিগারেট খায় না, আধখানা খায়। সিগারেটও অগ্নিমূল্য। যখন ঠোঁট পুড়তে থাকে তখন ফেলে দেয় সেটাকে। ফেলত না, অনেকগুলো টুকরো থেকে সিগারেট বানাতে পারত যদি ভালো সিগারেট পেপার পাওয়া যেত। কিন্তু ভালো সিগারেট পেপার আজকাল পাওয়া যায় না, যা পাওয়া যায় তা অগ্নিমূল্য। সবই অগ্নিমূল্য। দেশ যদি সীতার সঙ্গে উপমা দেওয়া যায় তাহলে বলতে হয় রাবণের পরাধীনতা থেকে উদ্ধার করে তাঁর অগ্নিপরীক্ষা করা হচ্ছে। এইবার বোধ হয় তিনি পাতাল প্রবেশ করবেন। এই সব কথা মাঝে মাঝে মনে হয় রাখালের। রাখাল একটু কবি-প্রকৃতির। সাহিত্যের ভালো ছাত্র সে। হঠাৎ তার ভয় হল— স্যার এসে যদি সিগারেটের

গন্ধ পান! একটু পরেই নবীন দত্ত এলেন। কিন্তু সিগারেটের গন্ধের কথা উল্লেখ করলেন না। বললেন—'গিন্নী, তোমার জন্যে হালুয়া তৈরি করছেন। খেয়ে যেও। ভালো হবে না। কারণ, ভালো সুজি, চিনি, ঘি সবই দুর্লভ। তবু যা হচ্ছে খেয়ে যাও। আর একটা কথা শুনে রাখ। আগে ভালো খাবার, তারপর যদি পয়সা বাড়তি থাকে, তাহলে পোশাক। জমকালো শৌখীন পোশাক না হলেও চলে। তালতলার চটি আর শাদা উড়ুনি পরে বিদ্যাসাগর একদিন বাংলাদেশকে জাগিয়েছিলেন। নেকেড ফকির মহাত্মা গান্ধী জগৎ মাতিয়েছিলেন এসব আদর্শ তোমরা ভুলে যেও না। প্রুফগুলো আর একবার দেখব। হিসেবের খাতাও তোমাদের ঠিক নেই। যাদের টাকা দিয়েছ তাদের নাম থাকলেই শুধু চলবে না। ঠিকানাও চাই। কুলি ও ঠেলা-ওয়ালা সবার নামও লিখে রাখবে। সম্ভব হলে ঠিকানাও। তোমার এ হিসাবের খাতা বিশ্বাসযোগ্য খাতা হয় নি। যা হয়েছে তা তো আর সংশোধন করবার উপায় নেই। এবার থেকে যা যা বললাম তুমি তাই কোরো। আর ব্ল্যাক থেকে কিছু কিনো না, তাতে আমাদের ব্যবসা থাক বা যাক কিছু এসে যায় না। ভালো বই সত্যি যদি বার করতে পার ব্যবসা চলবে। ভালো ইংরেজি বই অনেক টাকা দাম দিয়েও আমরা কিনি। খেলো বই শস্তা হলেও কিনি না। ভালো ইংরেজী প্রকাশকরা বাজে বই বার করেন না। ফিচলেমি ছুঁচোমিও করেন না, তাই তাঁদের ব্যবসা বিশ্বব্যাপী।—'

আরও কিছু উপদেশ হয়তো দিতেন, কিন্তু হল না। পারুলবালা একটা ডিসে হালুয়া নিয়ে উপস্থিত হলেন। 'খাও বাবা, ভালো হালুয়া আজকাল আর করাই যায় না। জিনিসপত্র পাওয়া যায় না। খাও—'

রাখাল খেয়ে দেখল অপরূপ হয়েছে হালুয়া। মনে পড়ল তারা যখন পাটনায় থাকত তখন মা এই রকম হালুয়া করতেন। পাটনা থেকে অনেক দিন চলে এসেছে তারা, মা-ও মারা গেছেন অনেকদিন। এই হালুয়া তাকে অনেক দূর নিয়ে গেল নিমেষের মধ্যে।

বলল—'বাঃ অপরূপ! অনেক দিন আগে মায়ের হাতে এই রকম হালুয়া খেয়েছি—'

রাখাল তাড়াতাড়ি উঠে এঁটো হাতেই প্রণাম করলে পারুলবালাকে।

পারুলবালা সসঙ্কোচে দাঁড়িয়ে রইলেন এক ধারে। তারপর সসঙ্কোচেই বললেন—'বেঁচে থাকো বাবা। দেশের মুখোজ্জ্বল কর।'

নবীন দত্ত হেসে বললেন—'তা পারবে কি না সন্দেহ আছে। চোরাবাজারীদের সঙ্গে এর মধ্যেই মেলামেশা আরম্ভ করেছে।' তারপর ধমকের সুরে বলে উঠলেন—'ফের যদি দেখি তুমি কালোবাজারে কাগজ কিনেছ তাহলে আমি আর তোমাদের সংস্রবে থাকব না—'

'আর কিনব না স্যার।'

প্রণাম করে কাগজপত্র গুটিয়ে রাখাল চলে গেল। তার মনে হতে লাগল আজ সে এমন একটা বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল যা এককালে মোটেই অসাধারণ ছিল না, কিন্তু যা আজকাল দুর্লভ। হ্যাঁ, সেকেলে বাঙালী বাড়ি আজকাল সত্যিই দুর্লভ। আজকাল খুব কম বাড়িতেই স্নেহময়ী মা দেখা যায়। আজকাল ঘরে ঘরে সমাজসেবিকা, বড় লেখিকা, বড় কংগ্রেসকর্মিণী, দেশবিখ্যাত নেত্রী, বড় অভিনেত্রী, এ সবই আছে— সেকালের স্নেহময়ী মা

নেই। যা আছে ও মুখোশ পরা, তাদের হাব ভাব, নিতান্তই লোকদেখানো। মাতৃহীন রাখাল অনেকদিন পরে পারুলবালাকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল।

পারুলবালা খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর তাকে জিগ্যেস করলেন —'আজও দয়ের কোন চিঠি পত্র আসে নি?'

'না। এখনও আসে নি তো। পিওনের আসবার সময় অবশ্য এখনও যায় নি।'

তবুও দাঁড়িয়ে রইলেন পারুলবালা।

নবীন দত্ত বললেন—'তুমি অত ভাবছ কেন?'

'সাধ করে কি আর ভাবছি! ভাবনা হয়, কি করব। সেই গিয়ে একবার পৌঁছে সংবাদ দিয়েছে, আর চিঠি লেখে নি দুমাস হয়ে গেল।'

'আমি তো জানি সব' - একটু ঝাঝালো স্বরেই উত্তর দিলেন নবীন দত্ত। ' কিন্তু আমিও তো নিরুপায়। দুশো বার উঠ বোস করলে এখনি যদি তার চিঠি এসে যেত তা হলে প্রাণ তুচ্ছ করেও আমি তাও করতাম কিন্তু তাতে তো কিছু হবে না। বৃথা আমাকে বলছ কেন? ছেলে যখন সাবালক হয়েছে, নিজে রোজগার করতে শিখেছে, নিজের ভালোমন্দ বুঝতে শিখেছে, তাকে আঁচলে বেঁধে রাখবার চেষ্টা কোরো না। করলে নিজেই দুঃখ পাবে, আর কারো কিছু হবে না। ছেলেমেয়ে বড় হলেই নাগালের বাইরে চলে যায়। এটা মেনে নাও।'

'তোমার চিন্তা হচ্ছে না?'

'হচ্ছে বই কি! আমি তো পাষাণ নই। কিন্তু তোমার মতো দিনরাত মুখ গোমড়া করে আমি বেড়াচ্ছি কি?'

পারুলবালা আবার কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন বড় বৌমা কাল এক জায়গায় ইন্টারভিউ দিতে গিয়েছিল। তোমাকে বলেছিল কি'— ভ্রূকুঞ্চিত করে চুপ করে রইলেন নবীন দত্ত। পারুলবালা বলল, 'বৌমার এক কলেজের মাস্টার নাকি ওকে একটা ভালো চাকরি দিতে পারেন। দরখাস্ত করতে বলেছিলেন। কাল ইন্টারভিউ দিয়ে এসেছে। তোমাকে বলে নি কিছু?'

'না। চাকরি করতে চাইছে কেন। আমি তো ওর জন্যে টিউশনি করছি —'

'ও বলছিল বাবা বুড়ো বয়সে আমাদের জন্যে এত পরিশ্রম করবেন সেটা আমার ভালো লাগছে না। আমি আবার চাকরিই করবো।'

'তাতো করবে। কিন্তু ওর রূপকে লুকুবে কি করে? রূপসী দেখে বউ করেছিলে, সেই রূপই যে এখন অভিশাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে ওর। রাস্তায় বেরুবার উপায় নেই। একদল ছোঁড়া পিছু নেবে। উফ্, দেশটা দেখতে দেখতে কত নেবে গেল। এই দেশে বিদ্যাসাগর বিবেকানন্দ জন্মেছিল, বিশ্বাস হয়?'

পারুলবালা আবার কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন— 'এ চাকরিটা যদি হয়, হেঁটে আপিস যেতে হবে না। মোটর এসে নিয়ে যাবে, মোটরে পৌঁছে দিয়ে যাবে।'

'তাই নাকি।'

ভ্রূকুঞ্চিত করে নবীন দত্ত নীরব হয়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত।

'কোন আপিসে চাকরি?'

'তা জানি না। তবে ওর প্রফেসারটির নাম জানি। খগেশ্বর হাজরা।'

'ও, খগেশ্বর? সে তো অলঙ্কারের সঙ্গে পড়ত। খুব ভালো ছেলে ছিল। বিলেতের বড় ডিগ্রী আছে। খুব বন্ধুত্ব ছিল অলঙ্কারের সঙ্গে। বিরাট বড়লোক।'

'আমাদের বিপদের কথা শুনেই বোধহয় চাকরিটি যোগাড় করে দিচ্ছে। বউমা তোমাকে কিছু বলে নি?'

'না। সাহস পায় নি হয়তো। আমি তাকে চাকরি নিতে মানা করেছিলাম। এই অসভ্য দেশে ভদ্র মেয়েদের রাস্তায় বেরোন উচিত নয়। কিন্তু মোটরে যদি যাতায়াত করবার সুযোগ পায় তাহলে আপত্তি করব না। টাকার তো সত্যিই দরকার। আমি ভাবছি টাকার যদি সুবিধে হয়, ওর মেয়ে দুটোকে কোন ক্রিশ্চান স্কুলের বোর্ডিংয়ে রেখে দেব। ওর মা যদি ওদের দেখাশোনা করবার সুযোগ না পায়, তাহলে ওদের লেখাপড়া হবে না।'

'ক্রিশ্চান স্কুলের বোর্ডিংয়ে কেন?'

'ক্রিশ্চান স্কুলেই আজকাল ভালো পড়াশোনা হয়। অন্য জায়গায় রাজনীতি হয়, আর কিছু হয় না। মাস্টাররা হয় অনপুযুক্ত, নয় অসাধু, নয় দুইই। বাড়িতে পড়ানোই সব চেয়ে ভালো। কিন্তু পড়াবে কে? ভালো প্রাইভেট টিউটার পাওয়াও সমস্যা আজকাল। বিশেষত মেয়েদের জন্যে—'

পারুলবালা ঈষৎ বঙ্কিম ভঙ্গীতে দাঁড়িয়েছিলেন। ওই ভাবেই তিনি দাঁড়ান। দাঁড়ালে ডানদিকটা একটু কাত হয়ে থাকে। রোগা পাতলা মানুষ তিনি, এভাবে দাঁড়ালে বেশ মানায় তাকে। যৌবনকালে খুবই মানাতো। তাঁর দিকে চেয়ে সেই যৌবনকালের ছবিটা হঠাৎ মনে পড়ল নবীন দত্তের। তাঁর ষোড়শী বধূকে বহুদিন পরে তিনি যেন দেখতে পেলেন—যে তাঁর কলেজ যাবার সময় নিজে হাতে দু' খিলি পান সেজে নিজে তাঁর মুখে পুরে দিত। তখন ওর হাতে বাজু ছিল। কানে দুল ছিল। এখন নবীন দত্ত পান খান না, হরতুকি খান। পারুলও আর কোনও গয়না পরে না। হাতে খালি শাঁখা আর নোয়া। মেয়েদের বিয়েতে অধিকাংশ গয়নাই মেয়েদের দিয়ে দিয়েছেন।

হঠাৎ নবীন দত্ত বললেন—'পান খেতে ইচ্ছে করছে। নীচে থেকে দু' খিলি পান সেজে পাঠিয়ে দাও তো।'

'পান খাবার ইচ্ছে হল যে আজ—'

'এমনি—'

পারুলবালা চলে গেলেন।

নবীন দত্তের আবার ভাবনা হল। সাবিত্রী চাকরি করবে? খগেশ্বর ওর চাকরি করে দিচ্ছে? অলঙ্কারের খুব বন্ধু ছিল। ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছিল ইংরেজিতে। অলঙ্কারের বিয়েতে বরযাত্রী গিয়েছিল। সাবিত্রীকে একটা হার উপহার দিয়েছিল বিয়ের সময়। বড়লোকের ছেলে খগেশ্বর। অলঙ্কার তো মারা গেছে অনেক দিন আগে। এতদিন তো ও কোনও খবর

নেয় নি। এতদিন পরে তার বউকে চাকরি যোগাড় করে দিচ্ছে এর মানে কি! সাবিত্রী কি ওকে লিখেছিল না কি কিছু? আগে কোন বিবাহিত মেয়ে স্বামীর বন্ধুকে চিঠি লিখত না, পারুল তাঁর কোন বন্ধুকে চিঠি লেখে নি কখনও, লেখবার কথা ভাবতেও পারে না। কিন্তু আজকালকাব মেয়েবা পারে, চিঠি লেখেও। লেখাটা যে খুব অন্যায় তা মনে করেন না নবীন দত্ত। কিন্তু তিনি জানেন, পরপুরুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করলে অযথা নানা রকম অবাঞ্ছিত ফ্যাকড়া, ইংরেজিতে যাকে বলে কমপ্লিকেশন—হতে পারে। বিশেষত বিধবার পক্ষে। মেয়ে মানুষের মন লতার মতো। কাছে শক্ত, সমর্থ কাউকে পেলে আঁকড়ি বার করে তার উপর নির্ভর করতে চায়। মোটর পাঠিয়ে আপিসে নিয়ে যাবে, আবার দিয়ে যাবে? নবীন দত্তের ভ্রূ আরও কুঞ্চিত হয়ে গেল। কিন্তু বেশীক্ষণ কুঞ্চিত হয়ে থাকল না, বড় দৌহিত্র প্রতাপ্ এসে প্রবেশ করলেন। হাতে একটা বাটি।

'মা তোমাব জন্যে খাবার পাঠিয়েছে।'

'কি খাবাব?'

'আগে দেখতে দেব না। তুমি চোখ বুঁজে হাঁ কর। খেয়ে বল জিনিসটা কি—'

নবীন দত্ত চোখ বুঁজে হাঁ করলেন। প্রতাপ বাটি থেকে একটা ছোট পানতোয়াব মতো বার করে ঢুকিয়ে দিলে তাঁর মুখে। নবীন দত্ত খেয়ে বললেন—'খেতে মন্দ হয নি। তবে ছানার নয।'

'কিসেব বল না?'

'আলু বোধহয। মিষ্টি আলু?'

'না। ডিমেব সঙ্গে পোস্ত দানা গুলে বড়ার মতো করে ভেজে সেগুলো বসে ফেলেছে। ভালো হয় নি?'

'চমৎকাব। আর একটা দে—'

হাত পাতলেন নবীন দত্ত।

'দাদু, তোমার হাতে নখ এত বড় বড় কেন।'

'তার কারণ তুমি, আমার ছুরিটি চুরি করে নিয়ে গেছ। নাপিতেব দেখা পাচ্ছি না।'

'বাঃ, চুবি করতে যাব কেন! তুমি তো দিয়েছ আমাকে। প্রথমে যখন চেয়েছিলাম তখন অবশ্য 'না' বলেছিলে। কিন্তু দ্বিতীয়বার যখন চাইলাম তুমি চুপ করে রইলে। আমি ভাবলাম মৌনং সম্মতি লক্ষণং, তাই নিয়ে গেলাম। আচ্ছা, আমি তোমাকে একটা ভালো 'নেলকাটার' কিনে দিয়ে যাব।'

'আমি সেকেলে লোক, নেল কাটার দিয়ে নখ কাটতে পারব না। ওই ছুরিটার উপর তোমার এত লোভ কেন? তোমরা তো ব্লেড দিয়ে দাড়ি কামাও, নেল কাটার দিয়ে নখ কাটো, ফাউন্টেন পেন দিয়ে লেখ—ছুরি নিয়ে কি কর তুমি—'

'কিচ্ছু করি না। আমার একটা ওলড় কিউরিয়সিটি বাক্স আছে, তাতে রেখে দিয়েছি। তোমার ছুরির বাঁটটা দেখেছ? অদ্ভুত! প্রকাণ্ড একটা কুমীর খোদাই করা আছে ওর উপর। দেখেছ? তোমাকে আর একটা ছুরিই এনে দেব তাহলে—'

আজকালকাব ছুবিতে কিছু কাটা যায না।'

'তাহলে তোমাব নখেব কি ব্যবস্থা হবে?'

'বঞ্জিত নাপিত দেশে গেছে, সে ফিরুক, তখন কেটে নেব। ও কথা থাক—'

'বঞ্জিত যদি দেশ থেকে না ফেবে, তাহলে তুমি নখই কাটবে না?'

'তখন প্রতাপকে বহাল কবব। বঞ্জিতেব মৃত্যুসংবাদ না আসা পর্যন্ত তাব জন্যে অপেক্ষা কবতে হবে।'

হো হো কবে হেসে উঠল প্রতাপ।

'আচ্ছা একগুঁযে লোক তো তুমি—'

'আমাব কথা থাক তোমাব কথা বল। পডাশোনা কেমন হচ্ছে?'

'পডাশোনা তো কবি না। কলেজে প্রফেসাববাও পডায না, আমবাও পডি না পড়ে হবেই বা কি? কলেজে যা পডতে হয বাইবে তো তা কাজে লাগে না। বাবা বলেছেন পাশ কবলেই তাঁব আপিসে ঢুকিয়ে দেবেন। তাঁব আপিস মানে কযলাব কাববাব। সেখানে শেকসপিযব, মিল্টন বা ববীন্দ্রনাথেব স্থান নেই। সেখানে খদ্দেব পটানোই কাজ আব আপিসেব মামুলী কেবাণীগিবি। সবকাব মশাই যদি আগেই বিটাযাব কবতেন তাহলে আমাকে এম এ পডতে হত না। বাবা বললেন— যতদিন সবকাব না বিটাযাব কবছে ততদিন এম এ টা পডে ফেল। ইতিমধ্যে পাবিস তো বি সি এস টা দিযে ফেল সবই বোজগাবেব পন্থা দাদু। আব ওসব সাহিত্য টাহিত্য আমাব ভালোও লাগে না তেমন মাথাতেও ঢোকে না।'

'পবীক্ষা পাশ কববি কি কবে?'

'টুকে। কিংবা নোট পডে। তোমাব নোটবইটা শুনেছি বেশ ভালো। আমাকে কযেকটা ইমপবট্যান্ট কোশ্চেন লিখে দেবে দাদু?'

'আমবা সেকেলে লোক তো আমাদেব কাছে সবই ইমপবট্যান্ট মনে হয।'

'প্লীজ, দাদু বলে দিও—দু একটা কোশ্চেন। তুমি তো মাঝে মাঝে পেপাব সেটাব হতে শুনেছি—'

'ভুল শুনেছ। আমি খোসামোদ কবতে পাবি না। দূর্গা বলে বইগুলো একবাব পডেই ফেল না। দেখ না কেমন লাগে। ছুবিব বাঁট দেখে মুগ্ধ হযেছ, ওথেলো বা হ্যামলেট পডলেও হবে—'

'বড খটমট। কেউ বুঝিয়ে দেয না।'

'নোট দেখে পড। যেখানটা বুঝতে পাববে না আমাব কাছে এসো বুঝিয়ে দেব।'

'তোমাব নোটবইগুলো কবে বেরুবে?'

'বাখাল জানে। আমি বলতে পাবব না। ছাপা হচ্ছে, এইটুকু শুনেছি। একটু আগে একটা প্রুফ এনেছিল, ভুলে ভবতি। আবাব আনতে বলেছি—'

'কিন্তু পবীক্ষার আগে যদি না বেবোয়, তাহলে তো বিক্রিই হবে না।'

'বাখাল চেষ্টা কবছে। দেখি কতদূব কি কবতে পাবে—'

'আমি উঠি এখন—'

'এত তাড়া কিসের—বস না।'

'রবীন্দ্রসদনে ব্যালে নাচ হচ্ছে। সেটা দেখব, টিকিট কিনেছি। চলি কেমন?' প্রতাপ চলে গেল।

গালে হাত দিয়ে বসে রইলেন নবীন দত্ত। তথাকথিত আধুনিক যুগের ছোপ তাঁর পরিবারেও লেগেছে। তাঁর আর এক বন্ধু নগেন ভট্‌চায্যির কথা মনে পড়ল। তাঁর ছেলে বিয়ে করেছে এক সোনার বেনের মেয়েকে। যে বংশে তার জন্ম, সে বংশের মর্যাদাবোধ সম্বন্ধে শ্রদ্ধা নেই ছোকরার। সে সত্যেন দত্তের একটা কবিতা আউড়ে দিয়েছে যে জাতিভেদ মানে না—জগৎ জুড়িয়া এক জাতি আছে সে জাতির নাম মানব জাতি। মানব জাতির মধ্যে কিন্তু চিরকাল নানারকম জাতি আছে। নানা বিভিন্ন নামে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য শূদ্র সব সমাজে চিরকাল আছে, সব সমাজে চিরকাল থাকবে। আজকাল অনেক ব্রাহ্মণ পতিত হয়েছে, নগেনের বংশে সুরেনই তো অব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণের বংশে কোনও গুণই তার মধ্যে নেই। প্রকাশ—সে সোনার বেনের মেয়েকে বিয়ে করেছে, প্রেমে পড়ে। এই প্রেমটা কিন্তু কামেরই ছদ্মবেশ। ত্যাগের কষ্টিপাথরে প্রেমের বিচার হয়। ও ছোকরা কিছুই ত্যাগ করে নি। বাপের তৈরি পাকা ইমারতে সুখে বাস করেছে, মেয়েটিও নাকি বেশ শাঁসালো। নগেন ভট্টাচার্যের বংশে অনেক বড় বড় পণ্ডিত জন্মেছিল, সেকালের গোঁড়া পরিবার ওরা, বাড়িতে শালগ্রাম শিলা আছে। মেয়েটি না কি কোন ধর্মই মানে না। জুতো খটখটিয়ে ঠাকুরঘরের সামনে দিয়ে ভ্যানিটি ব্যাগ ঝুলিয়ে ববড্‌ হেয়ারের বাহার তুলে যাতায়াত করে। শ্বশুর শাশুড়ির মনে যে আঘাত লাগতে পারে এ জ্ঞান সে মেয়েটার নেই, ছেলেটারও নেই। নিজের বংশের মর্যাদাবোধই নেই ওদের। ওরা খালি স্বার্থ চেনে, টাকা চেনে, সুবিধা চেনে, প্রয়োজনের জন্য রং বদলাতে মুখোশ বদলাতে আপত্তি নেই ওদের। তাতে বাপ মার মনে আঘাতই লাগুক বা বংশমর্যাদা চুলোয় যাক—ওরা দৃকপাত করবে না। ওরা আধুনিক। নিজেদের গায়ে 'আধুনিক' এই ছাপ লাগিয়ে ওরা যে কোনও বেলেল্লাগিরি করবে এবং ওদের দাবি তা সহ্য করতে হবে। বলতে হবে—ওরা আজকালকার ছেলেমেয়ে, ওরা তো করবেই। আধুনিক সাহিত্য মানে দুর্গন্ধ কামসাহিত্য। তাতে নাকি বাস্তবতা ফুটেছে। আগেকার কবিরা না কি অবাস্তব স্বপ্নলোকে বাস করতেন। জীবনের ছাপ নেই ওদের কৃষ্টিতে। নবীন দত্ত কিন্তু জানেন তা সত্ত্বেও টিকে থাকবেন মিল্টন, সেকসপীয়র, শেলি, কীটস, মধুসূদন, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ। ভেসে যাবে এরাই—এই হেঁজিপেঁজি হা-ঘরে আধুনিকের দল যারা রাস্তায় উলঙ্গ হয়ে দুহাত দিয়ে উন্মাদের মতো বে-আব্রু হয়ে গুহ্য আর বস্তিপ্রদেশ চুলকুচ্ছে। তারা কখনও স্থান পাবে না জগতের রসিক সমাজে। কখনও পায় নি। রাস্তার কুকুর বেড়াল পাখীপক্ষীরাও ওই বাস্তব কর্ম আবহমান কাল থেকে করছে, কিন্তু সাহিত্যিক বলে কেউ গণ্য করেনি তাদের। বরং তাদের নিয়ে প্রতিভাবান কবিরা কখনও ক্বচিৎ যে অবাস্তব কাব্য সৃষ্টি করেছেন তাই সাহিত্যে অমর হয়ে আছে। থাকবেও। এরা একটা ময়লা প্রদীপ নিয়েই নাড়াচাড়া করছে। তার মলিনতা নিয়েই যত আস্ফালন। সেটাকে আলাদিনের প্রদীপ করতে

পারেনি । পারেনি, কিন্তু বাহাদুরির অন্ত নেই, ওই অক্ষমতা নিয়েই লম্ফঝম্ফ করছে ওরা। করুক। কুকুর বেড়ালদের থামানো যায় না, এদেরও যাবে না। এখন চারিদিকে অন্ধকার। অপেক্ষা করতে হবে। অপেক্ষা করতে হবে সূর্যের জন্য। সূর্য উঠলে ফুল ফুটবে। সূর্য উঠবেই একদিন। সে দিনের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। অপেক্ষা করার মতো ধৈর্য যেন থাকে। এই সব কথাই এলোমেলো ভাবে ভাবছিলেন নবীন দত্ত। হঠাৎ তাঁর সাবিত্রীর কথাটা আবাব মনে পড়ল। ইন্টারভিউ দিয়ে এসেছে? তাকে জানায় নি কেন। সাহস হয নি? সাহস না হবার কাবণ কি? তিনি মানা করবেন এ আশঙ্কা কেন করেছিল সাবিত্রী? তিনি তো আগে ওকে চাকরি কবতে অনুমতিই দিয়েছিলেন, ওর রূপই ওর চাকবির পথে বাধা হল বলে তিনি মানা করেছিলেন। এখন যদি মোটরে যাতায়াত করার সুযোগ পায—চাকরি করুক না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আর একটা প্রাচীন প্রবচন তাঁর মনে পড়ল—ঘোমটার নীচে খ্যামটা। এ খ্যামটা নাচ চিরকাল চলছে। এ থামানো যায় নি, থামানো যাবে না। মানুষেব মধ্যে পশুত্ব যতদিন থাকবে ততদিন এটা চলবে। সুতরাং—। তাঁব চিন্তাধারা থমকে গেল। তাবপব বললেন--যা চলছে চলুক। বলেই উঠে পড়লেন। তাঁকে টিউশনি কবতে যেতে হবে।

নবীন দত্তের দুটি টিউশনি। দুটিই ছেলে। মেয়েদের টিউশনি তিনি নেন নি। একজন ভদ্রলোক তাঁর মেয়ের জন্য মাসে আড়াই শ' টাকা দিতে বাজী হয়েছিলেন। টিউশনিটি নিযেও ছিলেন তিনি। কিন্তু পড়াতে গিযে মেয়ের সাজসজ্জা দেখে ভড়কে গেলেন। ঠোঁটে রং, চোখে কাজল, গালে রুজ, পেন্ট করা মুখ, বব্ করা চুল, প্রায় অনাবৃত যৌবনপুষ্ট দেহ, ন্যাক ন্যাকা কথা দেখে তাঁর ঘৃণা হল। সঙ্গে সঙ্গে মনে হল যাকে দেখে ঘৃণা হচ্ছে তাকে তিনি ঠিকমতো পড়াতে পারবেন না। ছাত্র ছাত্রীকে ভালো না লাগলে তাদেব পডানো যায না। ফাঁকি দিয়ে সময় হরণ করা যায়, কিন্তু তাকে শিষ্যারূপে গ্রহণ করা যায না। নবীন দত্ত তার পরদিন থেকে আব যান নি, লিখে পাঠিয়েছিলেন—আমি পারব না, মাপ কববেন। প্রায সঙ্গে সঙ্গেই ভাগ্যে তিনি আর একটি টিউশনি পেযে গেলেন, তা না হলে একটু মুশকিলেই পড়তে হত তাঁকে। তাঁব একটি ছাত্র আগেই ছিল। সে মাসে একশ' করে টাকা দিত। সপ্তাহে দু' দিন করে পড়াতেন তাকে। কিন্তু সাবিত্রীর চাকরিতে ইস্তফা দেওয়াব পব আরও একশ টাকা রোজগার করবার প্রয়োজন হয়ে পড়ল। মেয়ে ছাত্রীটিকে পড়ালে তাঁর অভাবেব অতিরিক্ত কিছু টাকা হাতে জমত, কিন্তু তা আর হল না। তাঁর প্রথম ছাত্রটি আর একটি মেয়ে জুটিয়ে দিয়েছিল তাঁকে। সপ্তাহে তিন দিন পড়বে, মাসে দেড়শ' টাকা করে দেবে। কিন্তু মেয়ে শুনেই রাজী হলেন না নবীন দত্ত। বললেন—মেয়ে ছাত্র আমি পড়াতে পাবব না। তুমি তার জন্যে মেয়ে প্রফেসার খুঁজে দাও। কোনও পুরুষ ছাত্র যদি আমার কাছে পড়তে চায়, আর আমার যদি তাঁকে পছন্দ হয় তবেই আমি পড়াব। আমি কুলী নই যে পয়সা পেলে যে কোনও মোট বইব। আমি অধ্যাপক, যাকে পড়াব তাকে যদি ভালো না লাগে তাহলে তাকে পড়ানো যাবে না ঠিকমতো। মন খিঁচড়ে থাকলে পড়ানো যায় না।

'তবে ক্লাসে এতদিন কি করে পড়াতেন স্যার'—জিজ্ঞাসা করেছিল ছেলেটি।

নবীন দত্ত উত্তর দিয়েছিলেন—'ক্লাসে লেকচার দেওয়া আমার চাকরি ছিল, ক্লাসে এক

ঘন্টা লেকচার দিতাম। এক মিনিটও ফাঁকি দিই নি। ক্লাসকেই পড়াতাম। কোনও বিশেষ ছেলে বা মেয়েকে নয়। আমার লেকচার থেকে কোনও ছাত্র বা ছাত্রী কোনও শিক্ষা পেয়েছে কি না—গড নোজ। আমি জানি না। ক্লাসের পর দু' একজন ছাত্র-ছাত্রী আমার কাছে মাঝে মাঝে এসেছে, তাদের যথাযোগ্য সাহায্য করেছি। ব্যস এর বেশী আমি আর কি করেছি। আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় ছাত্র-শিক্ষকের অন্তরের যোগ কদাচিৎ হয়। যেখানে হয় সেখানে সুফল ফলে। তাই আমি আমার মনের মতন ছাত্র বেছে নিতে উৎসুক। বাজে মার্কা ছেলেকে পড়িয়ে তার কাছ থেকে টাকা নেওয়ার সরল অর্থ তার বাবা মাকে ঠকানো। আমার অভাব আছে সত্যি—কিন্তু ঠক হতে পারব না।'

নবীন দত্তের এই ছাত্রটি তাঁর অনেকদিনের পুরাতন ছাত্র। বাংলায় এম. এ. পাশ করেছে। এবার ইংরেজিতে দিতে চায়। বড়লোকের ছেলে, একমাত্র ছেলে। কিন্তু ভারী ভালো ছেলেটি। বিনয় নাম। নামের মর্যাদা ও রেখেছে। বি. এ. পড়বার সময় নবীন দত্ত ওকে ইংরেজিতে কোচ করেছিলেন। অনার্স পেয়েছিল। বাংলাতেও অনার্স পেয়েছিল। বাংলাতেও ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছে। এবার ইংরেজিতে দেবে। নবীন দত্ত পড়ান তাকে।

বিনয় বলল—'আপনি যা চাইছেন তা আজকাল পাওয়া শক্ত। একটি জানাশোনা ছেলে টিউটার খুঁজছে। ছেলেটি খারাপ নয়। কিন্তু তার চওড়া জুলফি আছে—

'ও ছেলে আমি পড়াতে পারব না।'

বিনয় হেসে বললে—'ভালো অধ্যাপকরা যদি এদের না পড়ান তাহলে এদের গতি কি হবে।'

নবীন দত্ত সংক্ষেপে বললেন—'দুর্গতি।'

'ওদের হয়ে ওকালতি করতে লাগল।

'ওরা ফ্যাসানের স্রোতে ভেসে চলেছে, ওদের বাইরেটাই একটু কিম্ভূত গোছের। ভিতরে ওরা সবাই খারাপ নয়। ভূপেন জুলফি রেখেছে বটে, কিন্তু ছেলেটি ভালো।'

'কিন্তু ওদের মধ্যে অনেকেরই মন বিষিয়ে দিয়েছে আজকালকার বাজে নেতা, বাজে সাহিত্যিক, আর বাজে প্রফেসারগুলো। ওরা অনেকেই বিশ্বাস করতে শুরু করেছে যে যেহেতু ওরা যুবক সেই হেতু ওদের অভব্যতা করবার অধিকার আছে। ওরা ওদের বুলি মুখস্থ করে বলতে শিখেছে এদেশের ভদ্রলোক মাত্রেই শোষক সম্প্রদায়ের লোক। ওরা জেনারেশন গ্যাপের থিয়োরি আউড়ে জাহির করে বেড়াচ্ছে গত যুগের সঙ্গে এ যুগের আকাশ পাতাল তফাৎ হয়ে গেছে। সুতরাং ওরা নতুন-কিছু হয়েছে। হলে আপত্তি করতাম না, কিন্তু হয়নি, মুড়ি মুড়িই আছে—নামটা হয়েছে চাল-ভাজা। নানা রকম প্যাকেটে মোড়া আছে যদিও। অধিকাংশই আবার মিয়োনো!'

'আমি ভূপেনকে নিয়ে যাব একদিন আপনার কাছে—'

'এসো'।

জুলফি সত্ত্বেও ভূপেন ছেলেটিকে ভালো লেগে গেল নবীন দত্তের। ভূপেন এসেই প্রথমে প্রণাম করল, তারপর চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। চোখে মুখে সম্ভ্রম আর একটু ভীতু ভীতু হাসি।

বিনয় বলল—'এই সাব ভূপেন। ইংরেজিতে এম. এ. পড়ছে। আপনার কাছে পড়তে চায়—'

' টুকে পরীক্ষা পাশ করবার দিকে ঝোঁক আছে না কি?'

'আজ্ঞে না—'

'নেই কেন। সবাই তো ওই করছে। ডিগ্রীর ছাপ মারা একটা কাগজ পাওয়াই তো উদ্দেশ্য। তার জন্যে আমার কাছে প্রাইভেট পড়বার দরকাব কি— কোনও চোরের সন্ধান নাও।'

ভূপেন বলল-- 'আমি ডিগ্রীর জন্য পড়ছি না সার। ইংরেজি সাহিত্যে পড়াশোনা করতে চাই। এম. এ. ক্লাসে ভরতি হয়েছি, কারণ, ভালো লাইব্রেরির সাহায্য পাব, ভালো অধ্যাপকদের দেখা পাব, এই জন্যে। আপনি যদি আমাকে পড়ান তাহলে তো সেটা ভাগ্য বলে মনে কবব আমি।'

ভূপেনেব মুখেব দিকে চেযে নবীন দত্ত প্রশ্ন করলেন--'জুলফি রেখেছ কেন?'

'রাখতে হয়েছে, কাবণ ওটা উত্তবাধিকার সূত্রে পেয়েছি। বাবাব, ঠাকুবদাব, প্রপিতামহ, বৃদ্ধ প্রপিতামহ—এই চাব পুরুষেব ছবি আমাদেব বাড়িতে আছে। প্রত্যেকেবই জুলফি।

'তাই নাকি।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। জাতে আমরা রাজপুত। মেবারের কাছে আমাদের পূর্বপুরুষবা থাকতেন। তাবপব অনেক দিন আগে তাঁরা বাজনৈতিক কাবণে বাংলাদেশে চলে আসেন। সাত পুরুষ আমরা বাংলা দেশে বাস কবছি। এখন আমরা বাঙালী।'

তাবপর একটু হেসে বলল—'জুলফিটা আমাকে ঠিক মানায় না। কিন্তু বংশের প্রথা বলেই বেখেছি—আমার মায়ের ওটা ইচ্ছে।'

নবীন দত্ত খুব খুশি হলেন মনে মনে । বললেন—'বেশ, তোমায় পড়াব। কিন্তু তার আগে তোমাকে একটু বাজিয়ে নেব। চসার পড়েছ'?

'ক্যানটারবেরি টেল্‌স পড়েছি—'

'বেশ। নিজের ভাষায় চসার সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ লিখে এনে দেখাও আমাকে। পনেরো দিন সময় দিলুম।'

'কিন্তু আমি আজ থেকেই আপনার শিষ্য হলুম। ভালো দিন দেখে বেরিয়েছি,—'

এই বলে হেঁট হয়ে সে প্রণাম করল এবং একটি একশ টাকার নোট তাঁর পায়ের কাছে রেখে দিল।

'ওটা কি?'

'গুরুদক্ষিণা।'

'দক্ষিণা শেষে দিতে হয়। আগে নেব না।'

'তাহলে প্রণামী বলে নিন।'

'না —তা-ও নেব না। ওসব ভড়ং করবার যোগ্যতা আমার নেই। আসল কথা, তোমার প্রবন্ধটা দেখে আগে ঠিক করি তোমাকে নেব কি না। তারপর টাকাকড়ির কথা হবে। দেখ,

যেদিন থেকে আমরা বিদ্যা বিক্রয় করতে শুরু করলাম সেই দিন থেকে আমাদের অধঃপতন শুরু হয়েছে। গুরু যেদিন অর্থের দাস হল, অর্থদাতা শিষ্যের চাটুকার হল, সেইদিনই আমাদের বারোটা বেজে গেছে।'

'কিন্তু আপনাদের সংসার চলবে কিসে?'

'সেটা দেখবেন দেশের রাজা বা স্টেট। যে বিদেশের নকল আমরা করেছি সেখানেও ভালো অধ্যাপকদের অর্থাভাবে ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়াতে হয় না। ভালো অধ্যাপককে স্টেট গুরুর আদরেই রাখেন সেখানে। কিন্তু এখানে সে সব হবার উপায় নেই। ইংরেজদের আমলে গুণের কিছু কদর তবু ছিল, এখন একদম নেই। এখন ভাইপো-ভাগনেদের দবাদবা, রক্ষিতার আত্মীয়দের ববরবা, এখন ভদ্রলোক বিপন্ন। সভায় সভায় যে সব আদর্শের আস্ফালন, কার্যকালে সে সব আদর্শের মূলোচ্ছেদ। বাইরে কোঁচোর পত্তন, ভিতরে ছুঁচোব কেত্তন। যাক এসব বলে আর কি হবে। নিয়তিকে ওলটানো শক্ত। তবু চেষ্টা করতে হবে। ওই চেষ্টা ওই পুরুষকারই আমাদের একমাত্র ভরসা এখন।'

হঠাৎ থেমে গেলেন নবীন দত্ত।

তারপর বললেন—'প্রফেসারদের একটা দোষ কি জান, মহা বাক্যবাগীশ তারা। বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করলে থামতে জানে না। আচ্ছা, আজ তুমি চলে যাও। 'এসে'টা লিখে এনো।'

ভূপেন সাত দিন পরেই লিখে এনেছিল প্রবন্ধটা।

নবীন দত্তের এতো ভালো লেগেছিল যে তিনি বলেছিলেন--'বেশ, তোমাকে পড়াব। মাইনে না দিলেও পড়াব। চমৎকার হয়েছে লেখটা--'

ভূপেন চক্ষু অবনত করে বলেছিল – 'মাইনে কিন্তু নিতে হবে।'

'বেশ।'

নবীন দত্তের এই দুটি ছাত্র তাঁর ছেলের মতন। এদের উপর মনে মনে অনেকখানি নির্ভর করেন তিনি। বাইরে অবশ্য এদের কাছ থেকে এক মাইনে ছাড়া অন্য কিছু নেন নি। কারো কাছে কোনও কিছু চাইতে তাঁর ভারী লজ্জা হয়। মনে হয় মাথা কাটা যাচ্ছে যেন। নিজের ছেলেদের কাছেও কখনও কিছু দাবি করেন নি তিনি। তারা স্বেচ্ছায় যখন যা দিয়েছে তা ই নিয়েছেন। কিন্তু তা-ও সব সময়ে নিজের কাজে লাগান নি। দুম্ যে পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে গেছে তা স্পর্শ করেন নি এখনও তিনি। অথচ এ জন্য মাঝে মাঝে তাঁর মনে হয়—এটা আমার চরিত্রের দোষ। সবার সঙ্গে মিলে মিশে গলাগলি করে থাকতে পারি না, এটা কি আমার গুণ নাকি? তাঁর সান্ত্বনা বিদ্যাসাগরেরও এ দোষ ছিল। বিদ্যাসাগরের ছবির দিকে চেয়ে দেখলেন একবার। মনে মনে প্রশ্ন করলেন—ইয়ং সাহেবের সঙ্গে আপনি ঝগড়া করেছিলেন কেন? মেরী কার্পেন্টারের সঙ্গেও তো আপনার মতের মিল হয় নি, ফট করে বেথুন বালিকা বিদ্যালয়ের সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দিলেন। বন্ধু মদনমোহন তর্কালঙ্কার, রাজকৃষ্ণ বসু, এদের সঙ্গেও আপনি ঝগড়া করেছিলেন, কার সঙ্গেই বা মতের মিল হয়েছিল আপনার? ভাইদের সঙ্গে, ছেলের সঙ্গে, বীরসিংহের লোকদের সঙ্গেও — কারও সঙ্গে তো আপনার বনে নি। বিদ্যাসাগরের নির্বাক ছবি নির্বাক হয়েই রইল। নবীন দত্তের মনে হল

একটি নীরব উত্তর ফুটে উঠেছে কিন্তু তাঁর চোখের দৃষ্টিতে। তা যেন বলছে— মায়ের সঙ্গে আমার মতের কখনও অমিল হয় নি। ছবিটার দিকে আরও খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে নবীন দত্ত নেমে গেলেন। টিউশনি করতে যেতে হবে বালীগঞ্জে বাসে বেশ কিছুক্ষণ লাগবে। তারপর ইচ্ছে আছে শিশুসমার খবর নেবেন একটু। তার বাড়িতে যাবেন না—ফোন করবেন। ভূপেনের বাড়িতে ফোন আছে। মেয়েটাকে খুব স্নেহ করেন তিনি। কিন্তু তাকে ঠিক বুঝতে পারেন না। মাঝে মাঝে মনে হয়, কাকেই বা বুঝতে পেরেছেন তিনি। সবাই তো দুর্জ্ঞেয় রহস্য এক-একটি। দুম্‌কে বুঝতে পেরেছেন? পারেন নি। পারুলকে পেরেছেন? পারেন নি।

রাস্তায় নেবেই একটা পিঠকাটা জামা-পরা মেয়ের দেখা পেলেন। বুকেব কাপড়টা প্রায় খোলা। প্রকৃতি যে তাঁকে একজোড়া স্তন দিয়েছে এইটে বিজ্ঞাপিত করতে করতে চলেছে। কোনও ছোঁড়া ওর ওপর যদি ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে খুব দোষ দেওয়া যাবে কি? প্রকৃতি স্ত্রীলোকমাত্রকেই স্তন দিয়েছেন, ওতে ওব নিজের কৃতিত্ব কিছু নেই। কৃতিত্ব আস্ফালন করাটাও অশোভন। কিন্তু বোকা মেয়েটা তা বোঝে না। ছ্যা, ছ্যা, আমবা কোথায় নেবে গেছি।

বাস এসে পড়ল। তাড়াতাড়ি উঠে পড়লেন নবীন দত্ত। সেখানেও গুঁতাগুঁতি ঠেলাঠেলি অসভ্যতার চরম। তবু তার মধ্যেই একটি মহিলা নিজের সীট ছেড়ে উঠে পড়ল—'আপনি আমার সীটে বসুন।'

'কে আপনি?'

'আমি আপনাব ছাত্রী ছিলাম বিদ্যাসাগর কলেজে।'

প্রণাম কবল মেয়েটি।

এই ভীড়েই হঠাৎ যেন স্বর্গ হাতে পেলেন তিনি।

শ্যামবর্ণা রোগা মেয়েটিকে স্বর্গের দেবী বলে মনে হল তাঁর।

'তুমি বস। আমি বেশ তো দাঁড়িয়ে আছি—'

'না, না। আপনি বসুন।'

জোর করে বসিয়ে দিলে মেয়েটি তাঁকে তার সীটে। বসেই নজরে পড়ল ওদিকের সীটে একটা চকরবকরা শার্ট পরা নীল চশমা চোখে জুলফিদার ছোকরা খ্যা খ্যা খ্যা করে হাসছে। চোখ বুজে রইলেন নবীন দত্ত।

ভূপেন্দ্রকে শেকসপীয়রের ক্লিওপেট্রা ও বার্ণার্ড শ'র ক্লিওপেট্রা নিয়ে একটা তুলনামূলক সমালোচনা লিখতে বলে নবীন দত্ত শিশুসমাকে ফোন করছিলেন।

'শিশু, কেমন আছিস?'

'ভালই তো আছি। আপনি আব আসেন না কেন?'

'রাগ হয়েছে। তাছাড়া সময়ই বা কই। রোজগার করে সংসার চালাতে হয় তো। ব্যস্ত থাকি। তা ছাড়া রাগও হয়েছে—'

'আমার উপর?'

'না। তোর বাবার উপর—'

'বাবার খুব অসুখ। সেই জন্যই আপনার কাছে যেতে পারি নি।'

'কি হয়েছে?'

'ডাক্তার ক্যানসার সন্দেহ করছে।'

'সে কি! কোথায় ক্যানসার হয়েছে?

'প্রস্টেটে—'

'তাই নাকি। আমি যাচ্ছি একটু পরে—'

'কোথা থেকে ফোন করছেন?'

'বালিগঞ্জ থেকে।'

ট্রামে বাসে আসতে অনেক দেরি হবে তো?'

'হ্যাঁ, ঘন্টা দেড়েক লাগবে।'

'আপনি ঠিকানাটা বলুন না, গাড়ি পাঠিয়ে দিই।'

'না। গাড়ি পাঠাতে হবে না।'

ফোন কেটে দিলেন নবীন দত্ত।

ঘন্টা দুই পরে ধীরেশের কাছে গিয়ে দেখলেন ধীরেশ বিছানায় শুয়ে আছেন। তাঁকে দেখে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলেন তিনি।

'নবীন, আমি তো এবার চললুম। তুমি শিশুর বিয়ে দাও এবার।'

নবীন চুপ করে রইলেন। একটু পরে বললেন—'একেই তো রোগে কষ্ট পাচ্ছেন। মেয়ের বিচ্ছেদযন্ত্রণা কি এর উপর সইতে পারবেন? ওসব কথা এখন থাক—'

ধীরেশের চোখ দিয়ে অবিরল ধারায় জল পড়তে লাগল। তার দিকে চেয়ে চুপ করে বসে রইলেন নবীন দত্ত।

।। তিন।।

ধীরেশের মৃত্যুর ঠিক পাঁচ দিন পরেই তাঁর শাশুড়ীরও মৃত্যু হল। ধীরেশ হাসপাতালে ছিলেন। মৃত্যুর দুদিন আগে তিনি অজ্ঞানও হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুর কিছুক্ষণ আগে নবীন দত্ত তাঁকে দেখতে গিয়ে দেখলেন নির্বাক হয়ে চোখ বুজে শুয়ে আছেন। চোখ দিয়ে জল পড়ছে। শিশু দুহাতে মুখ ঢেকে বসে আছে তার মাথার শিয়রে। নবীন দত্ত পাশের টুলটিতে সন্তর্পণে বসলেন। ধীরেশবাবুর জন্যে একটা আপেল আর একটা কমলালেবু নিয়ে গিয়েছিলেন। সে দুটো নীরবে রেখে দিলেন পাশের টেবিলে। চারদিকে কেমন যেন একটা থমথমে ভাব। নার্সরা সন্তর্পণে যাতায়াত করছেন। দূরে কোথায় যেন একটা ফোন বেজে উঠল।

একটু পরে একটি নার্স এসে বললেন—'আপনিই কি নবীন বাবু?'

'হ্যাঁ কেন—'

'আপনার স্ত্রী ফোন করছেন—আপনি এখুনি বাড়ি চলে যান। আপনার শাশুড়ির অবস্থা ভালো নয়।'

নবীন দত্ত উঠে দাঁড়ালেন। তারপর শিশুসমার কাছে গিয়ে মৃদু কণ্ঠে বললেন—'আমি বাড়ি যাচ্ছি। আমার শাশুড়ীর অবস্থা খারাপ' —বলেই চলে যাচ্ছিলেন। একটু দূরে গিয়ে দেখলেন শিশুও তার পিছু পিছু আসছে।

'তুমি উঠে এলে কেন?'

'ড্রাইভারকে বলে দিচ্ছি সে আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসুক।'

'ধীরেশবাবুর সম্বন্ধে ডাক্তাররা কি বলছেন?'

' বলছেন কোন আশাই নেই।'

'গাড়িটা এখানেই থাক। ধীরেশবাবুর জন্য কোনও জরুরি ওষুধপত্র দরকার হতে পারে—'

'সব আনিয়ে রাখা হয়েছে। আপনি নিয়ে যান গাড়িটা। একজন ডাক্তার সঙ্গে নিয়ে যান। টাকা আছে আপনার কাছে?'

'আছে—। তুমি যাও বাবার কাছে বস গিয়ে—'

শিশু শুনল না। তাঁর পিছু পিছু গিয়ে ড্রাইভারকে বলে এল—এঁকে নিয়ে যাও।

প্রকাণ্ড বড় ডজ গাড়ি। ধীরেশবাবু মাত্র কয়েকদিন আগে 'এমব্যাস' থেকে কিনেছিলেন। ইচ্ছে ছিল শিশুকে নিয়ে ভারতভ্রমণে বেরুবেন। তা আর হল না।

তাঁর একজন ছাত্র-ডাক্তারকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন তিনি। বিখ্যাত ডাক্তারদের চেয়ে অবিখ্যাত যুবক ডাক্তারদের উপর তাঁর বিশ্বাস বেশী। এই ছেলেটি আই. এস. সি. পড়বার সময় তাঁর কাছে ইংরেজি পড়েছিল। ভারী ভালো ছেলেটি। সেই তাঁর গৃহচিকিৎসক, পারুলের মায়ের চিকিৎসা সেই বরাবর করছে।

তাঁর শাশুড়ীর জ্ঞান ছিল। বুকে অসহ্য ব্যথা।

অমিয় তাঁকে পরীক্ষা করে বলল—করনারি।

'কি রকম বুঝছ?'

'ভালো নয়। পালসের অবস্থা খুব খারাপ। তবু যা করা দরকার আমি করছি।'

'কোনও নামজাদা ডাক্তারের সঙ্গে 'কনসল্ট' করতে চাও?'

'করতে পারি। কিন্তু তাতেও যে ফাঁড়াটা কাটবে তা মনে হয় না। তবু ডাকুন একজনকে—'

একজন বড় ডাক্তারেরই নাম করলে সে। সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু বললেন—' এঁকে ডাকলেই পাওয়া যায় না। অনেক আগে 'কল' বুক করতে হয়।'

'তুমি যা ভালো বোঝ কর।'

অমিয় ট্যাক্সি করে বেরিয়ে গেল এবং নিয়ে এল একজনকে। তিনিও বললেন—হোপলেস। এবং ওই একটি কথা বলার জন্য তাঁকে চৌষট্টি টাকা ফি দিতে হল। দিলেন নবীন দত্ত। সেইদিনই তিনি এক ছাত্রের কাছ থেকে মাইনে পেয়েছিলেন।

ঘণ্টা দুই পরে মারা গেলেন তাঁর শাশুড়ী।

পারুল সাবিত্রী রেবতী পার্বতী সবাই মড়া-কান্না শুরু করলে। নবীন দত্ত পাশের বাড়িতে গেলেন তাঁর শালাদের খবর দেবার জন্য। পাশের বাড়িতে ফোন আছে।

নবীন দত্ত বললেন—'সৎকার সমিতিতে খবর দাও তারা সব ব্যবস্থা করবে।'

তাঁর বড় শালা বললেন, 'মায়ের মৃতদেহ মোটরে করে নিয়ে যাওয়া হোক এটা আমরা চাই না। মা সেকেলে লোক ছিলেন, সেকেলে ধরনেই নিয়ে যাওয়া হোক তাঁকে।'

ছোটশালা বললেন—'আমি একটা ভালো খাট কিনে আনছি—'

খাট কিনে নিয়ে এলেন তিনি। পারুলবালার ঘন ঘন ফিট হচ্ছিল। তাঁকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল সাবিত্রী আর তার মেয়েরা। নবীন দত্ত পাড়ায় বেরুলেন শব-বাহক সংগ্রহ করবার জন্য। পাড়ায় দশ বারো জন লোক রাজী হল। কিন্তু তারা যা চাইল তা তিনি প্রত্যাশা করেন নি। কারণ ওদের মধ্যে একজন কিছুদিন আগে তাঁকে অনুরোধ করেছিল এক সংস্কৃতি সভায় পৌরোহিত্য করবার জন্য। সে লোকটি অবশ্য সোজাসুজি তাঁর কাছে বলতে পারে নি। আব একজন লোকের মারফত জানিয়েছে। তিন বোতল ব্র্যান্ডি বা হুইস্কি চাই। শুনে অবাক হয়ে গেলেন তিনি। শালাদের এসে বললেন—' আমি চাই না যে কতকগুলো মদ্যপ মাকে বয়ে নিয়ে যায়। তোমবা 'সৎকার সমিতি'কেই খবর দাও।'

বড় শালা হরবিলাস বললেন—'আপনি ও নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন কেন। আমবা ওদের সঙ্গে কথা বলে নিচ্ছি।।'

ছোট শালা হরিবিলাস ফোড়ন দিলেন...' মদ তো দিতেই হবে। ওটা তো রেওযাজ হয়ে গেছে। সবাই তো মদ খাচ্ছে আজকাল। শুধু পুরুষবা নয়, মেয়েবাও। কোথায় আছেন আপনি জামাই বাবু---'

নবীন দত্ত কিছু না বলে সোজা বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন। হাঁটতে হাঁটতে গিয়ে নিমতলা ঘাটে যখন পৌঁছলেন তখন অন্ধকার। দেখলেন একটা চিতা জ্বলছে। সেই দিকে চেয়ে চুপ করে বসে রইলেন তিনি। তাঁর শাশুড়ীর শবদেহ এল অনেকক্ষণ পরে। খাটটা নাকি খুব ভারী ছিল।

।। চার ।।

শাশুড়ীর শ্রাদ্ধের সময় পারুলবালা তাঁর বাপের বাড়িতেই ছিলেন। তাঁর ভায়েরা যদিও তাঁর মায়ের জীবদ্দশায় তেমন খোঁজখবর করেন নি কিন্তু মৃত্যুর পর শ্রাদ্ধটা করলেন জাঁকজমক করে। আসল শ্রাদ্ধটা যদিও হল 'তিলকাঞ্চন' কিন্তু শ্রাদ্ধের ভোজটা হল শুধু দ্বাদশজন ব্রাহ্মণ ভোজনের ভোজ নয়, শালাদের বন্ধুবান্ধবদের ভোজ। হোটেল থেকে খাবার আনানো হয়েছিল। শাশুড়ীর দশ হাজার টাকার একটা ইনসিওরেন্স করা ছিল। পুত্ররাই সে টাকা পাবে। অতগুলো টাকা যখন পাওয়া যাবে তখন মায়ের শ্রাদ্ধকে উপলক্ষ্য করে কিছু আমোদ আহ্লাদ করা বোধ হয় অনুচিত হবে না—এই যুক্তিই বোধহয় জেগেছিল ছেলেদের

মনে। মায়ের যে সব গয়না কাপড় ছিল তা দুই বউই ভাগ করে নিয়েছিল। পারুলবালাকে তারা দিয়েছিল পুরোনো বিবর্ণ বোম্বাই শাড়ি একটি। পারুলবালা বলেছিলেন—ওটাও তোমাদের থাক। আমার কিছুরই দরকার নেই। মায়ের শেষ সময়ে যে সেবা করতে পেরেছি এইটেই আমার পরম ভাগ্য। বউদের এ শুনে নাকি মুখ ভার হয়েছিল। নবীন দত্ত শ্রাদ্ধের দিন গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। ভোজে যোগদান করেন নি। শালারা পীড়াপীড়ি করাতে বলেছিলেন—সেকালে আমরা যে ধরনের ভোজ খেয়ে তৃপ্তি পেতাম সে ধরনের ভোজ তো হচ্ছে না। আজকাল হয় না। সেই সুগন্ধ চালের ভাত, মুগের ডাল, ভাজাভুজি, ছ্যাঁচড়া, ডালনা, কোর্মা, ঝাল, অম্বল, ক্ষীর পরমান্ন—এসব আজকাল কেউ খায়ও না, রাঁধতেও জানে না। হোটেলের খাবার আমার সহ্য হয় না। আমি স্বপাকে খাই, তাই খাব গিয়ে। অনেক পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও চলে এসেছিলেন তিনি। পারুলবালা চলে আসেন নি। কাজ শেষ হবার দুদিন পরে এলেন। এসেই তিনি সোজা চলে গেলেন নবীন দত্তের চিলে কোঠার ঘরে। নবীন দত্ত তখন তাঁর ইকমিক কুকার থেকে সিদ্ধ ডাল ভাত তরকারি ঢালছিলেন একটা থালার উপর। পারুলবালা এসেই প্রথমে জিগ্যেস করলেন—'দুমের কোন খবর এসেছে'?

'না।'

পারুলবালা চুপ করে দাঁড়িয়ে স্বামীর খাওয়া দেখতে লাগলেন। তারপর বললেন—'কাল থেকে আমি তোমার জন্যে রাঁধব।'

নবীন দত্ত খেতে খেতে তাঁর মুখের দিকে চাইলেন একবার। তারপর আবার খেতে লাগলেন।

পারুলবালা বললেন, 'আমার তো এখন আর কিছু করবার নেই। আমি কি নিয়ে থাকব।'

'কেন, তোমার নাতনীরা তো আছে।'

'বউমা চাকরি পেয়েছে। সে রেবতী আর পার্বতীকে নিয়ে যাবে বলছিল।'

'নিয়ে যাবে? কোথায়?'

'আমি ঠিক জানি না। শুনছি যে চাকরি পাবে, সেটা নাকি স্কুলের হেড মিস্ট্রেসের চাকরি। স্কুলের কাছেই কোয়ার্টার আছে। খগেশ্বর বলছে আপনার শ্বশুর শাশুড়ী যদি আপত্তি না করেন তাহলে আপনি ওই কোয়ার্টারেই থাকতে পারেন। আর যদি আপত্তি করেন তাহলে বাড়ি থেকেই মোটরে যাতায়াত করবেন। বউমার ইচ্ছে ওই কোয়ার্টারে গিয়ে থাকা—'

'মানে আমাদের সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকিয়ে দিতে চায়?'

পারুলবালা চুপ করে রইলেন।

নবীন দত্ত বললেন—'তাকে ডাকো তো একবার। ব্যাপারটা পষ্টাপষ্টি জেনে নিই।'

'সে বাপের বাড়ি গেছে। যখন ফিরবে তখন পষ্টাপষ্টি জেনে নিও। কিন্তু আমি দুমের জন্য বড্ড অস্থির হয়ে উঠেছি। জার্মানির ঠিকানা কি, সেখানে টেলিগ্রাম, কি ট্রাংক কল করা যায় না? দাদা বলছিল—যায়—'

'যায়। কিন্তু তাতে অনেক ঝঞ্ঝাট, বেশ কিছু খরচও আছে। আমি তার ঠিকানা ফোন নম্বর সব লিখে দিচ্ছি, তোমার দাদার সাহায্যে যা করবার তুমিই কর না।'

'তুমি করবে না?'

'না। ওসব ঝঞ্ঝাট আমি পোয়াতে পারব না। দুমের জন্যে আমারও চিন্তা হচ্ছে কিন্তু আমি ও নিয়ে মাতামাতি লাফালাফি করতে পারব না। আমি জানি, সে ভালো আছে। খারাপ থাকলে একটা খবর নিশ্চয় আসত। তোমার ছেলেকে চেন না? কিছু একটা নিয়ে মত্ত হয়ে আছে সে। তাই চিঠি লিখছে না। আবার যখন খেয়াল হবে লম্বা লম্বা চিঠি লিখবে।'

পারুলবালা রুষ্ট মুখে ঈষৎ বেঁকে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর আর কিছু না বলেই নেমে গেলেন নিচে।

সেইদিনই বিকেলবেলা সাবিত্রীর সঙ্গে দেখা হল নবীন দত্তের। বাপের বাড়ি থেকে ফিরেই সে এসেছিল নবীন দত্তের চিলে কোঠায়। সাবিত্রী মনে মনে আধুনিকা, অর্থাৎ আধুনিক যুগের চাল চলনের স্রোতে ভাসতে চায়। যখন বিয়ে হয় নি, তখন ভেসেছিল। কিন্তু বিয়ের পর নবীন দত্তের আওতায় এসে দমে গিয়েছিল বেচারী। বুদ্ধিমতী মেয়ে, বুঝতে পারলে এ বাড়িতে থেকে নবীন দত্তের প্রবল ব্যক্তিত্বকে উপেক্ষা করা শক্ত। যে লোকটা কারো কাছ থেকে কিছু চায় না, বরং সব্বাইকে যথাসম্ভব দিতেই চায়, তাকে সমীহ করতেই হয়। সাবিত্রী মনে মনে সত্যিই শ্রদ্ধা করত নবীন দত্তকে। কারণ সে বুঝেছিল নবীন দত্ত বাইরে প্রাচীনপন্থী হলেও সত্যিই আধুনিকতা বিরোধী নন। তিনি ছিলেন উন্নাসিকতা-বিরোধী। আধুনিকতার স্বাভাবিক প্রকাশকে ভদ্র মন নিয়ে শ্রদ্ধা করেন তিনি। চটে যান ঢং দেখান। সাবিত্রী অসাধারণ রূপসী। ঐ রূপের জন্যই পারুলবালা তাকে পছন্দ করে বিয়ে দিয়েছিলেন অলঙ্কারের সঙ্গে। সাবিত্রীর কুলে কোথায় কি যেন একটা খুঁত ছিল, নবীন দত্ত দোনোমোনো করছিলেন বিয়ে দেবেন কি না, কিন্তু পারুলবালার জেদই জয়ী হয়েছিল শেষকালে। অলঙ্কারও মুগ্ধ হয়েছিল সাবিত্রীকে দেখে। অতিবড় রূপসীকে বউ করে এনে নবীন দত্ত মনে মনে একটু ভীত ছিলেন। বি. এ. পাস করে বিয়ে হয়েছিল তার। ইচ্ছা ছিল ইউনিভারসিটিতে এম. এ পড়ে। অনার্স পেয়েছিল বি.এ. তে। নবীন দত্ত আপত্তি করেছিলেন। বলেছিলেন ঘরের বউয়ের আবার ডিগ্রি নিয়ে কি হবে। তবে বাড়িতেই যত ইচ্ছা পড়াশোনা তুমি করতে পার। আমিই তোমাকে সাহায্য করব। তুমি বাড়িতে বসে এম.এ.র কোর্সটা পড়ে ফেল না। সাবিত্রী তা পড়ে নি। নভেল নাটক পড়েছিল যথেষ্ট। কিছু কিছু কমিউনিস্ট সাহিত্যও। এ সবের জন্যে নবীন দত্তের সাহায্য নিতে হয় নি। তারপর হঠাৎ বিধবা হল সে। পরিবারে একটা আকস্মিক বজ্রপাত হল যেন। মানুষটা তো গেলই, সঙ্গে সঙ্গে অনেক টাকার আয়ও চলে গেল। শোকের ঝড়টা যখন প্রশমিত হল তখন সাবিত্রী একদিন নবীন দত্তকে বলল—'আমি একটা চাকরি যোগাড় করেছি। আপনি অনুমতি দেন তো সেটা নিয়ে নি। মাইনে দুশ টাকা।'

নবীন দত্ত বিস্মিত হলেন।

'কি করে চাকরি যোগাড় করলে তুমি—'

'আমার বাবার এক বন্ধু করে দিয়েছেন। একা আপনার উপরই বড্ড চাপ পড়েছে। তার উপর দিদিমাও এসে রয়েছেন। ঠাকুরপোর পড়া এখনও শেষ হয় নি। তাই ভাবলুম আপনি যদি আপত্তি না করেন চাকরিটা নি—'

খবরটা শুনে নবীন দত্ত খুবই বিস্মিত হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি বুদ্ধিমান যুক্তি বাদী লোক।

আপত্তি করলেন না। সাবিত্রী চাকরি করতে লাগল। কিন্তু নবীন দত্তের মনের নেপথ্যে যে ভয়টা অশরীরী হয়েছিল এতদিন, সেটা শরীরী হয়ে আত্মপ্রকাশ করল। পথে গুণ্ডার হাতে পড়ল সাবিত্রী। সেইদিন থেকে সাবিত্রীর চাকরি খতম করে দিলেন নবীন দত্ত। তিনি বুঝলেন, ও গুণ্ডার দেশ, ছোটলোকের দেশ, এখানে দেবতারা বিহার করেন না, নারীরাও পূজা পায় না। একদা বেথুন কলেজের গাড়িতে যে সংস্কৃত শ্লোকটা কর্তারা লিখেছিলেন সেটা এ দেশের পক্ষে হাস্যকর, বেনাবনে মুক্ত ছড়ানো।

সাবিত্রীকে দেখে সোজা প্রশ্ন করলেন—'শুনলাম তুমি আবার চাকরি নিচ্ছ।'

মাথা হেঁট করে সাবিত্রী বলল—'হ্যাঁ, নিয়েছি। একটা স্কুলের হেড মিস্ট্রেসগিরি। নতুন স্কুল হয়েছে, আমাকেই সেটা ভালোভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে —'

'স্কুলের নাম কি।'

'জগন্মাতা বালিকা বিদ্যালয়। খগেশ্বরবাবুই স্থাপন করেছেন এটি নিজের মায়ের নামে। সব খরচ তাঁরই। স্কুলের বাড়ি করে দিয়েছেন, হেড মিস্ট্রেসেরও বাড়ি করে দিয়েছেন। আপনার ছেলেব তো সহপাঠী উনি, তাই আমাকে চিঠি লিখেছিলেন যে আপনি আপাতত এসে স্কুলটাব ভার নিন। আমি গিয়েছিলাম। মিস্টার হাজরা বললেন--আপাতত আমরা নিচের দিকের কয়েকটা ক্লাস আরম্ভ করছি। আস্তে আস্তে বড় করব। আপনি এসে এদের ভার যদি নেন আপনাকে মাসে তিনশ করে দেব। সেটা বেড়ে ক্রমশ পাঁচশ হবে। তাছাড়া ফ্রি কোয়ার্টার্স। আব আমি যদি ওখানে গিয়ে না থাকি তাহলে মোটরে কবে নিয়ে যাবেন, আবার পৌঁছে দেবেন।'

'তুমি কি কোয়ার্টার্সে থাকবে ঠিক করেছ?'

'আমি কিছুই ঠিক করি নি। আপনি যা বলবেন তাই কবব।'

'খগেশ্বরের সঙ্গে দেখা করবার আগে তো আমাকে জিগ্যেস কব নি। করলে আমি আপত্তি করতাম না। নিজের আত্মসম্মান বাঁচাবার জন্যেই করতাম না। আজকাল সকলেই স্ব ইচ্ছায় চলতে চায়, চলতে পারলে তো ভালই, আপত্তি করবার কি আছে। অলঙ্কার যদি বেঁচে থাকত তাহলে সে কি করত তা জানি না। না, আমার কিছুতেই আপত্তি নেই। তুমি যা ভালো বোঝ তাই কর।'

সাবিত্রী কিছুক্ষণ মাথা হেঁট করে বসে রইল।

তারপর বলল—'কোয়ার্টার্সে থাকাই সুবিধা। রেবতী পার্বতীকেও ওই স্কুলে ভরতি করে দেব। আমি একটা কথা বলছিলাম—'

একটু ইতস্ততঃ করে থেমে গেল সাবিত্রী।

'কি কথা—'

'আপনি আর মাও গিয়ে যদি থাকতেন ওখানে বড় ভালো হ'ত। দোতলা বাড়ি। কিছু কষ্ট হত না আপনাদের। এ বাড়িটা ভাড়া দিয়ে দিলে আরও শ পাঁচ ছয় টাকা আয়ও বাড়ত আমাদের—'

'না। তা পারব না। তুমি আলাদা থাকতে চাও থাক গিয়ে। আমরা যাব না। চিরকাল স্বাধীনভাবে থেকেছি, বুড়ো বয়সে কারো আওতায় থাকতে পারব না।'

সাবিত্রী বলল—' আপনি কিন্তু টিউশনি করতে পারবেন না।'

'কি নিয়ে থাকব তাহলে। সারাজীবন ছেলে পড়িয়ে এসেছি। যতক্ষণ শক্তি থাকবে ছেলেই পড়াব। আর জিনিসপত্রের দাম যা বাড়ছে ক্রমশ পেন্সনে আর কুলোবেও না। তাছাড়া, ভাগ্নেটা আছে, সে মানুষ না হওয়া পর্যন্ত তাকে টাকা দিতে হবে। তুমি ও নিয়ে মাথা ঘামিও না। মাথা ঘামিয়ে কেউ কিছু করতে পারে না। যা হবার তাই হয়।'

নবীন দত্ত উঠে জামা গায়ে দিতে লাগলেন।

'কোথায় যাবেন এখন—'

'অনেক জায়গায় যেতে হবে। প্রথমে যেতে হবে লাইব্রেরিতে।'

' সাবিত্রী বলল—' আমি তাহলে চাকরিটা নিই।'

'নাও।'

'আপনি রাগ করছেন না তো বাবা।'

'কিছু মাত্র না। রাগ করব কেন?'

কিন্তু তাঁর কণ্ঠস্বরে যে উত্তাপ বিকিরিত হল তা তিনি গোপন করতে পারলেন না।

সাবিত্রী প্রণাম করে নেমে গেল নিচে।

।। পাঁচ ।।

নবীন দত্তের দিন কেটে যাচ্ছিল। এ যুগে যেমনভাবে কাটা সম্ভব তেমনি ভাবে কাটছিল। অগ্নিমূল্য খাদ্যদ্রব্য কিনেও তাঁর কুলিয়ে যাচ্ছিল, কারণ বাড়িতে তিনি আর পারুলবালা ছাড়া আর কেউ ছিল না। বারো টাকা কে জি পাকা পোনা, আর সাড়ে তিন টাকা কে জি সরু চাল কেনা অসম্ভব হচ্ছিল না তাঁর পক্ষে। কারণ দুজনে আর কত খাবে। তবু দৈনিক দশ বারো টাকা খরচ। মুখপুড়ি এখনও রোজ আসে। সেই বাজার করে। পারুলবালার রান্নার সাহায্যও করে। পারুলবালা তাকে পর মনে করেন না। মাঝে মাঝে শাড়ি সেমিজ কিনে দেন তাকে। একটা আংটিও কিনে দিয়েছেন নগদ টাকা দিতে সঙ্কোচ হয় তাকে। নবীন দত্তও মনে মনে শ্রদ্ধা করেন মুখপুড়িকে, কিন্তু তার সঙ্গে খুব বেশী মাখামাখি করাটাও পছন্দ করেন না তিনি। অথচ মুখপুড়ি পারুলবালার অন্তরঙ্গ—সে অন্তরঙ্গতায় ফাটল ধরাবার সাধ্য নেই তাঁর, বাসনাও নেই। বরং মাঝে মাঝে মনে হয় তাঁর—আহা, আমি যদি কারো সঙ্গে অন্তরঙ্গ হতে পারতাম। পারলে এমন নিঃসঙ্গ হতে হত না আমাকে। মাঝে মাঝে মনে হয় ছেলে দুটো কাছে থাকলে বোধহয় তাদের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা হত। কিন্তু বিধাতা বাদ সাধলেন। অলু মরে গেল, দুম্‌ সরে গেল। দুমের খবর এসেছে। সে অপরূপ কয়েকটা রঙীন ফোটো পাঠিয়েছে। তার সঙ্গে একটা চিঠিও লিখেছে—জার্মান ফার্মের চাকরি ছেড়ে দিয়েছি। বেলের সম্বন্ধে যে সব তথ্য বার করেছিলাম তা ওদের বিক্রি করে দিয়ে মোটা টাকা পেয়েছি। পরের তাঁবেদারি করতে ভালো লাগল না। যদি কোনওদিন নিজের ল্যাবরেটরি করতে পারি আবার গবেষণা করব। আমার তোলা কয়েকটা ফোটো এখানকার একটা কাগজ ছেপেছিল। ভালো পয়সা দিয়েছে। আমার ফোটো সুখ্যাতিও অর্জন করেছে। শুধু তাই নয়, গুণগ্রাহীও হয়েছে দু

একজন। বিশাল সম্পত্তির অধিকারিণী এক ধনী কন্যারও ফেটোগ্রাফির দিকে খুব ঝোঁক। তিনি আমার ফোটো দেখে আমার সঙ্গে দেখা করেছিলেন এসে। পৃথিবীতে যেখানে যত 'বিউটি' আছে যে সবের ফোটো তোলবার উচ্চকাঙ্ক্ষা আছে তাঁর। আমাকে সঙ্গে নিয়ে পৃথিবী ভ্রমণ করবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। আমি ভাবছি এ সুযোগ ত্যাগ করব না। তিনি এজন্য আমাকে মাসে যে হাত খরচ দিতে চাইছেন তার পরিমাণ মাসে দশ হাজার টাকা। মেয়েটির বাবা আমেরিকার একজন বড় বিজনেস ম্যাগনেট। মেয়েটি তাঁর একমাত্র সন্তান। জার্মানিতে ফোটো তুলতেই এসেছে। আমার সঙ্গে আকস্মিক যোগাযোগ হল। এ ধরনের মেয়ে আমাদের দেশে দেখি নি। হার্ভার্ডে এম. এ.। চার পাঁচটা ভাষা জানে। রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি গীতাঞ্জলি গড় গড় করে মুখস্থ বলতে পারে। আমার কাছে বাংলা শিখতে চাইছে। মেয়েটির উৎসাহ প্রবল বন্যার মতো। তা বলে ভেবো না ওর তোড়ে আমি ভেসে গেছি। তবে মেয়েটিকে ভালো লেগেছে। ও যদি আমাকে সত্যিই ওর সঙ্গে পৃথিবী ভ্রমণে নিয়ে যায় আমি যাব ওর সঙ্গে। কারণ এ সুযোগ জীবনে আর দ্বিতীয় বার পাব না। তোমরা আশা করি ভালো আছ। দিদিমা কেমন আছেন? তোমাদের জন্যও আরও কিছু টাকা পাঠাবার ব্যবস্থা করছি আমি। তুমি বিশ্রাম নাও। অর্থোপার্জনের জন্য শরীরপাত করবার দরকার নেই। মাকে চিঠি লিখতে বোলো। আমার নূতন ঠিকানাটা নিচে লিখে দিলাম। এই চিঠির কাগজে যে হোটেলের ঠিকানা ছাপা আছে, সে হোটেল আজই আমি ছেড়ে দেব। নূতন ঠিকানায় কাল চলে যাব। এই ঠিকানাতেই চিঠি দিও। বৌদি, রেবতী, পার্বতী মুখপুড়ি দিদি কেমন আছে? বৌদিকে আবার একটা চাকরিতেই লাগিয়ে দাও। ঘরে চুপচাপ বসে কি করবে। বেরতী পার্বতীকে ভালো একটা বোর্ডিংয়ে দিয়ে দাও। তুমি মা ও বৌদি আমার প্রণাম জেনো। পার্বতী রেবতীকে আশীর্বাদ দিও। ইতি প্রণত দুম্

চিঠিখানা পড়ে নবীন দত্তের মনে যে প্রতিক্রিয়া হল তার মূলে নিহিত আছে নিদারুণ অভিমানে, যে অভিমানের ছবি কবিরা নানা বর্ণে এঁকেছেন বিরহী প্রেমিক প্রেমিকার মনস্তত্ত্বকে কেন্দ্র করে। নানা রকম প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছেন তাঁরা। নবীন দত্তের ক্ষেত্রে কিন্তু প্রতিক্রিয়াটা অদ্ভুত রকম হল। তিনি সোজা গিয়ে জার্মানীতে দুমকে একটা 'কেবল (cable) করলেন Thanks, Need not send money. Nabin Dutta.

নবীন দত্ত পারুলবালাকে জানান নি যে তিনি টাকা পাঠাতে মানা করেছেন। পারুলবালা চিঠিখানা পড়ে চুপ করে রইলেন। চুপ করে থাকাই তাঁর স্বভাব। নীরবতাই তার একমাত্র ব্যক্তিত্ব। অন্তঃসলিলা ফল্গুর মতো তাঁর চিন্তাধারা লোকচক্ষুর অগোচরে থাকে। কল্পনা করতে লাগলেন দুম টাকা পাঠালে তিনি একটা বালুচরী শাড়ি কিনবেন, আর কিনবেন নবীন দত্তের জন্যে একটা ভালো কাশ্মীরী শাল। লোকটা ছেঁড়া ময়লা কাপড় পরেই সারা জীবনটা কাটাল। শেষ বয়সে একটু ভালো জামা কাপড় পরুক না। একটা গরদের পাঞ্জাবি এবং তাঁতের ভালো ধুতিও কিনে দেবেন ঠিক করলেন তিনি। কিন্তু দুম কবে আসবে? এক মেম ছুঁড়ির কথা লিখেছে, শেষে ওকে বিয়ে টিয়ে করবে না তো। তা যদি করে তাহলে তো তাঁর সব সাধ আহ্লাদ শেষ হয়ে গেল। ও মেমকে নিয়ে যদি এদেশে আসেও তাহলে বাঙালী মায়ের সাধ আহ্লাদ মেম বউ মেটাতে পারবে না। ভালো হলেও পারবে না । কেক কখনও

সন্দেশের স্বাদ মেটাতে পারে? লজ্জা বলেছিল (লজ্জা তাঁর মেয়ে, প্রতাপের মা) তাদের পাড়ায় একটি ছেলে বিলেতে গিয়ে মেম-বউ এনেছে। বউটি ভালো মেয়ে। সুক্তো চচ্চড়ি খেয়ে বাঙালী সংসারে খাপ খাওয়াবার চেষ্টা করছে। কিন্তু পারছে না কিছুতেই। তেল ক্রমাগত ভেসে উঠছে জলের উপর। মিশছে না। ছেলেটি ডাক্তার। বউকে নিয়ে বিলেতেই চলে যাবে ঠিক করেছে শেষ পর্যন্ত। ছেলের মা বোনেরা প্রথম প্রথম গদগদ হবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারে নি। অনেক গাদ ও খাদ বেরিয়ে পাড়ছে না কি। পারুলবালা নীরবে ভাবেন খালি। নবীন দত্ত তাঁর ভাবনার অংশ নেন না। নিতে চান না, নিতে পারেনও না। পারুলবালা তাই তাঁর কাছে প্রায় চুপ করেই থাকেন। নবীন দত্ত দুবেলা তাঁর কাছে খেতে আসেন অবশ্য। দুমের কথা কিছু বলেন না। খানও অন্যমনস্ক হয়ে। সেদিন হঠাৎ ভাজা মুগের ডালের প্রশংসা করেছিলেন। পারুলবালা মায়ের সেবা করছিলেন যতদিন ততদিন মাছ খান নি। নবীন দত্তও মাছ খেতেন না। ইদানীং কিন্তু পারুলবালা মাছ কিনছেন আড়াই শ' গ্রাম করে। মুখপুড়ি তাঁকে বলেছে সধবা মানুষের নিরামিষ খাওয়া স্বামীর পক্ষে অমঙ্গলজনক। একটু আঁশমুখ করতেই হবে সধবার।

ইদানিং খবচ কিছু কমেছে, তাই মাছ কিনছেন পারুলবালা। নবীন দত্ত মাছের ঝোল খুব ভালোবাসতেন। একদিন হঠাৎ বললেন, 'আমাকে মাছ খাইযে লোভী করে তুলছ। পয়সার টানাটানি হলে মহাকষ্টে পড়ে যাব। অভ্যস্ত জিনিস পাইলে সুখ নাই, না পাইলে দুঃখ—বলে গেছেন একজন মস্ত বড়লোক।' এর উত্তরে পারুলবালা সঙ্গে সঙ্গে কোন উত্তর দিলেন না। তারপর বললেন—'পয়সার টানাটানি হবে কেন, দুম অত রোজগার কবছে। সেই খরচ চালাবে।'

'ওর টাকা আমি নেব কেন।'

'নেবে না ই বা কেন।'

'নিলে স্বস্তি পাব না। কারো হাত-তোলা হয়ে থাকি নি কখনও। নেবার দরকারও তো নেই। লক্ষ্ণৌতে আর টাকা পাঠাতে হবে না। দেবনাথ পাশ কবে চাকরি পেয়েছে একটা। ভালো ছেলে দেবু। লিখেছে আপনি ও মাসীমা আমার কাছে এসে থাকুন।'

পারুলবালা দেবনাথের উপর খুব প্রসন্ন ছিলেন না। যখন এ বাড়িতে বধূ হয়ে এসেছিলেন তখন তার মা কালী তাঁকে ভারী জ্বালিয়েছিল। দেবনাথ হওয়ার অনেক দিন পর পর্যন্ত বাপের বাড়িতে ছিল কালী। স্বামীর একটু বার টান ছিল বলে ঝগড়া ঝাঁটি করে চলে এসেছিল। নবীন দত্তের মা সর্বাঙ্গসুন্দরী (লোকে সংক্ষেপে বলতো সর্ব-ঠাকরুন) যেতে দেন নি মেয়েকে তখন। দেবুর তখন বছরখানেক বয়স। দুমের বয়স তখন তিন বছর, অলুর পাঁচ বছর। দেবুর সঙ্গে ওদের কি যে পক্ষপাতিত্ব করতেন মা তা আজও পারুলবালার মনে আছে। দেবুকে আলাদা ফলের রস খাওয়ানো হত, দুধ ছাড়া আলাদা হরলিকসও কিনে দিতেন ওকে। কলী পারুলবালার নামে গোপনে নানারকম লাগান ভাঙান করত, ফলে নানারকম লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ভোগ করতে হয়েছিল পারুলবালাকে। মা এখন কাশীবাস করছেন, কালী মারা গেছে, পারুলবালা কিন্তু কিছু ভোলেন নি। কালীর ননদ বিশাখা মানুষ করেছিল দেবনাথকে। বিশাখা সম্বন্ধে পারুলবালার ধারণা ভালো। মেয়েটা দজ্জাল কিন্তু খারাপ নয়।

দেবনাথকে নবীন দত্ত মাসে মাসে টাকা দিচ্ছিলেন এতে আপত্তি করেন নি পারুলবালা। তবে তাঁর মনে হয়েছিল নিজে না খেয়ে ময়লা জামা কাপড় পরে বুড়ো বয়সে টিউশনি করে ভাগ্নেকে টাকা পাঠানোর কোনও মানে হয় না। এসব মনে হয়েছিল কিন্তু কিছু বলেন নি। নবীন দত্তের কোনো আচরণেরই প্রতিবাদ করেন নি তিনি কখনও। নবীন দত্ত তাঁর রুগ্না মাকে এনে আশ্রয় দিয়েছিলেন এটাও তো ভুলতে পারেন না তিনি। তিনি নবীন দত্তকে ভয় করেন, ভক্তি করেন আর সব সময়ে বুঝতেও পারেন না। বুঝতে না পারলেও অবোধের মতো তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। ওইটেই তার অভ্যাস হয়ে গেছে। দুমের টাকা নেবেন না একথা শুনে মনে মনে ভয় পেয়ে গেলেন তিনি। কিন্তু প্রতিবাদ করতে ইচ্ছে হল না। চুপ করেই রইলেন। একটা কথা তিনি মনে মনে ভালো করেই জানেন দুম্ তাঁরও ছেলে। দুমের উপর তাঁর অধিকারও কিছু কম নয়। জানেন, কিন্তু সে কথা বললেন না।

নবীন দত্ত দুপুরে খেয়ে দেয়ে বেরিয়ে গেলেন। গেলেন রাখালের খোঁজে তার দোকানে। প্রতি রবিবারে এসে তার হিসাবপত্র দেওয়ার কথা। কয়েক সপ্তাহ থেকে সে আর আসছে না। দোকানে গিয়েও তাকে পান নি। একটা ফড়ে গোছের ছোঁড়া বসে থাকে, সে দরকারি কথার জবাবে কেবল বলে—জানি না। রাখাল কোথায় জানতে চাইলে বলে জানি না। কখন দোকানে আসবে জিজ্ঞেস করলেও বলে, জানি না। এই জানি না—মার্কা ছোকরাকে সেদিন গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ছাপাখানা থেকে বই ছেপে এসেছে? এর উত্তরেও সে যথারীতি বললে জানি না, তখন নবীন দত্ত বললেন, তুমি কিছুই যখন জান না, তখন এ দোকানে বসে কি করছ তুমি? তাকের উপরে রাখা একটি ছোট গণেশমূর্তিকে দেখিয়ে বললে—ওইখানে ধূপ জ্বেলে গঙ্গাজল ছিটিয়ে দিই আর পাহারা দিই। নবীন দত্ত দেখলেন একটা ছোট্ট কাচের টেবিলের সামনে একটা টিনের চেয়ার রয়েছে। ছোঁড়াটা সিঁড়ির একধারে বসে। তার আশপাশে অসংখ্য বিড়ির টুকরো। রাখাল ঠিকই বলেছিল, জায়গাটা নরক-কুণ্ড বিশেষ। চারিদিকে আবর্জনার স্তূপ। পাশাপাশি আরও অনেকগুলো দোকান। সকলেরই ওই অবস্থা। কিন্তু আর সব দোকানের মালিকরা দোকানে বসে আছেন। রাখালই কেবল অনুপস্থিত। নবীন দত্ত ঠিক করলেন রাখাল যতক্ষণ না আসছে ততক্ষণ তিনি অপেক্ষা করবেন তার জন্য। সেই টিনের চেয়ারে গিয়ে বসলেন তিনি। লক্ষ্য করতে লাগলেন সামনের দোকানের ছোকরাটিকে। সেও মাঝে মাঝে তার দিকে চাইছিল। হঠাৎ ছোকরাটি দোকান থেকে নেবে এসে নমস্কার করে প্রশ্ন করল—'আপনিই কি অধ্যাপক নবীন দত্ত?'

'হ্যাঁ' কেন—'

'রাখালবাবু আপনার নোট ছাপছেন?'

'ছাপাব বলে তো এনে রেখেছ অনেকদিন। ইদানিং তার কোন খবরই পাচ্ছি না, তাই নিজেই এলাম।'

'তাঁকে আর বিকাশবাবুকে পুলিশে ধরে নিয়ে গেছে।'

'কেন?'

'নকশাল সন্দেহ করে।'

স্তম্ভিত হয়ে গেলেন নবীন দত্ত।

ছোকরাটি তখন ইতস্ততঃ করে বলল—' আমরাও নোট ছাপি। আপনার নোটের ম্যানাসক্রিপ্ট কি রাখালবাবুর কাছে?'

'হ্যাঁ।'

ছোকরাটি কেমন যেন রহস্যময় ভাবে চেয়ে রইল তাঁর দিকে।

তাবপর বলল—'তাহলে তো উদ্ধার হওয়া শক্ত।'

উঠে পড়লেন নবীন দত্ত। উঠে বই পাড়া দিয়ে হাঁটতে লাগলেন। হঠাৎ একটা দোকানে চোখে পড়ল—হ্যামলেট সাজানো রয়েছে অনেক। আর বড় বড় অক্ষরে লেখা রয়েছে—নোটস বাই প্রঃ এন দত্ত। দাঁড়িয়ে পড়লেন। প্রফেসাব এন. দত্ত কে আবার? একখানা বই চেয়ে নিয়ে দেখলেন। এ তো তাঁরই নোট। দেখলেন ছেপেছে সেই সামনের দোকানের ছেলেটি। তার দোকানের উপর সাইনবোর্ডে যে নাম ঝুলছিল এ তো সেই নাম। থ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। ভাবলেন একবার গিয়ে জিগ্যেস করেন এ নোট তোমরা পেলে কোথা থেকে। কিন্তু হঠাৎ নিদারুণ বিতৃষ্ণায় মনটা ভরে গেল তাঁর। তিনি হনহন করে হেঁটে বেরিয়ে গেলেন। মনে হতে লাগল— চোর, চোর, চোর, সব চোর। ওই রাখালটি ওব সঙ্গে সড় করেছে। কিন্তু রাখালকে চোর বলে মনে হয় নি তো তাঁব। বিকাশকেও না। দুজনেই তাঁব ছাত্র, অনেকদিন ধবে দেখছেন তাদের। ওরা চোর? কলেজ স্ট্রিট থেকে বেরিয়ে মির্জাপুব স্ট্রীটে পড়লেন। হঠাৎ এক পুবাতন বন্ধু ব্রজেন চাটুজ্যের সঙ্গে দেখা। পটিকপাড়ায় যখন থাকতেন তখন ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী ছিলেন। ভদ্রলোকেব সাহিত্য চর্চার দিকে ঝোঁক ছিল। নিম্নলিখিত রূপ আলাপ হল।

ব্রজেন্দ্র। আরে নবীন বাবু যে। নমস্কার, অনেকদিন পরে দেখা হল। খবব কি সব।

নবীন। দেবাব মতো সুখবর কিছু নেই। সবই দুঃসংবাদ। এইমাত্র আবিষ্কার করলাম—একজন প্রকাশক আমাব হ্যামলেটের নোটটা চুরি করে ছেপেছে।

ব্রজেন্দ্র। ছাপবেই তো, এ যে চোরের দেশ মশাই। সাহিত্য ক্ষেত্রেও ওই ব্যাপার। পুকুর চুরি করছে সব। আমি একটা কয়লার দোকান করছি মশাই—রোজই কিছু না কিছু চুবি হচ্ছে। চোর ধরবার জন্যে ওই কয়লাগাদার উপর দিনরাত বসেই বা থাকি কি করে বলুন! আচ্ছা চলি, হাওড়া যেতে হবে। কয়লার ওয়াগন এল কি না খোঁজ নিতে যাচ্ছি। কয়লা এসেছে কিনা এই খবরটি জানবার জন্যেও কিছু ঘুষ দিতে হয়। কোথায় আছেন মশাই আপনি! উর্ধ্বে অধে সম্মুখে পশ্চাতে, লড়াই করুন খালি ছ্যাঁচোড়ের সাথে। আচ্ছা চলি। নমস্কার।

নবীনবাবু হাঁটতে হাঁটতে একটি কথাই ভাবতে লাগলেন কেবল—হেরে যাব? শেষকালে হার মানতে হবে? চোখের উপর বিদ্যাসাগরের ছবিটা ভেসে উঠল। তাঁকে প্রশ্ন করলে—'আপনার জীবনীতে পড়েছি আপনর বাবা কাশী যাবার আগে নাকি স্বপ্ন দেখেছিলেন আপনার বাড়ি শ্মশান হয়ে যাবে। খবরটা ভুল না তো, তিনি হয়তো দেখেছিলেন বাংলা দেশটাই শ্মশান হয়ে যাবে। বিদ্যাসাগরের ছবি যেন উত্তর দিলেন—কোন শ্মশানও বেশী দিন শ্মশান থাকে না হে।

বাড়ি ফিরে এসে দেখেন রাখাল শুষ্কমুখে বসে আছে। সে তাঁর পা জড়িয়ে হাউ মাউ করে কেঁদে উঠল।

'সর্বনাশ হয়ে গেছে আমার, সর্বনাশ হয়েছে—'

'ওঠ, ওঠ, পা ছাড়—ব্যাপার কি?'

একটা পুঁজে ভরতি ফোঁড়া হঠাৎ ফেটে গেলে যে রকম আরাম হয় নবীন দত্ত সেই রকম একটা আরাম অনুভব করলেন। রাখাল তাহলে চোর নয়। চোর হলে ফিরে আসত না।

রাখাল আত্মস্থ হয়ে বসল অনেক কষ্টে। তবুও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। কোন কথাই বলতে পারল না খানিকক্ষণ। মাথা হেঁট করে বসে রইল খালি। নবীন দত্তই প্রশ্ন করতে লাগলেন।

'তুমি এলে কোথা থেকে? আমি একটু আগে তোমার দোকানে গিয়েছিলাম। দেখলাম দোকানে যে ছোঁড়াটা বসে আছে সে তো কিছুই জানে না।'

রাখাল চুপ করে বসে রইল।

'আমি কিন্তু কিছু খবর নিয়ে এসেছি। তোমার সামনে যে দোকনদারটা আছে সে বললে তোমাদের নকশাল সন্দেহ করে না কি পুলিশে ধরে নিয়ে গেছে। ফিরে আসছিলুম, হঠাৎ চোখে পড়ল একটা দোকানে হ্যামলেটের নোট স্তূপীকৃত করা আছে। গ্রন্থকার প্রফেসার এন দত্ত। একটা বই নিয়ে খুলে দেখলাম—সব আমারই নোট। ছাপিয়েছে ওই সামনের দোকানদারটা। এ কি করে সম্ভব হল?'

রাখাল তবুও নীরব।

'ব্যাপারটা কি খুলে বল না। চুপ করে আছ কেন?'

'প্রথম কারণ আমরা গরীব। দ্বিতীয় কারণ কতকগুলো ধনী জুয়াচোর আমাদের ঠকাচ্ছে। আমরা কোন প্রতিকার করতে পারছি না।'

'ও সব তো সব দেশে চিরকাল হয়। তোমার কি হয়েছে তাই বল।'

'আমি বইটা প্রথমে যে প্রেসে দিয়েছিলাম সেখানে শস্তা বলেই দিয়েছিলাম। কিন্তু দেখলাম সেখানে নির্ভুল ছাপা হওয়া অসম্ভব। আপনি রাগ করতে লাগলেন। তখন ওই সামনের দোকানদারটি বললে—আমাকে দিন, আমি নির্ভুল করে ছেপে দেব। আমাদের প্রেস আছে। ভালো প্রুফ-রীডারও আছে। আপনি ও প্রেসে যে রেট দিচ্ছেন সেই রেটেই আমরাও ছেপে দেব। বিশ্বাস করে দিয়ে দিলাম তাকে ম্যানাসক্রিপট। কোন রসিদও নিলাম না। তার দুচার দিন পর পুলিশ এসে হাজির একদিন। বলল—লালবাজার যেতে হবে। গেলাম। সেখানে অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখে, তারপর জেরা শুরু করলে। অফিসারটি ভালো লোক ছিলেন, তিনি আমাদের ছেড়ে দিলেন। কিন্তু তারপর থেকেই সন্দেহ হচ্ছে স্পাই আমাদের পিছনে লেগেই আছে। আর এটাও এখন বুঝতে পেরেছি ওই সামনের দোকানদারটির সঙ্গে বন্ধুত্ব আছে ওই স্পাইটির। একদিন দোকানে যাওয়ার ঠিক পরেই সামনের দোকানে এসে বসল। আমি যতক্ষণ রইলাম ততক্ষণ বসে রইল। তারপর আমরা যেই দোকান থেকে নামলাম সে-ও উঠে পড়ল। দেখলাম আমার পিছু পিছু আসছে। যতক্ষণ বাড়িতে থাকি বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থাকে। বিকাশ কানপুরে চলে গেছে। সেখানে তার কাকা বড় পুলিশ

অফিসার। সে আমাকে চিঠি লিখেছে, তুই লালবাজারে গিয়ে সেই অফিসারটির সঙ্গে দেখা কর। দেখা করেছিলাম। তিনি বললেন—আপনি দু একজন গণ্যমান্য লোকের কাছ থেকে গুড ক্যারেক্টার সার্টিফিকেট নিয়ে আসুন। একটা সার্টিফিকেট হলেই হবে। কোন গভর্নমেন্ট অফিসার, বা প্রফেসর, বা নামজাদা ডাক্তার—এই ধরনের লোক হওয়া চাই। আপনি স্যার, আমাকে একটা সার্টিফিকেট লিখে দিন।'

নবীন দত্ত বললেন—' আমি তো গণ্যমান্য লোক নই। আমার সার্টিফিকেটে কাজ হবে না। তাছাড়া আমি তোমার কতটুকু জানি বল? তোমাকে কলেজে পড়িয়েছি, এই জানি। তোমার ক্যারেক্টার সম্বন্ধে কিছুই জানি না। তুমি কোন পলিটিক্যাল নেতার কাছে যাও। তাঁরাই আজকাল গণ্যমান্য। পুলিশের কাছে তাঁদের কথারই ওজনও আছে—'

'আমি তো কাউকেই চিনি না স্যার।'

চুপ করে বসে রইল রাখাল।

'তোমার মতলবটা কি বল দেখি—'

'আপনি আমার ব্যবস্থা করুন একটা স্যার। আমাকে কেউ চেনে না, আমার বাবা গরীব কেরানী—'

আবার তার গলার স্বর কাঁদ কাঁদ হয়ে এল।

'আমি কি করব। এ তো মহা মুশকিলে ফেললে দেখছি? খেয়ে এসেছ?'

'না। সকাল নটায় খেয়ে বেরিয়েছি। রাত্রে আবার ফিরে গিয়ে খাব।'

'সেই স্পাইটা কোথায়?'

'আপনার বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছে বোধহয়।'

'এতো মহা বিপদ দেখছি।'

ভ্রূকুঞ্চিত করে চেয়ে রইলেন তিনি হতভাগা ছেলেটার দিকে। ভয়ানক রাগ হল। ইচ্ছে হল ঠাস ঠাস করে চড়িয়ে দূর করে দেন তাকে। হঠাৎ বিদ্যাসাগরের ছবিটা চোখে পড়ল। মুখে মৃদু হাসি, চোখ দুটি করুণায় ভরা। হন হন করে নিচে নেমে গেলেন। দেখলেন মুখপুড়ি কুটনো কুটছে। পারুলবালা রুটি বেলছেন।

'আমার একটি ছাত্র এসেছে। কিছু খাবার পাঠিয়ে দাও তো।'

তিনি বুঝলেন এ সময় খাবার দেওয়া আসুবিধাজনক।

তবু বলে চলে এলেন। একটু পরে মুখপুড়ি এক প্লেট গরম সিঙাড়া দিয়ে গেল।

'সিঙাড়াগুলো খেয়ে নাও। খেয়ে বাড়ি চলে যাও। আমার সার্টিফিকেটে কিচ্ছু হবে না।'

রাখাল নীরবে সিঙাড়াগুলি খেতে লাগল। সত্যিই খুব খিদে পেয়েছিল তার। নবীন দত্ত বিদ্যাসাগরের ছবির দিকে নির্নিমেষে চেয়ে বসে রইলেন। হঠাৎ রাগে সর্বাঙ্গ জ্বলে উঠল তাঁর। ওই ব্রাহ্মণকে এ দেশের লোকেরা সারা জীবন ঠকিয়েছে। দুহাতে তাঁর কাছ থেকে হাত পেতে নিয়েছে আর আড়ালে তাঁকে গাল দিয়েছে। বাড়িটা পর্যন্ত পুড়িয়ে দিয়েছে। বিশ্বাসঘাতক পরশ্রীকাতর বদমাইশের দল সব। এই ছোঁড়াটাও সেই সব রক্তবীজের বংশধর। এখন মাকে কাঁদছে সুযোগ পেলেই তুড়ি লাফ দেবে।

সিঙাড়াগুলো শেষ করে এক গ্লাস জল ঢকঢক করে খেয়ে ফেললে রাখাল।

'এবার বাড়ি যাও। আমার সার্টিফিকেটে কোনও লাভ হবে না। তাছাড়া তোমার ক্যারেক্টর কেমন তা আমি জানি না। সার্টিফিকেট দিতে পারব না।'

'আমি কি করব তাহলে স্যার।' —করুণকণ্ঠে বলল রাখাল। টপ টপ করে আবার জল ঝরে পড়ল তার চোখ দিয়ে।

'আমি কি করে বলি বল।'

হঠাৎ বিদ্যাসাগরের ছবিটার দিকে আবার চোখ পড়ল তাঁর। দেখলেন চোখ দুটি যেন উজ্জ্বল। করুণায় পরিপূর্ণ। আর তাতে অতি প্রচ্ছন্ন স্নিগ্ধ একটা হাসি নবীন দত্ত এর থেকে কি বুঝলেন কে জান। রাখালকে বললেন—'একটু বস তাহলে। ভেবে দেখি।'

তারপর অস্থিরভাবে পায়চারি করতে লাগলেন। রাখাল ঘরের ভিতর চুপকরে বসে রইল।

মিনিট পনেরো পরে হঠাৎ ঘরের ভিতর ঢুকলেন নবীন দত্ত। 'হয়েছে, চল যেতে হবে এক জায়গায়।'

তাড়াতাড়ি জামাটা গায়ে দিয়ে আর নতুন চপ্পলটা পায়ে দিয়ে পয়সার থলিটা পকেটে পুরে নিলেন। পারুলবালার জেদে নতুন চপ্পল কিনতে হয়েছিল এক জোড়া।

'চল।'

রাখাল উঠে অনুসরণ করতে লাগল।

রাস্তায় নেমে রাখাল জিগ্যেস করলেন 'কোথায় যাবেন?'

'শিশুসামার কাছে। সে আমার ছাত্রী, সে কোন উপায় করতে পারে।'

ট্রামে করে কিছুদূর গিয়ে বাস ধরলেন একটা। শিশুসামার বাড়িতে পৌঁছলেন যখন তখন আটটা বেজে গেছে। বাড়ির একতলার গেটে বিরাটকায় এক হিন্দুস্থানী দারোয়ান ছিল। সে বলল, 'মাঈজি আছেন।'

আগে কোন দারোয়ান ছিল না।

'খবর দিজিয়ে।'

'আভি খবর দেনা মনা হ্যায়। আপ লোগ বৈঠিয়ে। মাঈজি রেওয়াজ কর রহি হে।'

নবীন দত্ত বললেন—'এক টুকরো কাগজ দিজিয়ে। হাম নাম লিখ দেতা হ্যায়। পৌঁছা দিজিয়ে।'

দারোয়ান নবীন দত্তের ভাব-ভঙ্গী দেখে আর আপত্তি করতে সাহস করল না। কাগজ দিলো। নাম লিখে দিলেন নবীন দত্ত।

সঙ্গে সঙ্গে নিচে নেমে এল শিশুসমা। এসে প্রণাম করে বললে—'কাকাবাবু, খবর না দিয়ে এমন হঠাৎ এলেন যে—'

'চল ওপরে চল, বলছি।'

ওপরে গিয়ে দেখেন একটি বৃদ্ধ ওস্তাদ এবং একটি তবলচি বসে আছেন। আর রয়েছে একটি সেতার এবং বাঁয়া তবলা এক জোড়া। শিশুসমা বললে —' ওস্তাদজি, আজ কাকাবাবু এসেছেন, আজ আর বাজাব না। কাল আসবেন—'

ওরা চলে গেল।

'তুই গান বাজনা শিখছিস?'

শুধু বাজনা। সেতারটা শিখছি। কি আর করি বলুন, কি নিয়ে থাকব। আপনি তো ভুলে

গেছেন একেবাবে'—বাখালকে দেখিয়ে বললে, 'ইনি কে?'

'আমাব একজন ছাত্র। তবে তোমাব চেয়ে কয়েক বছব সিনিয়াব। বিপদে পড়েছে তাই তোমাব কাছে এসেছি। তোমাব বাবা তো বড় পুলিশ অফিসাব ছিল। তোমাব আলাপ আছে কোনও অফিসাবেব সঙ্গে?'

'হ্যাঁ আছে। অনেকেই আমাকে ভালোবাসেন। আমাব খোঁজখবব নিতে বাড়িতেও আসেন কেউ কেউ। কেন?'

'বাখাল বিপদে পড়েছে। দেখ, যদি উদ্ধাব কবাতে পাব।'

সব শুনে শিশুসমা বললে, 'চেষ্টা কবব। আমাব মনে হয় সব ঠিক হয়ে যাবে। কোনও প্রমাণ তো পায় নি আপনাব বিরুদ্ধে?'

'না। কোনও নকশালেব সঙ্গে আমাব আলাপই নেই।'

'তাহলে ঠিক হয়ে যাবে।'

নবীন দত্ত বললেন, 'তুমি তাহলে ওব ভাব নিচ্ছ তো?'

শিশুসমা হেসে বললেন, 'বেশ নিলাম।'

'আমি তাহলে চলি?'

'বা, কিছু খেয়ে যাবেন না। বসুন।'

'বসছি একটু। কিন্তু খাব না কিছু। খেলে পাকলবালা বাগ কববে।'

'সে আবাব কে?'

'তোমাব কাকীমা। সে বেঁধে বেড়ে বসে আছে। এখন কিছু খেলে আব খেতে পাবব না।'

।। ছয় ।।

নবীন দত্তেব দিন কেটে যাচ্ছিল। কিন্তু শান্তি ছিল না মনে। অর্থেব অভাব আব ছিল না। বিনয় আব ভূপেনেব বাড়ি গিয়ে তাদেব পড়াবাব ইচ্ছা আব ছিল না তাব। বস্তুত তাদেব তিনি বলেই দিয়েছিলেন তাঁব আব তাদেব পড়াবাব যোগ্যতাই নেই। তাবা নিজেবাই এত পড়াশোনা কবেছে যে তাব চেয়ে বেশী তিনি আব কিছু দিতে পাববেন না তাদেব। তিনি অবাস্তব হয়ে গেছেন। তাই তিনি তাদেব চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন আমি আব যাব না। যানও নি। কিন্তু তাবা নিজেবাই আসতে আবম্ভ কবেছে, আব মাসে মাসে টাকা দিয়ে যাচ্ছে। নবীন দত্ত কিছুতেই তাদেব নিবৃত্ত কবতে পাবছে না। তাঁব সন্দেহ হয়েছে ওবা বোধহয় পড়ার ছুতোয় তাকে অর্থ সাহায্য কবছে। অর্থাৎ অনুগ্রহ কবছে। অথচ কঢ় হয়ে তাদের প্রত্যাখ্যান কবতে পাবছেন না, এইটে তাব এক মহা অশান্তিব কাবণ হয়েছে। ছেলে দুটোকে ভালোবাসেন নবীন দত্ত, শ্রদ্ধাও কবেন। তাই এদেব উপব খুব কঢ় হতে পাবছেন না। আর একটা অশান্তিব কাবণ হয়ে উঠেছেন পাকলবালা। তিনি বলছেন আমি দুমকে না দেখে আব থাকতে পাচ্ছি না। দুম যদি এখানে না আসে তিনিই সেখানে যাবেন। তাঁকেও সঙ্গে যাবাব জন্যে পীড়াপীড়ি কবছেন। দুম তাব মাকে হাজাব দশেক টাকা পাঠিয়ে দিয়েছে। ধনকুবের

নন্দিনী বান্ধবীটিই নাকি দিয়েছে টাকাটা। বলেছে, তোমার মা-বাবাকে এখানে আনিয়ে নাও। পারুলবালা যাওয়ার জন্যে ব্যগ্র, নবীন দত্ত যাবেন না বলে দিয়েছেন। এ ব্যাপ্যরটাকে কেন্দ্র করেও একটা অশান্তির আগুন ধূমায়িত হচ্ছে। পারুলবালা মাঝে মাঝে শাসাচ্ছেন তুমি যদি না যাও, আমি একাই চলে যাব। প্রতাপ আমাকে নিয়ে যাবে বলেছে। নবীন দত্ত 'না' বলেছেন, তবু পারুলবালা আশা করে আছেন তার 'না'কে 'হ্যাঁ' করবেন তিনি। নবীন দত্তের প্রিয় তরকারিগুলি রোজ রেঁধে যাচ্ছেন। তাঁর হাতের রান্না অতি উত্তম, নবীন দত্ত চেয়ে চেয়ে খাচ্ছেন, কিন্তু আসল ব্যাপারে অনড় হয়ে বসে আছেন। দুম তাঁকে আর চিঠি লেখেন নি। দুম চেনে তাঁকে। পারুলবালাও চেনেন, কিন্তু তাঁর ধারণা পাষাণকেও মোমের মতো গলিয়ে ফেলবাব ক্ষমতা আছে তাঁর। তৃতীয় অশান্তি হয়েছে সাবিত্রীকে নিয়ে। অলঙ্কারের বন্ধু খগেশ্বব হাজরা একদিন এসেছিলেন তাঁর কাছে। এসে প্রণাম করে বললে—'আপনাকে আজ নিমন্ত্রণ কবতে এসেছি। আমাদের স্কুলে আপনি একবার পায়ের ধুলো দিন। এটা সকলেব ইচ্ছে।'

'সকলেব মানে?'

'আমাদেব ওয়ার্কিং কমিটির—'

ওয়ার্কিং কমিটির যে সব সভ্যদের সে নাম বললে, তাদেব মধ্যে তাঁর চেনা দু' চারজন প্রফেসার ছিল। পরমেশও ছিল। শুনেই তাঁর মনটা কেমন বিষিয়ে উঠল। তিনি আন্দাজ করলেন সাবিত্রী আর খগেশ্বরকে নিয়ে তারা মনে মনে একটা ঘোঁট পাকাচ্ছে নিশ্চয়। তাঁব নিজের মনেও কি সন্দেহের ছায়াপাত হয় নি? চুপ কবে বইলেন নবীন দত্ত।

'আপনি যেদিন যাবেন আমি মোটব নিয়ে আসব। মা-ও যদি যান, আবও খুশী হব আমরা।'

নবীন দত্ত সহসা প্রশ্ন করলেন।

'স্কুলের সঙ্গে তোমাব সম্পর্ক কি?'

'আমিই স্কুলের মালিক। আমাব মায়ের নামে বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করেছি। নিচেব কয়েকটা ক্লাস এখন আরম্ভ হয়েছে, পরে ওটাকে হায়ার সেকেন্ডারি পর্যন্ত করবার ইচ্ছা আছে—'

'টাকা সব তোমার?'

'হ্যাঁ। গভর্নমেন্টের সাহায্য নিলে বাধ্যবাধকতার মধ্যে যেতে হয় তাই সে সাহায্য নিই নি।'

'ওরা এ ইস্কুল recognise করবে?'

'করেছে। না করবার তো কোনও কারণ নেই। ওদের নিয়ম অনুসারেই তো সব হয়েছে। একজন মন্ত্রীও আমাদের স্কুলের পেট্রন হয়েছেন, আমাদের ইচ্ছে আপনিও একজন পেট্রন হন।'

'না, না আমি ওসব দলে বেমানান। তুমি তো প্রফেসারি করছিলে, ছেড়ে দিয়েছ?'

'হ্যাঁ। আজকাল যা অবস্থা তাতে ভদ্রভাবে আত্মসম্মান বজায় রেখে প্রফেসারি করা যায় না। প্রফেসাররা আজকাল এক একটা রাজনৈতিক দলে ভিড়ে গেছেন। ইউনিভার্সিটিতেও আজকাল তোয়াজ তদ্বির ধরাধরির ফলাও কারবার চলছে। তাই ওখানে থাকতে পারলাম না—'

'কি করছ আজকাল তাহলে?'

'একটা বইয়ের দোকান করেছি। আমাদের কয়েকটা বাড়ি থেকে আয়ও কিছু—'

নবীন দত্ত জানতেন খগেশ্বর ধনীর একমাত্র সন্তান। তাই আর কিছু বললেন না।

যাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগল খগেশ্বর। খগেশ্বর ভালো ছেলে এবং অলঙ্কারের প্রিয় বন্ধু বলে তাঁর সম্বন্ধে দুর্বলতাও ছিল নবীন দত্তের। বললেন—'আচ্ছা, যাব একদিন। আসছে রবিবারে এসো।

রবিবারে গেলেন পারুলবালাকে নিয়ে। নাতনীদের দেখবার জন্যে উৎসুক হয়েছিলেন পারুলবালা। গিয়ে দেখলেন সাবিত্রী সুখেই আছে। নাতনীরাও। তাদের গায়ে দামী দামী জামা। মাথায় চকচকে ক্লিপ। সাবিত্রী ঘরে একটি ফ্রিজ আছে, দামী টেপ রেকর্ডার আছে, রেকর্ড প্লেয়ার আছে। রেডিও তো আছেই। সাবিত্রীকে অবশ্য আগেও নবীন দত্ত বিধবার বেশ পরতে দেন নি কিন্তু এখন তার পোষাকের চটক তাঁর কাছেও খুব দৃষ্টিকটু ঠেকল। মাথায় সিঁদুর নেই কিন্তু গলায় হার পরেছে, হাতে চুড়ি বালাও আছে। পরণে বেশ দামী শাড়ি, ব্লাউসের পিঠ কাটা ঘাড়ের দিকটাও বেশ উন্মুক্ত। ঘৃণায় সমস্ত মনটা ভরে গেল নবীন দত্তের। তিনি কিছু বললেন না। চুপ করে বসে রইলেন। সাবিত্রী ভালো ভালো খাবার এনেছিল তাঁর জন্যে। একটিও খেলেন না। এই পরিবেশে পারুলবালাও কেমন যেন ভড়কে গেলেন। সহজভাবে কথাবার্তা বলতে পারলেন না। দু' চারটে মৌখিক লৌকিক আলাপ হল শুধু। নাতনীরা অবশ্য উচ্ছ্বসিত হয়ে নানা গল্প করতে লাগল। তারা চিড়িয়াখানায় গেছে, সিনেমায় গেছে, নেহরু গার্ডেনে গেছে। রেবতীর নাচের স্কুলে ভরতি হয়েছে। নবীন দত্ত নীরব হয়ে বসে রইলেন। তাঁর সমস্ত মন দখল করে রইল অলঙ্কার। আসবার সময়ে খগেশ্বর অনুরোধ করলেন—'প্রতি রবিবারেই এখানে আসুন না।'

নবীন দত্ত হঠাৎ উত্তর দিলেন ইংরেজিতে। বললেন—' I am not blind. Good bye

আর যান নি সেখানে।

কিন্তু সমস্ত মন জুড়ে যে তুষের আগুন জ্বলছে মনে হচ্ছে তা আর নিববে না। পারুলবালা প্রথম দিনে ফিরে একটি কথাই শুধু বলেছিলেন—'যা ভয় করেছিলাম তাই হয়েছে।' ও বিষয়ে আর আলোচনাই হয় নি। কেউই কম্বলটা তুলতে সাহস পায় নি। কম্বলের তলায় যে বীভৎস মড়াটা শুয়ে আছে তার মুখদর্শন করবার ইচ্ছা ছিল না কারোর। পারুলবালা বারবার একটা কথাই বলছিলেন—'চল, আমরা দুমের কাছে চলে যাই।'

নবীন দত্ত বলেছিলেন—'দেখ, যে জন্যে আমি সাবিত্রীকে চাকরি করতে মানা করি নি, দুমের খামখেয়ালীপনার মুখে লাগাম দিই নি, সেইজন্যে তোমাকে অনুরোধ করছি, আমাকে নিয়ে টানাটানি কোরো না।'

'কি সেটা?'

সেটা স্বাধীন ইচ্ছা। কারও স্বাধীন ইচ্ছায় আমি বাধা দিই নি, দেব না। কিন্তু আমার স্বাধীনতাতেও হস্তক্ষেপ করতে দেব না কাউকে।'

পারুলবালা ঠিক বুঝতে পারলেন না। তাঁর মাথায় ঢুকল না। পারুলবালা নবীন দত্তের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর বললেন— 'সমাজে বাস করলে কারো স্বাধীন ইচ্ছা থাকে না কি। সারা জীবনটাই তো পরের ইচ্ছায় চলেছি।'

নবীন দত্ত কোনও উত্তর দিলেন না। গুম হয়ে বসে রইলেন। পারুলবালা যাওয়ার পর নিজের জাবদা খাতাটা পেড়ে লিখতে শুরু করলেন

'পারুল যা বলে গেল তা সত্যি সভ্য সমাজে থাকলে খানিকটা স্বাধীনতা বিসর্জন দিতে হয় কিন্তু আদর্শ বিসর্জন দিতে হয় যে সমাজে সে সমাজ অসভ্য বর্বর সমাজ। সমাজে স্বাধীনতা বিসর্জন দিই পরের হিতার্থে, কিন্তু আদর্শ বিসর্জন দিই নিজের স্বার্থ সিদ্ধি করবার জন্য। পুরাণের সাবিত্রী স্বামীকে বাচাবার জন্য যমের পিছু পিছু ধাওয়া করেছিল একালের সাবিত্রীরা ভোগী স্বামী মরতে না মরতেই আর একটা পুরুষে আসক্ত হয় ভোগের লোভে। ভোগের লোভে বার বার পথ বদলানো মত বদলানো আধুনিক রীতি। এই রীতিকে অনুসরণ করছে পাশ্চাত্য দেশ। তাদের মতো আমাদের শক্তি সামর্থ্য নেই তবু আমরাও তাদের ব্যর্থ অনুকরণ করছি। ওদেশের চিন্তাশীল লেখকদের বই পড়ে মনে হয়েছে যদিও ভোগের সমুদ্রে ওরা সাঁতার কাটছে, কিন্তু শান্তি পাচ্ছে না, আমরা নকল নবীশ ভোগের প্রচুর উপকরণ আমাদের নেই তাই আমাদের অশান্তি আরও বেশী। ভোগে একটা আপাত আনন্দ পাওয়া যায় বেশীক্ষণ সেটা থাকে না। তারপর অশান্তির আগুনে দগ্ধ হতে হয়। সে আগুন তুষানলের মতো। আমিও আগুনে পুড়েছি, এখনও পুড়ছি। কারণ আমিও ভোগের কাঙাল। তবে আমার একটা সান্ত্বনা আছে ভোগের জন্য আমি কখনও আদর্শ বিসর্জন দিই নি। কিন্তু এই সান্ত্বনাটুকু নিয়েও কি আমি সুখী হয়েছি? হই নি। তার কারণ—আমার অহঙ্কার। আমি মনে মনে কল্পনা করেছি, সবাই আমার মতে চলুক। দুম বিদেশে না গিয়ে এদেশেই থাকুক, বেবা সাবিত্রী আমার পুত্রবধূ হয়েই কাটিয়ে দিক সারাজীবনটা। আমি অবশ্য আমার কর্তৃত্বের নিশান তাদের উপর চাপাই নি তাদের নিজের পথেই চলতে দিয়েছি। কিন্তু এজন্য আমার দুঃখ হয় নি একথা বললে মিথ্যে কথা বলা হয়। মনে খুবই আঘাত লেগেছে। পৃথিবীসুদ্ধ লোক আমার মনের মতো হোক এ আশা করলেই চোট খেতে হবে এবং সেটা হজম করে ফেলতে হবে। নইলে সেটা প্রকাশ করলেই খেলো হয়ে যাব। সুতরাং যদিও মুখোশকে আমি ঘৃণা করি তবু আমাকে ওই মুখোশই পরে থাকতে হবে একটা। মানে, বাইরে যতই না আস্ফালন করি আমি নিষ্কাম নির্বিকার হতে পারি নি। সুখে বিগত স্পৃহ বা দুঃখে অনুদ্বিগ্ন থাকবার মতো মনের জোর আমার নেই। আমি ভারতের শ্রেষ্ঠ আদর্শ পালন করতে অক্ষম। তাই দুঃখ পাচ্ছি। এটা আমার ন্যায্য পাওনা। আমি শুধু আমার ছেলে বউয়ের উপর কর্তৃত্ব করতে চাই নি অপর ছেলে মেয়েদের উপরও কর্তৃত্ব করবার লোভ আমার ষোল আনা। শিবুসমা, রাখাল, ভূপেন, বিনয় - এদের উপরও আমি আমার হুকুমের দাবী চাপাতে ব্যস্ত আমার স্পর্ধা সীমাহীন। ওদের আমি খুব ভালোবাসি তা ঠিক এবং সেইজন্যই মনে হয়েছিল ওরা সবাই আমার হুকুম মতো চলবে।। তা যখন চলে নি তখন বুঝতে হবে আমার ভালোবাসাতেই কোনও খুঁত আছে বোধহয়। কিম্বা ভালোবাসার হয়তো এখন শক্তিই নেই যার জোরে তা অপরের স্বাধীন ইচ্ছাকে স্বমতে আনতে পারে। সে হয়তো আমারই পায়ের

দড়ি। আমি অবশ্য কারো স্বাধীন ইচ্ছায় কখনও বাধা দিই নি। এইটুকুই হয়তো আমার সান্ত্বনা, কিন্তু এর জন্যে আমি মনে মনে অনেক কষ্ট পেয়েছি এইখানেই আমার পরাজয়।

আমার ব্যক্তিগত কথা থাক। দেশের দিকে চেয়েও তো তেমন আশ্বাস পাই না। স্বাধীনতার সাতাশ বছর কেটে গেল, আমরা কতদূর এগিয়েছি? ইংরেজদের আমলে আমাদের অনেক দুঃখ ছিল, অনেক অপমান, অনেক গ্লানি আমাদের জীবনকে বিষাক্ত করে রাখত, স্বাধীনতা পেয়েও তা কিন্তু কমে নি। সকলেই স্বার্থপর। সকলেই অসাধু। সেই সেকালের মাৎস্যন্যায়ের যুগ আবার ফিরে এসেছে যেন। দেশে মানুষ নেই, কেউ দেশকে ভালোবাসে না, কোন মহৎ আদর্শ নেই, দেশেব ছেলে মেয়েদের চবিত্র গঠনের কোনও প্রয়াস নেই। এখনও বিশ্ববিদ্যালয় কেরাণী তৈরিব কারখানা হয়ে আছে। বিদেশীদেব নানা চক্রান্তের আভাস পাওয়া যাচ্ছে মাঝে মাঝে। বিদেশীদের কাছে ঋণে আমাদেব মাথাব চুল পর্যন্ত বিকিয়ে গেছে। নাঃ, আর ভাবতে ইচ্ছে কবছে না। এইখানেই থামি—

লেখা বন্ধ কবে আবার বিদ্যাসাগরেব ছবিটার দিকে চাইলেন। মনে হল ওই লোকটাও এ দেশের ভালো করতে গিয়ে সারাজীবনটা কষ্ট পেয়েছে। সবাই ওকে ঠকিয়েছে।

হঠাৎ মনে হল বিদ্যাসাগরের চোখের দৃষ্টি যেন প্রখর হয়ে উঠল। তিনি যেন বললেন—' আমাব কথা ভাবতে হবে না তোমাকে। তুমি নিজের চরকায় তেল দাও—'

।। সাত ।।

শিশুসমা রাখালকে শুধু উদ্ধারই করে নি, আরও অনেক কিছু কবেছিল। রাখালের দোকানের সামনেব যে দোকানদারটি নবীন দত্তের নোট —এন দত্ত নাম দিয়ে চুরি করে ছেপেছিল তার নামে মোকদ্দমা রুজু কবে দিয়েছিল সে। তার বাবা ধীরেশবাবুর অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন একজন বড় এটর্নি। তিনিই এ ব্যাপারে তদ্বির করছেন। শিশুসমা একদিন এসে নবীন দত্তকে বললে সব। ভেবেছিল নবীন দত্ত বুঝি খুব বাহবা দেবেন। কিন্তু তিনি কিছু বললেন না। চুপ করে রইলেন।

'আপনাকে কিন্তু সাক্ষী দিতে হবে।'

'আমি ও সব পারব না।'

'শক্ত তো কিছু নয়, আদালতে গিয়ে শুধু বলবেন ওই এন, দত্তের নোটবুকে যা ছাপা হয়েছে তা আমারই লেখা, ওর পাণ্ডুলিপি রাখালের কাছে ছিল, তাকেই আমি ছাপবার অনুমতি দিয়েছিলাম, অন্য কাউকে দিই নি। আর একটা কি মজা হয়েছে জানেন? ওরা বলছে, এন. দত্ত নবীন দত্ত নয়, নিবারণ দত্ত।'

নবীন দত্ত হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন।

'আমি ওসব জোচ্চোরের ছায়া স্পর্শ করব না। আমাকে তুমি রেহাই দাও।'

'বেশ আপনাকে কোর্টে যেতে হবে না, আপনি লিখে দিন যে ওই এন. দত্ত মার্কা নোটবুকটা আপনারই, আর আপনিই সেটা ছাপবাব অনুমতি রাখালকে ছাড়া আর কারুকে

দেন নি। কোর্ট যদি আপনাকে শমন করে আপনি বলবেন—আমি খুব অসুস্থ। ডাক্তারের সার্টিফিকেট আমি যোগাড় করব—'

'আমি মিথ্যা কথা বলব কেন?'

'মিথ্যে কেন? আপনি সত্যিই তো খুব সুস্থ নন।'

নবীন দত্ত ভ্রূকুঞ্চিত করে চেয়ে রইলেন মেয়েটার মুখের দিকে। না ছোড়বান্দা জোঁক যেন একটা।

তাঁর ছাপা প্যাডটা নিয়ে শিশুসমা যা চাইছিল তাই লিখে দিলেন। না দিলে উঠবে না মেয়েটা।

শিশুসমা মুচকি হেসে বললে—' এইতেই হবে বোধহয়। যদি না হয় আপনাকে কোর্টে যেতে হবে না। যাতে বাড়িতে এসেই আপনার সাক্ষী নেওয়া হয় সে ব্যবস্থা করব।'

হঠাৎ নবীন দত্ত জিজ্ঞেস করলেন—' তুই এত কাণ্ড কবছিস কেন?'

'আমার রোখ চড়ে গেছে।'

উত্তরটা শুনে খুশী হলেন নবীন দত্ত।

প্রণাম করে শিশুসমা চলে গেল।—সে চলে যাবার পব একটা কথা মনে হল নবীন দত্তের—রাখাল তো আজকাল আসে না। ব্যাপাব কি।

।। আট ।।

নিমতলার শ্মশান ঘাটে গিয়ে বসেছিলেন নবীন দত্ত। মাঝে মাঝে এখানে আসেন তিনি। জায়গাটা যদিও মনোরম নয় তবু আসেন। ওই নিমতলা ঘাটেই তাঁর বাবা মহাপ্রয়াণ করেছেন। এই ঘাটেই তিনি আগুন দিয়েছেন তাঁর মুখে। তাঁকেও অবশেষে এইখানে আসতে হবে। তাঁর সংসারযাত্রার এইটেই শেষ স্টেশন। মনে হল তার মুখে আগুন দেবে কে? অলঙ্কার আগেই চলে গেছে, দুমও জার্মানিতে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনে হল এসব বাজে কথা ভেবে সময় নষ্ট করছি কেন। ওটা কি খুব দরকারি কথা? কেউ না কেউ দেবেই। তারপর হঠাৎ মনে হল তাঁকে নিমতলায় নিয়ে আসবার লোক কি জুটবে? পারুলও তো ছেলের কাছে চলে যাবে বলে কোমর বাঁধছে। সাবিত্রী আর তাঁর পৌত্রী দুটি তাঁর নিকটতম আত্মীয়। কিন্তু তারা--হঠাৎ তাঁর মনে হল প্রথম জীবনে অর্থকৃচ্ছ্রতার জন্য কনট্রাসেপশন-এর (contraceptpion) শরণাপন্ন হয়েছিলেন তিনি। এখন তাঁর মনে হল অন্তত একটা মূর্খ ছেলেও যদি থাকত তাহলে তিনি যেন বর্তে যেতেন। বিদ্বান না হয়ে মূর্খ হলেই যেন বেশী ভরসা পেতেন তিনি। কারণ মূর্খ হলেই সে তার কাছে থাকত, বিদ্বান হলে দূরে চলে যেত। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত মন আত্মধিক্কারে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। ছি, ছি, এত স্বার্থপর তিনি? নিজের স্বার্থেব জন্য এই হাস্যকর ঘৃণ্য কল্পনাও তাঁর মনে জাগছে? আশ্চর্য! মনের কদর্য পশুটা মরতে চায় না কিছুতেই। আত্মসুখের আশায় কান ধরে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে পশুটা। স্তম্ভিত হয়ে একটা জ্বলন্ত চিতার দিকে চেয়ে বসে রইলেন নবীন দত্ত। মনের নেপথ্যে আলো-আঁধারিতে চিন্তার একটা মিছিল চলছিল, সে দিকে লক্ষ্য ছিল না তাঁর। সমস্ত অতীত

জীবনটাই যেন অস্পষ্ট মিছিলের রূপ ধরে চলেছিল। হঠাৎ সেই মিছিলের ভিতর থেকে বেরিয়ে এলেন বিদ্যাসাগর। তাঁর দিকে যেন প্রকৃষ্টিত করে চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর বললেন— 'দেখ, আমি আমার একমাত্র ছেলেকে ত্যাগ করেছিলাম। শেষ বয়সে আমার আপন লোক কেউ আমার পাশে ছিল না। আমার তেজ সহ্য করতে পারে নি কেউ। কারো সঙ্গে আপোস করি নি আমি। যা ভালো বুঝেছি তা করেছি। মাথা চিরকাল উঁচু ছিল কিন্তু সুখী হই নি। সুখ যদি পেতে চাও আপোস করতে হবে, তোষামোদ করতে হবে, নিজের আদর্শকে দুমড়ে মুচড়ে নিজেকে খাপ খাওয়াতে হবে আর পাঁচটা মানুষের সঙ্গে। যদি পার সুখ পাবে, নচেৎ নয়।' বিদ্যাসাগর হঠাৎ এসেছিলেন আবার মিলিয়ে গেলেন। [illegible] নিছক এই কল্পনা। মনে হল যেন প্রত্যক্ষ দেখলেন।

বল হরি, হরি বোল।

আর একটা শব্দ এল।

নবীন দত্ত উঠে পড়লেন।

বাইরে বেরুলে নিতান্ত দরকার না হলে তিনি ট্রাম বাসে চড়েন না। হেঁটেই ঘোরেন। আজকাল রাস্তায় হাঁটা একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাস্তার দু ধারে তো আগেই, ফুটপাথেও পা ফেলবার জায়গা নেই। ফুটপাথেও সারি সারি দোকান। রাস্তাও ফুটপাথেই হকাররা। পেটে ব্যবসা করতে হবে তো। কলেজের কাছে এ সব নিয়ে প্রতিবাদ করেছেন অনেকে। নবীন দত্তও মনে করেন বাঙালিরা ঠিকই, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়, হয় সারে কেন? সারা ভারতবর্ষের লোকই তো কলকাতায় এসে ভিড় করছে, বাইরের লোকদের আসতে দেবে না, এ কথা কি বাংলাদেশ বলতে পারে? অন্য সব দেশে প্রাদেশিকতা আছে, বাংলাদেশ চিরকাল তার প্রতিবাদ করেছে। এখন কি সে বলতে পারে, না তোমরা কেউ এসো না! আর সকলকে বাদ দিয়ে সে কি চলতে পারবে? অন্য প্রদেশবাসীদের সঙ্গ ও সাহচর্য অপরিহার্য হয়ে উঠেছে তার পক্ষে। সে কি একলা থাকতে পারে? এই সব ভাবতে ভাবতে পথ চলছিলেন তিনি। হঠাৎ একটা ঝকঝকে সাদা মোটর গাড়ি নিঃশব্দে দাঁড়াল পাশে।

'স্যার'

চেয়ে দেখেন, ভূদেব গাড়ি চালাচ্ছে। বিজয় তার পাশে বসে রয়েছে। তাঁকে দেখে নেমে পড়ল তারা।

'আপনার বাড়ি থেকে আসছি। অনেক দিন ফিরে এসেছি।' বলল সে, 'আপনি আজকাল প্রায়ই বেরিয়ে যান। অথচ আমরা—'

'আমি তো তোমাদের বলেছি, আমি আর তোমাদের পড়াব না। কেননা আমার চেয়ে বেশী বিদ্বান হয়ে গেছ। অন্য ভাষা শেখ এবার—জার্মান, ফরাসী, স্প্যানিশ বা রাশিয়ান। এ সব পড়াবারও ভালো লোক না কি পাওয়া যায়। তাদের খোঁজ কর।'

'আমরা বড় একটা কাজ আরম্ভ করেছি দুজনে। বইটার নাম দেব ড্রামা। ইংরেজিতেই লিখব। পৃথিবীর সব প্রধান প্রধান ভাষায় যত ভালো ভালো নাটক আছে, তারই আলোচনা করব। আমাদের কালিদাস, ভবভূতি, ভাস থাকবেন, গিরিশ ঘোষ, রবীন্দ্রনাথও থাকবেন।

ভারতের অন্যান্য ভাষায় নাটকেরও সন্ধান নেব। আমরা! আপনাকে আমাদের 'গাইড' হতে হবে—'

আর্তকণ্ঠে বলে উঠলেন নবীন দত্ত—'আমি শ্রান্ত, ক্লান্ত, জর্জরিত—তাছাড়া আমার অত বিদ্যে নেই। আমাকে রেহাই দাও তোমরা—'

বিনয় বলল—'আচ্ছা. আপনি যা বলবেন, তাই হবে। কোথা যাচ্ছেন এখন —'

'বাড়ি যাচ্ছি—'

'চলুন, আপনাকে পৌঁছে দিই।

নবীন দত্ত গাড়িতে উঠতে রাজী ছিলেন না। কিন্তু রাস্তার মাঝখানে একটা 'সীন' করবার ইচ্ছা হল না তাঁর। উঠে পড়লেন। ভূপেন ছেলেটি খুব বুদ্ধিমান।

সে বলল—'স্যার, আপনিই আমাদের বরাবর পড়িয়েছেন। সাহিত্যের মর্মস্থলে আপনিই অমাদের নিয়ে গিয়ে পৌঁছে দিয়েছেন। আপনি তোতাপাখীর মতো নোট মুখস্থ কবান নি, আপনি সাহিত্য-বোধ জাগাতে চেষ্টা করেছেন আমাদেব মনে। আপনি সত্যিই আমাদের গুরু। এখন আমরা এ তো বড় একটা কাজে হাত দিতে যাচ্ছি, আপনাকে বাদ দিয়ে তা কি সম্ভব? আপনাকে স্যার, থাকতেই হবে। শেকসপীয়রের নাটকগুলো সম্বন্ধে আপনিই ভূমিকা লিখবেন।'

'কিন্তু আমাব বযস হয়ে গেছে, কিছু লিখতে ইচ্ছে করে না।'

'আপনাকে লিখতে হবে না। আপনি ডিকটেট করবেন, আমরা টুকে নেব।'

'লেখবার মেজাজও থাকে না যে সব সময়ে। তোমরা এলেই বিবক্তি ধরে, মনে হয় উঠগে বাঁচি এ রকম লোককে নিয়ে তোমাদের চলবে কি করে? আমাকে বাদ দাও।'

উভয়েই সমস্বরে বলে উঠল—' না স্যার, তা হয় না।'

নবীন দত্ত বুঝলেন, এদের সঙ্গে তর্ক করা বৃথা। চুপ করে রইলেন। তাঁর বাড়ির সামনে তাঁকে নামিয়ে দিয়ে বিনয় বলল—'আমরা রোজই আসব স্যাব। যেদিন আপনার 'মুড' থাকবে সেই দিনই লেখাপড়া হবে— তা না হলে চলে যাব।'

'বেশ—'

ঘরে ঢুকেই নবীন দত্ত একটি পোস্ট কার্ড পেলেন। দেবনাথের পিসি বিশাখা লিখেছে। ছোট চিঠি।

মান্যবরেষু দাদা, দেবনাথকে আমি দূর করে দিলাম। ও কুলাঙ্গার। মতিচ্ছন্ন হয়েছে। একটা কৈবর্তের মেয়েকে বিয়ে করেছে। তুমিও ওকে বাড়িতে ঢুকতে দিও না। যদি আসে গলাধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দাও। আমি ঝাঁটাপেটা করে বিদেয় করেছি। প্রণাম নিও। বৌদিকে দিও। ইতি বিশাখা।

নবীন দত্ত পোস্ট কার্ডটার দিকে ভ্রূকুঞ্চিত করে চেয়ে রইলেন। যদিও এসব জিনিস আজকাল হচ্ছে তবু তিনি দেবনাথের কাছে এটা আশা করেন নি। তাঁর ধারণা ছিল ছোকরাটি ভালো। কিন্তু এ কি কান্ড!

বিদ্যাসাগরের ছবির দিকে চাইলেন। মনে হল তাঁরও চোখে মুখে একটা নীরব ব্যঙ্গ যেন ফুটে উঠল। শেষে মনে হল তিনি নীরব ভাষায় যেন বললেন—সহ্য কর। উপায় কি!

একটু পরেই পারুলবালা এসে বললেন—'চল খাবে চল।'

'এত তাড়াতাড়ি কেন?'

মুখপুড়ি বিকেলে খানিকটা মাংস দিয়ে গেছে। কালীঘাটে মানত ছিল ওর। পাঁঠা বলি দিয়েছিল। সেই মাংস কুকারে রেঁধেছি। গরম গরম লুচি দিয়ে এখনই খেয়ে নাও না। আটটা তো বাজে।'

'চল।'

খেতে খেতে নবীন দত্ত বিশাখার চিঠির কথা বললেন। পারুলবালা বললেন, এ খবর আমি তো সাত দিন আগেই পেয়েছি। তোমার কষ্ট হবে বলে বলি নি।'

'তুমি কি করে খবর পেলে?'

'দেবুই আমাকে চিঠি লিখেছে।'

উঠে গিয়ে একটি ইনল্যান্ডের চিঠি এনে দিলেন।

খাওয়া শেষ করে চিঠিটি পড়লেন নবীন দত্ত। ছোট্ট চিঠি।

"শ্রীচরণেষু—

মামীমা, আমি একটি অপরাধ করে ফেলেছি। জানি না আপনাদের কাছে ক্ষমা পাব কি না। মামাবাবুকে ভয়ে চিঠি লিখতে পারি নি। জানি না আপনার আশীর্বাদ পাব কি না। আমি একটি কৈবর্ত মেয়েকে বিয়ে করেছি। বিয়ে করতে বাধ্য হয়েছি। আমার পদস্খলন হয়েছিল। এ জন্য আমি খুবই লজ্জিত। কিন্তু মনে হল —ওকে বিয়ে যদি না করি, তাহলে আরও লজ্জার কারণ ঘটবে। আপনাদের আশীর্বাদ সততই কামনা করি। ইতি— প্রণত দেবু।

'এ চিঠির তুমি কোনও উত্তর দিয়েছ?'

'একটা পোস্ট কার্ডে লিখে দিয়েছি, তুমি বাবা বাধ্য হয়ে বে লাইনে চলে গেলে এ খবরে খুব সুখী হতে পারলাম না। তবু আশীর্বাদ করছি সুখী হও। আর কি লিখব?'

নবীন দত্ত আর কিছু বললেন না। উপরে উঠে গেলেন। উপরে উঠে গিয়ে শুয়ে পড়লেন। কিছুতে ঘুম এলো না। তারপর আলো জ্বেলে পড়বার চেষ্টা করলেন। ভালো লাগল না। বই বন্ধ করে আলো নিবিয়ে ছাতে এসে পায়চারি করতে শুরু করলেন। অনেকক্ষণ পায়চারি করলেন। মনের মধ্যে একটা ভাষাহীন কষ্ট টনটন করতে লাগল ফোড়ার মতো। আকাশের দিকে চেয়ে দেখলেন, অগণ্য নক্ষত্র। ছেলেবেলায় যেমন দেখেছিলেন ওরা এখনও তেমনি আছে। স্বাতী আর চিত্রা দূরত্ব বদলায় নি। অভিজিৎও ঠিক জায়গায় আছে। আকাশ-গঙ্গাও তেমনি ভাবেই বইছে। ছেলেবেলায় যে সমাজ ছিল সেটাই বদলে যাচ্ছে শুধু। বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লেন শেষে। চোখের উপর একটা ছবি ফুটে উঠল। একটা নদী যেন প্রলয়ঙ্করী হয়ে উঠেছে। ধস্ ভাঙছে। গ্রামের পর গ্রাম লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। মনের মধ্যে প্রশ্ন জাগল—নদীটা কে? কিন্তু কোনও উত্তর এল না মাথায়। স্বপ্নে দেখলেন যেন বিদ্যাসাগর এসেছেন। বলছেন— নদী তুমি, নদী আমি। আমরাই গড়ছি, আমরাই ভাঙছি।

।। নয় ।।

কয়েকদিন পরে শিশুসমাব চিঠি এল একটা। নবীন দত্ত প্রথমে বুঝতেই পারেন নি এটা

শিশুসমার ছিঠি। খামটা উলটে পালটে দেখলেন। হাতের লেখাটা চেনা মনে হল তবু বুঝতে পারলেন না কার চিঠি। তাঁরকাছে খামের চিঠি বড় একটা আসে না। খামটা খুলে অবাক হয়ে গেলেন কি এত লিখেছে শিশুসমা। ভ্রুকুঞ্চিত করে পড়তে শুরু করলেন।

শ্রীচরণেষু,

কাকাবাবু, আমার চিঠি পেয়ে আপনি একটু অবাক হবেন হয়তো। আগে তো কখনও আপনাকে চিঠি লিখি নি। লেখবার দরকারই হত না। আগে তো প্রায়ই আমার কাছে আপনি আসতেন। আজকাল আর আসেন না। মনে হয় আমার উপর রাগ করেছেন। কেন করেছেন তা জানি না। মকোদ্দমা করে আমি সেই জুয়াচোরটাকে জব্দ করেছি। আপনার নোট সে দশ হাজার কপি ছেপেছিল। কোর্টের রায় অনুসারে সে বইগুলো এখন আমাদের দখলে এসেছে। রাখালই তার বিলি ব্যবস্থা করছে। সে একটা ভালো দোকান ভাড়া করে বইয়ের ব্যবসায় আবার নেবেছে। টাকাকড়ি অবশ্য সবই আমি দিয়েছি। রাখাল বলছে সে আপনাকে না কি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে বইটার জন্য আপনাকে পাঁচহাজার টাকা দেবে। সে টাকাটা সে আপনাকে দিতে চায়। আমিও ওর দোকানের অংশীদার হয়েছি। আপনি অনুমতি করলেই আমি আপনাকে গিয়ে টাকাটা দিয়ে আসব। আপনার মনে নিশ্চয়ই প্রশ্ন জাগছে আমি রাখালের ব্যাপারে এতো জড়িয়ে পড়েছি কেন। জড়িয়ে পড়েছি তার কারণ রাখাল ছেলেটা বড় অসহায়। প্রথমত ও খুব গরিব, দ্বিতীয়ত খুব বোকা আর ভীতু। সংসারে চলতে হলে শুধু ভালোমানুষ হলেই চলে না, পৌরুষ চাই। ও তো আপনার ছাত্র, পড়াশোনায় খুব ভালো, স্বভাব চরিত্রও চমৎকার, কিন্তু এতো মুখচোরা যে কারও সঙ্গে ভালো করে কথা কইতে পারে না। কেরাণীগিরি পেলে ও হয়তো তা করতে পারত, কিন্তু চাকরিতে উন্নতি হত না। অথচ এতো ভালো, এতো নিরহঙ্কার, এতো সৎ যে কি বলব। তাই আমার মনে হয়েছে ওকে সাহায্য করা উচিত। আমারও তো কোনও কাজ নেই। সেতার শিখছি বটে, কিন্তু খালি সেতার নিয়ে কি সারাক্ষণ থাকা যায়? তাছাড়া আর একটা কথা আবার মনে হয়েছে। সুর নিয়ে সারাক্ষণ তন্ময় হয়ে থাকবার মতো মন আমার নয়। আমি ঠিক সুর শিল্পী গুণী নই। আমি ফ্যাসানের খাতিরে বাজনা শিখতে শুরু করেছিলাম। কিন্তু ক্রমাগত ডারা ডাগা করে আমার মন ভরছে না। বাবা যখন বেঁচে ছিলেন তখন বাবাকে নিয়ে অনেক সময় কাটত। এখন একা নিজেকে নিয়ে কি করব ভেবে পাচ্ছিলাম না। এমন সময় রাখলকে দিয়ে গেলেন আপনি। ভাবলাম ওর সঙ্গে বইয়ের ব্যবসাতে নেবে পড়ি। রাখালের মতো সৎ ছেলে যদি সাহায্যকারী হয় আর আমি যদি ভালো মূলধন দিতে পারি তাহলে ব্যবসাটা ভালোই চলবে বলে মনে হয়। আমি ভালো বইয়ের দোকান করতে চাই একটা। বাংলা, ইংরেজি আর সংস্কৃত বই রাখব ভেবেছি। ভালো হবে না? আর একটা অনুরোধ করতে ইচ্ছে করছে কিন্তু সাহস হচ্ছে না। আপনি আমাদের পেট্রন হবেন? মাঝে মাঝে আমি গাড়ি পাঠিয়ে দেব, আপনি আমাদের দোকানে আসবেন, আমাদের পরামর্শ দেবেন। আপনি যদি আপত্তি না করেন এর জন্য মাসে মাসে কিছু দক্ষিণাও আপনাকে দেব। আপনি আসুন আমাদের মধ্যে। আপনার উত্তরের প্রতীক্ষায় থাকব। আমার সভক্তি প্রণাম গ্রহণ করুন। ইতি—প্রণতা

শিশুসমা

চিঠি পড়া শেষ করে তিনি স্বগতোক্তি করলেন—'সবাই টাকা দিয়ে আমাকে অনুগ্রহ

করতে চায়। সবাই সামনে এসে টাকার থলি নাড়ছে' তাঁর হঠাৎ মনে পড়ল দুম যাওয়ার সময়ে তাকে পাঁচহাজার টাকা দিয়ে গিয়েছিল। সেটা তিনি রেখে দিয়েছিলেন ফুলদানীর মধ্যে, খরচ করেন নি। গিয়ে দেখলেন, টাকাটা তেমনিই আছে। একবার মনে হল দুমকে পাঠিয়ে দিই টাকাটা। আবার ভাবলেন একটু। নাঃ থাক, ছেলেটা কষ্ট পাবে। টাকাটা না হয় পারুলকেই দিয়ে দেব।

শিশুসমাকে ছোট্ট একটা চিঠি লিখলেন।

মা শিশুসমা,

আমি বুড়ো হয়ে গেছি। আমার দ্বারা আর কিছু হবে না। আমি যা পেন্সন পাই তাতেই আমার বেশ চলে যাবে। বেশী টাকার দরকার নেই। টাকা না হলে সংসার চলে না তা ঠিক, কিন্তু বেশী টাকা হলে যে সব সমস্যা অনিবার্য তা সমাধান করবার শক্তি আমার নেই। আশীর্বাদ জেন। ইতি —শুভার্থী

নবীন দত্ত

॥ দশ ॥

সামান্য ঘটনা। নবীন দত্তের মনে কিন্তু গভীরভাবে দাগ কাটল। মনে হল তাঁর মর্মের কোমলতম অংশে কে যেন ছুরি চালিয়ে দিলে। হেঁটে হেঁটে যাচ্ছিলেন। ফুটপাতে হঠাৎ হোঁচট খেলেন। পড়তে পড়তে সামলে গেলেন টাল খেয়ে। একজন লোক ধরে ফেলল তাঁকে। উপদেশও দিল—'রাস্তা দেখে চলতে পারেন না মশায়।' নবীন দত্ত তাঁকে নমস্কার করে আবার এগিয়ে গেলেন। কোনও জবাব দিলেন না। কিছুদূর গিয়ে দেখেন মোড়ে চার পাঁচটা ছেলে দাঁড়িয়ে জটলা করছে। সকলেরই মাথায় বড় বড় চুল। মুখে গোঁফ দাড়ি। হিপির নকল। তাদের পাশ কাটিয়ে সরে যাচ্ছিলেন, এমন সময় তাদের মধ্যে থেকে কে একজন বলল, 'ওই দেখ শ্লা নবীন দত্ত যাচ্ছে। এক্কের নম্বর হারামি বেটা, আমাকে ইংরেজিতে ফেল করিয়ে দিয়েছিল।'

নবীন দত্ত ঘাড় ফেরালেন না।

সোজা চলে গেলেন।

কিন্তু তাঁর অন্তরাত্মা বলতে লাগল—ধরণী দ্বিধা হও, প্রবেশ করি। বেরিয়েছিলেন হরতুকি কেনবার জন্য। একটি বিশেষ দোকান থেকে হরতুকি কেনেন তিনি। দোকানদারটি বুড়ো। তাঁকে খাতির করে, বেছে বেছে ভালো হরতুকি দেয়। শুধু দেয় না, জাঁতি দিয়ে কুঁচিয়ে টুকরো টুকরো করে দেয়। হরতুকি কিনে বাড়ি ফিরলেন। সেখানে একটি দুঃসংবাদ অপেক্ষা করছিল। টেলিগ্রাম এসেছে—মা খুব অসুস্থ— অবিলম্বে চলে এস।

পারুলবালা মেয়ের বাড়িতে গিয়েছিলেন টালিগঞ্জে। এক ঘন্টা পরে কাশীর গাড়ি। সে গাড়ি ধরতে না পারলে আজ যাওয়া হবে না। তিনি ঠিক করলেন একাই যাবেন। নিচের ভাড়াটেদের সব কথা বলে একাই বেরিয়ে গেলেন তিনি ট্যাক্সি করে। কাশীর ট্রেন ধরলেন ঠিক।

মণিকর্ণিকার ঘাটে মায়ের চিতা পুড়ছিল।

তার দিকে চেয়ে হাপুস নয়নে কাঁদছিলেন নবীন দত্ত। তাঁর বয়স চুয়াত্তর বছর। মা মারা

গেলেন চুরানব্বই বছর বয়েসে। দুঃখ করবার কি আছে এতে? নবীন দত্ত তবু শিশুর মতো কাঁদছিলেন। তাঁর মনে হচ্ছিল—শুধু মা নয়, তাঁর সব যেন পুড়ে যাচ্ছে।

।। এগারো ।।

এক বছর কেটে গেছে।

নবীন দত্তের মতি গতি কিন্তু আজও বদলায় নি। কিন্তু এই এক বছরে অনেক কিছু ঘটে গেছে তাঁর জীবনে। পারুলবালা প্রতাপকে নিয়ে জার্মানি চলে গেছেন। তাঁর ছাত্র দুটিও—ভূপেন আর বিনয়— চলে গেছে আমেরিকায়। সেখানেই তারা বড় ইউনিভারসিটিতে চাকরি পেয়েছে। সেখানেই নাটক নিয়ে গবেষণা করবে তারা। শিশুসমার সঙ্গে রাখলের বিয়ে হয়েছে। রাখাল নিজের বাড়ি ছেড়ে এখন শ্বশুর বাড়িতে থাকে। রাখালের বাবা কেরাণী ছিলেন, অতি কষ্টে একটা গলিতে জরাজীর্ণ বাড়িতে বাস করেন। রাখালই তাঁকে নাকি টাকা দেয় মাসে মাসে। বৃদ্ধ বহুকাল আগে বিপত্নীক হয়েছিলেন। রাখালের এক বিধবা বোন তাঁর দেখা শোনা করে। সাবিত্রীও বিয়ে করেছে খগেশ্বর হাজরাকে। শুধু তাই নয়, সাবিত্রীর মেয়েদের পদবীও এখন নাকি দত্ত নেই, হাজরা হয়ে গেছে। দুম মাঝে মাঝে তাঁকে বৃত্তি পাঠায়। পারুলবালা গিয়ে চিঠি লিখেছিলেন। সবই সেখানে নাকি চমৎকার, অপূর্ব। দুমের বান্ধবী সেই মেয়েটি না কি স্বর্গের দেবী। নবীন দত্ত কোনও উত্তর দেন নি। একটি কাজ তিনি করেছিলেন- বাড়িটা এক লক্ষ টাকায় বিক্রি করে দিয়ে টাকাটা ব্যাংকে রেখে দিয়েছিলেন।

কারমাটাড়ে গিয়ে ছোট্ট একটা বাড়ি ভাড়া করে একাই থাকেন এখন। একটা ছোঁড়া সাঁওতাল চাকর তাঁর রান্না বান্না করে।

বিদ্যাসাগরের ছবিটা তিনি সঙ্গে এনেছিলেন।

বিদ্যাসাগরও শেষ বয়সে কারমাটাড়ে ছিলেন—এইটেই তাঁর সান্ত্বনা। সমস্ত দিন তিনি মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়ান, মনে হয় লাঞ্ছিত বিদ্যাসাগরের আত্মাকে তিনি খুঁজছেন। জানেন দেখা পাবেন না, তবু খুঁজছেন। কারণ, আর কিছু করবার নেই।



বনফুল

রচনাবলী ২৩